শওকত ওসমান

উপন্যাস সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেক্‌ড়ে অরণ্য
জলাংগী
পতঙ্গ পিঞ্জর
আর্তনাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

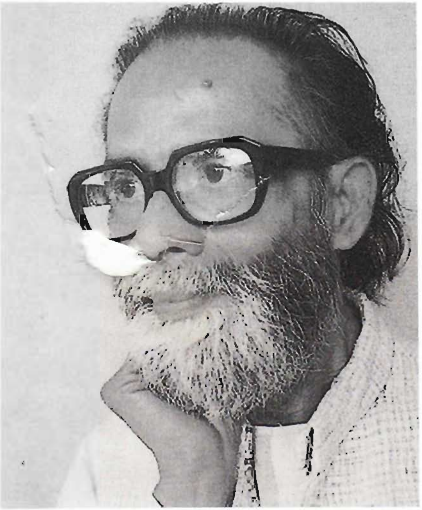

শওকত ওসমান এটি লেখকের ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান। পিতা: শেখ মোহম্মদ এহিয়া, মাতা: গুলেজান বেগম। জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯১৭, পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার খনাকুল থানার সবলসিংহপুর গ্রামে। পাড়ার নাম মেহেদি-মহল্লা।

গ্রামের মাদ্রাসার লেখা-পড়া শেষে ১৯২৯-এ ভর্তি হন কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়ায়। ১৯৩৩ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ.পাস করেন। এখান থেকেই বি.এ পাস ১৯৩৬ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বাংলায় এম.এ. ১৯৪১ সালে।

ছাত্র জীবনেই বিয়ে করেন হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের শেখ কওসর আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনকে ১৯৩৮ সালের ৬ই মে।

১৯৪১ সালে কলকাতা কমার্স কলেজে বাংলার প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। দেশ-বিভাগের পর অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মত করে অপশান দিয়ে চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কমার্স কলেজে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে দুই বাংলায় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটায় তাঁর পুরো পরিবার চট্টগ্রামে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তখন থেকে চট্টগ্রামে ৩৪বি চন্দনপুরায় বসবাস করেছেন। ১৯৫৯-এ ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসেন এবং পূর্বে মোমেনবাগে কেনা জায়গায় বাড়ি করেন এবং আমৃত্যু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭এ মোমেনবাগে কাটিয়ে গেছেন।

১৯৭০ সালে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময় কাটান কলকাতায়।

১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর গ্রহণ করেন, লেখায় পুরো সময় দেবেন বলে।

১৯৭৫-এ ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে ভীষণ মনোকষ্টে ভোগেন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় আশ্রয় নেন। ফিরে আসেন ১৯৮১ সালে।
ভ্রমণ করেছেন নানা দেশ : পাকিস্তান, ভারত, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক ও ইরান।

১৯৯৮-এ ২৯-এ মার্চ হঠাৎ সেরিব্রাল এ্যাটাকে আক্রান্ত হন। ১৪ই মে সকাল ৭-৪০ মিনিটে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছেলেবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। প্রথম কিছুদিন লেখেন কবিতা। পরে আসেন গদ্যে। নিরন্তর লিখে গেছেন, নাটক, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, রস-রচনা, রাজনৈতিক লেখা, শিশুতোষ রচনা, এমন কি কাব্য রচনাও করেছেন ব্যঙ্গ আকারে। অনুবাদও করেছেন প্রচুর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন। বাংলা একাডেমী, স্বাধীনতা ও একুশে পদকসহ পেয়েছেন দেশের সব পুরস্কার ও পদক। তাঁর 'জননী', 'ক্রীতদাসের হাসি', 'রাজসাক্ষী' ও 'জলাংগী' উপন্যাসসহ বেশ কিছু ছোটগল্পের সংকলন ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে।

তাঁর পরিবারের সব সদস্যই শিল্পী। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুলবন ওসমান সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের শিল্পকলার ইতিহাসের প্রফেসর। মধ্যম পুত্র আসফাক ওসমান মৃৎশিল্প-শিল্পী। তৃতীয় সন্তান ইয়াফেস্ ওসমান স্থপতি। কনিষ্ঠ পুত্র জাঁনেসার ওসমান চলচ্চিত্র নির্মাতা।

ISBN 984-458-348-9

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

9 789844 583481

শওকত ওসমান

উপন্যাস সমগ্র

৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই–

উপন্যাস

জননী
ক্রীতদাসের হাসি
বণী আদম
জাহান্নম হইতে বিদায়
উপন্যাসসমগ্র ১
উপন্যাসসমগ্র ২
উপন্যাসসমগ্র ৩
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র ১

গল্পগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠগল্প
গল্পসমগ্র
পিঁজরাপোল
ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী
বিগত কালের গল্প
উপলক্ষ্য

মুক্তিযুদ্ধ

কালরাত্রি খণ্ডচিত্র
১৯৭১ : স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর

স্মৃতিকথা/আত্মকথা

রাহনামা ১
রাহনামা ২
উত্তরপর্ব মুজিবনগর

কিশোরসাহিত্য

কিশোরসমগ্র ১
কিশোরসমগ্র ২

অন্যান্য

হস্তারক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত ওসমান

উপন্যাস সমগ্র

৩

সময় প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসসমগ্র ৩
শওকত ওসমান

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০২

সময়

সময় ৩৪৮

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
ওয়াটার ফ্লাওয়ার
২৮/এ কাকরাইল, ঢাকা

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স, প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

মূল্য : ৩২৫.০০ টাকা মাত্র

UPANYASHSAMAGARA-3 by Shaukat Osman. First Published: Bookfair 2002. 3rd Print: April 2013 by Farid Ahmed. Somoy Prakashan. 38/2ka Banglabazar. Dhaka.

Web : www.somoy.com E-mail : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 325.00 Only

ISBN 984-458-348-9 Code : 348

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : **'সময় . . .'** প্লজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা । ফোন: ৯১১ ৬৮৮৫

অন লাইনে পাওয়া যাবে: www.rokomari.com, www.boi-mela.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

এটি বাবার লেখা উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড। প্রকাশিত উপন্যাসের যে-সব বই পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যাচ্ছে এর মোট সংখ্যা চৌদ্দ (১৪)। অপ্রকাশিত উপন্যাস থাকার সম্ভাবনা কম। কারণ লেখার মধ্যে বাজারে উপন্যাসের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। সুতরাং অছাপা উপন্যাস থাকার কথা নয়। তবু যদি পরে কোন অপ্রকাশিত রচনা পাওয়া যায় তা পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভূক্ত হবে। আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি মোট উপন্যাস এই চৌদ্দটি । প্রথম খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে চারটি উপন্যাস : বণী আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি ও চৌরসন্ধি— দ্বিতীয় খণ্ডে আছে ছ'টি : সমাগম, রাজা উপাখ্যান, জাহান্নম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, রাজসাক্ষী ও পিতৃপুরুষের পাপ। এই খণ্ডে থাকছে : নেকড়ে অরণ্য, জলাংগী, পতঙ্গ পিঞ্জর ও আর্তনাদ।

'নেকড়ে অরণ্য' একটি মাত্র সেটে কাহিনীর বিন্যাস। মোটা করোগেটেড টিনে তৈরি গুদাম ঘরে গ্রামের মহিলাদের ধরে এনে জমা করে পাক-বাহিনী নির্যাতন চালাত। নানা নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলে। উপন্যাসটি ১৯৭২ সালের রচনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি করুনতম দিক হলো নারী নির্যাতন। পৃথিবীর সব দেশেই যুদ্ধে নারী ও শিশুরা নির্যাতিত হয়। আমাদের দেশে এটি ঘটেছে ব্যাপক হারে। তার অন্যতম কারণ হলো বিবেক বর্জিত হয়ে দেশের এক শ্রেণীর লোক পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করে এবং নারীদের সেনাদের হাতে তুলে দেয়।

'জলাংগী' উপন্যাসটি ১৯৭৩ সালে লেখা। এটির একটি অনুবাদও বের হয় বম্বে থেকে। তখন এর নামকরণ করা হয় 'বাঁকাজল'। এটির অনুবাদক হলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। 'বাঁকাজল' একটি গ্রামের নাম। মেঘনার পাড়ে অবস্থিত। এখানের এক মুক্তিযোদ্ধা জমির আলী-- গ্রামের জোহরার সঙ্গে ছিল তার ভালোবাসার সম্পর্ক। জমির আলী মুক্তিবাহিনীর অপারেশন করে। তাদের বাড়ি সেনারা পুড়িয়ে দেয়। তাদের গ্রাম থেকে চলে যাওয়া জোহরার খোঁজ নেবার জন্যে কাজীর চরে গেলে রাজাকাররা তাকে মেজর হাশেমের হাতে তুলে দেয়। মেজর হাশেম জোহরা ও জমির আলীর গলায় পাথর বেঁধে মেঘনার বুকে নিক্ষেপ করে। জমির ও জোহরা মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে তাদের প্রিয় স্লোগান চিৎকার করে বলে যায় : জয় বাংলা... কাহিনীর সঙ্গে এখানেই যবনিকা।

'পতঙ্গ পিঞ্জর' উপন্যাসের প্রকাশ কাল ১৯৮৩ এবং প্রকাশ করে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। উপন্যাস শুরুর আগে অর্ধ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকায় লেখক লিখছেন :

আমি এবং আবু জাফর শামসুদ্দীন চৌদ্দ বছর পূর্বে সংসারের ঝামেলা মুক্ত আবহাওয়ায় অবসর ও কাজ একত্রে মেলানোর তাগিদে কুমিল্লার এক ডাকবাংলা-জাতীয় ডেরায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখানেই এই উপন্যাসের একটি অধ্যায় খসড়া হয়। তারপর আর এগোয়নি। ১৯৭৮ সনে পুনরায় বিবাগী এক অবসর-কালে উপন্যাসটি শেষ হয়।

আরো পাঁচ বছর পরে জনাব মহিউদ্দিন আহমদ স্বতোপ্রণোদিত আন্তরিকতায় এই উপন্যাস জন-সমক্ষে তুলে ধরার জন্যে এগিয়ে আসেন.....

উপন্যাসটি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দীর্ঘকাল লেগেছে এটি লিখিত ও প্রকাশিত হতে।

১৯৭৮ সালে রচনাটি যখন শেষ করছেন তখন তিনি ছিলেন কলকাতায়। ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে বাবা খুব শক্‌ড হন এবং এতটা শোক-বিহ্বল হয়ে পড়েন যে আমরা বাবাকে বার বার অনুরোধ করি কলকাতা থেকে কিছু দিন বেড়িয়ে আসতে।

তিনি ১৯৭৫-এর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের দিকে কলকাতা যান। তারপর কলকাতায় থাকাকালীন সময় বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে নানা রকম গুজব শোনার ফলে দীর্ঘ ছ'বছর কাটিয়ে ১৯৮১ তে বাংলাদেশে ফেরেন। তৎকালীন সরকার অবশ্য তাঁকে কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করেনি এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির জন্যে, যেটা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল এবং অল্প দিনের মধ্যে তিনি নিজের সৃষ্টির কাজে পূর্ণ নিয়োজিত হন। যদিও প্রবাসকালে সময় মত খাওয়া-দাওয়া না করার ফলে টিবি নিয়ে ফেরেন। তবে সুচিকিৎসার ফলে ছ'মাসের মধ্যে তিনি পুরো রোগ মুক্ত হন।

AMARBOI.COM

ঢাকায় সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন পড়শি হিসেবে ছিলেন তাঁর নিত্য দিনের সঙ্গী। সকাল-বিকাল দু'জন ভ্রমণে বেরতেন। আর বাবার ছিল বেড়ানোর সখ। আমার দাদা শেখ মহম্মদ এহিয়ার মধ্যেও ছিল এই প্রবণতা। তিনি অবশ্য শিল্পী-স্যাহিত্যিক ছিলেন না। ছিলেন একজন কর্মজীবী মানুষ। মাঝে মাঝে সংসার ছেড়ে উধাও হয়ে যেতেন এবং আমার পরিষ্কার মনে আছে ছেলেবেলায় প্রায় শুনতাম দাদি অভিযোগ করতেন : খায় দায়, বলপাই ধায়। বলপাই হলো আমাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরের আর একটি গ্রাম। দাদা অভিযোগের কোন জবাব দিতেন না। অস্বচ্ছল পরিবারের কর্তারা যে-ভাবে চুপ করে থাকে তিনি তেমনি নিশ্চুপ থাকতেন।

আমরা যখন চট্টগ্রামে ছিলাম তখনও বাবা চট্টগ্রামে বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। তখন ছিলেন পূর্ণ যৌবনে। নতুন দেশ, নতুন জায়গা সব কিছুর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড কর্ম-উন্মাদনা। চট্টগ্রামে করছেন দুই বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে সংস্কৃতি সম্মেলন, সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন 'কৃষ্টি কেন্দ্র' গড়ার। আর চলছে অনর্গল লেখা। এই সময় 'নিশো' উপন্যাস অনুবাদ করেন যা কোলকাতায় ছাপা হয়। পরে এটি 'পার্বত্য নন্দিনী' নামে প্রকাশ পায়। সংসার চালিয়ে নিজের পয়সায় ছাপছেন 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প'। এ-ছাড়া 'ছোটদের কথা রচনার কথা'-ও নিজের পয়সায় ছাপেন। চট্টগ্রাম থেকে ডেলিগেট নিয়ে যাচ্ছেন মওলানা ভাসানীর কাগমারি সম্মেলনে। দেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্ম-কাণ্ডের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, কিন্তু এই পার্টির সদস্যদের সঙ্গেই ছিল তাঁর ওঠা-বসা। পঞ্চাশের দশকের চট্টগ্রামের পুরো সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি জড়িত ছিলেন। আর সত্যি বলতে কি তাঁর ভারত বিভাগের পর কলকাতার অধ্যাপনা ছেড়ে চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে অপশান দিয়ে আসাটাও তাঁর ভ্রমণ-পিপাসু মনের তাগিদটিকেই অন্যতম কারণ হিসেবে ফুটিয়ে তোলে।

পশ্চিমবঙ্গে পঙ্গপালের আক্রমণে অনেক সময় মাইলের পর মাইল গাছ-পালা ও শস্যাদি বিনষ্ট হতে দেখেছে অনেকে। এই বাস্তব ঘটনাটিকে শওকত ওসমান একটি রূপক জালে আবদ্ধ করে রচনাটি নির্মাণ করেছেন। পঙ্গপালের আক্রমণকে গ্রাম্য-অশিক্ষিত বাঙালি মুসলমানগণ অনেক সময় আল্লার অভিশাপ হিসেবে বিবেচিত করেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে দেখেনি। আমাদের গ্রাম-বাংলায় এখনো ফতোয়া, পানিপড়া ইত্যাদি সংস্কার জনিত ব্যাপারগুলো সবংশে বিস্তারিত হয়ে রয়েছে। আজকে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও মানুষের এ-সব থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা তেমন করে নেই। বরং ধর্ম কেন্দ্র করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে সেই অর্ধশিক্ষিত মৌলবী শ্রেণী এটিকে নতুন করে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছে। এই ব্যাপারটি উপন্যাসে খুবই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং শওকত ওসমান তাঁর পুরো সাহিত্যকে এ-সব সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। এই উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

উপন্যাস শুরু হচ্ছে এ-ভাবে :

আধা-গ্রাম, আধা-শহর নয়, নিছক মফ:স্বল এলাকা। ঘোড়া-টানা টাংগা আছে। বাংলাদেশের অখ্যাত জরিপ-বহির্ভূত এই এলাকার অন্য পরিচয় আপাতত অবান্তর।

AMARBOI.COM

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জায়গাটি বাংলার মানচিত্রে অবস্থিত হলেও নির্দিষ্ট কোন জায়গা নয়। বরং এটি একটি নমুনা-অঞ্চল। বাংলার মফস্বলের সব জায়গার সঙ্গে এর মিল হবে। অর্থাৎ বাংলার সব জায়গার যে প্রায় একই চরিত্র এতে এটাই ধরে নেয়া যায়। অঞ্চল ভেদে ভৌগোলিক পার্থক্য থাকলেও মানুষের মানস ও সংস্কৃতি প্রায় একই আদলের। পিছিয়ে পড়া সংস্কারাবদ্ধ জীবনধারা চলছে তো চলছেই।

লেখক অবশ্য এই গ্রামের একটি নাম দিয়েছেন গৌড়গ্রাম।

গৌড় তো এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল এটি সেই গৌড় ধরার কোন কারণ নেই। বরং গৌড়গ্রাম সব গ্রামেরই প্রতিনিধিত্বকারি একটি।

উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখি গ্রামে প্রচণ্ড গরম লোক মারা যাচ্ছে। এমন কি পুকুরের জল এত গরম যে মাছ মরে ভেসে উঠছে।

এই গ্রামে এক কবি নাম মহম্মদ আলী আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসে আটকে গেছে গরুরগাড়ির অভাবে।

গরম বেশি পড়ায় গাড়োয়ান গফুর কবির কাছে যায় এবং জানতে চায়, এত গরম পড়ছে কেন? কবির জবাব, এটা গজব....

গফুর ভাবে এ-দেখি ইমাম সাহেবের মত কথা বলে।

—ইমাম সাহেব সবাইকে মোনাজাত করতে বলে। আল্লা মেঘ দে... পানি দে... রবে গ্রাম মুখরিত হয়ে ওঠে— মহিলারাও এই জামায়েতে অংশ নেয়।

এক সময় হঠাৎ গরম চলে গেল। আকাশে ঘন কালো মেঘের ঘোরা ফেরা, কিন্তু বৃষ্টি নেই।

এর মধ্যে একদিন গ্রামে ঈশ্বর পণ্ডিত সকালে তরমুজ খেত দেখতে গিয়ে হঠাৎ মরে গেল। তার নাতি বুলান শুধু বললে যে দাদু আমাকে বললে গ্রামে গিয়ে খবর দিতে কি যেন বিরাট বিপদ আসছে।

গ্রামের লোকজন মাঠে এসে দেখে তরমুজ খেত উধাও। শুধু দু' একটা ফড়িং-এর বড় বড় পাখা পড়ে থাকতে দেখা গেল।

এর ক'দিন পর মতিবিবির চীৎকার। সবাই গিয়ে দেখে তার কলাবাগান উধাও। কোন গাছ আস্ত নেই।

এরপর গ্রমের সবচেয়ে পুরোনো অশ্বত্থগাছটি দেখা গেল পাতা নেই, একেবারে ন্যাড়া।

গফুর বৃদ্ধ সুরত মন্ডলের কাছে গিয়ে জানতে পারল "পঙ্গপাল নেমেছে— পঙ্গপাল.... সব খেয়ে শেষ করবে..........."

কিন্তু কবি মহম্মদ আলী আর মসজিদের ইমামের একই কথা : গজব— অভিশাপ।

গ্রামে সব কিছু সাফ হয়ে যাচ্ছে। সবুজের নিশানা থাকছে না। কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় কিনা অনেকে ভাবছে। এর মধ্যে আরো একটা ব্যাপার দেখা গেল এই পঙ্গপালের পাখায় আবার আরবি কালাম লেখা, সুতরাং সবাই ভয় পেতে থাকে। বরং কেউ যেন এই পতঙ্গদের কোন বিরক্ত না করে সেদিকেই সবার নজর।

WWW.AMARBOI.COM

গফুর একবার ভেবেছিল সবাই মিলে পোকাগুলোকে পেটালে কেমন হয়? কিন্তু তখনি মনে পড়ে গিয়েছিল মোহাম্মদ আলী এবং মসজিদের ইমামের কথা : কি সে কি হয় তা মানুষ অত সহজে বুঝতে পারে না, সবুর করে যাও। এগুলো যে ছদ্মবেশী আশীর্বাদ নয় তার জবাব কে দেবে?

একদিন গফুরের বউ সখিনা কাঁদতে লাগল। উঠোনে শুকোতে দেয়া কাপড়ও খেয়েছে পোকাগুলো।

এর কিছু দিন পর ঝোপে ঝাড়ে দু' চারটে করে পঙ্গপালকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

কবির সঙ্গে মাতবরের কথা হয় এই নিয়ে।

কবি বলে এদের ওপর কেউ যেন হামলা না করে। সবুর করতে হবে।

তখন মাতবর বলে, ... পোলাপান ধুঁকে মইরব..... হে কি বাপ বইস্যা দেখতে পারে?

কবি বলে যে মানুষকে সবুর করতে হবে। মাতব্বর বলে, "কিন্তু মানুষ কি শত শত বছর সবুর করতে পারে?"

কবি বলে, পারা উচিত।

এই আলোচনায় কবি এক সময় বলে যে আল্লার মর্জি বলে মানুষ মরছে।

তখন মাতব্বরের প্রশ্ন, "দুধের বাচ্চা দুধের অভাবে মরছে। আপনি কন আল্লার মর্জি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের লোক গ্রাম ছাড়ছে দেখে কবি বলে, "...মাঠে মরার চেয়ে ঘরে মরা ভাল।"

শেষ পর্যন্ত গফুর মাতব্বরকে বলে, "আপনে ওগুলারে পোকা মনে করেন তয় সবাইকে কন না ক্যান?

মাতব্বর জানায় দালাদলির ভয়ে।

শেষে গফুর আর মাতব্বর ঠিক করে এই পঙ্গপাল মারার কাজ শুরু করবে।

তারা এক সময় তাই করতে শুরু করে। এই অভিযান চালায় রাত্রে এবং তারা সুড়ঙ্গ কেটে অন্য গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তারা খবর পায় যে ওগুলো নিছক পোকা। অভিশাপ বা গজব এ-সব কিছু নয়।

কবি যখন জানতে পারে এরা পোকা মারার পরিকল্পনা করছে তখন মাতব্বরকে বলে যে সে চলে যাবে এবং তার কবিতার খাতা আনার জন্যে কাউকে বলতে বলে।

গফুর তখন রেগে যায়। বলে, মানুষকে পোকায় খাচ্ছিল তাতে তোমার— হালা আপনের— কিছু তকলীফ অয় নাই। অহন ক'ডা কবিতার জন্যে শোক— মার হালা।"

গফুর সত্যি কবির পাছায় এক লাথি মেরে বসে।

কবিদের অনেক সময় স্টাবলিশমেন্টের পক্ষে দেখা যায় শওকত ওসমান এই ব্যাপরটি কখনই সহ্য করতে পারতেন না। তাই গাড়োয়ান গফুরকে দিয়ে কবির পাছায় লাথ কষিয়েছেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস বণী আদমেও আমরা দেখেছি বাড়ির চাকর হারেশ তার মনিব মুন্সীর পাছায় লাথ মেরে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। শওকত ওসমানের সাহিত্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের এই অন্তর্লীন স্রোতটি সব সময় বজায় ছিল।

শেষাংশে আমরা দেখি গ্রামের জোয়ান ছেলেরা মাতব্বরকে সঙ্গে নিয়ে হাজার হাজার মশাল নিয়ে গভীর রাত্রে পঙ্গপালের ওপর আক্রমণ চালায়।

পঙ্গপালের দল পালাবার পথ পায় না। লাখে লাখে মারা পড়তে থাকে।

গ্রাম পঙ্গপাল মুক্ত হয়।

উপন্যাসের একবোরে শেষাংশে মেনা শেখ নামে একটি জটাজুটধারী চরিত্রকে আমরা পাই যা একটা রহস্য হয়ে রয়েছে এই উপন্যাসে। মেনা শেখ মাতব্বরকে আলিঙ্গন অবস্থায় চিৎকার করে বলছে, এত দেরি করে আইলি, মাদবর? এত দেরি কইরা?

এরপর মেনা শেখ আরো প্রশ্ন করে ঃ

—পণ্ডিতপাড়ার হেরা কোথায়?

—সব খতম। মাতব্বরের জবাব।

—তাঁতিপাড়ার মহেশ-রমেশরা?

—সব শেষ...

এরপর মেনা শেখ মাতব্বরের হাত থেকে একটা মশাল নিয়ে অন্ধকার মাঠের দিকে দৌড় অরম্ভ করেছিল, মুখে চিৎকার, পুত— পুত— কী কইয়া গেলি— পুত— ওরে পুত—।

উপন্যাসের এই শেষাংশটি একটি পরাবাস্তববাদি চিত্র তৈরি করি। পুরো অনুষঙ্গটি নানান

AMARBOI.COM

ব্যাখ্যায় জড়ান যায়। এটি পতঙ্গের আক্রমণের কাহিনী হলেও বাংলার ওপর বিভিন্ন জাতির আক্রমণ ও স্বাধীনতা হরণকে প্রতীকী-রূপে ব্যবহার করা হয়েছে বলা যায়। পাকিস্তানী হানাদারদের বিতাড়নের জন্যে ১৯৭১ সালে আমাদের এক হতে হয়েছে এবং এই হানাদার পতঙ্গদের খতম করার জন্যে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালী পতঙ্গের মতই প্রাণ দিয়েছে... ফল বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

উপন্যাসের শেষ দুটি বাক্য :

মশালবাহী যাত্রিদল আবার এগিয়ে যেতে লাগল, যদিও অনেকের সামনে ভাসে অন্ধকারে সহসা অদৃশ্য আগন্তকের মুখ। বার বার।

"কাল খোঁজ করা যাবে।" হাঁটতে হাঁটতে মাদবর নিজের মনেই উচ্চারণ করে ফেলেছিল।

রহস্য থেকেই যায়।

'আর্তনাদ' উপন্যাসটি ভাষা-আন্দোলনের ওপর লেখা হলেও ভারত-বিভাগ ও এর পরবর্তী অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। নতুন রাষ্ট্র এই কথা বলে বাঙালির অধিকার হননের ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসে।

উপন্যাসের শুরুতে 'কোরাস' নামে ছোট যে অংশটি আছে তা 'মৌন নয়' নামে ছোট গল্প আকারে বাহান্ন সালে লেখা এবং হাসান হাফিজুর রহমানের 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে জায়গা পায়। এটার রেশ ধরেই সম্ভবত: বাকি অংশটুকুর অবতারণা। প্রথম অংশ কোরাসের শেষ বাক্যটি হলো : নির্বিকার গাড়ি শুধু এগোতে লাগল।

পরবর্তী অধ্যায় 'একাকী' অংশের শেষ এবং পুস্তক শেষ হচ্ছে সেই একই বাক্যের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে।

এই উপন্যাসে ভাষা বিশেষ করে বাক্য নিয়ে বড় ধরনের একটা পরীক্ষা করা হয়েছে। শেষের দিকে এক নাগাড়ে লেখা... দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি যতিচিহ্নহীনভাবে। ভূমিকায় এ-ব্যাপারে একটি উল্লেখ আছে... 'আর্তনাদ' উপন্যাসে ব্যাকরণ অনেক সময় অবহেলিত। তা পাঠকের বুদ্ধিমত্তার উপর ছেড়ে দিলুম। শেষের কয়েক পৃষ্ঠা বিরামচিহ্নহীন।

সাধারণত তাঁর রচনা ছোট ছোট বাক্য দিয়েই সাজানো। এখানে এটি একটি বড় রকম ব্যতিক্রম।

'আর্তনাদ' ভাষা-আন্দোলনের ওপর রচিত হলেও স্বীকার করতেই হবে যে বাংলাদেশ আবির্ভাবের পেছনে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির অপরিসীম তাৎপর্য রয়েছে। এটি সরাসরি ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক রচনা নয়।

শওকত ওসমানের সমগ্র উপন্যাস পর্যালোচনা করলে একটা জিনিস পষ্ট যে বাস্তবতা কেন্দ্রিক উপন্যাসের মত শওকত ওসমানের রূপক উপন্যাসগুলোও আসলে বাস্তবেরই চিত্র। তবে ফর্মের ক্ষেত্রটি পৃথক। সেখানে যেমন এসেছে বাগদাদ, গজনি, তেমনি এসেছে বাংলার গ্রাম-গঞ্জ ও তার দুখী মানুষের পাঁচালি।

২২ এ আগস্ট ২০০১ **বুলবন ওসমান**
চারুকলা ইন্সটিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

নেক্‌ড়ে অরণ্য ১৩
জলাংগী ৫৯
পতঙ্গ পিঞ্জর ৯৫
আর্তনাদ ১৮৩ ·
শওকত ওসমান : সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেক্‌ড়ে অরণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে আলো রুগ্ন এবং ফিকে।

সিভিল সাপ্লাইজের বিরাট গুদাম ছিল কদিন আগে পর্যন্ত; টিনে ছাওয়া গোটা দালানটা সেইভাবে তৈরি। সমতল মেঝে নেই। উঁচু উঁচু পোস্তা বাঁধা, যেন নিচে থেকে স্যাতলা উঠে চাল-ডাল বা গুদামজাত অন্যান্য মাল নষ্ট না করে দেয়। আবার কুলিরা মাথায় করে বস্তা এনে পোস্তায় স্বচ্ছন্দে রাখতে পারে। ফলে দুই পোস্তার মাঝখানে পরিখার মতো সরু রাস্তা। গোটা গুদাম জুড়ে এমন আড়াআড়ি লুকোচুরি খেলার বন্দোবস্ত রয়েছে। বিরাট আয়তনের তুলনায় বাল্‌বের সংখ্যা কম। তা-ও ষাট পাওয়ারের বেশি নয়। ফলে দিনেরবেলায়ও আলো-আঁধারির ছকে জায়গাটা বন্দি থাকে।

অনেকখানি প্রশস্ত সমতল। এখানে প্রায় দশ-বারো বিশ ফুট আছে পূর্ব-মুখী গুদামের পশ্চিম কোনায়। কর্তৃপক্ষ এমন জায়গায় কোনো বড় সামগ্রী না অন্য কিছু রাখার বন্দোবস্ত করেছিল, তা তাদের কাছেই জানা।

মোটা করোগেটেড টিনের চওড়া দরজার বাঁপাশে অফিস। ডান দিকে মাল ওজনের দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি একদা ছিল। আজ কিছু নেই। অতীতের সাক্ষীরূপে একটা লোহার ডাণ্ডা আছে, যেখান থেকে পাল্লা ঝুলত।

বর্তমানে ফটকের দুই দিকে টুলের উপর বসেছিল দুই পাকিস্তানি সিপাই, একদা যেখানে একজন দারওয়ান পাহারা দিত। অবিশ্যি অনেক কিছু বদলে গেছে। গেটের সোজাসুজি আরো দেওয়াল এবং কামরা তুলে ফেলার ফলে বাইরে থেকে বোঝা যাবে না, ভেতরে গুদাম আছে।

অফিসারকে দেখে জওয়ান দুজন মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং একজন উচ্চারণ করলে, "সালাম, ক্যাপ্টেন সাহাব।"

কাপ্টেন রেজা খান ঝিলামের অধিবাসী। শ্যামবর্ণ চেহারা। গুম্ফধারী। প্রশস্ত মুখের আয়তন থুতনি এবং নাকের ব্যবধান স্বল্পতাহেতু বেঢপ দেখায় যেন কেউ থেবড়ে থুতনিটা মুখাবয়বের উপরে ঠেলে দিয়েছে। কালো রঙের সঙ্গে ঝুনো গোঁফের রং মিলে তার মুখাবয়বের কাঠিন্য এমন খোলতাই করেছে যে, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখেও চাতুর্য হিংস্রতার ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়।

"কিয়া খবর?" প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রেজা খান তার গোঁফে ঈষৎ তা দিয়ে নিলে। পরনে হাফপ্যান্ট এবং মোটা চপ্পল এই নাতিদীর্ঘ ব্যক্তিটির উচ্চতা তেমন বাড়াতে পারে নি। সেই জন্যে বোধহয়, ঈষৎ স্কন্ধভঙ্গির পরে জবাব আসার পূর্বেই ক্যাপ্টেন

আবার শুধায়, "কিয়া খবর, সব ঠিক হ্যায়?"

"হ্যাঁ হুজুর।" একসঙ্গে দুই ব্যক্তির জবাব ঠোকাঠুকি খায়।

"আওরাত লোগ আওরত চিখতা (আর চিৎকার করে না) নেহি?"

"নেহি।"

"এসব বাঙালি আওরত। একদম বাঙাল কা শের কি তাহের (বাংলার বাঘের মতো)।" একজন সিপাইয়ের দিকে ঠোঁট সংকুচিত করে, ঈষৎ হাসি ছিটিয়ে রেজা খান আবার যোগ করলে, "পোষ মানাও। সারা মুকুল কো শায়েস্তা করনে আয়া হু। আওরত কিদার জায়েগা?"

অন্যতম জওয়ান শের খান। বাড়ি মর্দান জেলা। সে এই সংলাপে তেমন মনোযোগী ছিল না। তবে অফিসারের মন-রাখা জবাব দিলে, "ও বাত সহি (ঠিক)।"

শের খানের সঙ্গী আলী খান পাঞ্জাবি। সেও ঝিলামের অধিবাসী। জেলাওয়ারী হৃদ্যতা দেখাতেই বললে, "ঝিলাম সে কিয়া খামখা আয়া হুঁ?" সে যে ঝিলাম থেকে খামখা আসে নি, তা প্রমাণের জন্যে আবার উচ্চারণ করলে "আন্দর যাইয়ে গা? দেখিয়ে, কৈসে শায়েস্তা কিয়া মাইনে।"

"আভি নেই।"

'চালিয়ে না।' মিনতি উচ্ছল গলার আওয়াজ।

"আভি নেই। আভি এগারা ভি নেহি বাজা। দিনমে এসব দেখলে কো দিল্ নেহি চাহতা।'

'তব শাম কো আইয়ে।'

'হ্যাঁ। ও বাত তো দুসরা।' কথাটুকু শেষ করেই ক্যাপ্টেন বিরাট ফটকের গায়ে কান রাখলে।

'আন্দর যাইয়ে গা, হুজুর?' আলী খান আবার অনুরোধ করে।

যথাস্থানে কান রেখেই ক্যাপ্টেন রেজা খান জবাব দিলে, "শুনতা হুঁ, কুই চিখতা ভি নেহি। নেই সব সুমশাম, ঠাণ্ডা।"

'পহলে পহলে সাব কুই চিখতা, শোর মাচাতা। বাদ সব ঠিক হো যাতা।' সাবাশি নেওয়ার জন্যে আলী খান মুখ খুললে।

ক্যাপ্টেন তখন খাড়া দাঁড়িয়েছে। গোঁফে একটা তা দিয়ে বললে, 'এই বাঙালি হারামজাদালোগ পাকিস্তান কো বরবাদ করনে মাংতা। শালা লোগ হিন্দু হ্যায়। এলোগ কা নসল্ (জন্ম) বদল দেনা চাহিয়ে। মুসলমান হোতা তো এ্যায়সা নেহি করতা।'

'ঠিক কাহা, সরকার' সায় দিলে আলী খান। শের খান যথারীতি চুপচাপ। সে সটান খাড়া, রাইফেল ও সঙ্গীনের সমান্তরাল।

'ইদার কিৎনা আওরত হ্যায়?'

'করিব (অনুমান) এ শও।'

'আওর লানা পড়েগা। শালা বাঙালি লোগ কা নসল্ হাম বদল দুঙ্গা।' বেশ উত্তেজিত ক্যাপ্টেন তারপর গটগট হেঁটে আফিসের প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে গেল, অধস্তনদের স্যালিউট পর্যন্ত গ্রহণ করলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী খান পেছন থেকেই স্থানীয় সুর বজায় রাখলে, 'খোদা কা কসম, একদম সাচ কহা।'

সঙ্গী নিরুত্তর দেখে সে চেতে উঠল, 'এই শের খান তুমরা হুয়া কিয়া?'

'তবিয়ৎ ঠিক নেহি।'

'তোমরা তবিয়ৎ কা এয়সি-ত্যায়সি— ' এইটুকু উচ্চারণের পরে সিপাই আলী খান, সম্মুখস্থ টেবিল থেকে একগোছা চাবি বের করে গুদামের ফটকের কাছে গেল এবং তালা খুলতে লাগল।

দরজা অল্প ফাঁকা করে সে সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বললে, 'এই খান, হাম অন্দর সে আতা। তোম ইঁহা রহো।'

সাত আট মিনিট পরে সে ফিরে এল খিকখিক হাসতে হাসতে এবং সেই অবস্থায় সে তালাবন্দি ফটক ছেড়ে সঙ্গীর সম্মুখে এসে পৌঁছল। কিন্তু খিকখিক হাসির আর বিরতি ঘটল না। বরং উত্তরোত্তর প্রবল হতে থাকে। অথচ অন্য দিকে কথা বলার চাড়ও ভীষণ, তা তার অবয়ব দেখে বোঝা যায়।

শেষ পর্যায়ে হি হি হাসির তোড় আলী খানের সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে পড়ছিল।

শের খান এমনিতে শান্ত মানুষ। তার মুখাবয়বে একটা প্রশান্তির ছায়া আছে। সিপাই হলেও চলাফেরায় অভিজাত। বর্তমান পরিস্থিতি তার কাছে অসোয়াস্তিকর ঠেকে। রেহাই পেতে সে সঙ্গীকে ঝাঁকুনি দিয়ে রাগত কণ্ঠেই বলে, 'এ-ই হাসি বন্দ করো। হুয়া কেয়া?'

শের খানের নোক্তায় সে কিছুটা সংযত হওয়ার চেষ্টা পায়। তবু বিষম হাসি কি সহজে থামে?

শের খান এবার ধমক দিলে, 'এই তুম পাগল হো গিয়া না কিয়া?' সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'তিন ঝাঁকুনি।

এবার কিছুটা শান্ত হয় আলী খান। একটা টুলের উপর বসে পড়ল সে। পাহারা দিতে দিতে ক্লান্তি মেটাতে কাঠের আসনটুকু বেআইনি যোগাড় করা। আজ অফিসারের সামনে সরিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিল।

'শোনো— ', আবার হাসি এসে যায়। তা কোনোরকমে চেপে আলী খান মুখ খোলে, 'শোনো— । খোদা কা কসম, এক সাথ এৎনা লাঙ্গা (নগ্ন) আওরত হাম কভি নেহি দেখা। খোদা কা মেহেরবানি। এৎনা আওরত। ক্যাপ্টেন সাব কা বাৎ শোন কর, হাম আন্দার গিয়া। দেখে কিয়া কর রাহা এসব বাঙালি আওরত?'

ছেদ পড়লে শের খানের কথায়, 'তো হাসনে কা হুয়া কিয়া?'

— শোনো না—

— বোলো—

— আল্লা পাকিস্তান কো কায়েম রাখখে (পাকিস্তান বজায় রাখে) দেখা এক বাঙালি ছোকরি। সিনা জৈসে পাত্থর। পাত্থর। খায়েশ হুয়া থোড়া হাত মার দে—

— তৌবা!

— শোনো। হাম হাত বাড়হানে গিয়ে, লেকিন হাত আওর উঠতাই নেহি। সরম না কিয়া হুয়া— হাত আওর উঠতাই নেহি। আজব বাৎ। তাব হাম ভাগ আয়া। আজব বাৎ—

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— আওরত লোগ হাসতা থা? তোমরা নামরদি (নপুংসকতা) দেখ কর?

— হাসেগা? কুই নেহি হাসতা। দোঁ চার যো পাগল হো গিয়ে, ওগোল হাসতা। তোম তো জান্‌তে হো।

— ওগোল কো ছোড় দেনা চাহিয়ে।

— নেহি। ওহি লোগ সাবসে খুবসুরাৎ— আওর অফিসার লোগ কা মর্জি—। লেকিন হামরা হুয়া কিয়া? আজ রাতকো এম্‌তেহান (পরীক্ষা) লুংগা। ইয়ে বাঙালি আওরত কা সামনে—।

আলী খান আবার হাসির চেষ্টা করতেই সঙ্গী তাকে ধমক দিয়ে উঠল, 'খোদা কা ওয়াস্তে খামুস রহো।'

২

তারা চারজন উবু বসেছিল। প্রত্যেকের হাঁটুর উপর মাথা। দুঃখের বোঝায় অবসন্নদের জন্য এই দেহভঙ্গি আবহমানকাল থেকে চালু আছে। নতুন কিছু নয়। পরস্পরের সান্নিধ্যে বুক হাল্কা করে। তাই নৈকট্যের তৃষ্ণা এমন ক্ষেত্রে পরম। কিন্তু কারো মুখ আমরা দেখতে পাব না। অবয়বের দর্পণে হৃদয়ে ছায়া পড়ে। কারো মুখ আমরা দেখতে পাব না।

গুদামের পোস্তার উপর শত শত বস্তা সারি সারি থাকে থাকে সাজানো থাকত কদিন পূর্বে। আজ সারি সারি মানুষ শুয়ে আছে। অবিশ্যি স্তর অনুপস্থিত। কারণ, কারো উপরে কেউ শুয়ে নেই। একদম সিমেন্টের উপর, যাদের মানুষ বললাম, তারা শুয়ে আছে, মানুষের মধ্যে যাদের মানবী বলা হয়। কেউ সটান। কেউ কুকড়ে গেছে শীতের রাত্রের কুকুরের মতো। নিজের পেটের মধ্যে মুখ। চার জন শুধু উপবিষ্ট। তারা প্রায় ওই ভঙ্গি অনুযায়ী বসে থাকে। ঘুমের প্রয়োজন হয়ত এইভাবে মেটে না। কিন্তু বিশ্রাম, ঘুম ইত্যাদি শব্দ এই জগতে অবান্তর। এখানে অস্তিত্ব আছে— এই কথাটাই বড়। বাসনা কামনা এখানে থেৎলে থেৎলে কিমার মাংসের মতো কী রূপের আকার পায়, তা বিধাতা যিনি নাকি সকল সৃষ্টির উৎস, তিনিও বলতে পারবেন না। কারণ দৈনন্দিনতার অর্থ এখানকার অধিবাসীদের কাছে অজ্ঞাত। ছায়াময় আপন ভুবন এখানে প্রত্যেকে রচনা করে এবং তারি সড়ক ধরে এগিয়ে যায় কোনো পথের আকর্ষণে নয়— যেতে হয় তাই এগোয় এবং পদক্ষেপের মাত্রায় নিজেই কায়াহীন হওয়ার চেষ্টা করে। নচেৎ ছায়াময় পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মতা আর কিভাবে মেলাবে?

হঠাৎ মেশিনগানের দূরাগত ব্রাশ-শব্দ শোনা গেল দু'তিন বার। তারপর পাঁচটা রাইফেলের শব্দ। শেষে একটা চিৎকার। কী তার অর্থ? কেউ বলতে পারবে না।

কিন্তু শব্দটা কোনো আর্তজনের। বাইরে নিশুতি রাত্রি বিধায় সব ছাপিয়ে চিৎকার এখানে এসে পৌঁছায়। নচেৎ টিনের চাল ভেদ করে গুদামের ভেতর কিছু ঢোকে না, বাতাসই যখন এখানে অপ্রতুল।

তখনই চতুর্মূর্তির একজন হঠাৎ মাথা তুলে কান খাড়া করলে। দুই হাঁটু তার আগের মতো দশ আঙুলে বাঁধা আছে। শুধু গ্রীবা সমুন্নত। কান উৎকর্ণ। সাপিনীরা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাসের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে পথপার্শ্বস্থ পথিকের যাতায়াতের ধাক্কায় নাকি এমনই সজাগ হয় মাথা তুলে।

পার্শ্বস্থ সঙ্গিনীর গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ফিসফিস শব্দে সে বললে, 'তানিমা, তানিমা।'

সঙ্গিনী মাথা তুললে, তাকালে এবং হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের কণ্ঠে বিড়বিড় করলে, "বাড়ির কম্পাউন্ডে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটেছে এত দিনে...।" তারপর সে সঙ্গিনীর মৃদু ধাক্কার যেন জবাব দিলে আরেক ধাক্কা যোগে এবং মুখ সরব রাখলে, 'আমি তানিমা নই। আমি জুঁই। আমার কর্তা আমার জায়েদা নামটা বড় ছোট করে নিয়েছিল।"

"আমি জুঁই। তুমি তানিমা।" প্রতিবাদ করলে সঙ্গিনী।

"না, না। 'তানিমা ইজ ডেড।' সে মরে গেছে।"

জায়েদা। কান খাড়া করে শব্দ শোনো। তানিমা। শব্দ?

জায়েদা। রাইফেলের ব্রাশ আওয়াজ আমি শুনেছি, তানিমা। এখন টক্-টক্ রাইফেলের আওয়াজ।

জায়েদা। না, চিৎকার।

তানিমা। কে চিৎকার করছে?

তানিমার ফর্সা গোলগাল চেহারা। কিন্তু মোটা মুখ নক-ক্ষত, ময়লাটে। বহুদিন ভালোমতো জলস্পর্শহীন। ফলে, চেহারা পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি এলেও প্রৌঢ় দেখায়। দোহারা বাঁধন এখনো মাদকতাময়, ডাগর দুই চোখ সঙ্গিনীর মুখের উপর তুলে সে জিজ্ঞেস করলে, "আমি চিৎকার দেব? না, আর না।"

জায়েদা বা জুঁই তার মুখের উপর হাত দিয়ে সাবধান করলে, "খবরদার, এখনই শান্ত্রী এসে সকলকে পেটাবে।"

নাতিউচ্চরবে তানিমা হেসে উঠল এবং সহজ গলায় বললে, 'কলেজের বইয়ে পড়েছিলাম, ইউরোপীয় রূপকথা, ওয়ার-উলফের কাহিনী। সারারাত মানুষ থাকে, ভোরে আবার নেকড়ে হয়ে যায়। আমরাও তাই...আমার মাথা ঠিক হয়ে গেছে।...ঠিক হয়ে গেছে। ...কোনো গোলমাল দেখছ?'

জায়েদা নিজের মাথা ঠিক দশ আঙুলে দুদিক থেকে চাপ দিতে লাগল। চোখ বারবার পিটপিট করলে। তারপর হাত সরিয়ে ঘাড় এদিক ওদিক ঝাঁকালে। যেন মেরুদণ্ড সোজা করার জন্যে অমন ভঙ্গি। তানিমা সেই সময় আবার হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজতে যাবে, সঙ্গিনী তার চিবুকে করতালু যোগে বাধা দিলে এবং বললে, "শোনো শোনো...।"

"কী?"

"সেই শব্দ।"

"ওই শব্দের জন্যেই তো বেঁচে আছি। তখনই মাথাটা ঠিক হয়।"

"পরশু দিনে যে চাষিবৌ এসেছে, সেই বললে মুক্তিবাহিনী চারিদিকে প্রতিরোধ শুরু করেছে। তাদেরও মেশিনগান আছে, অন্য অস্ত্রশস্ত্র আছে। ... ঐ শোনো...।"

"কিন্তু রাইফেলের গুলি কার? একটা আর্তনাদ আমি শুনেছি। একদম স্পষ্ট।"

"সব মিথ্যে, মিথ্যে..." তানিমা চিৎকার দিয়ে উঠল, "আমি, আর বাঁচতে চাই নে।"

"আর আমি বুঝি বাঁচতে চাই? সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল জায়েদা। পরনে সায়া ছাড়া আর কিছু নেই। এই বিবস্ত্রের রাজ্যে ওই চার জন শুধু সায়া পরেছিল। আর যেদিকে তাকাও স্বর্গীয় উদ্যান। এখানে আদম অনুপস্থিত। সবাই এখানে ঈভ।

ক্রোধান্ধ জায়েদা হঠাৎ উড়ে পড়ার ফলে আর দুই জন ঠেস হারিয়ে ফেলে। তারাও মাথা তুললে। দিশাহারা ভাব দুই জনের চোখে। কী ঘটছে আশেপাশে তা বুঝতে পারার কোনো চেষ্টা নেই তাদের। ইতিউতি তাকিয়ে তারা আবার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজলে।

জায়েদা সঙ্গিনীর সায়ার খোঁট ধরে টানতে টানতে বললে, 'বসো। গোলমাল করো না। শোনো, শব্দ শোনো। এমন চেঁচালে কিছু শোনা যাবে না।"

"আমি কিছুই শুনতে চাই নে। আব্বা— আব্বা।" মৃদু সেই ডাক, আহ্বানের চিৎকার নয়। তারপর তানিমা ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। দুই করতালুর মধ্যে মুখ চেপে।

ভেন্টিলেটারপথে একঝলক বাতাস এসেছিল। তাই ঝুলন্ত দুটো বাল্‌ব ঈষৎ দুলতে লাগল। কেমন যেন ঝিলিক খায় সমস্ত আলো।

অনেক বন্দিনী হাতের উপর, কেউ-কেউ সোজা সিমেন্টের উপর, মাথা রেখে শুয়ে আছে। কিন্তু একদম জড়সড়। পোস্তার মাঝামাঝি সড়কের অন্ধকার শুধু ব্যবধান। নচেৎ সকলে অতি নিকট যেন একই বিছানায় শায়িতা।

জায়েদা সঙ্গিনীর সায়ায় হেঁচকা টান দিয়ে হেসে উঠল এবং উচ্চারণ করলে "আব্বাকে ডেকে কী হবে? বাবা এখানে কিছু করতে পারবে না। বরং তোমার স্বামীকে ডাকো, তানিমা বুবু।"

"স্বামী— " তানিমা হেসে উঠল এবং আবার মুখ খুললে, 'স্বামী?'

'হ্যাঁ!'

'কোন স্বামী? আর তো একজন নেই। অনেক অনেক। মেজর, ক্যাপ্টেন, কর্নেল, সুবেদার, অনেক কুকুরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা— ।"

স্বরগ্রাম ক্রমশ চড়তে থাকে, ক্রমশ লয় দ্রুত হয় এবং তানিমা তার সমস্ত শারীরিক শক্তি গলায় এনে জমা করে। একদম শেষপর্যায়ে, যখন আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম, ধপ-শব্দে বসে পড়ল এবং জায়েদার গলা জড়িয়ে দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে লাগল। তারপর ক্রমশ নিথর হয়ে গেল, ক্রমশ সজ্ঞাহীন।

পরিখার অন্ধকার থেকে তাদের পোস্তার সোজাসুজি তখন এক মহিলার মাথা উঠে পড়ে। সে আবার এক কোণ থেকে ছোট ছোট লাফে শায়িতাদের শরীর বাঁচিয়ে পরে হেঁটে এসেছে। মহিলা নয়, এক গ্রাম্য চাষিবৌ। প্রৌঢ়ত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছেন। খাটো আকৃতি। কিন্তু শক্ত বাঁধন শরীর। কুলীরা মাথা থেকে মাল সহজে এসব পোস্তায় নামাতে পারে। উচ্চতা তেমনই। এই প্রৌঢ়া সহজে নাগাল পায় না। তাই আঙুলের উপর ভর দিয়েই তিনি মাথা পোস্তার উর্ধ্বে তোলেন।

"বুবুজানরা— ।" এই ডাকের পর তিনি হাত বাড়িয়ে জায়েদাকে বলেন, "বুবুজানরা, গোল করেন না, আল্লাকে ডাকেন। আল্লাকে ডাকেন।"

মাথা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে যে দুজন বসেছিল, তাদের দুজনেই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, এবার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ তোলে।

একজন সবেমাত্র কৈশোর পার হয়েছে। যৌবনের স্পর্শ পেয়েছে কি না শুধু সে-ই জানে। স্কুল কলেজের ছাত্রী। এখানকার কঠিন চোয়াল ভেদ করেও তার সুকুমার কান্তি বেরিয়ে আসে।

— আল্লারে ডাকেন— আল্লারে ডাকেন। প্রৌঢ়া চাষিমহিলার কণ্ঠস্বর অনুরোধ মাখা? না। তার ঘন চুলের অবিন্যস্ত রূপ জানান দেয় এইমাত্র যেন পাগলামি ব্যাধি থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। কাজেই অনুরোধ বা উপদেশের ফারাক এখানে অবান্তর। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের একমাত্র পরিচয় মমতা যেন শব্দরূপে পৃথিবীতে এইমাত্র জন্ম নিল।

— বুবুরা আল্লারে ডাকেন। সুপ্তোত্থিত কিশোরী বা তরুণীর চোখ এবার চাষিবৌর সোজাসুজি।

"আবার কণ্ঠ বাজে, আল্লারে ডাকেন—।"

"আল্লারে ডাকতে কয় কেডা?"

"আমি কই সখিনা বুবুজান। আপনারা লিখাপড়া মানুষ—।"

"আল্লারে ডাকতে কয়, কেডা?"

"আমি কই সখিনা বু-জান!"

সখিনা বু-জান তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রৌঢ়া মহিলার চুল ধরে বেজায় ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে, "আল্লারে ডাকতে কও। আল্লা থাকে ইসলামি রাষ্ট্রে? ইসলামি রাষ্ট্রে আল্লা থাকে? কও— কও।"

সখিনা চুলের মুঠি এমন দৃঢ় করে যে প্রৌঢ়া ব্যথায় অস্থির, তখন নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা পান। কিন্তু প্রতিপক্ষের চিৎকার তীক্ষ্ণ হতে থাকে, "আল্লা আছে? ইসলামি রাষ্ট্র বানিয়েছিল আল্লা থাকার জন্যে? বলো...বলো...?"

প্রৌঢ়া তখন সখিনার এক হাত ধরে বলে, "আর মুঠাইয়েন না, বু-জান। ঠিগ কইছেন। এই বুড়া বয়সে...আমার জোওয়ান পোলা...এই বেইজ্জতির লাইগ্যা বাঁইচ্যা ছিলাম...।"

প্রৌঢ়া রশীদা বিবি তখন হাঁপাতে থাকেন, যদিও অন্য দিকে মুঠি শিথিল। এই আবহাওয়ায় ক্লান্তির কি শেষ আছে? কী মনে করে, রশীদা বিবি পরিখার কিনারা থেকে একটু সরে এলেন হেঁচকা টানে চুলের মুঠি খুলে ফেলার জন্যে কিন্তু সখিনা শুদ্ধ হুড়মুড় পোস্তার উপর থেকে নিচে পড়ে গেল। তারপর কোনো জ্ঞান নেই।

বিরাট সংসারের গৃহিণী। কাজই এতদিন সতেজ রেখেছিল। তেমনিই অবয়ব সুঠাম। কালের প্রহার সহজে নোয়াতে পারে নি। ধকল সওয়ার অভ্যেস আছে। রশীদা বিবি কোনোরকমে মুঠি খুলে সখিনাকে তুলে নিয়ে বসেন এবং ডাক দেন, "জায়েদা বুবু, নিচে আসেন। হুঁশ নাই। এরে উপরে তোলা লাগে।"

এত হুলস্থূলের মধ্যে যে এতক্ষণ নিজের হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে সমস্ত দুঃখ বিষাদ ধ্বংস করে দিতে তৎপর ছিল, তারও আর নির্বিকার থাকা সম্ভব ছিল না। এবার সে মুখ তুললে।

আমোদিনী রায়ের নাম সার্থক। এই পরিবেশে সে অনেক মুখে হাসি ফোটাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানত। সবসময় নয়, অবরে সবরে। কালো, পাৎলা শরীর। চোখের দ্যুতি জানান দিত, তার প্রাবস্তার স্বরূপ। ভুরুর উপরে কপালে একটা বড় তিল তার মুখাবয়বে এমন ছাপ ফেলেছিল যে ঘাড় একটু কাৎ করে কারো সঙ্গে কথা বললে মনে হবে তোমার আপাদমস্তক স্বচ্ছন্দে জরিপ করে ফেলেছে। তার কাছে কারো সত্তা গোপন অসম্ভব।

অবিশ্যি আজ ওই মুখ বিবর্ণ। তবু সহজভাবে যখন সে কারো দিকে তাকায় আত্মীয়তার অদৃশ্য রেখাগুলো নড়ে উঠে দৃশ্যমান হতে থাকে।

আমোদিনী সুপ্তোত্থিতা। নিজের কৃষ্ণসমুদ্র থেকে একমাত্র স্নান সেরে তীরে ওঠার জন্যে ব্যগ্র। পাশে সংজ্ঞাহীন তানিমাকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলে, "এসেছিল বুঝি?"

এই সংকেতবাক্য এখানকার অধিবাসীদের কাছে অতি পরিচিত।

দুই পোস্তার মধ্যস্থিত পরিখার অন্ধকার অনেক সময় সিপাইদের বাসরশয্যায় পরিণত হয়। এই অরণ্যে তো সকলে দৃষ্টিহীন। কাজেই কেন যে পরিখার তমসাটুকু সভ্যতার পাদপীঠ রূপে পরিগণিত হতো, তা যারা এই জঙ্গলের মালিক, তারাই বলতে পারে, আর কেউ না।

"এসেছিল বুঝি", জায়েদাকে আবার সম্বোধন করে অমোদিনী।

"না।"

"এন্নি।"

পাকিস্তানি মিলিটারি-অপারেশনে গ্রাম ছাড়ার সময় আমোদিনী পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার স্বামী। একটি পাঁচ বছরের সন্তান আছে। কারো কোনো খোঁজ নেই। কিন্তু আমোদিনী যেন নির্বিকার। এখানকার অধিবাসীদের খোঁজই তার কাছে বড় কথা।

পরিখার নিচে থেকে রশীদা বিবি আবার হাঁক দেন, "বুবু, আপনেরা আসেন। পারতাছি না।"

এবার আমোদিনী যেন একলাফে স্বাভাবিকতায় পৌঁছায়। জায়েদার কাছে ঘটনার বিবৃতি শোনামাত্র সে নিচে নেমে ধরাধরি করে সখিনাকে পোস্তার উপর তুললে।

দুই সজ্ঞাহীনা তাদের কাছে। আরো কতজন নিথর শুয়ে আছে, কারো জানার কথা নয়। নিজের মধ্যে বুঁদ হতে এই পন্থার চমৎকারিত্ব সম্পর্কে দুনিয়ার সকলে ওয়াকিবহাল। কিন্তু চেতনা খোয়াতে চাইলেই কি চেতনা খোয়ানো যায়?

জায়েদা হঠাৎ সচিৎকার কান্না জুড়ে দিলে কিশোরী বালিকার মতো, "বাবা, বাবা— আমাকে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। আমি আর পারছি নে— বাবা— "

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজল সে। আমোদিনীর অনেক ডাকেও আর সাড়া দিল না। সে তার জগতে ফিরে গেছে।

রশীদা বিবি এক মালসা পার্নি আনলেন গুদামের আরেক কোনা থেকে। আমোদিনী তানিমার মাথা নিজের কোলে রেখে পানি ছিটোতে লাগল। সখিনার শুশ্রূষায় ব্যস্ত চাষিবৌ। নিজের মনেই তিনি বলে যান, 'নসিব দ্যাহেন বুজানরা। বুড়াকালে আল্লা আল্লা কইরা মওতের নজদিগ যামু। পোলাপানরা কাইন্দে তুইল্যা গোরস্তানে দিয়া যাইব। অহন..." দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রশীদা বিবি আরো যোগ করেন, "আপনাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেইখলে আরো কষ্ট হয়। হগ্‌গলে জওয়ান। এই কী গজব আইল, ক্যান আইল, কিছু বুঝার পারি নে। আল্লারে তো হরদম ডাকছি হেই ছেলেবেলাথন। কহনও একডা ঝুট কথা কই নাই। অহন বেইজ্জতি দ্যাহেন। এই সিপাইগুলো আমার পোলার বয়সী... ।"

চাষিবৌ পানি ছিটান আর আদিখ্যেতা করেন। কিন্তু তানিমার একটু হুঁশ হতেই সে এমন চিৎকার দিয়ে উঠল যে গোটা বন্দিশিবিরে তার কম্পন দৌড়াতে লাগল।

বড় গেটের মাঝখানের ছোট দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল আলি খান এবং আরো চারজন সঙ্গী। সোজাসুজি এদিক সজাগ জীব দেখে এগিয়ে এল। কিছুক্ষণ এদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বলল, "চিখো মাৎ। হুঁশ...ও আ জায়েগা।"

তানিমার পাশেই সজ্ঞাহীনা সখিনা। সে তখনো বেহুঁশ। চিৎ হয়ে শুয়েছিল। মুখে পানি ছিটোচ্ছিলেন রশীদা বিবি।

"চলো ইয়ার" সঙ্গীদের এত্তেলা দিয়ে তারা এগিয়ে যেতে লাগল।

আলি খান সখিনার পাশে তখনো দাঁড়িয়ে। তার খোলা স্তনে কয়েকটা ডলা দিয়ে নিলে সরে পড়ার পূর্বে।

এতক্ষণ রশীদা বিবি চোখ বুঁজে ছিলেন। যখন বুঝলেন আর কোনো আততায়ী কাছে নেই, তখন মুক্তদৃষ্টি স্বস্নেহে সখিনার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং আর কী করে যেন মাথা নাড়ালেন, তা তারই জানার কথা।

AMARBOI.COM

৩

চব্বিশ ঘণ্টা গুদামের কাছে আলো জ্বলে। তাই দিন-রাত্রির ফারাক এখানে অবান্তর। অন্ধকার শুধু বস্তুর অস্তিত্ব গোপন রাখে না, অনেক সময় তার প্রচ্ছায়ে মানসিক সকল বিড়ম্বনা জমা দিলে বুক হাল্কা হয়, বাঁচার একটা আশ্বাস পাওয়া যায়। এখানে তারও যো নেই। মাঝে মাঝে তাই বন্দিনীরা পোস্তা ছেড়ে নিচে পরিখার ভেতর শুয়ে থাকে। স্যাঁতসেঁতে ভূমি এখানে কোনো দুর্বিপাক নয়। সকলেই নিশিগ্রস্ত। দু-চার জন যারা এই প্লাবনের মধ্যে কোনোরকমে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে নাক তুলে রাখে, যেমন চাষিবৌ রশীদা বিবি, তারা ছাড়া আর সকলেই কখন কোথায় শোয় বা কী বলে, তার সঠিক কোনো অর্থ অনেক কষ্টে উদ্ধারযোগ্য।

কেউ এখানে নিয়মিত আহারের কথা ভাবে না। অবিশ্যি কিছু ডাল-রুটি বা সাধারণ ব্যঞ্জন আসে। তার উপর কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। কারণ, জীবনধারণের জন্যে তো আহার। তারই চাড়া যখন অনুপস্থিত, তখন চর্বচূষ্যেয়র জন্যে কার অত মাথাব্যথা।

আমোদিনী তিন চার দিন কয়েক ফোঁটা জল ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করে নি।

এখানে অধিবাসীরা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছে। উঁচুনিচুর প্রশ্নও অবান্তর। সকলের কাছে একটা দুঃখই পাহাড়। তারই ভার সকলে বহনরতা তাই একে অপরের কাছাকাছি হওয়ার জন্যে ব্যগ্রতা অপরিসীম। বিশেষত যারা হালফিল আসে তাদের কাছে সকলে এগিয়ে যায়। কারণ, বাইরের খবর মেলে। সংবাদের মাহাত্ম্য কী, তা এই শিবিরের অধিবাসীনীরা জানে। চাষিবৌ যেদিন এসে খবর দিয়েছিল যে এখন গ্রামে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে, যারা পুল ওড়াচ্ছে, ওৎ পেতে খান শয়তানদের উপর

হামলা চালাচ্ছে, সেদিন এখানে হাওয়া বদলে গিয়েছিল। সখিনা যে আসা অব্দি প্রায় অপ্রকৃতস্থ থাকে, সেও গুনগুন গান ধরেছিল এবং আমোদিনীর গলা জড়িয়ে তাকে পাঁজাকোলা তোলার চেষ্টা পেয়েছিল। সংবাদ যে জীবন হতে পারে অনেক সাংবাদিকও তা জানে না।

মাঝে মাঝে দু-চার জন আবার চলে যায়। কোথায় কেউ জানে না। শিবিরের মধ্যে তা নিয়ে বেশ জল্পনার অবসর কোথায়? অনেকে ভাবে, একজন যাক বেঁচে গেল। অনেকে আর বাইরে যাওয়ার চিন্তা পর্যন্ত মনে জায়গা দেয় না। কী হবে আর বেঁচে থেকে। স্বামীর কাছে মুখ তুলে তাকানোর সাহস তো সব সৈন্যরা কেড়ে নিয়েছে। ভাই, মা, বাপ, আত্মীয়স্বজন সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। সে কেমন ধরনের বাঁচা? কিন্তু কেউ চলে গেলে তার শূন্যতা অনেককে অস্থির করে তোলে। মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুমের ঘোরে চিৎকার তখন বাড়ে।

যারা নতুন আসে, বসনহীনতা তাদের কাছে এমন মর্মান্তিক যে উবু হয়ে যে বসে আর সহজে উঠতে চায় না। একজন ঠাঁয় তিনদিন বসে থেকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল। কারো শত উপদেশ সত্ত্বেও সে আজও হাঁটাহাঁটি করে না, রাত্রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। কথা বলবে কী? নিজের খোলস তাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। মেয়েটি একদম গ্রামের মেয়ে। শহরের মেয়ে পর্যন্ত কোনোদিন দেখে নি। অনেকে বাঁচার জন্যে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা পায়। পবিত্র ইসলামে ছতর ঢাকা আল্লার আদেশ। এখানে ছতরহীনতা পাপবোধ উদ্রেক করে বৈইকী। বিশেষত এই ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান গোটা উপমহাদেশ এক। পাপের মুখোমুখি সাধু-সন্তরা হয়ত নির্ভয় নিলাজ দাঁড়াতে পারে। সাধারণ মানব-মানবী সেখানে পঙ্গু।

AMARBOI.COM

মনের পোড়ানি কখনো কখনো মানুষকে ভেতর-গোঁজা ভাব থেকে বেরিয়ে আসার সাহায্য করে। কিন্তু বস্ত্রহীনার বাধা পার হওয়া অতি সহজ নয়, স্বামী কি প্রিয়তমের কাছে বিবস্ত্র হতে পর্যন্ত যাদের শত সঙ্কোচ এড়িয়ে যেতে হয় এই দেশে। শতাব্দীর সংস্কার কজন মুছে ফেলতে পারে বা আজও পেরেছে?

এই শিবিরে দৈনন্দিনতায় আকস্মিক স্তব্ধতা তাই ধর্ম। মাঝে মাঝে কিছু শব্দের রেশ ভেসে ওঠে। যখন আহত কেউ থাকে। ফেনী অঞ্চল থেকে এক কৃষক তরুণীর উপর পাঁচ ছজন খানসেনা উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করছিল। শক্ত বাঁধন বা দৈহিক পরিশ্রমের সঙ্গে আবাল্য পরিচয়ের ফলে হয়ত মেয়েটা মরে যায় নি। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে এখানে তবু আনা হয়েছিল। যারা এনেছিল, হয়ত তাদের ভোগের নেশা মেটে নি। সুস্থ হলে, আবার যদি বিনা পয়সায় ভাড়া খাটানো যায়, মন্দ কী। এই মেয়েটার গোঙানির চোটে কেউ স্থির থাকতে পারত না। তারপর ভাষার ব্যবধান এত দুস্তর যে করুণাভিক্ষা পর্যন্ত এই রাজ্যে অসম্ভব। অবিশ্যি পরদিন ওকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। সকলে ভাবলে, মেয়েটা মরে যাবে অথবা আর এই নরকে আসবে না। কিন্তু সকলের প্রত্যাশা নাচক হয়ে গেল, কয়েক ঘণ্টা পরে যখন মেয়েটাকে আবার তারা ভেতরে ফেলে দিয়ে গেল। সেই থেকে মেয়েটা আর টুঁ শব্দ করে নি, সিমেন্ট-শয্যায় এপাশ ওপাশ করে দুই হাত উরুর মাঝখানে রেখে। কিন্তু যন্ত্রণায় শব্দরূপ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের জগৎ দেখতে পায় না। এতটুকু সম্ভব হয়েছিল, তা-ও একটি উর্দু লফ্‌জের জোরে : মেহেরবাণি। তানিমা এই ভাষার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়েছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের শহীদদের মৃত্যু দেখে সে শপথ নিয়েছিল, আর কোনোদিন উর্দু বলবে না জীবনে। সেদিন হঠাৎ হাতজোড়, আলী খানের কাছে সে আবেদন জানিয়েছিল কেবল মেয়েটার শোচনীয় অবস্থা দেখে : মেহেরবাণি, ডক্টর।

এমন সহসা ঘটনায় শিবির চঞ্চল হয়ে ওঠে মাত্র। কিন্তু পাথর হতে চায় যেন সকলে। তাই মূকের সাধনা এখানে মজ্জাগত। অবিশ্যি মাঝে মাঝে পাঁচ জন এত কাছে মাথা রেখে শয্যাগ্রহণ করে এবং কথা বলে বৈইকী। কিন্তু তার গ্রাম অতি নিচু। স্তব্ধতা চারিদিকে গিলে ফেলছে একটু একটু করে, তাই যেন অত সতর্কতা।

কয়েদীজীবনে অভিযোগ থাকে। এখানে তা-ও স্তব্ধতার শিকার। এত ভ্যাপ্সা গরম ভেতরে। কিন্তু তা নিয়ে কেউ সরব কোনো মন্তব্য করে না। যেন সকলের জানা কথাটা ঢোল শোহরৎ করে লাভ কী?

কোনোদিন রাত্রে যখন আলী খান এবং তার সঙ্গীরা এখানে শিকার বাইরে নিয়ে যেতে আসে, কোনো শব্দ ওঠে না। কোরবানির ছাগলের মতো বিবস্ত্র রমণী হেঁটে চলে যায়। সকলে ভ্যালভ্যাল তাকায়মাত্র। যেদিন পরিখার মধ্যে মাতাল সিপাইরা বাসরশয্যা বানায় সেদিনও স্তব্ধতা এই রাজ্যে ভর করে বসে থাকে। শব্দ হয় বৈইকী, তা দাঁতে দাঁতে ঘষার শব্দ— পরিধিতে অতি সীমাবদ্ধ। সচেতন এখানে কেউ শব্দ করে না। ঘুমের হাতে পড়ে কে কী করে, তার জন্যে আর কে জবাবদিহি হবে?

তবু এখানে অন্তঃস্রোত আছে। হয়ত কাছাকাছি শোয় কিংবা জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে কাছাকাছি বাড়ি বা কাছাকাছি জেলার অধিবাসী— এইসব সূত্র ধরে নৈকট্য গড়ে ওঠে বৈইকী। অমন অপরোক্ষ সেতুর ধ্বনিই এই জগতে অমূল্য সম্পদ। ধরার তো আর কিছু নেই, সমস্ত দেহ-মন যখন তলিয়ে যাচ্ছে অতলে অথবা অন্তহীন কোনো গুহাগর্তে।

তারা চার জন হয়ত তেমনই ধারায় এক দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছিল। অবিশ্যি চার জনে শিক্ষিতা, সভ্যতার বহু সম্পদের সঙ্গে পরিচিত। তাই হয়ত পারস্পরিক সৌরভে আকৃষ্ট। কিন্তু এখানে কে কার সঙ্গী? আত্মবুঁদ আচ্ছন্নতার তলা থেকে মুখ-রচনার পর তাকেই চুম্বন! এই শিল্পীজনোচিত প্রক্রিয়াই হয়ত এখানে টিকে থাকার একমাত্র অবলম্বন। অথচ কেউ তো সদা প্রকৃতস্থজন নয়।

সেদিন বাইরের প্রকৃতি উদ্দাম হয়ে পড়েছিল। ঝড় এবং বৃষ্টি। টিনের চাল থাকলে ওই দুই বাহনের দাপাদাপি অনুভব করা যায় খুব সহজে। আর বৃষ্টি এমন সুর হয়ে তো আর কোথাও দেখা যায় না। ঝমঝম শব্দ অনেক আদিম জগতের সূচনা করে বিরহীর প্রাণে। নিশ্চিন্তে শায়িত গৃহীজন সুখের বিশেষ আমেজ পায় ওই নিনাদে।

শিবিরের অধিবাসীনীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অনেক উপরে ভেন্টিলেটারপথে প্রবিষ্ট বাতাস জানান দিতে থাকে। বাইরের জগৎ যেন বায়বীয় রূপে তার সাথে সাথে উঁকি মারার সুযোগ পায়। গৃহবাসীরা তখন কল্পনায় বাইরের জগতে ছুটে যেতে পারে বৈইকী। স্মৃতি অনুষঙ্গের একটু চিলতে চিহ্ন পেলে ক্রমশ দিবাশেষের ছায়ার মতো দীর্ঘ, দীর্ঘতর হতে থাকে।

উদোম গা প্রায় একশ' জন রমণী। একটা হিমেল ছোঁয়াচে আনমনা হয়ে যায়। কেউ তেমন চঞ্চল নয়। কিন্তু যেখানে প্রাণ-প্রান্তর বেবহা সেখানে সামরিক শাসন কোন স্বৈরাচারী কবে জারি করতে সক্ষম হয়েছে।

এত ঝড়ের মধ্যে কয়েকটা মর্টারের শব্দ বজ্রপাতের সঙ্গে অনেকে ঘুলিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু এখানে তা হয় নি? আরো একদিন থেকে সকলে নির্বিবাদ। আজ সিপাইদের কোনো উৎপাত ছিল না। এমন শান্ত সন্ধ্যা এবং রাত্রি কদাচিৎ কাটে। তাই সকলে নিজের চিন্তা নিয়ে খেলা করার সুযোগ পায়।

পোস্তার চত্বরের উপর তারা চার জন বসেছিল। তানিমা বুকে দুই হাত চাপে যেন কত শীত পেয়েছে। অবশ্যি আপেক্ষিকভাবে গরমের পর এই পরিবর্তন হিমেল আঁচ দিতে পারে বৈইকী।

জায়েদা ঊর্ধ্বমুখী এতক্ষণ বসেছিল। হয়ত কোনো আকাশ-প্রার্থনায়। এখানে করোগেটেড টিনের ঝিলিকই নিলীমা। তানিমার দিকে চোখ পড়তেই সে স্বাভাবিক গলায় বললে, "শীত পেয়েছে নাকি তোমার?" এখানে বয়সের ফারাক থাকলেও একে অপরকে সমবয়সীর মতো সম্বোধন করে।

"না। সামান্য।"

"বাইরের শব্দ শুনছি।"

"শুনেছি, শুনেছি।"

আমোদিনী চুপচাপ সটান সামান্য উপরে হাতে মাথা রেখে আড় হয়ে শুয়েছিল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল এবং যোগ দিলে, "এখানে একটা বজ্রাঘাত হয় না কেন?"

"বজ্রাঘাত...", জায়েদা কথাটা লুফে নিয়ে ঠোঁটে বাঁকা হাসি ছিটিয়ে বললে, "না, অন্য আঘাত হচ্ছে। এখানে নয়, বাইরে।"

"কী করে বুঝলে?" আমোদিনীর প্রতিবাদ।

"যেদিন বাইরে নানা শব্দ শুনি সেদিন আমাদের এই হারেমে শান্তি থাকে। তাই ভাবছি চাষি-বৌ ঠিক বলেছেন।"

"আমার কানে পোকা পড়েছে, জুঁই। সেই একদিন মাত্র শুনেছি, গুলির পর গুলি। যেন দুদিকে লড়াই। আর তো শুনতে পাই না।'

'কিন্তু আমোদিনী-বোন, আমার মাথা কেন এমন করেছ? চিৎকার দিতে ইচ্ছে করছে বারবার।"

"না, সব শান্ত চারিদিকে, তুমি গোলমাল করে দিও না। এসো আমার বুকে মাথা রাখো।"

আমোদিনী তাড়াতাড়ি জায়েদার মাথা নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে সস্নেহে দৃষ্টি ও স্পর্শে তা ছেয়ে ফেলতে লাগল।

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে।

ঝড়ের একটু তোড় যেন বেড়ে যেতে ভেন্টিলেটারপথে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি এসে পড়ল। সখিনা পাশে বসে ছিল নির্বাক। দুদিন থেকে তার কী যেন হয়েছে, আর কথা বললে না। সে এই বৃষ্টির ছিট পেতে নিজের ডাগর দুই চোখ উপরের দিকে তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। শুধু ফুঁপিয়ে কাঁদে সে, কিছু জিজ্ঞেস করলে। তাই তিন সঙ্গিনী নির্বিকার রইল। শীর্ণ মুখখানা এমন উর্ধ্বমুখী যেন আলোর কাছে সে ফরিয়াদরত এবং জওয়াব না পাওয়া পর্যন্ত কেয়ামত তক সে শুধু চেয়ে থাকবে। আল্লার আরশ এইভাবে টলে যাওয়ার পথ বাৎলেছেন পিরপয়গম্বরেরা। সখিনা হয়ত তারই পরীক্ষা দিচ্ছে আজ।

আর সকলের কথা থেমে গেছে সখিনার দিকে চোখপড়ামাত্র।

কারো দিকে না তাকিয়ে তেমনই উর্ধ্বমুখী, সে স্বগতোক্তি করতে লাগল:

তুমি এখন কোথায়? মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছ নিশ্চয়। ...আর কখনো যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় এবং আমি জানতে পারি, তুমি তোমার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে রাইফেল ধর নি, মর্টার ছোড় নি,...আমি তোমাকে তখন খারিজ করে দেব আমার বুক থেকে। তোমার লম্ফঝম্ফ শুধু আমার কাছে। তুমি ভীরু...। পঁচিশে মার্চের ব্যবধান সব ভেঙে দিয়েছে নাকি? ঢাকা থেকে কুমিল্লা কত দূর? তিন হপ্তা আমি কুমিল্লার আশেপাশে থেকে গেলাম, তুমি এলে না।...আমার আব্বা কোথায় কী হয়ে গেল...আমি কেন এখানে?...আমি মালেগণিমৎ...আরবদেশে ইসলামের যুগে যুদ্ধের পর মাল ভাগ হোত। যুদ্ধবন্দিনীরাও মাল। ইসলামের রাষ্ট্র তৈরি হচ্ছিল ঠিক। তবে মালে-গণিমৎকে সেকালে তারা বিয়ে করত। এ যুগে তফাৎ এরা বিয়ে করে না। যখন করে দলে দলে একজনকে বিয়ে করে...ইসলামের ঐতিহ্য থেকে ওরা একদম দূরে সরে গেছে তা কেউ বলতে পারবে না।...বাবা, তোমার আদরের সখিনা কারবালার প্রান্তরে এজিদের বাচ্চাদের খোঁড়ায়ে...তার কাশেম কোথায় কে জানে? না, আমি আর তোমার কাছে যেতে পারব না, আজাদ...অনাঘ্রাতা কুসুমের মতো আমি তোমাকে নিজের হাতে তুলে দেব ভেবেছিলাম..শূয়োরের পাল গোলাপ বাগান তছনছ করে দিয়ে গেল..জননী বাংলাদেশ কোথায়? কোথায়? তার বীর সন্তানেরা আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে...। ...একটা কথা মনে পড়ল। হাসি পায় যখনই মনে পড়ে। বাড়ির কাছে স্টেশন থাকার ফলে ট্রেন এলে ছুটে যেতে ইচ্ছে করত। কত লোক ওঠে নামে। এসব দেখা একটা বাতিকের মতো। কিন্তু সবসময় তো যেতে পারতাম না। একই পাড়ায় বাসা। তাই তোমাকে কতদিন ঢাকা থেকে আসতে দেখেছি। কিন্তু সেদিন কী হলো— নিজেও ভেবে পাই নে। ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগে অনেক দূর থেকে ধোঁয়া, হুইসেল আর ট্রেনের দৌড়বাজি দেখে বেশ মজা পাচ্ছিলাম। তারপর ট্রেন স্টেশনে ঢুকল। তখন ওভারব্রিজ থেকে পড়ি-কি-মরি প্রায় দৌড়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে এলাম। দেখি, একটা স্যুটকেস হাতে তুমি হাঁটছ। পরনে পাৎলুন আর ঘিয়ে রঙের হাওয়াই শার্ট। একটু জোর বাতাসে তোমার আলুথালু চুল উড়ছিল। তোমার উপর চোখ পড়তে একটা ধাক্কা খেলাম। পাড়ায় কত দিন দেখা। কিন্তু এমন জেল্লাময় তোমাকে তো কখনো দেখি নি।...

চোখ থেকে সেই ছবি যেন মুছে ফেলতেই পারি নে, যত চেষ্টা পাই, কেবল লেপ্টেই থাকে। তুমি কী যেন মামুলি জিজ্ঞেস করলে, ভালো আছো বা ঐ জাতীয় কিছু। আমি জবাবও দিয়েছিলাম। তারপর তুমি স্যুটকেস দুলিয়ে চলে গেলে গেটের দিকে। আমি তখন ঠাঁয়ে পোঁতা। চতুর্দিকে তাকাই, কেমন যেন ঠেকে। একটু পা

চালিয়ে এলাম তোমাকে ধরার জন্যে। তুমি সেদিন রিক্‌শা চড়ে ভেগে পড়েছ। আমি গেটের কাছে এসে আবার ওভারব্রিজের দিকে এগিয়ে গেলাম। ট্রেন চলে গেল। আমি তার ছুটন্ত চাকার দিকে আনমনা চোখ রেখে চেয়েই থাকি। চতুর্দিকে আকাশ, মাঠ, তিতাস নদী— এক বিস্তীর্ণতার গহ্বরে আমি এত ছোট যে খেই ধরতে পারি নে, কোথায় আছি বা কোথায় যাব? ট্রেন যাত্রীদের ভিড় থিতিয়ে যাওয়ারও অনেক পরে আবার বাড়ির দিকে মুখ ফেরাই। এইভাবে কুসুম-শর নাকি নিক্ষিপ্ত হয়। নভেলের পাতা আমার দৈনন্দিনতার পাতায় এসে ঠেকল। আরো...কত দিন পরে তুমি জেনেছ, আমি তোমার অনুরাগী। পূর্বে বোকার মতো আমার চলাফেরার কোনো হদিস করতে শেখো নি। তোমাকে লুকিয়ে দেখার বা ছুতো-সংলাপের অর্থ করবে এমন বান্দা তুমি নও। যখন বর্ণপরিচয় হলো, তুমি আর আমার কাছ থেকে দূরে রইলে না সামাজিক বাধাটুকু তাও দূর হতে বেশি দেরি লাগল না। দুই পরিবার উল্লসিত হয়ে উঠল। তোমার এম. এ. পরীক্ষাটুকুর যা সাত আট মাস অপেক্ষা। আঙুলে নিয়ে আমি নক্ষত্র গুণতে লাগলাম— আজ আগ্নেয়গিরির লাভা সরিয়ে সরিয়ে কোনোরকমে মাথা খাড়া রেখে তোমাদের খুঁজছি। তোমার বাড়ি পুড়ে গেছে, তোমার ছোটভাই বাড়িতে ছিল। মিলিটারি হামলায় সে রাত্রেই মারা গেছে। তুমি ঢাকায় হোস্টেলে ছিলে..আর কোনো খোঁজ পাইনি। আমি মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। বাড়ির কারও খোঁজ পাই নি। পাওয়ার আশা ছিল, তার আগেই আমি এই জন্তুদের কবলে..মৃত্যুর স্পর্শ নাকি ঠাণ্ডা। আগে বুঝি নি কেন শাস্ত্রকাররা এমন লিখেছেন? আজ আর কিসের জন্য জীবনের উত্তাপ খুঁজব? অনেক খবর আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, তিমি মাছের মতো ব্যাধিত মুখ সহ। তার দাঁতে ছিন্নভিন্ন হওয়ার আগে নিজের নিঃশ্বাসটুকু বন্ধ করে দিতে পারলেই সব কিছু থেকে রেহাই পাওয়া যায়...কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি বিদায় নিতে পারি নি। এই একটা দুঃখই আমাকে পীড়িত করে। আর কোনোকিছু আমাকে স্পর্শ করে না, আজাদ। দুমড়ানো পাতায়ও বসন্ত আসে। তা মধুমাসের স্পর্শ নয়, বিদ্রূপ...প্রসাধনে দেহ এমন মেজেঘষে রেখেছিলাম কেন? পারিবারিক সন্ধ্যা, সিনেমা, উঠানে করমচার লাল ফল, একটা ট্রেন...আমি চাপা পড়ছি এই পড়লাম...। কিন্তু পোকাগুলো আবার কিলবিল করছে। আমার গায়ে সারা গায়ে কেঁচো কোটি কোটি কেঁচো চরছে।—

সখিনা তার দেহ থেকে সেই কল্পিত কেঁচোগুলো ছাড়িয়ে ফেলতে বারবার খিমচাতে লাগল, যেখানে খুশি হাত। এমনিতে তার আঙুলের নখ বড়। খিমচানির চোটে রক্ত ঝরতে লাগল কয়েক জায়গা থেকে। তখন সঙ্গিনীদের হুঁশ হয়। তানিমা তার হাত দুটো ধরে ফেললে, সে অনুনয়মাখা গলায় বলে, 'ছেড়ে দাও পোকাগুলো আমাকে খেয়ে ফেললে।'

তানিমা তাকে বুকে চেপে ধরে আর মুখে হাতচাপা দেয় বারবার। কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো সখিনা চিৎকার বা কোনো শব্দ করলে না। কচি বালিকার মতো তানিমার বুকে নিথর ঢলে পড়ল। ক্রমশ আচ্ছন্নতার ঘোরে নিমগ্ন।

তানিমা এবার কোলে রাখলে সঙ্গিনীর মাথা। তারপর হাত দুটো নিজের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে নিলে। ধীরে ধীরে নিজের আঙুলের স্পর্শ মারফত সে স্নেহের ধারা বইয়ে দিতে চায়। সখিনা সত্যি প্রসাধনপ্রিয় ছিল। তার আঙুল দেখলে বোঝা যায়। কী সুন্দরভাবে না পালিশ লাগাত। ঠিক অভিনেত্রীদের মতো। নখগুলো আঙুল ছাড়িয়ে আরো একইঞ্চি লম্বা একটায় গোলাপি পালিশ এখনো বেশ জমাট হয়ে রয়েছে। গত একমাসের জুলুমে একদম ক্ষয়ে যায় নি। উপরকার ময়লাটুকু মুছে নিতে তানিমা আঙুলের সাহায্য নিলে। বারবার দেখলে সখিনার নখগুলো বড় পরিপাটি করে কাটা। একমাসে বেশ বেড়ে গেছে।

দুই সঙ্গিনীর কোলে আর দুই জন। আশ্রয়দাতা এবং আশ্রিত এখানে কখন জায়গা বদল করে, বলা যায় না। দুঘণ্টা পরে হয়ত বিপরীত ছবি চোখে পড়বে। সবচেয়ে বয়সে ছোট সখিনা। তার জন্যে আর তিন জনের মমতা অনেক বেশি। অবিশ্যি এসব পরিমাপ এখানে খামখা। ঝড়ের রাত্রে একই গুহায় তিন চার জন আশ্রয় নিলে যে দরদ এবং উত্তাপ সঞ্চারিত হয়, এই ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছেমাত্র। বিপদে সাধারণত বাঁচার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। এই শিবিরে বাঁচার প্রশ্ন তো আছেই। তা ছাড়া আছে আবার জগতের সামনে দৈনন্দিন জীবনকে ফিরে পাওয়ার প্রশ্ন। আঘাত যখন নানা দিক থেকে আসে তখন আর সতর্ক হওয়া বা নিজেকে বাঁচানোর প্রশ্ন ওঠে না। তেমন ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এলোপাথাড়ি হাত বাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং দৈবাতের উপর নির্ভরশীলতা বড় হয়ে দেখা দেয়। তারা চার জন তেমনই ঘূর্ণিপাকে পড়েছিল।

বাইরে বৃষ্টির তুমুল বর্ষণে ধরিত্রি শীতল হচ্ছিল বৈইকী। হঠাৎ হঠাৎ বজ্রপাত সেই সামঞ্জস্য ভেঙে দিচ্ছিল।

ভেতরের অধিবাসীরা অবিশ্যি কেউ তেমন টের পায় না।...কারণ, বৃষ্টির অস্তিত্ব কারো কাছে আজ কিসের দূত হয়ে আসবে? বিজলী চমক খুব ক্ষীণভাবে এলেও চোখের পাতায় ধাক্কা দিয়ে যায়। তাই কেউ চমকে ওঠে। কিন্তু এমন চমকে ওঠার তো আরো বাহন আছে। আলী খান, রেজা খান কি ওই জাতীয় প্রবেশকারীদের বুটের আওয়াজ তেমনই সামগ্রী। আকাশ এইভাবে জুতোর তলায় ঢুকে যায়।

রাত্রে আহারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আহার্য বেশিরভাগ ফেরত যায়। সেদিন রাত্রে এই চার জন কোনো কিছু স্পর্শ করলে না। আমোদিনী তো আরো তিন দিন থেকে আহার ছেড়ে দিয়েছে। স্বভাবসুলভ কায়দায় সঙ্গিনীদের বলেছিল, 'ডাইটিং করছি, মোটা হয়ে গেছি কিনা।'

দেখা গেল বিশ গজ দূরে আরেক চত্বরে রশীদা বিবি এক উপুড় হতভাগিনীর পিঠ টিপে দিচ্ছেন। পা মেলে তিনি বসে আছেন। অবিশ্যি তার চোখ শুশ্রূষা-গ্রহীতার উপর নেই। একসময় কাৎ হয়ে পড়লেন তিনি, হাত কিন্তু সচল। তাও থেমে গেল। চাষি-বৌ ঘুমের কোলে।

সেদিন বাইরের প্রকৃতির প্রসার যেন এই গুদামের মধ্যেও প্রবিষ্ট। বড় শান্ত চতুর্দিক। এমন সাধারণত হয় না। অনেকে বিনিদ্র উসখুস বা এপাশ ওপাশ করে। আজ তাও নেই।

আমোদিনী, তানিমা বসেছিল। একসময়ে দেখা গেল, তারাও ঢলে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবসন্নতা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে এমন শান্ত আনে বৈইকী।

কিন্তু কাল-প্রবাহের কি অবসন্নতা আছে?

৪

তানিমার স্বামী নূর আহসান চিরন্তন বাঙালি। পাকিস্তান হয়েছিল। কিন্তু সে সরকারি হালচাল স্বীকার করে নিতে পারে নি, শুধু একটি কারণে। নচেৎ কোনো রাজনীতির ধার দিয়ে সে যেত না। কারণটি এত স্পষ্ট যে অন্ধেরও চোখে পড়ার কথা সাম্প্রদায়িকতা। পাকিস্তানের পক্ষে সবরকম যুক্তি সওয়া যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সবই হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের উপর গিয়ে থামে। এখানে নূর আহসান কোনো যুক্তি মানতে রাজি নয়। শত শত বর্ষ পাশাপাশি বাস। হঠাৎ সেখানে যত রকমের বিদ্বেষ-বিষ জ্বালিয়ে দেশের কোনো মঙ্গল হতে পারে, তা সদাগরি ফার্মের অফিসার নূর আহসান বুঝতে অক্ষম ছিল। অবিশ্যি তার রাজনীতি ঐ পর্যন্তই। কলেজ-জীবনে তার হিন্দু বন্ধু ছিল অসংখ্য। সবাই ছিটকে চলে গেছে। এই জন্যে নূর আহসান বেশ একটা বেদনা অনুভব আজও করে। কারণ, তার মতে কৈশোর বা যৌবনের প্রারম্ভে যাদের বন্ধুরূপে পাওয়া যায়, তাদের তুলনা আর কখনো মেলে না। পরবর্তীকালে পোশাকি হৃদ্যতা হতে পারে কারো কারো সঙ্গে। কিন্তু তা কৈশোর বা যৌবনের স্বাদ দিতে অক্ষম। নূর আহসান আবার নিজের দুর্বলতার উপর চাবুক কষাতে কসুর করত না। বেশ জোর গলায় বলত, "অবিশ্যি ব্যক্তিগতভাবে আমার ঢের উপকার হয়েছে বৈইকী। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কোথায় কেরানিগিরি করে জীবন কেটে যেত, সেখানে হয়ে গেলাম অফিসার। কারণ লোক নেই। মুসলমান যা পাওয়া যায় সেই ভালো। বর যখন মাংগা তখন কানা খোঁড়া বাছলে আর ভাতার পাওয়া দায়।" শেষের কথাগুলো বেশ হাত নেড়ে ভঙ্গিসহ উচ্চারণের পর আবার সে যোগ করত, "কিন্তু আমার তোমার মঙ্গল দিয়ে তো আর দেশের বিচার হয় না। কোটি কোটি হিন্দু মুসলমানের কী হয়েছে? সব মিলিয়ে দ্যাখো। দাংগা হাংগামা, লাখ লাখ মানুষ বাস্তুহারা, জীবজন্তুর মতো এদেশ ওদেশ করে বেড়াচ্ছে। ঠিক তুলোধোনা হয়ে গেল। পাকিস্তান হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান আর কেন?" এমন সহজ কতগুলো মতামত থেকে উত্তর চল্লিশ বয়সেও নূর আহসান এদিক-ওদিক হয় নি। কিন্তু রাজনীতির মারপ্যাঁচ তার কাছে অস্পৃশ্য। অফিস থেকে ঘরে ফিরলে তার একমাত্র নেশা ছিল তাস খেলা। কখনো নিজের ঘরে, কখনো বন্ধুদের বাড়িতে। তা নিয়ে গৃহিণীর প্রতিবাদ ছিল। কিন্তু নূর আহসান রবীন্দ্রনাথ দিয়ে স্রোত ফেরাত। হেসে হেসে বলত, অনেক খেলার মাঝে একটুখানি পাওয়া সেই পাওয়াতে জাগায় দখিন হাওয়া। অতি সহজ প্রাণের নূর আহসান। এই দ্যোতনায় সে বাঙালিয়ানার প্রবক্তা হয়ে উঠবে, তা বিচিত্র কিছু নয়। তাই পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে যখন ক্রমশ বাষ্প জমে উঠল, সে দূরে রইল না। যে-কোনো রাজনৈতিক দল হোক, যদি বাঙালির দাবি-দাওয়ার কথা থাকে, আহসান মিয়ার চাঁদার বহর বেড়ে যেত এবং অপরেও যাতে বাড়ায় তার জন্যে চেনা মহলে হামলা চালিয়ে বসত। দেশময় যখন ঝড় উঠল সে আর স্থির থাকবে কী

AMARBOI.COM

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে? মিলিটারি নৃশংসতার কাহিনী তার মফস্বল শহরে পৌঁছতে তিনদিন যা দেরি। তখন প্রথমে সে ভেবে উঠতে পারে নি, তার কর্তব্য কী? একজন রাজনৈতিক জনের পক্ষে এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত খুব সোজা। তার আদর্শ আছে, সে আছে। মাঝখানে কিছু থাকে না। কিন্তু যাদের আদর্শ থাকে এবং মাঝখানের ধাপ থাকে না, যেহেতু তেমন আগ্রহ বা মানসিক ভিত্তিহীন, তাদের পক্ষে যথাসময়ে যথা কাজ করা কঠিন। নূর আহসান আবার চাকরিজীবী। সুতরাং ভবিষ্যৎ এবং পরিবার যখন আছে, পরিবারের ভবিষ্যৎ সেই খুঁটাতে বাঁধা। প্রথম হপ্তা সে ভেবেছিল, প্রথম হামলার ধাক্কায় বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে। আপাতত আর বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বা উচ্চারণ থাকবে না। তার মতো অনুগত চাকরের পক্ষে এমন পরিবেশ স্বস্তিকর।

কিন্তু দেখা গেল, বাঙালি হওয়ার বিপদ রাজনীতি করার চেয়ে কম প্রাণঘাতী নয়। তখন সিদ্ধান্ত নিতে আর বিলম্ব হয় নি। নূর আহসানের মফস্বলে ছোট একটা টিনের বাড়ি অবিশ্যি মৌসুমে কৃষ্ণচূড়ার স্রোতে ভাসা। তার মায়া তো বেশি নয়। মায়া প্রাণের। মায়া তানিমার। মায়া দুই সন্তানের— যাদের বয়স আটের বেশি নয়। তখন অফিসে আর কাজকর্ম ছিল না। সব বন্ধ। কাজেই অন্যত্র কোনো নিরাপদ জায়গায় এদের রেখে এলেই সব সমস্যা চুকে যাবে। আপাতত এমন সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। সেইভাবে সে বেরিয়ে পড়েছিল। নিজের গ্রাম চাটগাঁয়। সেখানে আর যাওয়া অসম্ভব। তাই কুমিল্লা বা নোয়াখালির কোনো গ্রামে আশ্রিত হতে পারলেই এখন প্রাণে রক্ষা পাওয়া যায়। সেইভাবে বেরিয়ে পড়েছিল তারা। কিন্তু কিছু দেরি হয়ে যাওয়ার ফলে সব প্ল্যানমাফিক এগোচ্ছিল না। ১৯৭১ সনের মাঝামাঝি সময়। হানাদার সৈন্যরা তখন পঙ্গপালের মতো গ্রামবাংলার পথেপ্রান্তরে নেমে পড়েছে, আর শিবির বা শহরে আবদ্ধ নেই। গ্রাম-গ্রামান্তরে হন্যে সপরিবার ফেরার। এইভাবে আরো একমাস কেটে যায়। শেষে নিরাপদ জায়গার সন্ধান পাওয়া গেল। সঙ্গী সহকর্মীর বাড়ি। তার জন্যে মেঘনার সংলগ্ন খাল-পথে রাত্রে পাঁচ ছ'ঘণ্টা যাওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে এক হিন্দু পরিবার ছিল। একুনে দশ জন। একটা মাঝারি নৌকায় কোনোরকমে এই পথ পার হয়ে গেলে কিছুদিনের জন্যে খাতিরজমা। নূর আহসান স্থানীয় লোকদের সাহায্যে নিরাপত্তার সব খোঁজ নিয়েছিল। সেইভাবে তারা পাড়ি দেয়। কিন্তু কেউ ভাবতে পারে নি, চওড়া খালের মধ্যে গানবোট নিয়ে পাকিস্তানি হানাদারগণ টহল দেবে। বিপদ এইভাবে আসে। আর এই শত্রু তো কোনো সভ্য জগতের বাসিন্দা নয়। টর্চলাইট ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নৌকায় ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লেগেছিল। অন্ধকার রাত্র। সব ছিন্নভিন্ন। নূর আহসানের মনে ছিল শুধু সঙ্গী হিন্দু ভদ্রলোকের কথা। 'আবার এই তরীতে ঠাঁই। আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। দেখি ভগবান কোথায় নিয়ে যান।' ভগবানও সেদিন বলতে পারবে না, মাঝিসহ বারো তেরো জন প্রাণ কোথায় ভেসে গেল বা কূল পেল। তানিমার আবছা আবছা জ্ঞান ছিল। তারই সাহায্যে আজও মাঝে মাঝে ছবি আঁকতে পারে নিতান্ত ধূসর রঙে। মা-মা আহ্বানে সন্তান দুজন তাতে আঁকড়াতে গিয়েছিল হয়ত। কিন্তু ওই যা শেষ ডাক। আর কোনো ডাক সে শুনতে পায় নি। নূর আহসান বা হিন্দুপরিবারের কী হয়েছিল, তেমন স্পষ্ট ধারণা

করা এখন তার সাধ্যের বাইরে। যখন জ্ঞান হয়েছিল, সে আরেক জীবে রূপান্তরিত। ইসলাম এবং পাকিস্তান রক্ষাকারী এক অফিসারের আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ। এসব ঘটনা কদিন পরে ঘটেছিল, কিভাবে ঘটেছিল, তার কোনো বিবরণ তানিমা কোনোদিন দিতে পারবে না। প্রায় পাঁচ-সাত বার হাতফেরির পর এই বন্দিশিবিরে। এখানে সে প্রথম অনুভব করেছিল, বেঁচে আছে। কিন্তু কেন সে বিবস্ত্র বা তার মধ্যে লজ্জার হেতু কেন অপরিসীম— তা তলিয়ে দেখতে অক্ষম তানিমা। সব ছবি ভাঙা ভাঙা দশমিকতায় ছুটে আসে আর সে চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু তিন সঙ্গিনীর আশ্রয়ে সে সোয়াস্তি পেয়েছিল। কারো কোলে মাথা রেখে কারো মাথায় হাত বুলিয়ে বা অনুরাগের সহজ প্রকাশে মন শান্ত হয়। আশপাশের সবকিছু অর্থময়তায় গেঁথে ফেলতে এমন শক্ত জমিন প্রয়োজন। কিন্তু যখনই যুক্তি বা শিকল একটু দীর্ঘ হয় সব ঘুলিয়ে যায়। কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তারপর বিয়ে হয়ে যায়। আর লেখাপড়া এগোয় নি। তবে তানিমা জানত, ভাষান্তরে গেলে যেন সব সহজে ঢাকা যায়। তাই বোধহয়, ইংরেজি কথা বেশি বেরিয়ে আসে। 'তানিমা ইজ ডেড', তানিমা মরে গেছে— একথা অপ্রকৃতস্থ-প্রকৃতিস্থ দুই অবস্থায়, শোনা যায়। অবিশ্যি দুই অবস্থার ফারাক সবসময় সহজ নয়।

স্মৃতি ভেসে আসে। স্মৃতি দুদ্দাড় ঝড়। আবার সহসা বিদীরণের পর ধীরে ধীরে নিভে আসা আগ্নেয়গিরি। একসময় চোখ কী দেখে চোখে জানে না। একসময় হঠাৎ ছবিগুলো সহস্রগুণে বর্ধিত এবং এত কাছে আসে যে তার ঘনত্ব সব দুমড়ে দিয়ে যায়। দলাপাকানো অসহায়তার উদ্‌ভ্রান্তি তখন ঘিরে রাখে। চতুর্দিকে অর্থহীনতার বন্যা এই সময় থৈ থৈ করে। অথচ স্মৃতি জ্ঞান। স্মৃতি কল্পনা। জীবন উদ্যানের বিটপীবৃন্দের সঞ্জীবনী রস। এই সরসতার স্পর্শ ছাড়া সব মরুভূমি হয়ে যায়।

পরিবেশ একসময় ধাতস্থ হয় বৈইকী। সেও একরকম স্বাভাবিকতা। এই লেন-দেন না থাকলে কোনো মানুষই বাঁচার কোনো প্রেরণা পেত না। তাই ন্যুবিয়ার স্বর্ণখনির মধ্যে দাস শ্রমিকেরা কাজ করে গেছে পুরুষানুক্রমে। যখন ভেতর এবং বাইরে থেকে তেমন স্বাভাবিকতা আর কাউকে প্রেরণা যোগায় না, তখন পরিবেশের উপর আঘাত পড়ে।

তানিমা স্বপ্ন দেখে প্রতি রাত্রে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে, তখন সব মনের পরতে এগোয়। কিন্তু কোথাও কিছু সাহায্য মেলে না। নিজেকে প্রশ্ন করে তখন, কী দেখছিল সে? কিন্তু এমন স্বপ্ন দেখার পর তার মনে হয়, পৃথিবী বড় নির্বিবাদ। কোথাও কিছু খুঁৎ নেই। অজানিতে নিজের হাত নগ্ন পায়ের উপর পড়লেই ছ্যাঁকা লাগে, যেন সাপের পায়ে আঙুল পড়ে গেল। অথচ এই দেহের উপর যে বাথরুমে বহু সময় কাটিয়ে দিত সাবান মেখে, প্রসাধনের বহর বসিয়ে। আজ কতদিন নিজের মুখই দেখে নি সে। গালে তিনচার জায়গায় জখম। ঈষৎ ঘাও রয়েছে। মানুষের দংশন সরীসৃপের দংশনের চেয়েও এমন জ্বালাময়! নিজের মুখ কুঁচকে একরকম ঘৃণা বা বিস্বাদ প্রকাশ করে সে। তারপর মেঝের উপর মুখ ঘষতে থাকে। ঘষে ঘষে ছাল তুলে ফেলবে। কেউ তখন বাধা দিলে সে থামে। কিন্তু তারপরই ডুকরে কাঁদে। অনেকদিন কান্না এত জোর হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে আলি খান ছুটে আসে এবং তারপর নিতম্বে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে হুকুম চালায়। একবার দ্রুত উঠে তানিমা এক থাপ্পড় মেরে দিয়েছিল শাস্ত্রীর গালে। কিন্তু সেরাত্রে তার জন্যে অপরাধী কম শাস্তি পায় নি। দুজন লায়ালপুরী জওয়ান তাকে পরিখার ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। উপর্যুপরি বলাৎকার। গোটা শিবির স্তব্ধ সেদিন, মাথা কুটেছিল পাথরে। একদম মৃতের মতো নিঃসাড়। তানিমাকে চুষে ফেলে দিয়ে যাওয়ার পর তার কাছে যায় নি কেউ। তিন সঙ্গিনী নিজেদের মধ্যে এমন ডুবেছিল সে হাত পর্যন্ত এগিয়ে দেয় নি তার দিকে।

রশীদা বিবি আসার পর এখানে স্বপ্নচারণা অবিশ্যি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। সকলে সংযত থাকার চেষ্টা পায়। খামখা জন্তুর সামনে বারবার ইজ্জত খুইয়ে লাভ কী? তাই অযথা কেউ সাহস দেখায় না। একদিন রশীদা বিবি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, "বুবুরা, আমি তো নামাজের সুরা জানি না। আপনেরা লিখা-পড়া মানুষ, আইয়েন আমরা হগ্‌গলে নামাজ পড়ি।"

জায়েদার প্রশ্ন, "ক্যান?"

"আল্লারে ডাকুম, বুবু। মসিবৎ তিনি দ্যান, আবার তিনি দূর করেন।"

"তা জানি। কিন্তু নামাজ পড়তে কী লাগে জানো?"

"কী লাগে কন? আপনেরা লিখা-পড়া মানুষ।"

"ওজু লাগে।"

"এত পানি পাবে কই?"

"বুবু-রা মৌলভি সাব জ্বর অইলে কইছেন ধূলা-ওজুতে চলে।"

"তা চলে। কিন্তু 'ছতর' (অঙ্গ) খোলা থাকলে ওজু ভাঙ্গে জানো।?"

"হে জানি।"

"আমরা ল্যাংটা দ্যাখো না?"

জায়েদা তারপর খিলখিল হাসতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে করে তা থামিয়ে নিয়েছিল।

রশীদা বিবি তখন ঘাবড়ে যান। সত্যি নামাজের জন্য এসব ফরজ বা শাস্ত্রমতে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সকলের মুখের দিকে চেয়ে তিনি হতাশ, হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তিনি বলতে থাকেন, "বুবু-রা গোস্বা হন না, একডা কথা কই?"

রশীদা বিবি তখন দ্বিধান্বিত। ঈষৎ ইতস্তত করেন। শেষে যেন কোনোরকমে ঠেলেঠুলে শব্দ তোলেন, "বুবু, আমি কই। য্যামন দেশ, তেমন ভেশ। আল্লারে ডাকুম। তাই কাপড় কী দরকার? তিনি তো সব দ্যাহেন। আমরা 'ছতর' ঢাকছি কি ঢাকছি না, হেতে কী আসে যায় তার কাছে? তারেই তো ডাকছি, তারেই ডাকুম। আর আল্লা আমাগো হালৎ কি দ্যাখছেন না?"

নিরক্ষর গ্রাম্য মহিলা। কিন্তু তার জবাবের কাছে কেউ আর মুখ খুলতে পারে না। সখিনা সেই সময় হেসে উঠেছিল হা-হা শব্দে। তারপর রশীদা বিবির কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, "খালা, আপনে জবর কথা কইছেন।" তারপর আরো হাসির অনুসৃতি।

তানিমা তখন বাধা দিয়েছিল, 'এ-ই এত হাসো কেন?"

"হাসব না। খালা ঠিক বলেছেন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তা হাসির কী আছে?"

"খালা ঠিক বলেছেন। সিপাইদের কাছে ল্যাংটা হতে পারি, আর আল্লার কাছে ল্যাংটা হলে দোষ কী? তাই হাসছি।"

এদিকে রশীদা বিবির সাহস আছে। জীবনে অনেক পুড়েছেন। তাই হয়ত এইসব দুঃখে একদম মুষড়ে পড়েন নি। তা ছাড়া বাইরে গুলিগোলার শব্দ হলে তিনি যখন আশপাশে সকলকে ঘুমন্ত দেখেন, তাদের ঘুম ভাঙাতে ইতস্তত করেন না এবং ফিসফিস কণ্ঠে বলেন, "হোনো। আমাগো পোলারা শুরু করছে।" খালার তখনকার অবয়ব দেখার মতো। যেন নিজের সমস্ত বেইজ্জতি-বিস্মৃত আরেক আপ্ত রমণী তিনি। এখানকার অধিবাসিনীরা তাকে সত্যি খালা বা মাসি ডাকতে শুরু করেছিল কি সাধে।

তিনি সকলকে বলে রাখলেন নামাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করবেন আলি খান ও তার সঙ্গীদের। অবিশ্যি আলি খানই এখানে সর্বেসর্বা। যদিও চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করে না। তবু সে সবসময় আছে; এমনই ধরে নেওয়া যায়।

পরদিন আলি খান এই সৈন্য-হারেমে প্রবেশমাত্র রশীদা বিবি আরো তিন চার জন রমণী আশেপাশে তার সামনে গিয়ে জোড়হাতে উচ্চারণ করেছিলেন, "হুজুর নামাজ।" ভাষার যোগাযোগ তো নেই। রশীদা খালা আর কী-বা বলবেন।

আলি খান বেশ হতভম্ব হয়ে যায় প্রথমে। এমন তো কোনোদিন হয় নি। খালা আবার, "হুজুর, নামাজ"। উচ্চারণমাত্র সে প্রশ্ন করে, "নামাজ কিয়া?"

খালা তখন বিমূঢ়, ভাষা হাতড়ে বেড়ান। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি বেশি দূরে থাকে নি। তখনই আকাশের দিকে হাত তুলে সঙ্গী-মারফৎ দেখান কিছু তহরিমা, কিছু মোনাজাত।

"নামাজ?" আলি খানের চক্ষু তখন যেন কপালে উঠেছে।

"হ্যাঁ।"

"তোমলোগ নামাজ পড়ো গে?"

"হ্যাঁ।"

এমন বিস্ময়ের ধাক্কা, বোধহয় আলি খান জীবনে পায় নি। ছুতোনাতায় সে গুদামে ঢোকে রমণীদের বিশিষ্ট অঙ্গ-দর্শনের লোভে, কখনো কোথাও কোথাও হাত বুলিয়ে দেখতে অথবা উপরওয়ালাকে কোন 'ডিশ' সরবরাহ করা যায় তা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে। কারণ, ক্যাপ্টেন, মেজর, কর্নেল ইত্যাদি সকলের রুচি আলাদা। রেজা খান একটু বেশি বয়সী মেয়ে পেলে খুশি হয়। মেজর বুখারি কালো ধ্যাবড়া নাক মঙ্গোল মঙ্গোর রমণীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মাঝে মাঝে আসে কর্নেল ইস্তিয়াক। সে সুগঠিত নিতম্বের প্রতি এমনই মোহাবিষ্ট যে সম্মুখের দিকে ফিরেও তাকায় না। ক্লাবে সে চার-পাঁচ পেগ হুইস্কি টানার পর রওয়াব ঝাড়ে "হাম সুখা (শুস্ক) পছন্দ করতো। মাই মরদ হুঁ। গিলা ওসব হিজড়া লোগ কা লিয়ে।" আজ আলি খান যেন বেকুফ। আর কারো দিকে না তাকিয়ে সে তখনই বেরিয়ে গিয়েছিল এবং ফটক বন্ধ করে হেসেছিল এক পেট হাসি। সঙ্গি পাঠান শের খান আজ আগ্রহ দেখায় নি। কারণ, আলি খানের খাসলৎ তার জানা আছে।

গায়ে-পড়া আলী খান। হেসে হেসে সেদিন বলেছিল, "এক আজিব কিসসা শোনো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিয়া?"

'আজিব ইয়ে সব বাঙালি আওরত।"

"কিয়া হুয়া?"

"ইয়ে সব নাংগা বেসুয়া (বেশ্যা) আওরত নামাজ পড়নে মাংতা। কিয়া বাৎ।"

জবাব দিয়েছিল শের খান অতি রূঢ়স্বরে, "কিয়া ও আল্লাকা বান্দা নেহি?"

৫

বাড়ির কর্তা এই আম গাছের চারা অন্য গাঁ থেকে এনে লাগিয়েছিল। এত মেহনৎ সার্থক। কারণ, পরবর্তীকালে যখন আম ফলতে লাগল, তা শুধু প্রচুর নয় মিষ্টি। কাঁচাতেই পাড়ার ছেলেদের জিভে নাল পড়া শুরু হয়। ফলে খবরদারি অনেক বেশি। কর্তা তাই বড় আফসোস করতেন। একদম উঠানে পোঁতা উচিত ছিল চারাটা।

ঝড়ে একটা ডাল ভেঙে গিয়েছিল গত বৈশাখে। একদম গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু সংযোগ ছিল। কর্তা তাই দড়ি দিয়ে ব্যবস্থা করলে যেন একদম নিচে না পড়ে। এইভাবে রাখলে হয়ত ডালটা আবার সজীব হয়ে উঠতে পারে। একটা শাখা যাওয়া মানে অনেক ফল থেকে বঞ্চিত হওয়া। কিন্তু কর্তার চেষ্টা বৃথা। ডালটা ক্রমশ শুকাতে গেল। তখন তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। গাছের সঙ্গে যেন তার প্রাণ বাঁধা। বয়স হয়ে গেলে বোধহয় এমনতর বাতিক আপনা আপনি এসে জোটে। একটা গাছের ডাল নিয়ে অত মাথাব্যথা, মাথার কলকজা ঠিক আছে বলে প্রমাণ দেয় না। একরকমের আশঙ্কা শুধু কর্তাকে পেয়ে বসল। কোনো অমঙ্গল হতে পারে। গাছের প্রাণ মানুষের প্রাণ একসঙ্গে জড়িয়ে আছে যেন। গোটা বাড়ি আর গাছের মঙ্গল-অমঙ্গলের যোগাযোগ খামাখা কল্পনা ছাড়া আর কী। তবে মাঝে মাঝে ঘটনা সমাপতন হয়, তা আশ্চর্য নয়। এই বিরাট বসুন্ধরার প্রাণচাঞ্চল্য অজস্র ধারায় যেভাবে প্রবাহিত হয়, তার মধ্যে একই ধরনের নক্সা কোনো কার্যকারণের মিল ছাড়াই যদি দেখা যায় তা বিচিত্র কিছু নয়। দুরন্ত গরম পড়েছিল। কাজেই স্বাভাবিকভাবে শুকিয়ে যাওয়ার আগে ডালটা শুকিয়ে গেল। কর্তা মহাদ্বন্দ্বে পড়লেন। অকল্যাণের আশঙ্কা তার মনে বেশ জায়গা নিয়েছিল, তা আর সহজে নড়ল না। আশ্চর্য তিনিও হঠাৎ একদিন মরে গেলেন। বয়স খুব বেশি হয় নি। ষাটের কিছু উর্ধ্বে। কিন্তু শক্তসামর্থ্য লোকটা হঠাৎ মরে গেল। মাত্র দুদিনের জ্বর। বৃক্ষ-মানুষের সম্পর্কে প্রমাণ করতে যেন তিনি নিজে প্রাণ দিলেন। তবে এক দিক থেকে জীবন পূর্ণ হয়েছিল। চার জন জোয়ান খাটুনে ব্যাটা ঘরে। তিন জনের বিয়ে দিয়েছেন নিজেই। আইবুড়ো ছোট, আঠারো-উনিশ বয়স। তারই বউ শুধু দেখে যেতে পারলেন না। নচেৎ সব সখই তো মিটে গিয়েছিল। জমিজিরাৎ যা আছে, গায়েগতরে খাটলে অন্তত ডালভাতের অভাব হবে না। দুবিঘা জমিনের উপর ঘরদোর, মাটির হলেও বেশ খোলামেলা। গাছপালার সখ ছিল বলে ভিটা-উঠান সবুজ মণ্ডনে সদা সঙ্গতির আমেজ কায়েম রেখেছিল। মেজবউ বছর-বিয়োনী বিধায় কর্তা আরো খুশি ছিলেন। বংশে যত লোক বাড়ে তত মঙ্গল। স্নানে যাওয়ার আগে গায়ে তেল মাখতে মাখতে একথা এমন হাঁফুকার বলতেন যে বউয়েরা অন্দরে একে অপরের গা

AMARBOI.COM

টেপাটেপি করত চাপা হাসি-সহ। রাত্রে শাশুড়ি শোধ নিতেন তেমনই চাপা হাসির জের বজায় রেখে, "নিজে তো অপারগ, অহন অপরের ভরসা— ।" আশ্চর্য, সে-বছর একটা ডাল ভাঙলেও আম ধরেছিল প্রচুর। কর্তা বেঁচে থাকলে দেখতেন প্রতি বছর আম গাছটা যেন রুখে উঠেছিল, আরো আরো ফল দেওয়ার জন্যে। ফল নয় অমৃত। অতি মিষ্টি আর দেখার মতো লাল। আবার একদিক হলুদ, অন্যদিক কিন্তু একদম সিঁদুরের মতো লাল। আবার মধ্যে এই দুই রঙের ফুটকি ইতঃক্ষিপ্ত। আম খাওয়ার পূর্বে তার রঙ দেখেই প্রতিবেশীরা বলত, 'কর্তা কপালে মানুষ। তাই অমন গাছ।' অবিশ্যি গাছের ঝুড়ি ঝুড়ি আম পাড়া হলেই সব প্রতিবেশীদের জন্য অর্ধেকের বেশি বরাদ্দ থাকত। নিজের হাতে সকলকে কর্তা বিলি করতেন। মাঝে মাঝে বাজারে বিক্রির জন্যে পাইকের আসত। কিন্তু খুব হাত-টানা না থাকলে অমন প্রস্তাবে রাজি হওয়ার মতো লোক তিনি নন। মিষ্টি আমের প্রসিদ্ধি অনেক দূর যায় বউল সৌরভের মতো। কাজেই পাইকার এসে কম জেদাজেদি করত না। কিন্তু কর্ম কর্তার ইচ্ছায়। বৈঠকখানায় কত ভিন গ্রামের লোক এসে জুটত। তামাক ধ্বংস হতো প্রতিমাসে প্রচুর। তার ধকল যেত বাড়ির বৌ আর গিন্নির উপর দিয়ে তামাক কাটো, চিটে গুড় মাখাও। তারপর দলন। তেল তামাক ময়দা, যত দলবে তত ফায়দা। ছড়া কেটে কর্তা খালাস। কিন্তু মেহনতের বহর মাঝে মাঝে বেশি হয়ে গেলে, গিন্নি প্রতিবাদ করত। রসিক কর্তার কথায় আবার তারা নিমেষে বরফ। 'মানুষ লক্ষ্মী' এক কথা ছাড়া আরো কর্তার মুখে অহরহ শোনা যেত: মানুষের কাছেই মানুষ যায়। গমগমে আবহাওয়া যেমন সদরে, তেমনই অন্দরে। তিন বউ মোটামুটি মানিয়ে নিয়ে চলার মতো মেজাজ। অন্তত কখনো তেমন গোল পেকে ওঠেনি। শাশুড়িকে তিন জনই ভয় করত। অথচ আদৌ মুখরা বা কলহপ্রিয় নয় কর্ত্রী। বউদের সঙ্গে ব্যবহার মিষ্টি। রাগলে শুধু মুখের আদলে কিছু পরিবর্তন ঘটত। তার জের সাংঘাতিক। অমন, দরদি এবং বিবেচক মানুষকে ভয় করত বৌরা দাপটের জন্য নয়, তার আপ্ত চালচলনে ব্যবহারে। এই এক অদ্ভুত ধরনের শাসন, যদিও নিতান্ত ঘরোয়া। তাই গোটা পরিবারে ছন্দ ছিল। দুপুরে আহারাদি সারলে শাশুড়ি নিজেই সুপারি কাটতে কাটতে গল্প জুড়তেন। তখন সকলে সমবয়সী। কর্তা সারাদিন প্রায় বৈঠকখানায়, আহারের সময় অন্দরে। মেহমান (অতিথি) থাকলে সব বাইরে বাইরে কাজ সারা। ভাত ছেলেরা বয়ে নিয়ে আসত। বড় বউ ঈষৎ পেটুক। সে ছেলেদের নাম করে হাঁড়ি থেকে কিছু নিয়ে গেলে, তার কিয়দংশ হয়ত নিজেই গিলে বসে থাকবে। এসব জানা কথা। খেতে বসলেও বোঝা যায়। অথচ মেজ-বৌর আহার বেশি দরকার। ছেলেপুলে বেশি। কিন্তু তার না-ছোঁ-না-ছোঁ ভাব। ভাতের থালা সামনে এলেই যেন তার গায়ে জ্বর আসে। তখন গিন্নি কিছু ধমক দেন। এমন করলে শেষে ডাক্তার কবিরাজের পেটেই সব যাবে। 'আমার মাথার কসম, আর একটু ভাত ল' বেডি।' লক্ষ্মী মেয়ে— অনুরোধ রাখতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। বৌর ছোটছেলেটা দাদির বড় ন্যাওটা, একদণ্ড এদিক ওদিক হওয়ার যো নেই। কোলে নাও, বুলু করো। তার বায়না বড় বেশি। টাকার চেয়ে সুদ পেয়ারা। কচি হাতে গলা জড়িয়ে ধরলে বড় সুখ। 'তুমি আমারে শাদি করবে?' কইলেই জবাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ করমু।' পোলাপান কিছু বুঝে না তাই অমন জবাব। ওদিকে মা বারণ করে, 'ছিঃ ছিঃ কইতে নাই।' কইতে দাও, মা। বড় অইলে তো নিজেই সরম পাবে।' কচি হাত কচি বুলি। গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকবে। মা ডাকলেও যাবে না। গভীর ঘুমের কোলে না ঢুলে পড়লে কাছ-ছাড়া করা দায়। কাঁচা ঘুমে তুললে চেঁচিয়ে পাড়াশুদ্ধ নরিয়ে ছাড়বে। তাই সাবধান হতে হয় পদে পদে। মা পিটে বসে বেশি বিরক্ত করলে। তখন বেশ বকুনি খায়। বিয়াও ক্যান, যদি ঝামেলা সইতে না পারো? চলো দাদা, তুমাকে মিঠাই দিমু...অন্ধকারে পাট ক্ষেতে যখন গোটা বাড়ি সান্ধাইছিল, তহন কি চিক্কর (চিৎকার) না দিছে...আমি দাদি যাব, দাদি যাব। কর্তা চালাক মানুষ আগেই ভাগছে। নিজের হাতে গড়া ঘর ক্যামনে আগুনে জ্বলে, হে দেখত পারত না...কবরে মজায় ঘুমায়। বাঁশবনে রাত্রে একদল বক এসে বসে। গলা টেটে টেনে শব্দ করে। নিচে কবর। অহন কবরে শুইয়া খুব বকের ডাক শুনতাছে। আর তো কোনো কাম নাই। কোনো ঝামেলা নাই। শুধু শুইয়া থাকো। আক্কেল দেওনের কোনো লোক নাই। হেই তো ঘড়-বাড়ি ছাড়লাম। দুদিন আগে ছাড়লে কি ক্ষতি হতো? অহন কে কোথায়? মেজ-বৌ সাত মাসের হামেল (গর্ভবর্তী) ...কুই আছে আমার মজিদ, বড় পোলা মাজেদ, আমার ছোট পোলা ইজাদের কোনো খবর জানেননি? বিয়া-শাদি দিই নাই, দিমু। মাইয়া দ্যাহেন। জোড়া বাঁধে আল্লা। মানুষের হাত না বিয়া শাদীর কাম। আমার ইজাদের সমবাদ দ্যান, মিয়াভাই। আমার ঘর ভরতি মানুষ, আমাগো দ্যাস ময়মনসিংহ জিলা...কাশিমপুর চেনেন না? কবাল, নসিব। ঘর গ্যাছেগা, আল্লায় পুড়াইছে, আল্লার যা মরজি। অহনও গতরে জোর আছে, মেহনৎ করমু খামু। আমার ঘরের দরকার নাই, ঘর দিয়া কী করমু, যদি মানুষ না থাহে? সব লইয়া যান, হগ্‌গল জমিজিরাৎ, আমার মানুষ ফিরাইয়া দিন...পাট ক্ষেতে সান্ধাইয়া গোটা গেরাম পুড়তা দেখছি...তহন সকলে 'জানে বাঁচছি, তাই দুঃখ করি নাই। যহন পাট ক্ষেতে গুলি করতা লাগল, তখন যে যেদিগ পারলাম দৌড় দিলাম...আমার নাতিডারে দেখবেন। হরদম 'দাদি কইয়া চিককর পাড়ে...আমার পোলার পোলা...বুড়া মিয়া সেয়ান মানুষ। অহন আর কিছুই দেখতাছে না...মরার পর হুকা-কলকি গোরস্তানেই ফেইলা দিই, তামাকই খাক বুড়া...আগুনে আমি জ্বইলা রইলাম...দানা রাখছি পুঁটলি বাইন্ধা। পুবের ঘরে তাক আছে, হের ভেতর টিনের মইদ্যে...বিষ্টি নামলেই ঝিঙা শশা...হগ্‌গল দানা লাগামু... কিন্তু সংবাদ পাইলে দিবেন...। ...জীবনে কহনও গাড়ি চড়ি নাই। বড় সাধ ছিল। অহন গাড়ি চড়া হৈল... রাস্তার মদ্যি ধইরা আঁধারে নিয়া আইল...গাড়ি ঝক্ ঝক্ ঝক্...গুলির শব্দ গুলি...গুলি।...

অস্ফুট চিৎকার দিতে দিতে রশীদা বিবি মেঝের উপর মুখ ঘষছিলেন বারবার, যেন পাথরের নিকট তার কত আবেদন আছে, কত কথা বলার আছে।

অবস্থাগুণে কংক্রিটও মমতার স্পর্শ দেয় বৈইকী। শুষ্ক রুক্ষ টিলাভূমিই তো ঝর্ণার উৎস।

৬

সে মরে পড়ে ছিল।

এই ঘটনা কিছু বিচিত্র নয় এই গুদামের ভেতর। তা ছাড়া সহজে এই গন্তব্যে পৌঁছতে পারলে, কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু মৃত্যু প্রার্থনা করলেই পাওয়া যায় না।

তাই তার মৃত্যু এই অবস্থায় স্বাভাবিক ধরে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটা জলজ্যান্ত শরীর হঠাৎ নিঃশ্বাসহীন হয়ে গেলে চারপাশের কেউ স্থির থাকতে পারে না। এই ক্ষেত্রে তাই আলোড়ন দেখা গিয়েছিল।

সিমেন্টের মেঝের উপর ঊর্ধ্বমুখী তার লাশ পড়ে আছে। চোখ দুটো এখনো খোলা। নিথর। তবু মনে হবে, সে যেন আবিষ্ট কী দেখেছে এবং তারই দিকে অপলক চেয়ে আছে। মুখের দিকে তাকাও, পাৎলা অবয়বের সঙ্গী পাৎলা মুখ। ধবধবে শাদা, রক্তহীন, কিন্তু কী সুন্দর! কিন্তু সৌষ্ঠবে অদ্ভুত ছন্দ। তাই হয়ত ওকে এখানে এনেছিল জল্লাদেরা। জন্তর সৌন্দর্য পিপাসা নেই, এমন কথা হলফ করে বলা চলে না।

কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে তো লড়াই আছে জীবনের। কেউ টের পেল না এই দ্বন্দ্বের? অবিশ্যি তা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ অধিকাংশ এখানে অখ্যাত থেকে যেতে চায়। কী হবে কূলের কালি দুনিয়াময় ছড়িয়ে? এই মেয়েটা প্রথম থেকে নির্বাক ছিল। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলে নি। একধারে শুয়ে থাকত। আহারের জন্য সে তেমন লালায়িত ছিল না। জলের পিপাসা বোধ করত মাঝে মাঝে। তা দেখা গেছে। অবয়বে প্রামাণ্য, গ্রাম্য কোন মেয়ে গ্রামের? তা কেউ বলতে পারবে না।

কিন্তু লাশ মুখর হয়ে ওঠে। সকালে যখন দেখা গেল, মেয়েটা মরে পড়ে আছে, তখন গোটা শিবির তার পাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায়।

রশীদা বিবি এগিয়ে এসে, তার খোলা চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে দিলেন। কারো দিকে সে তাকায় নি! তবু মনে হবে, সে সকলের দিকে তাকিয়ে আছে। আর কী যেন প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষার্থী। চাষি-বৌ হয়ত, সহ্য করতে পারেন নি এই নীরব জিজ্ঞাসা ধাক্কা। তাই লাশের চোখ স্পর্শ করেছিলেন।

আমোদিনী এসে দাঁড়িয়েছিল। মৃত দেহ দেখে সে একবার ভেবেছিল, জীবন্তের যত অপমান হয় হোক, মৃতের কোনো অপমান সে করবে না। চিন্তামাত্র। একবার সে মনে করেছিল নিজের সায়া খুলে অন্তত গোটা লাশ ঢেকে দেওয়া যাক। কিন্তু সে পারে নি। এখানে সবাই বিবস্ত্র। তেমন চেতনা অনেককে স্পর্শ করে না। কারণ, বাঁচার কতগুলো উপাদান আছে। তা নয়ছয় হয়ে গেলে, আত্মজ্ঞান সবসময় স্পষ্ট থাকে না। তবু আমোদিনীর একবার মনে হয়েছিল, তারও যেন কোনো কর্তব্য আছে এই ক্ষেত্রে।

আশ্চর্য সকলে এখানে নির্বাক। অন্য সময় সমদুঃখ সমব্যথায় বুকের কথা মুখে এসে যায়। কিন্তু সকাল থেকে একদা-বেসামরিক 'সরবরাহের গুদাম নীরব হয়ে গেছে, যেন একটা কবর। আর শত খানেক প্রেত দাঁড়িয়ে আছে একদম চুপচাপ।

রশীদা বিবির মনে পড়ল, মৃত্যুর পর ইসলামের কী কী করণীয় আছে। এই সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোবান জ্বেলে দিতে হয়। লাশের পাশে বসে কেউ কোরান পড়ে। অন্তত কালেমা পড়া হয়। মসজিদের ইমাম সাহেব আসেন। সামনে শাদা কাপড় ঢাকা পড়ে থাকে মৃতজন। কাপড়ের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। লোবানের কথা পাগলের প্রলাপ। দোয়া-দরুদ পড়া যেতে পারে। তার জন্যে স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন। রশীদা বিবির মনে হয়, তার স্মৃতি মুছে গেছে। প্রথম কলেমাটুকু মনে আছে। কিন্তু তা দিয়ে কোনো কাজ হবে না। অন্তত দ্বিতীয় কলেমা, নাম শাহাদাৎ, এখানে কিছুটা উপযোগী। কিন্তু তার তো কিছু মনে নেই। আবছা আবছা শব্দ দু'একটা মনে আছে মাত্র। এই ক্ষেত্রে শিক্ষিতজনের সাহায্যে আসতে পারে। চিন্তার স্রোত তাই তার ডাঙার দিকে ছুটল।

রশীদা বিবি আবেদন করলেন, জনতার দিকে নয়। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তানিমা, জায়েদা এবং সখিনা। তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, "বুজান আপনেরা কিছু দোয়া-দরুদ পড়ুন।"

— কী বলেন চাচি?

তানিমা সোজা জিজ্ঞেস করলে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ না তদারক ছিল, রশীদা বিবি বুঝতে পারেন না? তাই একটু দ্বিধাগ্রস্ত উচ্চারণ করেন, "বুজান আমি কই। আপনেরা কিছু দোয়া-দরুদ পড়েন, লাশের মঙ্গল অইব।"

"ভিড়ে ঠেলে তানিমা সখিনা একদম লাশের পাশে গিয়ে বসে পড়ল। তারপর চোখ রশীদা চাচির দিকে, আবার কন চাচি, দোয়া-দরুদ পড়লে কী অইব?"

"লাশের মঙ্গল অইব"

"আপনি কি আরো মঙ্গল চান?"

একদম স্বাভাবিক গলায় আবার প্রশ্ন করে তানিমা।

"হ্যাঁ, বু-জান।"

"সব চেয়ে বড় মঙ্গল হয়েছে। আর কিছু দরকার নেই। এই রাষ্ট্রে দোয়া-দরুদের চেয়ে বড় মঙ্গল ও-ই।"

লাশের দিকে ইঙ্গিত করে তানিমা। ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান রশীদা বিবি। লেখাপড়া জানা রমণী। সমাজে তাদের স্থান তার উর্ধ্বে। নিজের নিরক্ষরতা সম্পর্কে কেউ অচেতন নয়। তাই অনেকটা সংকুচিত, সরল গলায় তিনি আবার আওয়াজ তোলেন, "বু-জান ও-ই কী?"

হাসতে লাগল তানিমা।

প্রেতের রাজ্যের এতক্ষণে নির্জনতা ঘুচে গেছে। হাসি নয়, যেন নির্মমতা ফালি ফালি গোটা গুদামের ভেতর স্প্রিন্টারের মতো এদিক ওদিক ছুটছে। তারির মধ্যে তানিমা উচ্চারণ করে ফেলে, "মৃ-ত্যুই-মৃ-ত্যুই-ইসলামি রাষ্ট্রে সব চেয়ে বড় মঙ্গল-পূণ্য-ধর্ম।"

রশীদা বিবি নির্বাক। কিন্তু তানিমা লাশের পাশে বসে এবং পরে বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাসতে থাকে। শেষের দিকে কান্নার প্রকোপ সব ঝেঁটিয়ে বিদায় দেয় যেন।

কয়েকজন তানিমাকে লাশছাড়া করলে অতি কষ্টে, কিন্তু তার চিৎকার থামে না

AMARBOI.COM

"চাচি, আমার গলা টিপে আমাকে ওর কাছে পৌঁছে দেন।"

রশীদা বিবি দুই পা জড়িয়ে উপুড়, ডুকরে কান্না জুড়ে দেয় তানিমা।

সঙ্গিনীরা আজ তার কাছে গেল না কেউ। সখিনা নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে পড়ল।

রশীদা বিবির মেহনত-পেটা শরীর। বেশ জোর দিয়েই তিনি তানিমাকে আলগা করতে সমর্থ হন এবং তার দুই বাজু চেপে চোখের দিকে চেয়ে বলেন, "মা, সবুর করো। জালেমের বিচার আল্লা করেন।"

অপরের চোখের পানি মুছিয়ে নিতে অভ্যাসবশত চাষি-বৌ নিজের আঁচলের খোঁজে হাত বাড়ান। কিন্তু কোথায় আঁচল? শেষে নিজের করতালু ব্যবহার করেন। তানিমা চেয়ে থাকে এই জননীসুলভ আচরণের উৎসের দিকে। আর কোনো উচ্চারণ করে না সে।

অন্যান্য বন্দিনীরা তখন যে-যার চিন্তাস্রোতে ভেসে ভেসে কেউ নীরব কেউ মৃদু সংলাপমুখী। কয়েকজন শোকাচ্ছন্ন স্বরে বিলাপ করতে লাগল সিনা থাপড়ে থাপড়ে, আজও বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে দুঃখ-প্রকাশের যে রীতি দেখা যায়।

কয়েদখানার মালিকদের তখন টনক নড়ে। ভেতরে অসহ্য গোলমাল হচ্ছে। তাই তদারক করে দেখতে হয়।

আলী খান, শের খান দুজন অকুস্থলে এসে পৌঁছিতে দেরি করে নি।

আলী খান হুঙ্কার দিয়ে ঢুকেছিল, 'এ-ই আওরত লোগ— কিয়া হুয়া?'

কিন্তু আওরত লোগ তখন স্তব্ধ। কেউ কোনো কথা বলে না। যে যার জায়গায় বসে পড়ে, মুখ বুক হাঁটু যদ্দুর সম্ভব একত্রে সেঁটে।

আলী খানের চোখে ধরা পড়তে বেশি দেরি হয় নি। নিজেই আঁৎকে উঠেছিল, 'আ রে মর গিয়া?' তারপর অভ্যাসমতো উচ্চারণ করেছিল, অভ্যাস-মাফিক কোরান থেকে 'ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না এলাইহে রাজেউন।'

সিপাহী নিজের অস্বোয়াস্তি তখনই কাটিয়ে ওঠে এবং কর্তব্য স্থির করতেও বিলম্ব হয় না। তাই সঙ্গী শের খানের সাহায্য প্রার্থনা করে, 'খান, পাকড়ো ইসকো বাহার লে জানা হ্যায়।'

'কৈসে?' শের খান রীতিমতো ভয়ার্ত কণ্ঠে জবাব দেয়।

'পাকড়ো। তোম শির পাকড়ো' শের খানের দোলাচাল ভাব দেখে আলী খান সতর্ক করল, 'ক্যাপ্টেন আনেসে মসিবৎ। চলো ইসকো বাহার লেজায়ে।'

হাল্‌কা শীর্ণ লাশ। তাগড়া জোওয়ানের জন্য কোনো বোঝা নয়। অখ্যাত বোঝা। তেমন যত্নের প্রশ্নও অবান্তর।

তারা দুজনে মৃতদেহ বয়ে বাইরে নিয়ে যেতে লাগল।

বেচারা পাঠান শের খানের আসোয়াস্তি যায় না। তাই বোধহয়, সে অন্য বাহককে জিজ্ঞেস করে, 'মর গিয়া, আফসোস।'

'মরেগা নেই?'

আলী খানের প্রশ্ন বুঝে উঠতে পারে না শের খান। তাই নিজের মনে আবার বলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মর গিয়া, আফসোস।'

'মরেগা নেই? ইসকো কর্নেল সাব্ নে বহুৎ বহুৎ কিয়া। মরেগা নেই? ইয়ে দুবলি পাৎলি—।'

অতি বিরক্তির স্বরে জবাব দিলে আলী খান।

৭

মোটা করোগেটেড টিনে তৈরি গুদামের দরজা। মাঝখানে আরেকটা ছোট দরজা আছে। শান্ত্রীরা এই ফাঁক দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু অনেক বন্দি যখন ঢোকাতে হয় বা বড় কিছু আনার প্রয়োজন হয়, তখন দরজা না খুলে উপায় থাকে না। তখন ধাতব শব্দ বেশ ঝনঝনিয়ে ওঠে। গোটা বন্দিশিবিরের অধিবাসীদের কাছে তা জানান দিয়ে যায়। তখন যে আচ্ছন্নতার ভেতর গুটিসুটি মেরে বসে বা শুয়ে থাকে সে-ও চমকে ওঠে। কারণ, কে জানে হয়ত তার পালা পড়ছে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বহু জনের সঙ্গে। প্রায়ই তা ঘটে। এই বিপদের আশঙ্কা অনেককে হঠাৎ সচেতন করে তোলে। কেউ-কেউ আছে, তারা বুঝতে পারে না। তাই দরজা খোলার শব্দে একবার নিরীহ দুই চোখ খুলে আবার বুঁজে নেয়। মনের ভাব, যা হয় হোক, সর্বনাশের আর তো কিছু বাকি নেই।

সেদিন প্রথম প্রহর রাত্রে বিরাট দরজাটা খোলার শব্দ শোনা গেল। অভ্যাসবশত কেউ এদিকে চায় না। বরং মনের ভেতর আন্দোলিত হতে থাকে। হয়ত শান্ত্রী এসে ধাক্কা দিয়ে তুলে বলবে, 'বাহার চলো।' বিজাতীয় ভাষা। কিন্তু এই দুই শব্দ বুঝতে আর কারো বাকি নেই। কেউ-কেউ তখনই নিজের গলা টিপে ধরে এবং ভাবে, এইভাবে নিজেকে শেষ করে দিতে পারতাম, সব বালাই চুকে যেত। অনেকে পাগলামিবশত চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং তারপর চুপ করে যায়। গুদামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশীর্বাদ মনে হয়। কারণ, মাঝে মাঝে থাম আছে। তার আড়াল অনেক ক্ষেত্রে দরজা দেখা যায় না। কারণ, আসন্ন বিপদ কেউ চোখে দেখতে চায় না।

সেদিন অধিবাসীনীরা টের পায়, দরজা খোলা হলে, বোধহয় আরো বন্দিনী আসছে অথবা এক দলকে কোথাও নৈশ বিহারের জন্য হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। নচেৎ আবার দোজখের ফটক খোলার কী প্রয়োজন?

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

আবার সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একজন আড়চোখে এই দিকে তাকিয়েছিল। সেই শুধু আবছা জানতে পারে, যেন একটা খাট নিয়ে দুই শান্ত্রী ভেতরে ঢুকেছিল এবং ভেতরে পরিখার ভেতরে কী যেন রেখে চলে গেল। উপরে পোস্তার উপর সাধারণত কোনো বেহুঁশ বন্দিনীকে অনেক সময় শুইয়ে দেওয়া হয়। কতবার এমন ঘটেছে। আজ তেমন কিছুই পুনরাবৃত্তি হয় নি।

সন্দেহের ডানা থাকে। বিশেষত আবহাওয়া সেখানে এমনভাবে বদ্ধ। তাই স্পষ্ট না হলেও প্রেতচ্ছায়ার মতো অনেকের মনে কৌতূহল ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দরজা যখন খুলতে হয়েছে, নিশ্চয় ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখিনা জেগেছিল।

আমোদিনী থামে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট। কিন্তু বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান ছিল না। তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল জায়েদা। জায়েদার হাঁটুর উপর মাথা রেখে তেমনই শায়িত তানিমা দরজা খোলার শব্দে একবার চোখ মেলেছিল মাত্র। আর কিছু না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শান্ত্রীর অনুকরণ করতে দেখা গেছে তা-কে। কয়েকদিন আগেই তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিশিগ্রস্ত ব্যক্তির মতো সে হাঁটতে পারে, একদম বাহ্যজ্ঞান-রহিত।

তখন রাত্রি কত? দুপুর বা তার বেশি হতে পারে। হঠাৎ দরজার নিকটস্থ এক পরিখার ভেতর থেকে গোঙানি উঠতে লাগল। খুব মৃদু। উহ্ আহ্ শব্দ অতি ঢিমা লয়ে এবং চাপা স্বরে উচ্চারিত। কখনো একটানা উঁ উঁ শব্দ, মার কাছে আবদার জানিয়ে হতাশ বালক বা বালিকা যা করে। অন্যদিন এমন শব্দ কারো কাছে আমল পেত না। কারণ এই রাজ্যে আহাজারী, বা ব্যথা-বেদনায় কেউ যদি কাঁদে বা চিৎকার করে— অবাক হওয়ার কী আছে? একশ প্রাণীকে আপন কক্ষপথে বিচরণের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে চোখ বেঁধে। সত্য শুধু কক্ষপথ। তারি মধ্যে যন্ত্রের মতো ঘুরে বেড়াও। বাইরের পথ রুদ্ধ। একে অপরকে দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না কেউ। যন্ত্রণায় চিৎকার দেওয়ার স্বাধীনতা পর্যন্ত অনেক সময় বন্ধ, যদি শান্ত্রীরা ঘুমিয়ে না থাকে। তেমন পরিবেশে কোনো মৃদু গোঙানির কি মূল্য থাকবে?

বিরাট যান-চলাচলক্ষত শহরে বাথরুমে ট্যাপের জলপড়া আবছা শব্দ ঘুমের ব্যাঘাত করে। বাইরে যত ধুমধাড়ক্কা আওয়াজ চেতনায় দাগ দিতে অক্ষম। অথচ সেখানে মৃদু জলের শব্দ তীরের মতো কানে সেঁধোনোর জন্যে কসরৎ করে।

এই গুদামের মধ্যে ঠিক তা-ই ঘটল। গোঙানি একটানা। অস্পষ্ট চরণ। কিন্তু বন্দিনীদের কান থেকে আর সহজে মুছতে চায় না। মাঝে মাঝে গোঙানির গ্রাম যেন বেড়ে যায়। তখন বহু বন্দিনী উৎকর্ণ। কিন্তু হঠাৎ এই অস্পষ্ট আর্তনাদ বিড়বিড় প্রলাপে পরিণত হয়েছিল। তখন আরো সকলে উৎকর্ণ— অর্থাৎ যারা তেমন চৈতন্যের পরিমাপে সক্ষম। কার কণ্ঠ? কী বলছে? কে সে? এমন প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

কিন্তু হঠাৎ বিকৃত কণ্ঠের আওয়াজ গোটা শিবির কাঁপিয়ে তুললে। বোঝা যায়, কে যেন মা-মা রবে ডাকছে এবং সাহায্য প্রার্থনা করছে। আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। কয়েদিরা আজ অস্বাভাবিকভাবে স্তব্ধ। অবিশ্যি ফেনার নিচে ঢেউয়ের খবর কারো জানার কথা নয়।

মা-মা রব ক্রমশ উচ্চগ্রামে দিকে ধায়। অবিশ্যি অমন স্পষ্ট ভাষণ নয়। বোঝা যায়, কেউ কাৎরাচ্ছে। কি বলছে, অনুমান করা চলে মাত্র।

শান্ত্রীরা সেই মাল খালাস করে দিয়ে চলে গেছে, আর তাদের কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মাঝে মাঝে সামান্য শব্দে তারা ঢুকে পড়ে এবং কর্তব্য পালন করে যায়। কিন্তু আজ তারা বোধহয়, অতি মাত্রায় নির্বিকার।

বুঝা যায়, কোনো আহত ব্যক্তি প্রলাপ বকছে। বন্দিশিবিরে দয়ামায়ার কথা তুলে লাভ নেই। তা প্রকাশের ক্ষেত্র কতটুকু? সেখানে আদানপ্রদানের প্রশ্ন আছে। এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন মানসকূটে সবাই ভ্রাম্যমাণ। কোমলতা যেটুকু প্রাণ থেকে বেরিয়ে আসে, তা স্বভাবিক কিছু নয়। নেহাৎ বানভাসী খড়কুটোর মতো। মেজাজের কথাই আসল।

কিন্তু গোঙানির আর বিরতি নেই। অস্পষ্ট বাল্‌বের আলো তো চব্বিশ ঘণ্টায় আছে। সেদিকে সরেজমিন তদারক কিছু কঠিন নয়। অবিশ্যি পরিখার অন্ধকার সব বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। পোস্তার উপরে থাকলে সব দেখা যেত। সেইমতো কর্তব্য ত্বরান্বিত হতে পারত। যদিও তেমন তাগিদ চাড়া দিত কিনা, কে জানে।

বিকৃত কণ্ঠ। কিন্তু যন্ত্রণা অকৃত্রিম। শব্দ তা জানান দিচ্ছে।

রশীদা বিবির ঘুম হাল্কা। অবিশ্যি ঘুম যখন ধরে। কিন্তু কখন তেমন স্পর্শ তার কাছে পৌঁছায় তিনি জানেন না। নিজের অতীতের কাছে এমনভাবে তিনি রেহনি খৎ দিয়ে রেখেছেন যে ঘুম অত সহজে আসে না। যখন নিকটে আসে, তা নিতান্ত ক্লান্তির দাপটে।

গোঙানি তার কানে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছু স্থির করতে পারছিলেন না। আর্ত চিৎকার শুনে শুনে কান অভ্যস্ত। কিছুই যেন আর সেখানে সেঁধেয় না। প্রথমে দিশা করতে হয়, কী ঘটছে। চেতনা ঘুড়ির সুতোর মতো যখন গিঁট পাকিয়ে যায়, তখন বোধবুদ্ধির সঞ্চার অনেক হিসেবের ব্যাপার।

রশীদা বিবি উঠে বসলেন। যৌথ পরিবারের কর্ত্রী। সহজে নির্বিকার হওয়া তার পক্ষে শক্ত। নিজের চৌহদ্দি উঁচু ডাঙায়। কিন্তু ডহর জমির দিকে চোখ রাখাই গিন্নিপনা। কর্তব্য সকলকে নিজের কাছে টেনে আনা। চিলের ছোঁ থেকে ছানাদের যেমন ডানার ভেতরে আশ্রয় দেয় ধাড়ী মুরগি। তাই শুয়ে থাকতে পারেন নি রশীদা বিবি।

গোঙানি অনুসরণ করে তিনি এগোতে লাগলেন।

অকুস্থল তো দু'দশ ক্রোশ নয়। কতক্ষণ আর সময় যায় পৌঁছতে।

রশীদা বিবি বুঝতে পারেন, নিচে পরীখার অন্ধকারে একজন ছটপট করছে। তিনি বসে পড়লেন। নিচে আলোর অভাবে কিছু স্পষ্ট দেখা অসম্ভব। তবে নিচে কোনো হতভাগিনী এসে পৌঁছেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খাটে করে বয়ে এনেছিল। নচেৎ অল্প চওড়া বোঝার জন্যে তার প্রয়োজন ছিল না।

হাতড়ে বেড়ায় চাষিবৌর হাত। অনুমান আর নেই কিছু। সবই স্পষ্ট। কিন্তু হাত তুলে রশীদা বিবি দেখতে লাগলেন। ভিজে কী যেন লেগে গিয়েছিল। খাটো দেহ। তাই চাষিবৌকে আবার দাঁড়াতে হয়, নচেৎ আলোর নাগাল পাওয়া যায় না পরিখা থেকে।

লাল রং!

তাজা রক্ত।

রশীদা বিবি আবার পরিখার অন্ধকারে মিশে গেলেন এবং আবার উঠে নিজের হাত দেখলেন। তাজা রক্ত।

আহতকে পোস্তার উপরে তুলে দেখা উচিত, কী কর্তব্য অপেক্ষাধর্মী। রশীদা বিবি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। আরো লোকের সাহায্য দরকার। তাই তিনি সেখান থেকেই হাঁক দিলেন, 'বু-জানরা, আপনেরা কেউ আসেন। এহানে একজন পইড়া আছে। সারা বদনে রক্ত, জখম। আইয়েন কেউ।"

আবেদনের জন্য কয়েকজন যেন উৎকর্ণ শুয়েছিল। চার পাঁচটি মেয়ে তখনই ছুটে

এল এবং ধরাধরি করে আহতজনকে পোস্তার উপরে তুললে।

আর কোনো কিছু অনুমান রইল না। এখানে সব স্পষ্ট। আলোয় দেখা যায়; সমস্ত শরীর থেৎলানো, রক্ত ঝরছে। আহতজন তখন বেহুঁশ। মানুষের শরীর নয়, এখন শুধু লাল রং। কেবল চুলগুলো কালো। কপালের সামান্য অংশ রক্ত-ছোপা নয়। সেই জায়গাটুকু গৌরবর্ণ। দেহের আসল আদল।

কিন্তু বোঝা উপরে তোলার পর একটি মেয়ে আঁৎকে উঠে বললে, "চাচি এ তো মেয়ে নয়, কোনো জওয়ান মরদ পোলা।"

মরদ পোলা!

যেন নতুন করে বজ্রাঘাত হলো উপস্থিত বন্দিনীদের মধ্যে। অনেকে তিন চার হাত ছিটকে সরে গেল। কয়েকজন দুই চোখে হাত চাপা দিলে এবং ধীরে ধীরে নিজের জায়গা অভিমুখে চলে যেতে লাগল।

মরদ পোলা!

চাষিবৌ নিজে হতভম্ব।

তরুণ যুবক। স্বাস্থ্যের বাঁধন থেকে বুঝা যায়। একদম বিবস্ত্র। শান্ত্রীরা একেই এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।

মরদ পোলা!

গোটা বন্দিশিবির যেন চাবুক খেয়ে স্তব্ধ। যন্ত্রণা প্রকাশের আর তাগদ নেই।

রশীদা বিবি পাশে বসে রইলেন। নিজের কর্তব্য তাকে স্থির করতে হবে। মনে মনে ভাবেন, কোন অভাগীর পুত এই নেকড়েদের খপ্পরে পড়েছে।

কিন্তু আপ্ত রমণী। কর্তব্য স্থির করতে আর অত দেরি হয় না। পাশে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা সরে যায় নি। কারণ, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। তাই অনড়।

রশীদা বিবি বললেন তাদের উদ্দেশ্যে "মা একটু পানি আনো।"

মেয়ে দুটি যেন এইমাত্র চৈতন্য ফিরে পেলে। একজন তখনই তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে এল। হুঁশ হওয়ার জন্যে রশীদা বিবি তরুণের চোখেমুখে পানি ছিটোতে থাকেন। হয়ত সামান্য হুঁশ ফিরে এসেছিল, আহত যুবক রশীদা বিবির পায়ের কাছে মাথা গুঁজে ডাক দিতে থাকে, "মা, মা...।" আর কোনো শব্দ না। শুধু এই চিরন্তন ডাক প্রতিধ্বনি তোলে।

রশীদা বিবি সব লজ্জা-বিস্মৃতি তরুণের মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়ে জল ছিটাতে থাকেন চোখে মুখে, কখনো যখম জায়গায় অতি আলগোছে রক্ত মুছে নিতে থাকেন।

মরদ পোলা!

গোটা শিবির সচকিত। এই উলঙ্গ যুবককে শান্ত্রীরা ফেলে দিয়ে গেছে। কারো আর জানতে বাকি থাকে না। আচ্ছন্ন অবস্থায় যারা শুয়েছিল তাদের কাছেই খবরটা অজ্ঞাত।

আহত যুবক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পৃথিবী তার কাছে ঝাঁপ্‌সা বৈইকী। কোথায় সে শুয়ে আছে, জানে না।

জায়েদার কাছে সংবাদ পৌঁছেছিল কিছুক্ষণ পরে। বন্দিশিবিরে এক একজন কয়েদী বেড়েছে, সে নারী নয়। ছুটে এল সে পোস্তায় লাফ মেরে যেন তড়িংতিড়িং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিণী। সোজা এসে সে থমকে দাঁড়ায় যুবকের পাশে। তারপর জিজ্ঞেস করে, "চাচি মরদ পোলা?"

রশীদা বিবি কোনো জবাব দেয় না। নিজের কাজে মশগুল থাকেন।

জায়েদা সরব উচ্চারণ করে, প্রায় চিৎকার, "মরদ পোলা?" তারপর দুই তিন লাথি কষায় সে যুবকের উরুর উপর এবং আবার বলে, "বিচ্ছুর জাত মরদ পোলা?"

আরেকটি মেয়ে তাকে ধরে না ফেললে সে আরো লাথি চালিয়ে যেত। জায়েদা কিন্তু অগ্নিশর্মা। সে আরো লাথি মারবে। কয়েকজন তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল যথাস্থানে। কিন্তু জায়েদার চিৎকার আর থামে না, "জাহান্নামে যাক মরদ পোলা!"

রশীদা বিবি নির্বিকার। তার কোলে যেন এক শিশু শুয়ে আছে। তিনি তারই পরিচর্যারত। জায়েদার আচরণ তাকে এতটুকু টলাতে পারে নি।

ওদিকে ভোরের আলো গুদামের অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছে।

রশীদা বিবি তেমনই পা ফেলে বসে আছেন। যুবকের মাথায় যেন আর চোট না লাগে। তাই তিনি অনড়।

ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ বৃথা যায় নি।

যুবক চোখ খুললে। কিন্তু বড় দ্রুত চেতনার শিকড় টান-টান নেচে ওঠে। চোখ মেলে তাকায় সে। সামনে দুজন উলঙ্গ রমণী। রশীদা বিবিকে সে আর সুযোগ দেয় না, ধড়মড়িয়ে উঠে সবে চতুর্দিকে চোখ ফেরায়। তারপর নিজের দুই চোখ দুই হাতে ঢেকে চিৎকার দিয়ে, ওঠে, "দুখিনী বাংলাদেশ তোমার সন্তানদের দুর্দশা দেখে যাও। এই বেইজ্জতি...।"

দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ে যুবকের বুক ঠেলে ঠেলে। একটু হাঁফ নিয়ে তখনই দুই চোখ চাপা, সে চিৎকার দিয়েই বলে যায়, "মা, কে তুমি আমার কপালে হাত রেখেছিলে। তোমাকে আর আমি দেখতে চাই না। তোমাদের অপমানের শোধ নিতেই নিজে এত জুলুম বুকের উপর দিয়ে বইতে দিলাম না...মা তুমি আজ থেকে আমার মা...মা...।"

রশীদা বিবি যুবকের পিঠে হাত রেখে বলেন, "তুমি শুয়ে থাহো, বাবা। আল্লা নসিবে বেইজ্জতি রাখছিল...।"

"মা তোমার মুখ আর আমি দেখতে পাব না, যেমন আমার মায়ের মুখ আর দেখতে পাব না। হতভাগিনী বসে আছে তার উজীর আলি ফিরে আসবে...।"

বাধা দিলেন রশীদা বিবি, "বা-জান শুয়ে থাহো। কথা কইও না আরো রক্ত পড়বো।"

"আমার মা-বোনের এই বেইজ্জতি দেখবার পর আমি শুয়ে থাকব? একটু পানি খাব, মা...।"

উরুর মধ্যে মাথা গুঁজলে উজীর আলি। বন্দিশিবিরে সবাই জেগে উঠেছিল। এমন অনাহূত অতিথির উপস্থিতি তারা কোনোদিন কল্পনা করে নি।

এক মালসা পানি আনলে একটি মেয়ে। পেছন থেকে সে রশীদা বিবির হাতে তা বাড়িয়ে দেয়।

চাষি-বৌ মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, "বাজান পানি খাও। সব নসিব—।"

"নসিব না, মা।— আহ্, আমার দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেল না কেন?" চুপ করে গেল

উজীর আলি এবং হাত বাড়িয়ে দিলে পানির জন্যে।

চোঁ মেরে সমস্ত মালসা নিঃশেষ করলে সে এবং তারপর সকলের উদ্দেশ্যে চিৎকার দিয়ে উঠল, "মা, বোন যারা এখানে আছেন, আমার দুঃখ আপনাদের বেইজ্জতির প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ আমার হবে না। তবে বাংলাদেশে মনুষ্যত্ব মরে যায় নি। এই জানোয়ারদের সমুচিত সবক দেবে বৈইকী আমার তরুণ ভায়েরা...।"

অতি কষ্টে শেষের দিকে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিল উজীর আলি। দুরন্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী সে। তাই এত ধকল সইতে পারছিল।

যারা ছিটকে পড়েছিল, তারা এগিয়ে আসছিল উজীর আলির দিকে। গোটা বন্দি শিবিরের চোখ তার উপর নিবদ্ধ। দুই চোখ চাপা দিয়ে সে বসে আছে।

চাষি-বৌ তাকে বারবার অনুরোধ করলেন আর কোনো কথা না বলার জন্যে। সে জবাব দিলে, "মা, নেক্ড়েরা আমাকে বাঁচতে দেবে না। তাই যতক্ষণ আছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলে নিই। তবে আমি আপনাদের বলছি, আমার আফসোস নেই কোনো। আমি স্টেনগান দিয়ে তিনটে পশ্চিম পাকিস্তানি জানোয়ার এ পর্যন্ত মেরেছি। আমার কোনো আফসোস নেই। আফসোস খামাখা ভুল করে ধরা পড়ে গেলাম। আফসোস আমি জানতাম না, মা-বোনদের ওরা এভাবে পশুর মতো বেইজ্জৎ করে। তবে খবর চাপা থাকবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা আরো শক্ত হবে।"

জায়েদা থামের কাছে হাঁটুতে মাথা গুঁজে জোরে জোরে কাঁদছে ডুকরে ডুকরে। উজীর আলির কানে এই কান্না পৌঁছায়। সে চোখ বুজেই হাত নেড়ে বললে, "কেঁদো না বোন। দেশের মানুষ জেগে আছ দা'দ নিতে।"

কিন্তু তারপরই যুবক একদম শেষ শক্তিযোগে চিৎকার দিয়ে উঠল, "শালা শান্ত্রীলোগ, কাঁহা?"

বন্দিনীরা ঘাবড়ে যায়। রশীদা বিবি বারণ করেন, "বা-জান, খামখা জানোয়ারদের গাল দিয়ে হইব কী?"

"আবে শালা শান্ত্রীলোগ। ইদার আনা শুয়ার কা বাচ্চা লোগ।" উজির আলির এই চিৎকার বৃথা যায় নি। কারণ যাদের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত তাদের কাছে পৌঁছেছিল। বোঝা গেল, ছোট দরজা খোলা থেকে।

শের খান, আলী খান, এবং তিন চার জন সেপাই ভেতরে ঢুকল।

উজীর আলি যেন জ্বলে জ্বলে উঠল শেষবারের মতো। চিৎকার দিলে ওদের দেখা মাত্র। "এই জানোয়ার লোগ—।"

সব কটা সিপাই স্তব্ধ খাড়া। বিস্ময়ের থাক্কা এমনই।

"এই জানোয়ার লোগ চলো হামকো কাঁহা লে জায়েগা। কাল বাৎ নেহি কিয়া এক ভী। আজ বাত করুংগা।"

সিপাইরা দৌড়ে এলো খুব গোস্বার সঙ্গে কিন্তু কোনো চোটপাট করলে না। উজীর আলি আরেক দফা সোজা তাদের উপর চোখ ফেলে লাভার প্রবাহ বইয়ে দিলে, "চলো, শুয়ার কা বাচ্চা লোগ কাঁহা লে জায়েগে। মাই মুক্তিফৌজ কা জওয়ান হুঁ। আমি বাংলাদেশের সন্তান।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দেখা?"

দুই দিন পরে টুলের উপর শের খান হাই তুলছিল। তখন সঙ্গী তার গায়ে খোঁচা দিয়ে বললে, "দেখা?"

— কিয়া দেখা?

— অফিসার লোগ জানতা কৈসে কাম লেনে হোতা।

— কিয়া কাম?

বিরক্তির সঙ্গে জবা দিলে শের খান।

— কিয়া দেখা?

— মা কুচ নেই দেখা।

— তোম উল্লু হ্যায়।

শের খান এই মৃদু ভর্ৎসনায় কিন্তু চটে উঠেছিল। তাই পাল্টা জিজ্ঞেস করে বসল, "তোম কিয়া দেখা?"

জবাবে আলি খান বয়ান করলে। মুক্তিফৌজের ওই ছোকরাকে চার দির ধরে "তিন ডিগ্রি" দাওয়াই দিয়েছে অনেকে মিলে, অনেকক্ষণ ধরে। এমনকি সব নিজের হাতে কম্বল ধোলাই চালিয়েছিল। কিন্তু একটা কথা কেউ বের করতে পারেনি। শেষে ক্যাপ্টেন রোজ খানের মাথা থেকে খেয়ালটা বেরোয়। আর সত্যি তা অকাট্য। কাল সকালেই প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু বদমাশ ছোকরা নামটা উজির আলি উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু "পাত্তা নেহি বোলা।"

— দেখা?

— কিয়া দেখা?

"নাংগা আওরাত সে কিয়া কাম আতা?" শের খান কোনো জবাব দিলে না। শান্ত্রীর কর্তব্য পায়চারী করা। সে পায়চারী করতে লাগল। কিন্তু নাছোড়বান্দা সঙ্গী। সেও পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। জিজ্ঞাসায় তাকে পেয়ে বসেছে।

বিরক্ত হয়ে আলী খান প্রশ্ন করে আবার, "তোমারা হুঁয়া কিয়া?"

— মাঁই ঘরসে আয়া বহুৎ রোজ। আভি ছুটিকা দরখাস্ত করুংগা।

— তোম উল্লু হ্যায়।

— কিউ?

— তোমারা ঘর মে কেৎনা আওরত হ্যায়?

"এক।" জবাব দিলে মর্দান জেলার অধিবাসী।

"হিয়াঁ শও, শও আওরত— উল্লু কাঁহাকা।" আলী খানের মন্তব্যের উপর কোনো টীকা করলে না শের খান। সে পায়চারী করতে লাগল যেন কোনো অফিসার এখনই এসে পড়বে। নিতান্ত কর্তব্যপরায়ণ। সঙ্গীর হাবভাব নিতান্ত অস্বাভাবিক। তাই আলী খান তাকে আর ঘাঁটাতে সাহস করলে না।

সেই বন্দিশিবিরে আমোদিনীদের চার জনের পাশে দাঁড়িয়ে রশীদা বিবি, চাপাস্বরে বলে যান, "বু-জান, আমি কইছি না, আল্লা এ জুলুম সইব না। নিজের চোখে দেখছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত? আহা, কার সোনার পুত— ।"

তানিমা, জায়েদা, সখিনা আর কোনোদিন এত প্রকৃতস্থ হয় নি। তাদের কথাবার্তা স্বাভাবিক। যেন হঠাৎ কোনো মানসিক অবলম্বন পেয়ে সকলে আবার খাড়া দাঁড়াতে পেরেছে।

"বলেন, চাচি", তানিমা চাষি-বৌর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করলে।

এই পোস্তার উপর তারা পাঁচ জন। তানিমার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি রশীদা বিবি। সে এমন কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী, তো জানা ছিল না। সামাজিক পার্থক্য সম্পর্কে তিনি সচেতন। তাই সহজে এদের কাছে গায়ে পড়ে তিনি কথা বলতে আসতেন না। শুধু অবস্থান গুণে কাছাকাছি যাওয়া।

জায়েদা কথার খেই ধরলে, "কার ছেলে কিছু জানতে পারলাম না।"

"আমাগো মুক্তিফৌজে এমন পোলা আছে। কিন্তু দুঃখ কি জানেন।" চাষি-বৌ সকলের মুখের দিকে তাকায়।

সখিনা প্রশ্ন করে, "কী দুঃখ?"

"অমন সোনার পুৎকে জল্লাদেরা মাইরা ফেইলবো।"

চাষি-বৌ তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং আরো কী যেন ভেবে মাথা নাড়লেন।

আবহাওয়া কালো হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। তার ছেদ টানলে আমোদিনী "চাচি, আমাদের কিছু করা উচিত।"

"আমরা মাইয়াপোলা কী করতা পারি?"

"কিছু করা উচিত।"

সমস্ত বন্দিশিবির আরো মৃদু সংলাপধ্বনি শোনা যায়। মাত্র একটি ঘটনার প্রবাহ যেন এমন জের এখন রেখে গেছে। একটি মেয়ে আসা অব্দি চুপচাপ কারো দিকে তাকায় না মাত্র। সেও থামে হেলান দিয়ে আশেপাশের মুখ নিরীক্ষণরত।

"কী করতা পারি মা?" হতাশ স্বরে জবাব দিলেন রশীদা বিবি।

"কটা সিপাই অন্তত সবাই মিলে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করতে পারি।" জায়দা বেশ গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলে।

— কী লাভ হৈব মা? তার চেয়ে আল্লারে সবাই ডাকি। আমাগো ফরিয়াদ কি তার কানে যাইব না?

রশীদা বিবি বললেন, "বেশ জোর বিশ্বাসসহ।"

তানিমা সায় দিলে না। হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে সে বললে, "লাখ লাখ মানুষ আল্লাকে ডেকেছে না? কী হলো? এই তো পরিণতি। আমার বেগুনা বাচ্চা দুটো রোজ শোয়ার আগে বলত, 'হে আল্লা, আমাদের— ।"

কিন্তু কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। ঢোক গিলে কী যেন গলার ওদিকে নামিয়ে দিতে তৎপর তানিমা। কিন্তু অসফল। হঠাৎ হাউমাউ চিৎকার দিয়ে উঠল সে, "না— আল্লাকে ডাকব কেন? তারপর সে ফুঁপিয়ে চোখের পানি ফেলতে লাগল। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে চাষিবৌ আর সাহস পেলেন না। বরং কথা অন্য দিকে পাড়লেন।

— বুবুরা, একডা সিপাই মাইরা কী লাভ হৈব? আমাগো বেবাকরে মাইরা ফেলব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— এই বেঁচে কী লাভ?

অমোদিনী জিজ্ঞেস করলে।

রশীদা বিবি তার কোনো জবাব দিতে পারলে না।

তানিমা ইত্যবসরে সামলে উঠেছে। সেও প্রতিধ্বনি করলে, "এই বেঁচে কী লাভ?" জায়েদা আরো জোরে সমর্থন দিলে, "এই জানোয়ারের অধম জীবন। বেঁচে কী লাভ?"

রশীদা বিবি তার বুবুদের মুখের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত পাঠ করতে পারেন কি পরম হতাশায় তাদের মুখ থেকে কথাগুলো বেরুচ্ছে। নিজেও মুশকিলে পড়েন। সত্যি এমন বেঁচে লাভ কী? তিন রাত্রি আগে উজির আলী তাকে যে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল, আজ তা যেন কে টান মেরে ধসিয়ে ফেললে।

রশীদা বিবি নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন তাকে অত সহজে ছাড়ে নি। এই পথেই তার কাছে ফিরে এসেছিল একধরনের অকুতোভয়তা। যা-ই হোক, অপরকে বাঁচতে তিনি সাহায্য করবেন। এই পরীক্ষা দিতে খুব বেশি বিলম্ব ঘটে নি।

আরো তিন দিন পার হয়েছিল মাত্র।

রাত্রি বারোটার পরে ক্যাপ্টেন রেজা শুধু আলী খান সহ বন্দিশিবিরে ঢুকেছিল। তার আগমনী এখানে সঙ্গে সঙ্গে জানান দেয়। কেন সে আসে, তাও কারো অজানা নয়।

রশীদা বিবি শুয়ে ছিলেন। কদিন থেকে যেন ঘুম কিছু প্রলোভন যুগিয়ে থাকে। ফটক খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সচকিত উঠে বসেন। এবং মুখ, চোখের উপর রাখা হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করেন শিকারি দলের গতিবিধি।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে দুই জন।

গুদামের কাছেই একসারি পোস্তা এখন শূন্য। অধিবাসীনীদের বিদায় দেওয়া হয়েছে। কোথায় গেছে তারা, এখানে কারো কারো জানার কথা নয়। কেউ তো মুখ খোলে না শাস্ত্রীদের কাছে। নানা শারীরিক অসুবিধা যায়। অনেক সময় পানির টান পড়ে। কিন্তু তা নিয়ে এখানে কোনো নালিশ নেই কারো বিরুদ্ধে। কেউ যদি অভিযোগ করে, তা তার স্রষ্টার কাছে।

রেজা খান আসে।

পেছনে পেছনে আলি খান।

চাষিবৌ দেখছিলেন। ক্রমশ তারা এগিয়ে আসছে। পোস্তার উপর বহু মেয়ে শোয়া। অনেকে যথারীতি হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে আছে। হয়ত টের পেয়েছে তারা শিকারি আসছে। নিতান্ত বাহ্যজ্ঞান-রহিত অথবা ভবিতব্যের হাতে সব সোপর্দ করে দিলে, মনের যে অবস্থা হয়, তেমনই চৈতন্যসমুদ্রে নিমজ্জিত।

চাষিবৌ শুয়ে ছিলেন। একদম পশ্চিম কোনায় এক পোস্তার উপর পাশে আর একটি মেয়ে, বিলকুল শীর্ণ লতা। সে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। পরে করোটা ফিরলে। তার মুখ রশীদা বিবির চোখে পড়ল একবার ঝলকের মতো। অন্য সময় হলে, তিনি এই চিবুকে হাত বুলিয়ে আদরের ছলে সান্ত্বনা বিতরণ করতেন অথবা হয়ত নিজের গণ্ডদেশের কাছে টেনে নিতেন আরেক গণ্ডদেশ। আজ তিনি যেন ওই দলিত মুখ দেখেও দেখলেন না। বরং উঠে পড়লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেজা খান অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।

এবার কিছু সুস্থ মেয়েদের খাটাল পড়ে। অসুস্থ মেয়েদের সাধারণত দরজার কাছাকাছি রাখা হয়। একধরনের মানবিক বেড়া। তাদের দেখে যদি কারো দয়া হয় এবং সেখান থেকে যেন ফিরে যায় আর এগিয়ে না আসে— এমন বাধা ডিঙিয়ে।

চাষিবৌ আর দেরি করলেন না। দ্রুত পায়ের ডগার উপর ভর করে, অনেক শায়িত অবয়ব ডিঙিয়ে সোজা পরিখার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একদম রেজা খানের সোজাসুজি। তারপর হাত জোড় করলেন।

চমকে উঠলেন রেজা খান।

এমন তো কখনো ঘটেনি। সে শাহানশাহের মতো এগিয়ে যায়, সামনে কোনো বাধা পড়ে না। হঠাৎ এমন অপচ্ছায়া কখনো তার সামনে নাজেল হয় নি। বাল্‌বের অস্পষ্ট আলোয় দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হলেও জায়গাটা প্রেতপুরী এবং বাসিন্দাদের প্রেতিনী ভাবতে কোনো অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা নেই।

জোড়কর নারীমূর্তি সম্মুখে।

অতি সূক্ষ্ম হাসির তাগিদে রেজা খানের গোঁফ দুদিকে একটু নড়ে উঠল ঠোঁটের সঙ্গে সঙ্গে।

অপচ্ছায়া তখন সরব : মাফ, মাফ!

শিকারির ভাষা রশীদা বিবি জানেন না। এই একটা শব্দ সব বুঝিয়ে দেবেন তাঁর ধারণা।

রেজা খান বেশ কৌতূহল বোধ করে। দৈনন্দিন রুটিনে কিছু এদিক ওদিক হলে জীবনে আস্বাদ বেড়ে যায়। তা ছাড়া এত রাত তক্‌ অফিসার মেসে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে হুইস্কির মৌতাত এমন পর্যায়ে তাকে ঠেলে দিয়েছিল যে যেন উন্মুক্ত হয়ে ছিল বৈইকী রগড়ের জন্য।

রশীদা বিবি আবার অতি বিনয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, 'হুজুর, মাফ।' আর একটা শব্দ তিনি যোগ দিলেন।

রেজা খান গোঁফে তা দিয়ে তার সামনের নারীপ্রাচীর নিরীক্ষণ করতে লাগল। পঞ্চাশের বেশি বয়স। সব কিছু ঝরে গেছে। কিন্তু চোখ দুটো এখনো এখনো তরুণী সুলভ। কেমন মায়া-ভরা, এখনো টান দিতে পারে। ফরিয়াদকারীর দুই হাত জোড় বাঁধা। সুতরাং নিম্নাঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়। এখনো সুগঠিত উরু! জোছনার মতো ধবধবে। ক্যাপ্টেনের লোভ হয়। কিন্তু বুকের দিকে চেয়ে দমে যায়। তাই দৃষ্টি তাড়াতাড়ি স্থানচ্যুত করে সে। কিন্তু দেহের চকিত ঝলক ছবির মতো তার চোখে গেঁথে থাকে। নেশা কল্পনার বহু খালি জায়গা পূর্ণ করে দেয়।

ক্যাপ্টেন রেজা এবার রসিকতা করে বলে, "কিয়া হামকো মাংতা?"

"হুজুর, মাফ।"

"কিয়া কসুর কিয়া?"

"হুজুর, মাফ।"

একই জবাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর তো কোনো ভাষা শেখেন নি চাষি-বৌ, পাঞ্জাবের এই ভদ্র সন্তানের কাছে যা তুলে ধরবে।

বিরক্ত ক্যাপ্টেন রেজা। সে এবার এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু চাষিবৌ সামনে দাঁড়ায় দুই হাত খুলে একদম আগলের মতো প্রসারিত বাহু।

"হাঁট যাও।" বেশ রূঢ় স্বরে রেজা খান উচ্চারণ করলে। কিন্তু নেশার টানে আওয়াজে তেমন কামড় অনুভব করা গেল না।

কিন্তু অন্য পক্ষ তখন বেশ জোর দিয়ে প্রসারিত বাহু যথাস্থানে রেখে উচ্চারণ করে, "হুজুর মাফ।"

ক্যাপ্টেন রেজা তারপরই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, দুই হাতে বাধা ঠেলে ফেলে। কিন্তু চাষিবৌ সোজা মোকাবেলার জন্য বেশ শক্ত-খাড়া থাকেন। শক্ত চোয়াড় হাত তাকে অত সহজে ঠেলে ফেলতে পারে না।

ধাক্কা দিয়ে এগোতে গেলে, ক্যাপ্টেন রেজার কোমর জড়িয়ে ধরেন চাষিবৌ, মুখে আদিম অনুনয়সহ : "হুজুর মাফ।"

বেশ ধন্দে পড়ে যায় ক্যাপ্টেন রেজা। একবার ধমক দিতে গিয়েছিলেন শান্ত্রী আলী খান। সে উল্টো ক্যাপ্টেনের ধমক খেলে, "খামুশ রহো।"

হয়ত নেশা, হয়ত নগ্ন দেহের এমন সোজাসুজি প্রদর্শনী, কি বলা মুশকিল। রেজা খান চাষিবৌর হাত ধরে তাকে হিড়হিড় টানতে টানতে নিয়ে গেল, দরজার কাছাকাছি এক পরিখার কাছে। হাফপ্যান্ট পরিহিত সামরিক পুরুষ। কোমরে পিস্তল গোঁজা। তার পায়ের চপ্পলের আওয়াজ এদিকে ওদিকে শব্দিত হতে থাকে।

পরিখার অন্ধকারে পরে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পাছড়ে ফেলার প্রতিযোগিতা। চাষি-বৌ-র কণ্ঠস্বর গোটা গুদামে ঝনঝন বাজতে থাকে, "তুমি আমার পোলার লাহান— আমার তুমি বা-জান।'

এ চিৎকার আর্তস্বর।

তার অনুরণন সহজে থামে না। বুঝা যায়, পরিখার আদিম অন্ধকারে কাপ্টেন তার পৌরুষ জাহির করার প্রয়াসী।

আলী খান আর অত দূর যায় নি। সে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছিল। অফিসারের সঙ্গে সে তো কোনো বেয়াদবি করতে পারে না। অফিসারের কাজ করে অফিসার। তা নিয়ে টীকা রচনার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত। অন্তত মিলিটারি কোডে তা-ই লেখা আছে।

চাষি-বৌর আর্তস্বর, "তুমি আমার পোলার লাহান..." শিবিরের স্তব্ধতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

সেই সময় দেখা গেল, তানিমা তার জায়গা থেকে উঠে লাফিয়ে পরিখার কাছাকাছি পোস্তার উপরে পৌঁছল এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যালা-দানের পদ্ধতিতে হাত নেড়ে চিৎকার দিতে লাগল, 'রঞ্জিত সিং-কে হারামজাদ, লোগ করো, করো, আপনা মাকো করো-করো-করো মাদা- চোর্দ...।'

আলী খান তখনই দৌড় দিয়ে এই বজ্জাত আওরতের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারত।

কিন্তু অকুস্থল নিকটে। অফিসার কী অবস্থায় আছে, কে জানে। তাই সে আর সেদিক পা বাড়াতে সাহস করল না।

তানিমা আরো জোর গলায় একই ভঙ্গিতে গলা ফাটায়, 'রঞ্জিৎ সিং কে হারামজাদ, লোগ করো আপনা মাকো করো-করো-করো মাদা-চোর্দ...।

ক্যাপ্টেন রেজার নেশা বোধহয় ছুটে গিয়েছিল। নেশাই। সে তো ইচ্ছে করলে, এ সব কাজ আর কোনো জায়গায় করতে পারত। সে তো সাধারণ জওয়ান নয়। এমন পরিবেশের প্রয়োজন ছিল না।

তখনই রেজা খান উঠে দাঁড়িয়েছিল পরিখার মেঝের উপর। চাষিবৌ গোঙানি শুরু করেছিল। হায়-হায়— শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যায় তারি মধ্যে।

কিন্তু আবার মুখ খোলা মাত্র রেজা খান সোজা তানিমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে। পিস্তলের দুইবার দ্রুম দ্রুম শব্দ হলো। একটাই যথেষ্ট ছিল। কারণ, প্রথম গুলি তার বুক ভেদ করে চলে যায়।

লুটিয়ে পড়ল তানিমা। '৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পর উর্দু ভাষার প্রতি তার এমন ঘৃণা জন্মেছিল যে আর কোনোদিন সে তা উচ্চারণ করে নি। আজ শেষবারের মতো তা মুখছাড়া করেছিল। নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে সে বিড়বিড় যেন বললে, "আহ্ নূর আহসান...।"

পরিখার দিকে লাশের মুখ ঝুলে পড়েছে। চাষিবৌ আদিম গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন যেন। মেহনতে অভ্যস্ত, ছোট লাফে পোস্তার উপর উঠে তিনি তানিমার মাথা নিজের কোলে রেখে চিৎকার দিলেন, পানি নিয়ে আসার জন্যে। অবিশ্যি তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

হাফপ্যান্টের ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে অপ্রস্তুত, হতভম্ব, ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেন রেজা রুষ্ট কণ্ঠে ডাক দিলে, "আলি, আজ রাত কা আন্দর সে লাশ নেকাল দো।"

"বহুৎ আচ্ছা সরকার।"

অনুগত কুকুরের মতো ঘেউ-জবাব দিলে আলি খান।

৯

সরব হয়ে থাকে সকল স্তব্ধতা।

গুদামের মধ্যে মৃদু নিঃশ্বাসের উত্থান-পতন আছে। তা হয়ত শোনা যায় না। কিন্তু নীরবতার ব্যাখ্যা কি সেখানেই সীমাবদ্ধ?

কয়েক দিনে চাষিবৌ যেন কেমন হয়ে গেছেন। অপমানের মাত্রা আছে। পরিচিত পরিবেশে তার মাত্রা সম্পূর্ণ বদলে দেয়। জানাশোনা লোকের সামনে ভিক্ষা করা কঠিন। কিন্তু অপরিচিত মানুষের সম্মুখে একজন স্বচ্ছন্দে হাত পাততে পারে বিনা লজ্জায়। চাষিবৌ পূর্বে বেইজ্জৎ হয়েছিল। তখন পরিচিত কেউ সামনে ছিল না। তাই হয়ত অমন বিষণ্নতার মধ্যে তিনি গুটিয়ে গেছেন।

থামের চারপাশে চারজন বসে থাকত। একটি আসন শূন্য। আমোদিনী আত্মচিন্তায় আরো বুঁদ। সখিনা উন্মাদিনীর মতো বিস্ফোরিত নেত্রে তাকায়। কারো দিকে নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়েদা অসুস্থ। জ্বর ছেড়ে গেছে দু'দিন। কিন্তু দুর্বলতার জন্যে আদৌ ওঠে না নেহাৎ প্রাকৃতিক কয়েকটা কাজ সারা ছাড়া।

গোটা বন্দিশিবিরে কয়েকদিন আগে যে আবহাওয়া ছিল, তা হঠাৎ উবে গেছে। চাষিবৌ শুধু বর্ষীয়ান বলে নয়, অপমানের শত বোঝা মাথায়ও যিনি অপরকে আবেগের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর সাহস যোগাতেন, নিছক কোনো কথায় নয়, শুধু নিজের উপস্থিতি দিয়ে, তিনিও মুষড়ে গেছেন। কোনোদিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখেন না। স্তব্ধতার বিরাট সামিয়ানার নিচে সবাই গুটিসুটি। কিন্তু একবার চোখের পাতা খোলা এবং বন্ধ কারার ভঙ্গি থেকে জানা যায়, সকলেই আত্মসংলাপে মগ্ন। প্রত্যেকেই প্রত্যাবর্তন করে নিজের অতি পরিচিত জায়গায় যার উষ্ণতার খোঁজে মন বিবাগী, চোখ নিজের আঁকা পটেই ঘুরে বেড়াতে দক্ষ।...

স্টেশনে ট্রেন এখনো যায় আসে কি? হয়ত নিয়মিত নয়। কারা আসে? প্ল্যাটফর্মময় দৌড়াদৌড়ি করতে পারার চেয়ে আর আনন্দের কিছু নেই। চারপাশ থেকে এলোপাতাড়ি এত গুলি! ডাক্তার পুরুষ মানুষ সামাল দিতে পারে নি। নচেৎ দেখা হত বৈইকী। কিন্তু কে আছে, কে নেই, কে বলবে? অতি আদরে মানুষ হওয়ার এই বিপদ। কঠিন আঘাত সইবার মতো দেহ থাকে না, মনও না। একটু ফাঁকা মাঠ পাওয়া যেত এই সময়। আলো বাতাসের অনেক দাম। তা অবস্থার ভেতর দিয়েই বুঝতে পারা যায়। দূরে ঝিরঝির ফলে ঝিকমিক দুপুরের আলোয় কয়েত বেলের গাছটা ডালপালা শুদ্ধ কী আশ্চর্য নড়ে। যেন মানুষের মতো কী বলতে চাইত। আমের গাছ পড়ে যেতে পারে। কেন এমন হলো? ফসলের সময়। কত কাজ। মাঠের উপর চোখ মেলে দিয়ে আজও দেখতে ভালো লাগে, কবে নাইওরে এসেছিলাম। একরাশ বালিহাঁস, আহ দল বেঁধে উড়েই চলেছে...আকাশে সাঁতার দিয়ে দিয়ে আরেক দেশে পৌঁছে যায়। দামাল শিশুগুলো হাসছে অনবরত। জুঁই ফুল ফোটে শ্রাবণের ধারায় ভিজে... আদরের জুঁই। চারপাশ থেকে গাছপালা নদী সব দৌড়াতে শুরু করেছে তীরবর্তী দাউদাউ অগ্নিস্নাত ঘরবাড়ি সহ। মানুষগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছে। মানুষ-মাঠ...আকাশ কত দূরে?

১০

বাইরের জগৎ যখন অর্থময়তায় ধরা দেয় না, বরং অসংলগ্ন হয়ে যায়, তখন উম্মাদিনীরা কী করে? কিন্তু কোনো পর্যায়ে এমন ঘটা সম্ভব নয় একদম সম্পূর্ণভাবে। স্বল্প পরিসরে কিছু অর্থময়তা থাকে। এ যেন দাঁড়িয়ে থাকার মতো।

এই গুদামের মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগ যেন ছিঁড়ে গেছে। থামের পাশে তিন জন এক হপ্তা একই ভাবে কাটিয়ে দিলে। কারো সঙ্গে কেউ কথা বললে না। এমনি পরস্পরে পূর্বে একে অপরের গায়ে ঠেস দিয়ে বা কোলে মাথা রেখে যে আশ্রয়টুকু খুঁজে পেত, আজ তারও যেন কোনো প্রয়োজন ছিল না কারো। আমোদিনী যে কথা বলার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকত সেও চুপচাপ। সখিনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে জীবনের সব অবলম্বন যেন পেয়ে যেত। নচেৎ এতক্ষণ এই ভাবে কী করে কাটিয়ে দেওয়া যায়? জায়েদা পূর্বে নির্বিকার থাকত। তার কঠিন মুখাবয়ব এবং চোখের

AMARBOI.COM

দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায়, মাত্র একটি জিজ্ঞাসাচিহ্নের উপর সে তার দৃষ্টি একাগ্রভাবে নিবদ্ধ রেখেছে। চাষিবৌ তানিমার মৃত্যুর পর থেকে যেন সকল শক্তিহারা। কংক্রিটের মেঝের উপর বহুক্ষণ ধরে মুখ ঘষেন যেন কোনো প্রিয়তমের কাছে, বাক্যহীন এইভাবে নিজের সকল আবেগ নিঃশেষ করে দিচ্ছে নিদারুণ যন্ত্রণাসহ।

পূর্বে অনেক ঈষৎ খোঁয়াবির মধ্যেও চমকে উঠতে বাইরে মেশিনগান কি গুলিগোলার শব্দ। আজকাল তেমন কোনো শব্দ আর আসে না। বায়ুতরঙ্গে এমন কম্পন সকলকে চেতিয়ে তুলত অন্য কোনো পথে নয়, মনের মধ্যে হামাগুড়ি দেওয়ার শক্তিসঞ্চয়ে। সেইদিন এখন সীমাবদ্ধ নয়, দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত। কর্ণপট সাহায্যে অক্ষম।

গোটা বন্দিশিবির প্রেতনগরী। কদিন বাইরে থেকে কোনো জুলুমের সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না। কারণ, অধিকাংশ কয়েদি অসুস্থ। কয়েকজন ছাড়া পেলে অর্থাৎ তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো কেবল শরীরের অজুহাতে। জ্বরের প্রকোপে কেউ যদি কাঁপে, তার কাছে বাসরঘর আর কোন পুলক সঞ্চার করবে? যে-যার জায়গায় চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে। রশীদা বিবি পর্যন্ত এমনই নিঃসাড়। বিশাল মরুভূমি সামনে পড়ে থাকলে গন্তব্যের আকর্ষণ ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। মরীচিকার পেছনে তখন আর কেউ দৌড়ায় না।

জায়েদা একদিন রাত্রে খামাখা পরিখা ধরে পায়চারি করতে লাগল। ঘুম এখানে আচ্ছন্নতা মাত্র। প্রায় নিশিগ্রস্ত সে হাঁটছিল কারো দিকে না তাকিয়ে। বাইরে স্মৃতিজগতে বিচরণ করছিল বৈইকী সে। কারণ, উম্মাদেরও অর্থময় জগৎ আছে। নচেৎ একদম যুক্তিহীন কাজের দিকে তারা ছোটে না কেন? তার স্বামীর মুখ এবং জুঁই-আহ্বান সে একত্রে যোজনা করছিল। চোখ-কান কখনো কখনো একত্র হয়। বিদ্যাপতি তার পরিচয় অনেক কাল আগে দিয়ে গেছেন। কিন্তু জায়েদা সঠিক কিছু ভাবতে পারে না। তার মনে হয়, কাছ থেকেই তার জন্যে ডাকটা আসছে। দু-পাশে পোস্তা না থাকলে সে হয়ত এই সময় দৌড়দৌড়ি করত ওই শব্দ-মরীচিকার পেছন পেছন। একবার পোস্তার উপরে পা তুলে দিতে গেল সে। অতদূর এগোয় না। ছোট লাফেও নাগাল সম্ভব নয়। এককালে খাটের চারপাশে এমন অভিনয় চলত অ-ধরা থাকার জন্যে অথবা কৃত্রিম বিচ্ছেদ সৃষ্টির পর হঠাৎ অধরের তৃষ্ণা গভীরে নিঃশেষ করতে। নবদম্পতির এই খেয়াল এই পরিবেশে উঁকি দিয়ে যেতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু স্মৃতি যেখানে সারথী সেখানে অসম্ভব কিছু নেই। হঠাৎ এক জায়গায় স্তব্ধ দাঁড়িয়ে জায়েদা সজোরে নিজের মাথাটা পোস্তার সঙ্গে ঠুকে নিলে। কংক্রিটের কিনারা মোটা, ভোঁতা। ঈষৎ ধারাল হলে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরত। অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে কপাল ফুলে উঠল। হাত বুলিয়ে দেখলে জায়েদা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, সব সুমশাম। মুখ চোখ কুঁচকে এবং হাতের মুঠি শক্ত করে সে উপরের দিকে বাল্বের উপর চোখ রাখলে। কেন, সেই জানে। তারপর আবার নিজের জায়গার দিকে এগিয়ে গেল এবং যথাস্থানে পৌঁছে দেখলে, আমোদিনী করোট ফিরে শুয়ে আছে। তার চোখ খোলা। সখিনা তার পাতালি শুনে একবার চোখ খুলে তখনই বুঁজে নিলে। সে সটান চিৎ শুয়ে আছে। আবছা আলোয় তার বুকের ওঠা-নামা স্পষ্ট দেখা যায়। কোনো দ্রুতগতি নেই সেখানে। প্রশান্তির দোলায় যেমন নিঃশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্থর হয়, এ তেমনই ব্যাপার।

জায়েদা নিজের জায়গায় পা মেলে অনেকক্ষণ বসে রইল। তার কোলে যেন শিশু উপবিষ্ট যে এখনো ভালো হাঁটতে শেখে নি। তার অঙ্গভঙ্গি জানান দেয় সেই শিশুর পরিচর্যারত সে। একটু পরে নিজের দুই তালুর মধ্যে মুখ রেখে জায়েদা ফুঁপিয়ে উঠল। কিন্তু বেশিক্ষণ না। হাত সরিয়ে নিলে সে। মুখ তখন প্রস্তরীভূত কঠিন। হাত মুষ্ঠিবদ্ধ। এবার সে সঙ্গিনী আমোদিনীর দিকে তাকায়। বুঝা যায়, সে জেগে আছে, যদিও চোখ বন্ধ।

ডাক দিলে জায়েদা "দিদি"। এবং আমোদিনীর গায়ে হাত রাখলে সে।

উঠে বসল সঙ্গিনী। জায়েদার দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিকভাবে বললে, "কী?"

"আমি আর বাঁচতে চাই না।" ফিসফিস, কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠ জায়েদার।

"কে এখানে বাঁচতে চায়?"

"তবু তিন মাস কেটে গেল।"

"উপায় কী? আমার—।"

"কী দিদি?" জায়েদা অতিশয় ব্যগ্র।

আমোদিনী সঙ্গিনীর হাত নিজের তলপেটে নিয়ে এসে বললে, "এখানেও এক শত্রু বসে আছে।"

"না—।" যেন এই কণ্ঠস্বর দিয়ে সব নাস্তি করে দিতে চায় জায়েদা।

"আমার জানা আছে। আমি আর বাঁচতে চাই না।"

"আমার বাঁচার এতটুকু প্রবৃত্তি নেই।"

"এই অহরহ যন্ত্রণা—।" আমোদিনীর কণ্ঠ বুঁজে এল।

জায়েদা তখন আমোদিনীর কানে কানে ফিসফিস কী যেন বললে।

আমোদিনী ঈষৎ চুপ করে থেকে সায় দিলে, "শব্দ করে না। কিন্তু কী ভাবে?"

"আমি সব দেখে রেখেছি। আর কোনো দুর্ভোগ আমি সইব না। নচেৎ মাথা কুটেই মগজ বের করে দেব।" জায়েগা এমন সহজভাবে কথা বলে যেন কত স্বাভাবিক। আইসবার্গের শান্ত রূপ সমুদ্রতরঙ্গের সংবাদ গোপন করে রাখে।

তারা দুইজনে উঠে পড়ল।

থামের যেদিকে তানিমা শুয়ে থাকত সেদিকে দুটো ইট দেখে আমোদিনী মৃদু কণ্ঠে বললে, "কোথা থেকে পেলে?"

"মেয়েদের বাথরুম করে দিয়েছিল দুটো ইট দিয়ে। আমি এনে রেখেছি।"

"আর লাগবে না?"

"না।"

"না।"

"তুমি বড় হিসেবি।" আপন স্বভাবে ঈষৎ হাসি ছিটিয়ে সে বললে।

"আজই আমার চোখে পড়ল।" জায়েদা জবাব দিলে।

"আগে পড়ে নি কেন?"

"ইচ্ছা ছিল না। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।" তানিমা তেমনই শুয়ে আছে। মাত্র

দু'তিন হাত দূরে। জায়েদা অন্যান্য সহবন্দিনীদের দিকে তাকালে। সকলে শায়িতা। একজন বসে পর্যন্ত নেই।

আমোদিনী প্রশ্ন করলে, "একটা ইট যথেষ্ট।"

"হ্যাঁ, সহজ হিসেব। একইঞ্চি ফাঁক থাকলেই চলে।"

"দুটো এনেছিলে কেন?"

"ফাঁকের উপর বিশ্বাস আরো জোর করতে।"

"তুমি বড় হিসেবি। তোমার এই দয়া মনে রাখার মতো।"

জায়েদা তার সায়া খুলে ফেলল। তারপর বন্দ্‌টা বের করে নিলে অতি দ্রুত।

উলঙ্গ সে আমোদিনীর গলা জড়িয়ে বললে, "আজ সকলের সঙ্গে আমি এক। আমাদেরও উলঙ্গ থাকা উচিত ছিল। বাঙালির ইজ্জৎ, হুঁহ্।" ব্যঙ্গঘৃণা একসঙ্গে তার মুখ থেকে ছিটিয়ে পড়ে।

"দেরি হয়ে যেতে পারে। গলা ছেড়ে দাও, বোন।"

কিন্তু জায়েদা তাকে আরো নিবিড়ে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "এমন দেখাও হয় জীবনে। হিন্দু, মুসলমান। হতভাগারা হিন্দু, মুসলমান করে করে গোটা দেশটাকে এখানে এনেছে। এবার যদি শিক্ষা হয়।"

আমোদিনী তাকে এবার নিজের বুকে চেপে ধরল। কিন্তু কিছু বললে না।

এবার বড় গতিবতী জায়েদা। তাড়া দিলে সঙ্গিনীকে, "তৈরি হও দিদি।"

আমোদিনীর বিবস্ত্র হতে দেরি লাগল না। সায়া খুলে বন্দ্‌টা পরীক্ষা করলে খুব জোর দিয়ে টেনে। বেশ শক্ত, সহজে ছিঁড়বে না।

জায়েদা আস্তে আস্তে তাকে টেনে নিয়ে এল থামের গায়ে। ফিসফিস শব্দে বললে, "হাত বাড়িয়ে দ্যাখো, দ্যাখো।"

এখানে থামের সঙ্গে হুক থাকতে পারে কারো ধারণার বাইরে। দুই দিকে দুটো লোহার গোল হয়ত একইঞ্চি বেড়। কিন্তু ছিল।

আমোদিনীর ক্ষিপ্রতা এবার দেখার মতো। সে তাড়াতাড়ি ফাঁস হুকে লাগিয়েই নিচের ইটখানা লাথি মেরে ফেলে দিলে। কয়েক মুহূর্ত যা বিলম্ব। জায়েদা তেমনই কর্মপটু।

সব হিসেবমতো কাজ। গলা থেকে কারো কোনো শব্দ পর্যন্ত বেরুল না।

অনন্তের যাত্রী দুজন মর্তে ঝুলতে লাগল।

এমন না-ও ঘটতে পারত।

নিতান্ত আপতিক ব্যাপার।

নিদারুণ দুঃখে পাশে কেউ আছে, এ এক বিরাট সান্ত্বনা। সামান্য ধ্বনি। কিন্তু ওই স্বল্প অবলম্বন একজনকে নিচের গিরিখাদ থেকে পড়া থেকে হয়ত বাঁচিয়ে দেবে।

এমন না-ও ঘটতে পারত।

চোখ বুঁজেছিল সখিনা, পাশে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল হঠাৎ। ফাঁকা। কেউ নেই। হঠাৎ পোস্তার সিমেন্ট তখন সাপের গা হয়ে বসে। ছ্যাঁৎ করে উঠল সখিনার সারা শরীর। অন্যদিন কখনো এমন হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে।

নিজেকে প্রশ্ন করলে, কোথায় গেল তারা? পাশ ফিরে দেখলে। কেউ নেই। তখন উবু অবস্থায় সে থামের আরেক পাশে গেল।

সঙ্গিনীদের দেখে আঁৎকে উঠেছিল সখিনা। কিন্তু কোনো চিৎকার দিয়ে ওঠে নি সে।

তখনই দাঁড়িয়ে সে দেখলে, তারা ঝুলছে। পায়ে হাত দিলে, তখনো গরম। কিন্তু জিভ আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে।

বসে পড়ল সখিনা। পোস্তার ওপর। কয়েকবার তাকালে সে সঙ্গিনীদের দিকে। তারও সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না। অবশ্যি তার পূর্বে সে অন্য দুই থামে অমনই হুক খুঁজছিল। কিন্তু কিছু নেই। একদম সমতল।

সখিনা বসে বসে তার প্রসাধন পরিচর্যার ফসল নখগুলোর দিকে তাকালে। ধনীর দুলালী। ফিল্ম এ্যাক্‌ট্রেসের মতো থাকত। লম্বা লম্বা নখ। তর্জনীর নখটা অন্তত দেড় ইঞ্চি লম্বা পরিচর্যা নেই। বেড়েছে তিন মাসে। অগ্রভাগের তীক্ষ্ণতায় ছুরি হার মানবে।

সামনে আরো দুটো সায়া পড়ে আছে। সখিনার চোখে পড়ল। বেশ কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল সে। তারপর নিজের দিকে মন দিলে। তার দুই চোখ কঠিন পাথরের প্রতিভূ। ভেতরে চাঞ্চল্য পর্যন্ত যেন স্তব্ধ।

একটানে নিজের ইজারবন্দটা খুলে ফেলল সে।

তলপেটে ধবধবে শাদা চামড়া। বড় আদরের সঙ্গে হাত বুলিয়ে দেখল সে। তারপর খোলা চোখেই নখটা এদিক ওদিক ছুরির ফলার মতো ঢুকিয়ে দিয়ে টান মারলে নিজের গোটা শক্তি দিয়ে। ফাঁক হয়ে গেছে পেট। এক হাতে চামড়া তুলে সে নখ শুদ্ধ ঢুকিয়ে দিলে সব কটা আঙুল। আত্মনিগ্রহের উন্মাদনা যখন পেয়ে বসে, তখনই আর সহজে বিরতি জানে না। নিজের পেটের মধ্যে সে সব কটা আঙুল ঘোরাতে লাগল যেন বহু ক্লেদ গ্লানি বার করে তবে নিরস্ত হবে।

AMARBOI.COM

কিন্তু তখন ফিন্‌কি রক্ত ছুটছিল চতুর্দিকে।

সখিনার সামনে থেকে একটা সায়া নিয়ে পেট চেপে ধরলে, অন্য সায়া মুখে।

কিন্তু আর্তনাদ কী অত সহজে ঠেকিয়ে রাখা যায়? তারও সীমা আছে।

তবু চিৎকার নয়, জোর গোঁ গোঁ শব্দ উঠতে লাগল সখিনার মুখ থেকে। একসময়ে সে পেটের মধ্যে সায়া আর চেপে রাখতে পারছিল না। তখন রক্ত, আর্তনাদ একসঙ্গে ফিন্‌কি দিয়ে বেরুতে লাগল।

কে বলে, রশীদা নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেছেন?

সকলে জেগে উঠেছিল, কিন্তু তিনি প্রথমে অকুস্থলে হাজির হয়েছিলেন। তারপরই নিজের চিৎকার দিয়ে উঠেছিলেন, "হায়, হায়, হায়! তিন জনেই হায় আল্লা রে...।"

বন্দিনীরা গুদামের বিভিন্ন কোণ থেকে ছুটে আসে।

চাষিবৌ সখিনাকে কোলে তুলে নিয়েছেন কণ্ঠে খোদোক্তি, "হায় মা, পোলাগো কথা মনে পড়ল না? হায়, মা। এ্যাতো বেইজ্জতি নিয়ে বাঁইচ্যা আছি ক্যান... খালি পোলাদের মুখ চাইয়া...।"

দিশেহারা বর্ষীয়ান ঠিক করতে পারে নি, তখন যথার্থ কর্তব্য কী।

সখিনা ধুঁকছিল।

বিস্ফারিত নেত্র বেশিক্ষণ তেমন থাকল না। একসময় চিরতরে বুঁজে গেল।

আর কাউকে ডাকার প্রয়োজন কোথায়?

১১

পরদিন অনেক মিলিটারি অফিসার এই গুদামে জড়ো হয়েছিল। কর্নেল রমিজ, ক্যাপ্টেন রেজা খান, আলি বখ্‌শ এবং আরো তিন-চারজন অফিসার।

ক্যাপ্টেন রেজা ঝুলন্ত লাশের সামনে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলে, "কর্নেল সাব, মাফ কিজিয়েগো। আপকা বাৎ পর হাম উয়ো চারকো সায়া রাখনে দিয়া। লেকিন ইয়ে বাঙালি আওরত কো হাম জানতে। দেখিয়ে আব কিয়া হুয়া?"

কর্নেল সাহেব কোনো জবাব দিলেন না। ক্যাপ্টেন আলি বখ্‌শ বললে, "লেকিন বাঙালি আওরত এৎনা বুজ্‌দিল কিঁউ?"

ক্যাপ্টেন রেজা মুখ খুললে তখনই "মরদ শালা লোগ কিয়া হ্যায়? সব বুজ্‌দিল। সামনে সামনে নেহি লড়তা। সব শালা ছিপ্‌কে লড়তা। আরে গেরিলা লড়াই কুই লড়াই হ্যায়?

"ইয়ে বাৎ সহি (ঠিক)।" ক্যাপ্টেন আলী বখ্‌শ নির্বিকার গলায় জবাব দিলে।

সায় পেয়ে ক্যাপ্টেন রেজা, আরো বলে চলল, "বাঙালি শালা লোগ সাব বুজ্‌দিল। কাল বারা জওয়ান আদমি পাকাড়কে লায়া দেহাৎ সে। খুন লেনে কা লিয়ে। এগারা ঠিক থা। এক তো সুই দেখ্‌তেহি আগে ডর্‌ সে মর গিয়া। ডাক্তার বোলা উসকা খুন কাম মে নেহি লাগে গা। খামখা মেহনৎ। উধার বারা লাশ পড়া হুয়া হ্যায়। আউর তিন বাড়হা। কুচ হারাজ (ক্ষতি) নেহি। ইন্তেজাম তো একহি হ্যায়।"

আলি বখ্‌শ শান্ত্রীদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়েছিল, "যো ভি আওরত হ্যায়, এক তিন্‌কা কাপড়া ভি মা রহমে দো। আওর দেখো কাঁহা কাঁহা হুক হ্যায়। সাব তোড় ডালো।"

একসময় অফিসারেরা অন্যান্য সতর্কতার ব্যবস্থা করে চলে গিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় পাঠান শের খান সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলে, "ইয়ে কর্নেল রমিজ তো বড়া শরিফ আদমি হ্যায়।"

"কিউ?" গোঁপে তা' দিতে দিতে আলি খান পাল্টা প্রশ্ন ছাড়লে।

"এক বাত ভি নেহি কিয়া।" সঙ্গীর মুখের দিকে চেয়ে শের খান বললে।

"আবে তু উল্লু হ্যায়। কুচ নেতি সমঝ্‌তা। শোন— শরিফ-উরিফ কুচ নেহি। ও যো কালি রংগকা আওরত দেখা, উসকা পেট-মে কর্নেল সাব কা লাড়কা ইয়া তো লাড়কি থা। তু উল্লু কুচ নেহি সমঝতা।"

নিজের রশিকতায় শান্ত্রী আলি খান হো হো হেসে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

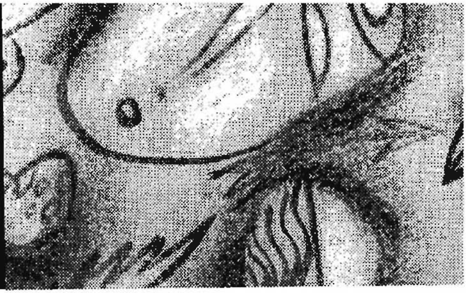

জলাংগী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টিমার ঘাট থেকে আরো আধ মাইল রাস্তা হাঁটতে হয়। পনর-বিশ মিনিট লাগে।

বাঁকাজোল গ্রামের কেউ তার জন্যে কোনো বিরক্তি দেখায় না।

কাঁচা রাস্তা। কিন্তু খুব সংকীর্ণ নয়। একটা গরুর গাড়ি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে।

আকর্ষণ সেখানে নয়।

সব টান প্রকৃতির জন্যে! দুপাশে গাছপালা, বনবাদাড় ঠেলে বাঁকাজোল গ্রাম আরো একমাইল চলে গেছে এই ভাবে। গ্রীষ্মের দিনেও ক্লান্তি লাগে না তাই পথ হাঁটতে। দুপাশে ভিটে, বেশ জনাকীর্ণ। বেশি ক্লান্তি লাগলে তৃষ্ণার জল মেলে। গ্রামে কিছু বুড়ো আছে। তারা তো পথের ধারেই বসে থাকে! কেউ গেলে দুনিয়ার খবর জিজ্ঞেস করবে। দুই দিক থেকেই একঘেয়েমির ক্লান্তি এই ভাবে কেটে যেতে পারে।

অতি নিকটে মেঘনা। তারই ফলে এমন লাম্বাটে আয়তন গোটা গ্রামের। নদীর খাম-খেয়ালের বশেই তা হয়েছে, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমানে মেঘনার ধ্বসে ভেসে যাওয়ার কথা কেউ মনে করে না। অন্তত তিন পুরুষ তো এই ভাবে কেটে গেছে। কিন্তু ভিটের পরেই জলাজমি। বর্ষাকালে একদম দ্বীপ, অবিশ্যি হরিৎ দ্বীপ। এখানে গ্রীষ্ম কোনো দাঁত বসাতে পারে না। জোয়ারের সময়, বর্ষাকালে মেঘনার সঙ্গে দূরত্ব থাকে না বললেই চলে। অন্য মৌসুমে নদী যখন অনেক দূরে সরে যায়, পেছনে শাদা বালুচর ছড়িয়ে ছড়িয়ে, তখন অনেকে চোখে হাত দিয়ে তার ঝলমলে রেখা দেখে নিতান্ত কৌতূহলে নয়, আজন্ম সুবাদের তাগিদে।

গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী চাষি, মাঝি। মধ্যবিত্তের সংখ্যা অল্প। তেমন ধনী কেউ নেই। পাটের ব্যবসায় হঠাৎ দু-তিন হাজার টাকা পায় বছরে, এমন দু'চারজন পাওয়া যেতে পারে। সঙ্গতিপন্ন কৃষক আছে। কিন্তু তাদের সংখ্যাও হাতে গণা যায়। দারিদ্র স্বচ্ছলতার অহরহ কোলাকুলি-রত এই একচিল্‌তে গ্রাম। অখ্যাত।

কিন্তু ইতিহাস মাঝে মাঝে কৌতুক হেনে যায়। তখন খ্যাতির বরণ-ডালা কোথায় গিয়ে ঠেকে, তা বলা কঠিন। তা না হলে এ কাহিনীর সূত্রপাত নিষ্প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশে চৌষট্টি হাজার গ্রাম আছে। বাঁকাজোলের আর এমন কী মাহাত্ম্যগুণ থাকবে? তবু একদিন জেলায় জেলায় এই নাম সকলের ঠোঁটে জায়গা পেয়েছিল।

কিন্তু আমাদের কাহিনী কোনো গ্রামের কাহিনী নয়।

ফয়েজ মৃধা উঠান থেকে নেমে এসেছিল অন্যান্য দিনের মতো। প্রৌঢ় মানুষ।

দিনে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই। তাই কোনো না কোনো কাজে লেগে থাকা বহু দিনের অভ্যেস। সেদিন গাইগরু নিয়ে বেরিয়েছিল। উদ্দেশ্য বাঁধের পাশে পাশে কিছু দুর্বা ঘাস আছে, গরুটা খাবে এবং মালিক জিরোবে। চৈত্রি মাসের গরমে গাছপালার সঙ্গ সব সময়ই তোফা।

কিন্তু একশ গজ দূরে ছেলে জামিরালি-কে দেখে তার বুকটা ধক করে উঠল। এই সময় তো বাড়ি আসার কথা নয়। কলেজের ছুটি হতে এখনো মাস দুই দেরি।

হঠাৎ পুত্রের আগমন উপলক্ষ্য করে অপত্যবৎসল পিতা বেশ অসোয়াস্তি বোধ করছিল। তাই নিজে এগিয়ে যেতে লাগল। গরুটার দৃষ্টি তখন, প্রতিবেশী গৃহস্থের মাচাং থেকে লাউ-ডগা বেড়ার এপারে এসে গিয়েছিল, তারই দিকে। ঘাড় বাঁকায় দড়ি ধরে টান দিলে। এই টানাটানিতে কিছু বিলম্ব ঘটে যায়।

জামিরালি পিতাকে দেখে তখন উৎসাহিত জোরে পা চালিয়ে নিকটে উপস্থিত। এলাকার রেওয়াজ অনুযায়ী সে পিতার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে বসে কদমবুসি(প্রণাম) করার জন্যে। পিতা অন্য আশীর্বাদের কথা আজ ভুলে গিয়েছিল। সে আগেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে।

—বা-জান, হঠাৎ আইলা?

—জি।

বোধহয়, বয়সের ব্যবধান। তাছাড়া আদবের প্রশ্ন আছে। জামিরালি প্রায় পিতাকে এড়িয়ে থাকে। কোনো তিক্ততা নেই ভেতরে। তবু দুইজনে সম্পর্ক তেমন সহজ নয়।

—ক্যান, ব্যাডা?

পিতা স্নেহবিগলিত হলে আর ছেলের নাম ধরে ডাকে না। ওদিকে কুশল জানার তাগিত খুব বেশি, তা বোঝা গেল যখন পুত্রের জবাবের আগেই আবার মৃধা প্রশ্ন করলে, 'অহন তো আসার কথা নয়। তবিয়ৎ বালা নি?'

—তা বা'লা।

—তয়।

স্কুল-কলেজ অহন বন্ধ।

বন্ধ?

ঠিক বন্ধ না।

তবে?

—শুধু স্কুল-কলেজ না, বা-জান। গোটা ঢাকা শহরের কলকারখানা, আপিস আদালত সব বন্ধ।

—ক্যান?

—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হুকুম।

গাভীটিও যেন পিতাপুত্রের সংলাপে কৌতূহলী, একদম ঠাঁয় চুপ দাঁড়িয়ে গেছে। অবিশ্যি জামিরালির সঙ্গে চেনাজানা গত আট বছর। সেও মনিব বৈইকী। হঠাৎ মনিবের আবির্ভাবে প্রাণীরও কিছু বিস্ময় থাকতে পারে।

পিতা ক্ষমার্হ সুরে বললে, 'তা-ই হুনছিলাম। আমি অত খেয়াল করি নাই। তোমাগো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলেজ বন্ধ?'

মৃধা কষ্ট করেই ছেলেকে শহরে রেখে লেখাপড়া শেখায়। সেখানে কোনো বাগ্‌ড়া তার পক্ষে স্বোয়াস্তিহর। তাই অমন প্রশ্ন।

— হ, বা-জান। হগ্‌গল কলেজ, স্কুল, ইউনিভার্সিটি বন্ধ। তাই ভাবলাম খামখা খরচ—

এমন মিতব্যয়ী মনের পরিচয়ে পিতা এমন খুশি হয়ে ওঠে যে কথা আর শেষ করতে না দিয়েই বললে, 'ঠিক করছ, বা-জান।' কিন্তু নিজে আহম্মকির উপর অতঃপর এক চোট ঝেড়ে নিল প্রৌঢ় মানুষটি, 'কত তকলিফ অইছে পথে। জলদি বাড়ি চলো। আমি এহানে কী জুড়েছিলাম? বয়স বাড়লে আর মানুষ মানুষ থাহে না।'

গরুর খবরদারী সিকেয় উঠল।

পিতা পুত্রের অনুগমনে বেজায় খুশী।

তার পূর্বে গরুটা রাস্তার ধারে ফাঁকা জায়গা খুঁটাবন্দি করে নিলে মৃধা ফয়েজ মহাম্মদ।

দুপুরের কাজকর্ম সেরে পনের-বিশ মিনিট মা'র ঘুমোনোর অভ্যেস আছে। সেদিন কাঁচা ঘুম ভেঙে দৌড়ে এল। কারণ, নাসিমন বিবি অন্দরবাসিনী হলেও বাইরের জগতের খবর অনেক বেশি রাখে। পাড়ায় ট্রান্‌জিস্টার থাকার ফলে এই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। মনের কাঠামোর উপর নির্ভর করে বাদ বাকি। পুত্র শহর পড়ে। ফলে নাসিমন বিবির মনে একটা চাপা অহঙ্কার ছিল। সেই জন্যেও বহির্মুখী। গত কয়েকদিন প্রায় সে খবর শুনত। পুত্রের আগমনে উল্লসিত মা কুশলাদি যথাদ্রুত সেরে শ্রান্তি-তোয়াজে এগিয়ে গেল। আহার এবং বিশ্রাম এই ক্ষেত্রে স্নেহের পরম সীমা। কথায় কী হবে?

AMARBOI.COM

মৃধা মুরুব্বি মানুষ। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহ্‌রা। এই শরীরের জোরেই মোটামুটি অবস্থা ফিরিয়েছে নিজের। অন্তত পেটের ভাতের জন্য অত ভাবতে হয় না। ভাবনা ছেলের লেখাপড়ার। মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়। কখনো কখনো পরীক্ষার ফি, এটা ওটা— তখন মাসিক বরাদ্দ ছাড়িয়ে যায়। এমত অবস্থায় বেশ বিপাকে পড়তে হয়। সব সময় কাঁচা টাকা হাতে থাকে না। পাটের মরসুমে যথাসময়ে পাট বিক্রি না হলে ধার কর্জের জন্যে মাথা হেঁট— আর এ-বয়সে মানায় না। কিন্তু মৃধার তেমন দুর্বিপাকও গেছে। পোলার জন্যেই সেবার পাটের দর ওঠে নি, তবু ছেড়ে দিতে হলো।

আজ নিজেই হাত-পাখা নিয়ে ছেলের পাশে বসে গেল সে। ছেলের বারণ কানে নিলে না। একটা পোলা। স্নেহাতিশয্য কিছু আছে বৈইকী। মা আরেক দিকে ঘোমটা টেনে। এই বয়সেও নাসিমন বিবি সাবেক কালের ধাঁচ ছাড়তে পারে নি। ছেলে কিছু অসোয়াস্তি ভোগ করে। কারণ, পিতার উপস্থিতির ফলে মার সঙ্গে দিল্‌খোলা আলাপ চলে না। এই অসোয়াস্তি কাটিয়ে উঠতে সে মুখ খুললে প্রথমে।

— বা-জান, এবার ভোট দিলেন কা'রে?

— শেখ মুজিবের পার্টিতে।

পুত্র তখন একটা ট্যাংরা মাছের মাথার উপ দাঁত বসিয়েছে। বাপ চেয়ে আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাপড়া ছেলের প্রতিক্রিয়া কী হয়। কিন্তু অপর পক্ষ তখন আহারে মনোযোগী। পিতা কিন্তু না-সবুর। কাজেই খুঁচিয়ে কথা তুললে, 'ঠিক দিছি না?'

'হ। এখানকার মানুষটা তো বালা?'

ভোটপ্রার্থীর চরিত্র সম্পর্কে পুত্রের প্রশ্নে মৃধা ঘাবড়ে যায়। কী জবাব দিতে কী জবাব দেব? কিন্তু সরলভাবেই সে জবাব দিলে, 'মানুষটা সম্পর্কে জানি না, বাপ। তবে পাড়ার ছেলেরা কইল বা'লা (ভালো)।'

'হেডাও দ্যাখা উচিত, বা-জান।'

পুত্রের জবাবে আরো ঘাবড়ে যায় মৃধা। কী বলতে চায় জমিরালি? লেখাপড়া জানা ছেলে। ওরাই ঠিক বোঝে। পাঁচ পাড়ার মাদ্‌বর ফয়েজ মৃধা এখানে নিজের উপর কোনো বিশ্বাস রাখতে পারে না।

মা অন্য প্রশ্ন তুললে। ঢাকা শহরের গোলমাল হয় কি না, এই হচ্ছে তার রাজনৈতিক মাপকাঠি, যেখানে পুত্র আছে। ছেলেরাই গ্রামে ভোটের সময় এসে পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করে গেল। ওদের আবার নানা দল আছে। মাঝে মাঝে মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়। তাই নাসিমন বিবি শুধু খবর রাখে, ঢাকা শহরে গোলমাল আছে কি না। রাজধানী শান্ত থাকলেই নাসিমন বিবি নিশ্চিত। তার বেশি রাজনীতির সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কের প্রয়োজন আছে, সে মনে করে না। অর্থাৎ পুত্রের নিরাপত্তা-কুশল দিয়ে আর সব কিছুর বিচার। এত রৌদ্রে ছেলে হেঁটে আসে, তা-ও তার পছন্দ নয়।

সেই খাতেই তার প্রশ্ন প্রবাহিত, 'বা-জানে, একডু সকাল-সকাল আসতা পারো না। এই ঝামাল রোদে—।'

জবাব দিয়ে পুত্র, সে ট্রেন ফেল করেছিল। তার ফলে এই ভরা দুপুর মাথায়। তা-ছাড়া, আজকাল স্টিমারে এত ভিড় যে প্রায় প্রতি ঘাটে ঘাটে ওঠানামায় অনেক বিলম্ব ঘটে।

মা আবার কথা পাড়ে, 'একডা পোলা তুই, তাই এত ভাবি।'

'যেদিনকাল পড়ছে, মা। এত ভাবেন না।'

'ক্যান?'

'কে মরে কে বাঁচে, কেউ কওয়ার পারে না।'

আশঙ্কিত মা। মুখ একদম শাদা কাগজ। পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী অইছে, বা-জান?'

'তুমি সব বুঝবে না, মা। পাঞ্জাবিগো লগে আমাগো লড়াই লাইগব হেরা যদি ছ-দফা— হে তুমি বুঝবে না— হেরা যদি আমাগো ব্যবসাবাণিজ্য চাকরি এসব না দেয়। হব তো তাগোর পেটে।'

'হেরা দিব না ক্যান?'

'তাগোর হাতে রাইফেল কামান আছে। সিনাজুরি কইরতে পারে। তহন লড়াই লাইগব।'

'খোদা-না করে, কী ক'স্ বাবা?'

মৃধা উভয়ের সংলাপ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তারও মুখে আলোছায়ার প্রলেপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্র আহারে ব্যস্ত, নত মুখ। পিতার উপস্থিতি যেন ভুলেই গিয়েছিল। জামিরালি মাকে অভয় দিতে বললে, 'ঘাবড়ান না, মা। লড়াই হৈলে হৈব। কিন্তু এবার আমরা আর সইহ্য করব না। হালারা পাইছে কী?'

পিতা তখন কেশে ওঠে। মুরুব্বির সামনে গালাগাল মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে লজ্জিত জামির। পুত্রের দিকে চেয়ে কিন্তু মৃধা গর্বিত। তারই পুত্র। আঠারো বছর বয়সে কী লম্বা চওড়া। কব্জির হাড় মোটা-মোটা। মার জবাব সে কাপুরুষের মতো দেবে নাকি? তা ছাড়া, মৃধার চাপা ক্ষোভ ছিল মনে। চব্বিশ বছর আগে পাকিস্তান হওয়ার সময় সে কত কী আশা করেছিল। আরো স্বাচ্ছন্দ্য, নিশ্চিন্ত জীবন। কিছুই সহজে মেলে নি। যেটুকু পেয়েছে স্রেফ গতরের জোরে। তার একটা বিহিত হওয়া দরকার।

মার যেন কেঁচো খুঁড়তে সর্প-দর্শন ঘটে গেল। পুত্রের কথায় সে সহজে খাতিরজমা হতে পারে না।

দাঁতে একটা কাঁটা বিঁধে গিয়েছিল। সেটা ছাড়াতে গিয়ে মার মুখের দিকে চোখ পড়তে জামিরালি পরিবেশের আঁচ পেয়ে যায়। তাই মোক্ষম জায়গায় আঘাত দিলে। সে জানে, মা কী রূপে শান্ত হয়।

পুত্র বললে, 'মা সব খোদার হাত, সব নসিবের ব্যাপার। ভেবেচিন্তে কী লাভ?'

মার বুক থেকে যেন পাথর নামল। পুত্রকে আরো কিছু খাওয়ার অনুরোধ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায়। সহজ গলায় নাসিমন বিবি আরো যোগ করলে, 'দুপুরে কিন্তু আসিস না, বা-জান।'

'না, আর আইতাম না।'

কিন্তু মা তো পুত্রের বিধাতা নয়। তার সব কথা জানার উপায়ও নেই। পুত্র অনেক সকালে আসতে পারলে ঢের বেশি না, ভয়ানক খুশি হতো। এই গ্রামের প্রতি তার আকর্ষণ এক-বিধ নয়। জামিরালি ভালোরূপে জানে, গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রাম নির্জন থাকে, লোকজন বেরোয় কম। তখন পত্রপুঞ্জের আড়ালে, কলাগাছের বন, ঝোপঝাপ নিভৃতির যে পরম উপাদেয় বিতান টানায়, তার নিচে মনের কথা নির্বিবাদে বলা যায়— যা বললে বুক হাল্কা হয়। আটপৌরে জীবন থেকে পলাতক হওয়ার সময় আছে। তার সুযোগ চলে গেলে অপেক্ষা যা অনুতাপ করতে হয়। যেন মৌসুমি ফল বা ফুলের ব্যাপার।

জামিরালি দেখলে, মা গেরস্থালির কাজে লেগে গেছে। বাবা গরু নিয়ে আবার ঘাসের সন্ধানে। বিশ্রামের জন্যে ঈষৎ গড়াগড়ি দিয়ে শুয়েছিল সে। কিন্তু তার পক্ষে বিনা ঘুমে এমন রাজত্ব পোষায় না। তাই উঠে পড়ল।

পাড়াগাঁয়ে জন্ম হলেও শহরের হালচাল কিছু অজানিতে এসে গেছে। একটা হাফশার্ট গায়ে জড়িয়ে নিলে জামিরালি। বাইরের আকর্ষণ এখন ঢের বেশি। যদিও শহরের ছাত্রাবাসে থাকে, যেখানে জীবনযাপনের ধারা আলাদা, তবু এই গাঁয়ের প্রতি তার স্নেহবোধ এখনো গভীর। সাহিত্যের ছাত্র ব'লে নয়। স্বভাবতই একটা মমত্ববোধ আছে তার এখানকার গাছপালা, জলা-জাংগালের প্রতি। আর মেঘনা নদীর আকর্ষণ তার কাছে কত প্রবল তা নিজেই পরিমাপ দিতে পারবে না। গ্রামের বাঁধের উপর দাঁড়ালেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা যায়, জলের হাতছানি। তিন চার মাইল দূরে ওপারের গ্রামগুলো তার সঙ্গে গাঁথা। এখন শহরবাসী বলে তেমন চাড়া নেই। বয়সের সঙ্গে কতগুলো অকারণ শালীনতাবোধ জন্মায়। নচেৎ দুবছর আগেও সঙ্গীদের নিয়ে সে ছিপ বা জাল নিয়ে মেঘনার তীরে ছুটে যেত। পরিশ্রমের মূল্য সেখানে বড় কথা নয়। মেহনতের মধ্যে সঞ্চিত আনন্দই তো সকল পাওয়ার পাওয়া। হাতে পায়ে কাদা মেখে পরে স্নানের আনন্দ আরো বেশি। তেমন হুল্লোড়ের ঘোর কমে গেলেও মেঘনার আহ্বান যেন জামিরের কানে কানে। রাত্রে বান ডেকে যখন জোয়ার আসে, তার বিপুল কলকলধ্বনি কতদিন বিছানায় শুয়েশুয়ে জামিরালি শুনেছে এবং পুলকিত হয়েছে। স্টিমার ঘাটে গিয়ে যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখা এবং গঞ্জে গল্প করা— এক কালে তো বাতিকের মতো ছিল। কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে সব বিদায় নিয়েছে। কিন্তু জের আছে বৈইকী। বয়সের ধর্ম আচরণের নক্‌শা বদলে দেয়। কিন্তু গ্রামে এলে বিকালে কোনো না কোনোদিন একা বা সঙ্গীদের নিয়ে মেঘনার উপকূলে হাঁটতে যাওয়া জামিরালিকে পেয়ে বসে। এই বিশ কি তিরিশ মিনিটের মেহনৎ তখন গায় লাগে না।

পশ্চিমে বড় নদী। কিন্তু মেঘনার একটা সরু বাহু আরো দু'মাইল উত্তর দিয়ে গোটা গ্রাম বেড় দিয়ে আবার মেঘনায় মিশেছে। বর্ষার সময় নৌকাপথে তখন বাঁকাজোল পৌঁছানো যায়। কিন্তু অনেক সময় লাগে, বিশেষত উজান ঠেলতে হলে। তাই বাঁধ ধরে পায়ে হাঁটার পথই বেশি ব্যবহৃত। কিন্তু সঙ্গে মালপত্র থাকলে তখন নৌকাই তোফা বাহন। এই সরু খালের প্রতিও কেবল জামির কেন, গোটা গাঁয়ের ভালোবাসা অশেষ। এই গাঁয়ে মাছ খুব কম লোকে কিনে খায়। জাল নিয়ে বেরুলে কিছু না কিছু জুটবেই। এমন কল্পবৃক্ষ দুর্লভ বৈইকী। কিন্তু জল বড় ঘোলাটে। নিচে জমাট পলির জন্যে বুঝি এমন হয়। গ্রীষ্মে খাল ধু-ধু করে। তখন দু'এক জায়গায় ছিপ্‌ছিপে পানি থাকে। কিন্তু চেঁয়ো বা ঐ জাতীয় ছোটখাট মাছ তখনও অল্পস্বল্প হলেও পাওয়া যায়। খালের জন্যে বাঁকাজোল একদিক থেকে দ্বীপই। তারপর আরো গ্রাম, আরো ঘন বসতি। স্টিমার ঘাটের একমাইলের মধ্যে পাটের বড় বড় আড়ৎ; গুদাম এবং ব্যবসাবাণিজ্যের নানা সাজসরঞ্জাম— এই এলাকার খ্যাতি দূরে দূরে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাঁকাজোল অতি সাধারণ গ্রাম, যেন ধনীর দরিদ্র আত্মীয়। লোকসংখ্যা একহাজারও হবে না।

এসব এলাকা জামিরের মুখস্থ। গ্রামের আভ্যন্তরীণ জরিপেও সে বিশারদ। ছেলেবেলায় কিছু ডানপিঠে বিধায় গাছপালা জমিনের হিসাব কষতে হয়েছিল। বিশেষতঃ, মকতব থেকে পালিয়ে কোন ঝোপে লুকিয়ে থাকা যায়, তাও আগে থেকে জেনে রাখতে হত বৈইকী। আট দশ বছর আগেই এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

বাইরে বেরিয়ে জামির পাড়ার গলিপথে এগিয়ে গেল। ছোট ছোট কুটির-সদৃশ ঘর। মেঘনার ভয়ে কেউ বড় বাড়ি তোলে না এখানে, সঙ্গতির প্রশ্ন বাদ দিলেও। তুমুল বোর গাছের ফাঁকে ফাঁকে হয়ত একদম মাটি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, কিন্তু জানান দিতে পেছপা নয়। আদৌ বাতাস নেই কোথাও। নিচে খট্‌খটে শাদা সরু রাস্তার রেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্ভুত দেখায়। আঁকাবাঁকা, সর্পিলতার ছন্দ জামিরের চোখ এড়ায় না। অবিশ্যি অরণ্যজ শীতলতা এখানে আরামদায়ক। আনমনা হেঁটে হেঁটে আরো দশ বিঘা জমিন পার হয়ে এসেছিল মৃধা-পুত্র। কারো সঙ্গে দেখা হয় না। যেন জনহীন গ্রাম।

কাজেম মৃধা তাদের জ্ঞাতি। আগে পাশাপাশি বাড়ি ছিল। পরে উঠে এসেছে এইদিকে। বড় ঘেঁষাঘেষি পাড়া। এখানে এক নিঃসন্তান বুড়ি মরে যাওয়ার সময় তার ভিটা কাজেম মৃধাকে দান করে গিয়েছিল। কাজেমের ছোট ভিটা তখন কিনে নেয় ফয়েজ মৃধা। নচেৎ পাঁচ বছর আগে তাদের একই উঠান ছিল।

জামির কাজেমের বাড়ির কাছে এসে একবার থামল। ইতিউতি তাকালে। দুপুরে সবাই বোধহয় ঘুমোচ্ছে। একবার জোরে কাশি দিলে যেন সর্দিকাশির বিষম ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মনেমনে জামির ভাবলে, সকলে এখন ঘুমোচ্ছে। অবিশ্যি শহর থেকে এলে, একটা পাউরুটি কি দুটো কমলালেবু বা এক-আধ পোয়া বিস্কুট— এসব দেওয়ার রেওয়াজ এখনো জ্ঞাতিদের সঙ্গে আছে। সব জ্ঞাতি নয়, যাদের সঙ্গে সুবাদ বেশ ঘনিষ্ঠ। তেমন কিছু সামগ্রী হাতে ছিল না জামিরের। হয়ত এম্নি বুলু করার বাতিকে ঘর-ছাড়া। আরো এগিয়ে গেল সে খাঁ-পাড়ার দিকে। একদম দক্ষিণে ছিল হিন্দুপল্লী। দেশ-বিভাগের পর তা পাৎলা হতে-হতে কুল্লে দু-ঘরে ঠেকেছে। অবিশ্যি বসু-পরিবারের সদস্য একুনে বারো-তেরো জন হবে। তাদের এক ছেলে অতুল কলেজে পড়ে। জামিরের সমবয়সী। ক্রমশ দক্ষিণমুখী যেতে দেখে আঁচ করা যায়, বোধহয়, সে তারই খোঁজে চলেছে। কিন্তু হঠাৎ কী মনে করে সে আবার যে পথে গমন সেই পথেই প্রত্যাবর্তন। আশ্চর্য দুপুর। গোটা পাড়া যেন ঘুমিয়ে আছে। একটা লোকের সাক্ষাৎ মিলল না। জামিরালির বেশ অবাক লাগে।

এই স্বগোতোক্তির হদিস পাওয়া গেল, আবার যখন সে সন্ধ্যার পর কাজেম মৃধার উঠানে এসে ডাক দিলে: চাচা। হাতের ঠোঙায় শহর থেকে আনা কিছু সামানা।

'আরে চাচা, কহন আইলা।' জিজ্ঞাসু মুখে বেরিয়ে এল কাজেম মৃধা।

'আজই দুপুরে।'

'বয়ো, বয়ো।'

তারপর কাজেম একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিলে।

ছোট উঠান। কিন্তু ধারে ধারে দু'তিনটি গাছ। পেয়ারা ও বাতাবি লেবু গাছের আওতায় জায়গাটা সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আরো ঘন অন্ধকারে লেপা। একটা ডিপা নিয়ে এল তাই বর্ষীয়ান। মুখ দেখা না গেলে, আলাপ জমে না। তখন ঠোঙাটা হাতে দেওয়া মাত্র কাজেম মৃধা আরো পুলকিত অন্দরে চলে গেল। বেরিয়ে এল হুকা হাতে। কাজেম ফয়েজ মৃধার চেয়ে বয়সে ছোট। কিন্তু ঘন দাড়ি এবং শীর্ণ চেহারার জন্যে বেশ বুড়োবুড়ো লাগে।

নারিকেলি হুঁকায় টান দিয়ে সে প্রশ্ন করে, 'শহরের খবর কী, চাচাজান্?'

'বয়কট চলছে।'

'হে তো চলবই। ছ'-দফা না পাওয়া পর্যন্ত। আমাগো কইলে গাঁয়ে আমরাও খাজ্‌না বন্ধ কইরা দিমু।'

'কিন্তু চাচা—।'

আশঙ্কিত পিতৃব্যের ধূমপান বন্ধ। জামিরালির দিকে তাকায়। উত্তরদাতা তখন যোগ করে, 'কিন্তু মিলিটারিরা সহজে দম্‌বে বলে মনে হয় না।'

'কি আমাগো মাইরব?' উত্তেজিত কাজেম উচ্চারণ করলে।

'মারছে। কতো মারছে গত এক হপ্তায়। ওদের বিশ্বাস নাই।'

'পাকিস্তান হৈল। খুব তো সুখ পাইলাম। আগে ইংরেজ লুটত। অহন পাঞ্জাবি লোটে! তা আর অইতে দিমু নি। এই আগুন ছুঁইয়া কইছি, চাচা।'

বেশ তপ্ত আবহাওয়া। জামিরালির মুখ দিয়ে কথা আসে না। অসোয়াস্তি অনুভব করে সে। যেন কথা পেলে বাঁচা যায়।

কাজেমই এগিয়ে এল যখন ডাক দিলে, 'হাজেরা— হাজেরা।'

কল্কের ঠিকমতো আগুন ধরে নি। তাই কন্যার সাহায্যের জন্য এই ডাক।

শুধু হাজেরা নয়, মৃধাগিন্নি পর্যন্ত বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার রূপান্তর ঘটে। আবার একপশলা কুশলাদি জিজ্ঞাসা। যথারীতি উত্তর।

জামিরালি যখই গ্রামে ফেরে, তার মনে হয়, রাতারাতি ডাগর হচ্ছে হাজেরা। দু'মাস আগে কী দেখে গিয়েছিল, এখন কী? হৃষ্টপুষ্ট সুডোল গঠনে খাপ-সই চোখ দুটো পর্যন্ত যেন আরো ডাগর। পিতার হাত থেকে কল্কে নিয়ে সে অন্দরে গেল কী শুধু? পেছনে ছন্দের একটা টুংটাং ছড়িয়ে সব যেন গোলতাল পাকিয়ে ফেলেছে। শ্যামাঙ্গ এমন জৌলুষের অধিকারী হয়, জামিরালির আগে জানা ছিল না।

নানা কথা জমে উঠল। শেষ পর্যন্ত দেশের কথাই বড় হয়ে দেখা দেয়। চাচি এবং তার কন্যা চুপচাপ। চাচা-ভাতিজার কথাবার্তায় তারা মনোযোগী শ্রোতা।

একসময় জামিরালি বললে, 'মেয়েরা পর্যন্ত রাইফেলের ট্রেনিং নিতাছে।'

হাজেরা এবার মুখ খোলে, 'মাইয়া পোলারা?'

'— হ।' বেশ গর্বের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে এবং হাজেরার সোজাসুজি চোখ মেলে জামির জবাব দিলে।

'মাইয়ারা লড়াই করব?' তারপর দুহিতা খিকখিক করে হেসে উঠল। মুরুব্বিরা উপস্থিত। নচেৎ এই হাসি পাড়া-বিদারী হতে পারত।

'দরকার হৈলে লড়বে। পাঞ্জেবিগো লগে এবার হিসাব-নিকাশ হৈব। বাংলাদেশের মান্‌ষরে হালারা চেনে না।'

ছোটদের বহসে যোগ দেওয়া বড়দের বেমানান। এই মনে করে দুই বর্ষীয়ান চুপ থাকলেও বেশ আনন্দ পাচ্ছিল।

হাজেরা মকতবে কিছুদিন পড়েছিল। এখানে মেয়েদের লেখাপড়ার তেমন সুযোগ নেই। এত বেড়াজালে লালিত-পালিত জনের পক্ষে বিশ্বাস করা মুশকিল, মেয়েরা যুদ্ধ করতে পারে।

কাজেম চাচা ছেদ টানলে এই তর্কের মাঝপথে, 'আরে মা, দরকার হৈলে সব করণ লাগে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ আমি নিজে কত করছি। অহন আমিই পোলাপানগো লগে কই, পাকিস্তান ধ্বংস হোক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজেরা বয়সের তুলনায় কিছু বেশি ডাগর দেখায়। জোর পনেরো বয়স। কিন্তু সতেরো দেখায়। নাকের কাছে একটা গোল কালো জড়ুল থাকার ফলে তার মুখের হাসির মধ্যে দুষ্টুমির আভাস প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই তাকে কিছুটা জিদ্দি, কিছুটা কৌতুকপরায়ণ মনে হয়।

সে হেসে হেসে বললে, 'লড়াই লাইগলে দ্যাহা যাইবো ছেলেরা ক্যামন লড়ে।'

'সে তোমারে দ্যাহা লাইগব না। অহন ঢাকা গেলে দেখ্‌তা, রোজ রাইফেল বন্দুক নিয়ে ছেলেরা প্র্যাকটিশ করতাছে।' বেশ জোর দিয়ে বললে জামিরালি।

'আ রে তোরা কথা রাখ্‌। চাচা রে অন্য কথা জিগাই।' মেয়েকে ধমক দিয়ে কাজেম প্রশ্ন করলে, 'চাচা যদি লড়াই বাধে, তখন আমরা কী করমু? আমাগো তো বন্দুক নাই।'

'চাচা, লড়াইয়ের ইচ্ছা থাকলে হাতিয়ারের অভাব হয় না।'

'হে ঠিক কথা।' কাজেম আরো যোগ করলে, 'আঁধার রাইত। চলো তোমারে আগাইয়া দিই।'

আসর শেষ।

চাচি ভেতরে চলে গেল। কাজেম মৃধা ডিপা হাতে এগিয়ে দিতে পথ ধরলে। পাড়ার ভেতরকার গলি। সামান্য পার করে দিলেই তারপর সোজা রাস্তা।

কাজেম মৃধা ডিপা হাতে সকলের আগে।

পেছনে জামির আলি।

দুই জনে এগোয়। হঠাৎ জামির আলির ঘাড়ে কিসের স্পর্শ। তাই তখনই পেছনে ফেরে সে। ডিপার আলোয় আবছা তার চোখে পড়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখ আর চেনা মুখ।

ওদিকে চাচা এগোন আর বলে যান, 'জামির বা-জান। সব গোলমাল ঠেক্‌তাছে। কী যে হৈব।'

'গোলমাল বৈইকী।' জামির জবাব দিয়েই ঘাড় ফিরিয়ে এক হাতে অনুবর্তিনীর চিবুক স্পর্শ করে।

কাজেম মিয়া হুঁশিয়ার-বাণী ছাড়ে, 'চাচা', সামনে একটু গর্ত। দেখো পা দিয়ে বসো না। একটা বাঁয়ে চাইপ্যা যাও।'

'জি।'

কাৎ-ঘাড় জামির তখন অন্য এক হাতের বাধা অনুভব করে, অর্থাৎ চিবুকে আঙুল আর রাখা গেল না। আবার চাচার কী যেন প্রশ্নের জবাব দিয়ে পেছনে ফিরে দেখলে যে কেউ নেই। ডিপার আলো যদ্দুর দেখা যায় জনহীন। তারপর কালো আঁধার।

'সোজা চইল্যা যাও বাবা। আবার আইস্যো। তোমরা আইলে কত কথা শোনা যায়। মুরুক্ষুসুরুক্ষু মানুষ। কী বা বুঝি?' কাজেম মৃধা কথা শেষ করলে।

এবার সোজা পথ।

জামির এগিয়ে গেল না। উল্টা ফিরে তাকিয়ে রইল যে-পথে কাজেমালি মৃধা হেঁটে হেঁটে চলেছে। হাতে ডিপা। তাই সম্মুখে আলো। পেছনে শুধু অন্ধকার, ছায়ামূর্তি, অন্ধকার।

২

রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যেও নদী-তীরবর্তী এইসব এলাকা সজাগ থাকে। মাঝে মাঝে হয়ত মানুষের কণ্ঠস্বর ছেদ টানে। কিন্তু তাছাড়াও ঠিক বহমান জলের ধর্মের সঙ্গ যেন সামঞ্জস্য রাখার প্রয়াসী এখানে সব কিছু। নৈশ পাখিগুলো না ডাকলেও পাখ্‌নার শব্দ রেখে যায়। ক্লান্ত মাঝি নৌকার উপর ঘুমায়। কিন্তু সেও বিপদের ঈষৎ সম্ভাবনাময় জেগে উঠবে, এমন ভরসা রাখে। অন্ধকার বা জোছনায় নিদ্রাহীনতার এই রাজত্ব নদীবাসী মাত্রেই টের পায়।

বাঁকাজোল তার ব্যতিক্রম নয়। আর জামিরালির মতো তরুণেরা কালেভদ্রে পয়লা পহরে ঘুমাতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে পল্টনের মাঠে বক্তৃতা শুনে তাকে গ্রাম-এলাকার প্রেমে পড়তে হয় নি। শহরের স্মৃতি তার কাছে অত প্রখর নয়। অবিশ্যি বয়সের প্রবাহে বা জীবিকার টানে উত্তরকালে কী হয়, কেউ বলতে পারে না। অনেকে মনের দিক থেকেও ছিন্নমূল হয়ে যায়।

তা ভবিষ্যতের কথা।

কিন্তু জামিরালি অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমায় নি। শহরে ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে সে কয়েকদিন রাইফেল ট্রেনিং নিয়েছিল। যদি প্রতিরোধ করতে হয় পাঞ্জাবি সেনাদের, তারা পেছিয়ে পড়ে থাকবে না। তাছাড়া রাজনৈতিক তাপ যেভাবে মাত্রায় মাত্রায় বাড়ছে, শেষ পর্যন্ত ইস্‌পার-উস্‌পারেই হয়ত ব্যাপারটা শেষ হবে। এসব চিন্তায় তার মন মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়। সামাজিক জীবনের এমন ছবির কথা তার মনে কিন্তু বেশিক্ষণ জায়গা পায় না। তাড়াতাড়ি সরে যায়। ব্যক্তিগত টুকিটাকি তখন ধেয়ে আসে। কিন্তু যখনই সচেতনভাবে একটি কিশোরীর মুখ আঁকতে যায়, সে ভয়ে পিছিয়ে আসে। কেমন যেন অপরাধী-ভাব। একরকমের গ্লানির প্রলেপ মনে ধাক্কা দেয়। অথচ সে ভেবে পায় না, কেন এমন মানসিক আলোড়ন। পাশের ঘরে বাবা ঘুমাচ্ছে। হঠাৎ দরজা খুললেই বাবা টের পাবে। নচেৎ জামিরালির এই মুহূর্তে ইচ্ছা হচ্ছিল সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে মেঘনার ধারে গিয়ে বসে। তখনই যেন সব অসোয়াস্তি মুছে যেতে পারে।

বিছানা ছেড়ে ওঠার উপায় নেই। রাত্রে বাবা একা অন্ধকারে যেতে দেবেন, এমন প্রস্তাব পর্যন্ত অসম্ভব। জেদাজেদি করলে লণ্ঠন জ্বেলে নিজে সঙ্গী হতে চাইবেন। তাই কল্পনায় ছুটে যেতে হয় আবাল্যের পরিচিত নদীর কাছে।

বিস্তীর্ণ জলরাশির প্রবাহ এককে সময় লয় থেকে লয়ান্তরে যায়। যারা পরিচিত এই পরিবর্তনের সঙ্গে তারাই শুধু মেঘনার সজীবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম। গ্রীষ্মে যখন ধু-ধু চর পড়ে ক্রোশের পর ক্রোশ, সদা হাহাকারে দুপুরে ঝলমল, তখনো আঁকাবাঁকা সর্পিলতায় নদীর প্রাণস্ফূর্ততা লেখা হয়। কিন্তু পলে পলে গতি-ত্যাগের ছন্দটুকুও না জানলে, ডাঙার রাজ্যে বিচরণের সমান হয়ে পড়ে। আকাশ-তটে অনেক মেঘ জমলে ভরা মেঘনা যেন অভিমানী কুলবধূ, আক্রোশে কাঁখের গাগরি আছড়ে ভেঙে ফেলে দিয়েছে এবং তারই ঝংকার আসছে থেকে থেকে ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার। বহু দিনের নদীতীরবাসী-কে জলতরঙ্গের যাতায়াতের ছন্দ রক্তেও জায়গা দিতে হয়।

জামিরের জন্যে তা যেন আরো সত্য। কোনো অসোয়াস্তির খপ্পর থেকে রেহাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেতে কতবার সে নদীর দিকে ছুটেছে। গ্রামের পশ্চিমে কয়েক বিঘা বাদে সবই তো চর। কিন্তু খাগড়া বা ঐ জাতীয় ঘাস হয়। তাই ছাড়া গরুর পাল খেদিয়ে আনতে চাষিরা দৌড়াদৌড়ি করে মেঘনার কোল পর্যন্ত। নচেৎ ছেলেদের খেলাধূলার আসর এমন ফাঁকা বালুচরেই তো জমে ওঠে। জামিরের কাছে এসব অতি পরিচিত ব্যাপার।

আজ নিজ মনে সে ছবি আঁকতে লাগল বালিশে উবুড় মাথা রেখে। ছলচ্ছন্দ ঢেউয়ের আঘাত নৌকার কিনারায়। আরো বহু নৌকা, বহু যাত্রী। নানা রঙের বাদাম, গাঙচিল দূরে ঝাপসা গ্রাম। সূর্যের ঝিলিক নদীর চোখ-রূপে দিগন্তে বিবাগী। দূরাগত ভাটিয়ালি গান আবার সব স্তব্ধ করে দিয়েছে। শব্দ যেন সব শব্দহর ধমকের মতো। তারি সড়ক-পথে হাজেরার গলা শোনা গেল...

—এই শহুরে, মিয়া-সাব...

—আমি আবার শহুরে হৈলাম কবে?

—হৈছেন টের পাওনি।

—ক্যামনে।

—কাপড়চোপড়ে।

—তাইলে তুমিও শহুরে মাইয়া।

—ক্যামনে।

—তুমিও কাপড় পরো না?

—তা হগ্‌গলে (সকলে) পরে।

—আমি গাঁইয়া গাবুর-মুনিষ।

—গাবুর লেহাপড়া শেখে না।

—তুমি তো মকতবে গিছলা গাবুরানি।

—শহুরে মিয়া যা করে, আমারও তা-ই করা লাগে।

গোধূলির আবছা অন্ধকার সহসা আলিঙ্গন-উন্মুখ বুকের মতো নিঃশ্বাসে উদ্বেলিত হয়। জামির আর কাউকে বুকের কাছে টানার জন্যে এক হাত বাড়িয়ে দিলে। তক্তপোষের উপর পাতা মাদুরের অল্পমসৃণ সমতল বিদ্রূপের মতো হঠাৎ যেন তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠল। তারি ঝন্‌ঝনায় নদী উথালপাতাল করে। রাগী স্রোতের ক্যারাভান খড়কুটো ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, নৌকার তলায়, তটে আক্রোশ ভেড়ে পড়েছে অজস্র শব্দের বিদীর্ণতায়। চোখের দৃষ্টির বাইরেও জল আছে, প্রচুর জল— মেঘ্‌লা-মেদুর প্রসারে প্রসারে বিবাগী।

ছেলের জন্যে বাপ আরো সজাগ। কান খাড়া করে পুত্রের নিঃশ্বাসের মাত্রা জরীপ করে। নিদ্রিত ব্যক্তির বুকের স্পন্দন কিছু আলাদা বৈইকী। স্নেহাতিশয্য দৃষ্টিকটু। কিন্তু যে-শিকার সে তো কিছু বিচার করতে পারে না।

ফয়েজ মৃধা খুব মৃদুস্বরে ডাক দিলে, বা-জান।

পুত্র আচ্ছন্নতার মধ্যে থাকলেও টের পায়। পিতার এই অভ্যেস আজকের নয়। তাই প্রথম দিকে মট্‌কা মেরে পড়ে রইল। কিন্তু দ্বিতীয় ডাকের পর ভাবলে, বুড়ো মানুষের কিছু জরুরি প্রয়োজনও তো থাকতে পারে। তাই জবাব দিলে জামিরালি, কী

AMARBOI.COM

বা-জান?

—ঘুমাও না?

—ঘুমাই তো। আপনার ডাকে নিঁদ ভাঙছে।

ডাহা মিথ্যে কথন। পিতা ওদিকে বেশ লজ্জিত। তাই আফসোস করলে, 'আমি খামখা ডাক দিলাম।'

বাঁশবেড়ার ঘর। মাঝখানে কাদা দিয়ে দেওয়ালের আদল তৈরি। কথা সহজে শোনা যায়। পিতা আবার যোগ করলে, 'ঘুম যাও বা-জান।'

সন্তান এই ছেদে আদৌ বিরক্ত হয় না। যেন দুস্তর গহ্বর থেকে এইমাত্র কেউ তাকে টেনে তুললে। কিন্তু স্তব্ধতার মধ্যে আবার ফিরে আসে স্মৃতির বিড়ম্বনা।

ভোরের হাওয়ায় একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল জামিরালি। কিন্তু তার পূর্বে নিজের ঘাড়ের কোমল মাংসে আঙুল বুলিয়ে তা নিজের চিবুকে ঠেকিয়েছিল বহুবার নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো, যেখানে ঘটনার চেয়ে তার কাল্পনিক ছোঁয়াচই ঢের বেশি কাম্য।

৩

পরদিন সকালে জলযোগ সেরে জামিরালি একবার গাঁয়ের ভেতর চক্কর দিয়ে বুঝলে কী যেন পরিবর্তন ঘটে গেছে। দু'বছর আগে রাজধানীর ঢেউ এসে লেগেছিল। কিন্তু তখনো এমন পরিবর্তন চোখে পড়ে নি। মানুষগুলো আর আগের মতো নেই। তিন-চারখানা ট্র্যান্‌জিস্টার থাকার ফলে খবর ভূকম্পনের মতো অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা শহরের খবর শোনার জন্য গাঁয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে মানুষ ছুটে যায়। বয়স এখানে বড় কথা নয়। দু'চারজন বুড়ো ছাড়া ছোট ছেলেরা পর্যন্ত বেতার-যন্ত্রটি ঘিরে বসে যায়। আগে গান শোনার জন্য কেউ-কেউ অমন হন্যেমি দেখাত। এখন সেই জায়গায় খবর। আর "জয় বাংলা" স্লোগান তো ডালভাত। যেন স্লামালেকুম কি নমস্কারের জায়গা নিয়েছে। মজুর কোদাল যোগে মাটি কাটবে। "জয় বাংলা" মুখে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর পয়লা কোপ। ছোটখাট দৈনন্দিনতার মধ্যে মন্ত্রের মতো ওই দুই শব্দ ঢুকে গিয়েছিল।

বহু দিনের শখ : একটা ট্র্যানজিস্টার। এবার ফয়েজ মৃধা নিজে ছেলেকে টাকা দিয়েছিল কিনে আনার জন্যে। সুটকেসের মধ্যে পড়েছিল। কাল নানা উত্তেজনার মধ্যে খেয়াল হয় নি। আজ সকালে বের করতে বর্ষীয়ান মা এবং বাবা কী খুশী! দুপুরের খবরের সময় তেমন কেউ আসে নি। কিন্তু সন্ধ্যায় অনেকে এসে জুটল। গান শুরু হতে তাদের বেশিরভাগ লোক আসর ছেড়ে গেল, যেন আর কোনো আনন্দময় কিছু নেই, সংবাদ ছাড়া।

আরো দেখা গেল, গাঁয়ের যুবকেরা নানা কল্পনায় মত্ত। অনেকে লাঠি তৈরি করেছে। যদি গণ্ডগোল লাগে, তারা পিটিয়ে সব শায়েস্তা করে ফেলবে। গঞ্জের কাছে নাকি মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। আগে সার্ভিসে ছিল, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এক ক্যাপ্টেন তার ভার নিয়েছে। কথাটা সত্যি। জামিরালি, অতুল এবং আরো কয়েকজন যুবক তা তদারক করে এলো। ফয়েজ মৃধা অবিশ্যি পুত্রকে আদৌ উৎসাহ দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র, মা লড়ায়ের আশংকায় ভীত। পুত্র কাছে আছে তাই নিরুদ্বেগ। তবু ছেলেদের কথায় তার অস্বোয়াস্তি এত প্রবল যে স্বামীর কাছে ধর্ণা দিয়ে বসল আগে থেকে, জামির যেন ওসবে যায় না। অন্দরে যা-ই হোক, সদরে দেশ, সমাজ, পশ্চিম পাকিস্তান বাঙালি অবাঙালি— এমন কতকগুলো কথা কেন্দ্র করেই যেন গোটা দিন এবং রাত্রি ঝুলছিল।

কুঁচোকুঁচো ছেলেগুলো গঞ্জ থেকে ফিরে কুচকাওয়াজ শুরু করে দিয়েছিল, যেখানেই একটু ফাঁকা জায়গা পায়। বন্যা এলে, বাঁধের ভেতর দিয়ে কোথাও জল চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ে। সুড়ঙ্গের সেই সূত্রপাত। একদিন তার আয়তন ক্রমশ বাড়ে। জলের চাপে তারই ফলে বড় বড় বাঁধ ধবসে যায়। সামাজিক তোড়ের মুখে তেমন পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। আগুনের তাপে জল বাষ্প-বুদ্বুদে পরিণত হচ্ছিল। একদিন হাঁড়ির ঢাক্‌না ভাপের চাপে ছিট্‌কে পড়ল, যার পেছনে লুকিয়ে ছিল দৈত্যদানব। শেখ মুজিবের ময়দানের ডাক কার না কানে গিয়েছিল ৭ই মার্চ : তোমাদের হাতে যা আছে তাই নিয়ে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়...এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম...স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ইতিহাস যেন স্বকণ্ঠে রায় দিলে। থরথর কম্পনে গোটা দেশ নড়ে উঠল বিরাট অজগরের মতো। সেই মোহন-বর্ণিল ভীতময় অবয়ব। সেই গর্জন এবং শিকারের আষ্টেপৃষ্টে লেজ-সাপ্‌টানি! আঘাতের সময় সরল, সমুন্নত। নচেৎ শরীরের ধর্ম সর্পিলতা সদা শাঙ্কব-আকার।

বাঁকাজোল গ্রামকে মেঘনাও কোনোদিন এমন তলিয়ে দিতে পারত না। বন্যা এমন ছয়লাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অক্ষম।

AMARBOI.COM

তুমুল উত্তেজনার মধ্যে জামিরালি ভাবে এই সময় তার শহরে থাকা উচিত ছিল। হাজার হলেও গ্রাম সেই তুলনায় স্তিমিতরঙ্গ। তা ছাড়া একটা কিছু করা উচিত। শুধু খাওয়া-দাওয়া আর বচসায় দিন কাটানো ক্রমশ বিস্বাদ লাগবে। এসব অস্বোয়াস্তি অবিশ্যি সে নিজের মধ্যেই চেপে রাখে। অন্যদিকে হৃদয়ের বিস্তার-কাহিনী কে আর জানতে পেরেছে? গ্রামে তা কেউ ভালো চোখে দেখবে না। তবু তারই জন্যে সবকিছু এমন দুদ্দাড় বেগের আমেজ আনে। মাঝে মাঝে রক্তের ছলকানিতে টের পাওয়া যায়। আর যে গ্রাম তার জন্মভূমি, তা দেশের খণ্ডচিহ্ন হিসেবে এখন আরো মনোহারিত্বের আচ্ছাদনে বিকশিত। গাছপালা আর সাধারণ তরু মনে হয় না। রাত্রে বনানী-শীর্ষে দীপ্যমান নক্ষত্রদের ইশারা যেন বাঁকাজোল গ্রামেও পৌঁছায়। আড়ালে-আবডালে দু'চারটে সংলাপের খণ্ডতার ভিতর দিয়ে যৌবন-কৈশোরের প্রান্তরবাসিনী একটি প্রাণের ইঙ্গিতময় আহ্বান এত উচাটন রাখে যে তখন বসুন্ধরা চেতনার সঙ্গে একাত্ম বিরাট কিছু ঠেকে না। যেন মুঠির মধ্যেটা মানবজন্মের সব পরিতৃপ্তি এসে জটলা বাধায়। এইভাবে জীবন কেটে গেলে কে আর দৈনন্দিনতার সংগ্রামে কলঙ্কিত হ'তে যেত?

কিন্তু আর এক পক্ষকাল মাত্র। ছাব্বিশে মার্চের বেতার সকাল থেকে স্তব্ধ। ডায়াল ঘুরিয়ে আরো দেশ তো পাওয়া যায়। প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষ, পাকিস্তানের শাসকেরা যার নাম সহজে ভারত, অবজ্ঞায় হিন্দুস্থান উচ্চারণ করত— তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে খবর আসতে লাগল। খবর নয় মানবেতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়ের পাতা থেকে

পাঠ। সভ্যতা নিমর্জিত। যুগযুগান্তরের সংস্কৃতির সকল অবদান ঢাকা শহরে পঁচিশে মার্চের রাত্রে পাকিস্তানি শাসকেরা ডুবিয়ে দিয়েছে। অরণ্যের যূথচারী জন্তবৃন্দ খাকি উর্দি-পরিহিত, মারণাস্ত্রে নখর-সজ্জিত— বেরিয়ে এসেছে তাদের ইসলাম-মার্কা মধ্যযুগীয়তার গুহা থেকে। হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম এই তিন শব্দের চরমতম রূপ ঢাকা-নগরীর পথে ঘাটে পল্লীতে পল্লীতে বাস্তব আকার নিয়েছিল। আর্তনাদ আর আর্তনাদ নয়, রক্ত আর রক্ত নয়।

কারণ, মানবিক পরিবেশেই তাদের অর্থ থাকে। মানুষই এইসব বোধ-জ্ঞাপক শব্দের জন্মদাতা। তা-ই যখন অন্তর্হিত, তখন কথা বা প্রত্যয়ের কোন্ অর্থ থাকে? হাহাকার, আতঙ্ক, সারা জীবনের নিঃশ্বাস একত্রে ফেলে নিশ্চিন্তে মৃত্যুর মুখে আত্মসমর্পণ, সকল স্নেহ বিনিঃশেষ করার উদগ্রতায় বুকের শিশুর প্রতি শেষ আলিঙ্গন— এমন খণ্ডিত ছবির পটভূমিকায় অন্যদিকে শ্বাপদের গর্জন রাইফেলে মর্টারে মেশিনগানে শব্দিত। তৎসঙ্গে "আলি হায়দার ইয়া আলি" চিৎকার। ইসলামি রাষ্ট্রের লেবেল যে তা-না হলে পূর্ণ হয় না। আর কত ধোঁওয়া শহরে, চোখের পর্দায়। দৃষ্টিহরণে রাত্রির অন্ধকার সেখানে তুচ্ছ।

আদিমতা নিঃশ্বাস ফেলেছিল চতুর্দিকে।

আগেই বাঁকাজোল নড়ছিল। এবার ফেটে পড়ল। রক্তের জবাব রক্তেই দিতে বা নিতে হয়। ধবস নেমেছিল গোটা বাংলাদেশে। স্থির থাকা সেখানে অসম্ভব বা অপরাধ। যার বুকে মনুষ্যত্বের শেষ ছিঁটেফোঁটা বজায় ছিল, সেও অস্বোয়াস্তির শিকার। কে যেন দেশের গোটা আঁত ধরে টান দিয়েছে সকল শিকড়সহ। তাই তো আট দশ দিন পরে দেখা গেল, এই এলাকার দস্যু নামে পরিচিত জাফর শেখ বে-আইনি তিন চারখানা বন্দুক বের করে গ্রামে গ্রামে ছেলেদের ট্রেনিং দিচ্ছে। বেশি গুলি নেই। তবু মাটিতে হাঁটু গেড়ে পড়ে যাওয়া, বুকে হাঁটা— এসব শিখুক। গাছের মূলে টান পড়েছে। ডালপালার আর কী করবে? কয়েক দিনে জাফর ডাকাইত জাফর মিয়ায় পরিণত হয়। দাঙ্গার সময় হিন্দু বাড়ি লুটে যে বিত্তবান, সে গাঁয়ের হিন্দু যুবকদের কাছে স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে চোখের জল ফেলেছিল। প্রায়শ্চিত্তবিধি কোথায়? তা জানার জন্য ব্যগ্র। খিস্তিযোগ ছাড়া সে আর পাকিস্তান-নাম উচ্চারণ করে না, একটা মুসলিম লীগের গুণ্ডারূপে যে বহুদিন ভারা খেটেছিল। গোটা এলাকা এমনই ধ্বংসের প্রবাহে টলমল। সব ওলট-পালট ভাসমান।

তিন হপ্তা কোনোরকমে কাটল। কিন্তু জামিরালি অস্থির। নানা খবর আসে। তার প্রতিক্রিয়া সে সহজে হজম করতে পারে না। একদিন খোলাখুলি মার কাছে নিজের মনের কথা প্রকাশ করে ফেলল।

—মা, দ্যাশের এমন দুর্দিনে, ঘরে বইস্যা থাকমু খামখা?

—তুই কী করার চাস?

'লড়াই শুরু হৈছে। আমার আর এখানে মন বসে না।'

নাসিমন বিবি একমাত্র সন্তানের জন্যে এমনই উতলা ছিল। পুত্রের জবাবে হাউমাউ কান্না জুড়ে দিলে ফয়েজ মৃধা ছুটে এল। হদিস জানার পরে সে মন্তব্য করে, 'দ্যাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো মানুষ আছে' বা-জান?'

'তা আছে। কিন্তু আমার কী কিছু করার নাই?' এমন সোজাসুজি জবাব আর কোনোদিন প্রৌঢ় পিতাকে দেয় নি জামিরালি।

'যার যা কাম হে কইরব। চাষি যদি লাঙল ছাইড়া বন্দুক ধরে, মুক্তি ফৌজরা খাইব কী? তুমি পড়ার কামে আছো পড়ার কামে থাকবে।'

পিতার এই যুক্তি অকাট্য। কিন্তা জামিরালি তা সহজে মেনে নিলে না। জবাব দিলে, 'কিন্তু বহু ছাত্র লড়ায়ে গেছেগ্যা।'

নাসিমন বিবির চোখে আর জল নেই। কিন্তু উৎকণ্ঠিত সেই দুই জনের সংলাপ শোনে।

'তাগো বাবার আরো ছেলে আছে। তুই আমার— ', এবার পিতার গলা আর সহজ থাকে না।

সেদিন এইভাবে কাটল। কিন্তু জামিরালি ক্রমশ : নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে পড়েছিল। বাপ-মার সঙ্গে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া আর কোনো কথা নেই। এই অস্বাভাবিকতা দুই প্রৌঢ়জনের পক্ষে উদ্বেগের ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বুঝাপড়ার কী আছে? তাই নাচার দুই জনে। গোটা বাড়ি ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিল।

হাজেরার কাছে জামির কথাটা পেড়েছিল অন্যাভাবে। দেশের এই পরিস্থিতি, একজনের কর্তব্য কী?

তখন হাজেরা সহজ সরলতায় জবাব দিয়েছিল, 'দ্যাশের মান্ষের মঙ্গল হয়, হেই কাজ করা।'

—অহন লড়ায়ে যাওয়া উচিত?

—হেতে মঙ্গল অইলে যাওয়া উচিত।

—আমি যামু?

হাজেরা তখন কোনো উত্তর তাড়াতাড়ি দিতে পারে নি। সোজা প্রশ্নকর্তার চোখের দিকে তাকিয়েছিল।

—আমি যাব?

আবার প্রশ্ন।

'আপনে এক পোলা বাপ-মার। আপনে ক্যান যাইবেন?'

এখানে সকল হিতাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে যেন একই সুবাদ। বাপ-মা প্রিয়তমার কোনো ফারাক নেই।

কিন্তু সকলের উৎকণ্ঠা নিরসনে জামির তার তিন চার দিন পরেই ভোর রাত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কাউকে কিছু বলে নি সে। অবিশ্যি সে কোথায় যেতে পারে সে সম্পর্কে সকলে নিঃসন্দেহ। আগরতলায় মুক্তিফৌজের শিবির খোলা হয়েছে। লোক মারফত গুজবে গুজবে তা বাঁকাজোলাতে পৌঁছতে বিলম্ব হয় নি।

ফয়েজ মৃধা কয়েকদিন গুম হয়ে রইল। স্ত্রী নাসিমন আহারত্যাগিনী বললেই চলে। কাজেম রীতিমতো বিচলিত। মনের কোণে একটা আশা সে দুহিতার মতই পোষণ করছিল। হঠাৎ সব তছনছ হতে পারে, সে জানত না।

AMARBOI.COM

অতুল বসু গ্রামে থাকলে, জামিরের গতিবিধি একটা খবর সে রাখত। কলেজের ছাত্র গ্রামে মাত্র দুজন। তাই মেলামেশার সহজ সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে। কিন্তু গ্রামে আর হিন্দু পরিবার নাই। বসুরা সকলেই এক হপ্তা না যেতে সীমান্তের দিকে চলে গেছে। আগেকার দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিনে মৃধাই ছিল বসু-পরিবারের সকল অভয়। এবার ফয়েজ এবং জামির বরং তাদের তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিল। কারণ আততায়ী আর বাঙালি নয়। তাই মৃধার মতো মানুষও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল।

বাঁকাজোলের আধিবাসীরা কেউ গ্রাম না ছাড়লেও প্রত্যেকে কোনো নিরাপদ গ্রামের খোঁজ করতে লাগল। সকলেই জেনেছিল, মেঘনার তীরবর্তী যেকোনো এলাকা বিপজ্জনক। স্টিমারে যখন সৈন্য চলাচল শুরু হলো, তখন আর এমন জায়গায় বসবাসের সাহস কারো থাকল না। গ্রাম আরো খালি হয়ে গেল। ফয়েজ মৃধা অন্য এলাকায় চলে যেতে পারত। কিন্তু পুত্রের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর জীবনের প্রতি আর অত দরদ পোষণের সুযোগ কোথায়? কাজেম মৃধা আত্মীয়তার টানে থেকে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বাধা দিলে জামিরালির মা। তার সোমত্ত মেয়ে। এমন বিপজ্জনক জায়গায় বসবাস করা উচিত নয়। মিলিটারি জুলুমের কাহিনীর সঙ্গে সকলেই পরিচিত। অমূলক নয় তার আশঙ্কা।

একদিন হাজেরা মা-বাবার সঙ্গে বাঁকাজোল ছেড়ে চলে গেল আরেক আত্মীয় বাড়িতে। আরো দশ মাইল অভ্যন্তরে।

গ্রামের নাম : কাজির চর।

AMARBOI.COM

৪

চার মাস অতিবাহিত, জামিরের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

ট্রানজিস্টারখানা কত সংবাদ বয়ে আনে। পঞ্চাশ লাখের বেশি রিফিউজি প্রতিবেশী ভারতের বুকে আশ্রিত।

ফয়েজ মৃথার কয়েক বার মনে হয়েছে, তারও বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে সীমান্ত। জোয়ানকালে একদিনেই এই পথ সে হেঁটে শেষ করত। আজ তাগত ফুরিয়েছে। দু'দিনের জায়গায় পাঁচদিন লাগবে।

কিন্তু বুড়ো মানুষের কাছে বাস্তভিটা ত্যাগ অত সহজ নয়। যে যেখানে জন্মগ্রহণ করে এবং বহুদিন থাকে, সে তারি অংশ হয়ে পড়ে। প্রৌঢ় বৃক্ষ আর মানুষ সমান। হঠাৎ ঠাঁই-নাড়া হলে বাঁচা দায়। শিকড়-মেলার একটা প্রেরণা থাকত পুত্রের সঙ্গে জড়িয়ে। সেদিন অন্ধকার। আর বৃদ্ধা স্ত্রী প্রায় শয্যাশায়ী। পথে-ঘাটে বিপদ আছে। তার চেয়ে পূর্বপুরুষের হাড় যেখানে মিশে রয়েছে মাটির সঙ্গে সেখানেই থাকা ভালো। একটা সান্ত্বনা নিয়ে মরা যাবে।

আষাঢ় মাস এসে গেল।

মেঘনা আর দূরবর্তী নদী নয়। কূল ছাপিয়ে তার পানি বাঁকাজোলের বাঁধে আছড়ে পড়ছে। জমিনের মতো জলের প্রসার ভিটা থেকে দেখা যায়। অবসন্ন বৈকালে জীবন-সায়াহ্নে উপনীত দুই প্রাণী চুপচাপ দূরে চোখ রেখে আত্মমগ্নতায় সান্ত্বনা পায়। সংবাদও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু সান্ত্বনা। জন্মভূমির প্রেমে বহু শহীদের নাম এবং তাদের বীরত্বগাথা বেতারে কীর্তিত হয়। নিজের সন্তানের বিসর্জন-চিন্তা মৃধা মনে জায়গা দিতে পারে না। কিন্তু কোথায় যেন আশ্রয়ের যষ্ঠি মেলে, যা হাতে নিয়ে পুনরায় খাড়া হওয়া যায়। অন্তত পরদিনের ভার সইবার মতো ধকল ভেতরে জমা হয়। গ্রামে কোনো জওয়ান ছেলে আর নেই। আরো অনেক বাড়ি এমনই নিরানন্দ শূন্যতার শিকার। দিনে ফয়েজ মৃধা তাদের কাছে গিয়ে বসে, কথাবার্তা বলে। এইভাবে মানসিক ধৈর্যের সন্ধানে ফেরে। কিন্তু রাত্রি বিষম ভয়ঙ্কর। তামাক খাওয়া অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু বুকের হাহাকার তো আগুন। ধোঁয়ায় তা আরো বাড়ার কথা। স্ত্রী নাসিমন প্রায় মৃতা। দিনে সংসারের কাজকর্মে তবু সচল থাকে। সন্ধ্যায় তার কবর হয়ে যায়। নদীর দূরাগত গর্জন কানে এসে যখন পড়ে ফয়েজ মৃধার মনে হয়, সে নিজেও এক লাশ— ভেসে যাচ্ছে কূলকিনারাহীন দরিয়ার মধ্যে। চারিদিকে শুধু হিমশীতলতার স্পর্শ। চৈতন্যের গহন শুধু জানান দিয়ে যায় : নিজেকে তুমি দেখছ দেহান্তর ঘটিয়ে।

একবার রাত্রে মুক্তিফৌজের তিন চারটি ছেলে তার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামেও তখন দালালের আনাগোনা শুরু হয়েছে। অতি সাবধানেই কোথাও আশ্রয় নিতে হয়। তারা আগে থেকে খোঁজ নিয়েই ঠিক ঠিকানামতো এসেছিল। কোনো কিছু খায় নি তারা। শুধু কিছুক্ষণ বিশ্রাম। আবার ভোর-ভোর কারা চলে গিয়েছিল। সেই যুবকেরা কথা দিয়েছিল, তারা জামিরের খোঁজ পাঠাবে। কথায় খেলাফ করে নি যোদ্ধারা। জামিরালি উত্তরবঙ্গের কোনো ফ্রন্টে আছে। তাই এইদিকে আসা সম্ভব হয় নি। তবে যথাসম্ভব তাকে এই এলাকায় বদলির চেষ্টা করতে হবে। কারণ, পিতা-মাতার প্রতি খামখা নিষ্ঠুর হয়ে তো লাভ নেই। এই এলাকায় এখন যথেষ্ট কাজ আছে। বিশেষত তখন পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় দালাল-নিধন শুরু হয়েছিল। যথেষ্ট গুরুত্ব এমন হত্যার। সুতরাং জামিরালি স্বচ্ছন্দে এইসব এলাকায় চলে আসতে পারে।

সেদিন থেকে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল ফয়েজ মৃধা। জীবনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অনেকে। এমন যোদ্ধা দেখার সুযোগ হবে কোনোদিন সে ভাবে নি। বৃদ্ধা নাসিমন-কে ঝোলার মধ্যে থেকে স্টেন্‌গান বের করে একটি ছেলে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল, 'মা, বুক শক্ত করুন। আমারও তো মা আছে। তবে দেশও আমার মা। মায়ের বেইজ্জৎ কোনো সন্তান সইতে পারে নাকি?' বেশ গৌরবর্ণ ঢ্যাঙা চেহারা ছেলেটির। দেখেই বোঝা যায়, কোনো অবস্থাসম্পন্ন ঘরের সন্তান। নাসিমনের বুক আর কোনোদিন এত হাল্কা হয় নি, সেই রাত্রি থেকে যেমন হয়েছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার অতিথিরা কোথায় যেন চলে গেল। একজন প্রয়োজনমতো তাদের সীমান্তে রেখে আসার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু ফয়েজ মৃধা রাজি হয় নি। গ্রামের আর কারো এসব খবর জানা নয়। পয়পয় যোদ্ধারা বারণ করে দিয়েছিল। কারণ, জানাজানি হলে দালালেরা পরে মৃধার উপর চাপ দিতে পারে। নাসিমন বিবি শুধু তাদের ছবি অবসরকালে চোখের উপর ভাসিয়ে রাখে। 'কী সব সোনার চাঁদ, আহা!' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যদিও নিজের সন্তানের কথা তখন বিশেষভাবে তার মনে জেগে ওঠে না। মেঘনার গর্জন তাই শান্তি দিয়ে যায়। জনক-জননীর বুকের ভেতর তা আর উথালপাতাল করে না।

AMARBOI.COM

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফয়েজ মৃধা গ্রামে থেকে ভুল করেছিল। ভিটা আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাইলে কি থাকা যায়? অবিশ্যি একদিক থেকে তার কামনা সফল হয়েছিল। ভিটে আঁকড়েই ছিল তারা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু সেদিন আর বুকে স্পন্দন ছিল না। গোটা দেহ ঝলসে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে অন্তরের আগুনের সঙ্গে এইভাবেই বুঝি পার্থিব আগুনের সাক্ষাৎ ঘটে।

বর্ষার ভরাট নদী। গান্‌বোটের আনাগোনা শুরু হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জলপ্রান্তরে। মুক্তিফৌজ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছিল হাতিয়ারের দিক থেকে। আরো পাঁচ-সাত মাইল উজানে চার দিন আগে হানাদারবাহিনীর একটা গান্‌বোট মুক্তিফৌজ ডুবিয়ে দেয় এমনই নদীতীরবর্তী ঝোপঝাড়-ভরা গ্রামের ভেতর থেকে। তাই আক্রোশে নির্বিচার, গ্রাম পোড়াতে শুরু করেছিল পাকিস্তানের জঙ্গি শয়তানেরা। বাঁকাজোল গ্রাম আর বাদ গেল না। ঘটনাটা ঘটে রাত্রে। হঠাৎ বজ্রঘাতের মতো গুলি নিক্ষেপ এবং আগুন লাগানো শুরু হয়। গান্‌বোট থেকেই এসব করছিল হানাদারবাহিনী। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তেমন ছিল না। তবু অনেকে বেঁচে গিয়েছিল অন্ধকারে এদিক-ওদিক সরে গিয়ে। কিন্তু ফয়েজ মৃধার বাড়ির উপর তারা যেন তাক্ করে আগুন লাগিয়েছিল, গুলি ছুড়েছিল। স্বামী-স্ত্রীকে আর উঠতে হয় নি। হয়ত তারা জানে নি, কী ঘটেছিল এবং কীভাবে ঘটেছিল। গ্রামে নামে নি হানাদারবাহিনী। ভোরের দিকে তারা আরো ভাটির দিকে গান্‌বোট নিয়ে চলে গিয়েছিল। পরদিন সকালে যারা বেঁচে ছিল তারা জড়ো হয়েছিল মৃত জনের সৎকারে। বন্যার দিন। অল্প আধ-হাত মাটি খুঁড়লেই পানি ওঠে। তাই কবর দেওয়ার কথা বাদ দিতে হলো। সব লাশ ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। রাক্ষসী মেঘনা তাদের টেনে নিয়ে গেল নিজের অন্তঃপুরে। একের পর এক। প্রায় সত্তর জন।

আরো একদফা গ্রাম খালি হয়ে গেল।

অনেকের অন্য আশ্রয় নেই। তাই মাটি আঁকড়ে ধরল আবার। অনেকে যুক্তি দিয়ে অন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছল। একজায়গায় বিপদ হয়ে গেলে, সেখানে আবার বিপদাশঙ্কা খুবই কম। সুতরাং বাঁকাজোলে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়। মাঝে মাঝে আগুন চতুর্দিকে এগোতে পারে নি। হয়ত ফাঁকা জায়গা থাকার ফলে বা বৃষ্টির ফলে এত ভেজা যে সহজে আগুন ধরতে চায় না। তাই কিছু ঘর বেঁচে গিয়েছিল। তারই মধ্যে প্রায় যৌথ পরিবারের মতো জীবনযাপন। গ্রাম্য-বিবাদের বিষ অনেক আগেই ধুয়ে গিয়েছিল। তার শেষ ফোঁটা পর্যন্ত এবার মুছে গেল। সহানুভূতি, মমতার এমন ফোয়ারা আর কোনোকালে এই গ্রামে এমন সতেজ ধারায় প্রবাহিত হয় নি। কয়েকজন দালাল পুড়ে মারা যায়। ফলে, নিম-দালালেরা পর্যন্ত তাদের মনিবদের প্রতি সকল শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। তাই এই গ্রাম একদম নিষ্কণ্টক হয়ে যায়। অবিশ্যি সংবাদের গতি-বেগ কত দ্রুত হতে পারে, তা হানাদারবাহিনীর আমলে যারা বাংলাদেশে থেকেছে, তারা বিলক্ষণ জানে। বাঁকাজোলের খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি দেরি লাগে নি।

তাই তো জামিরালি, মুক্তিবাহিনীর সদস্য জামিরালি একদিন এই গ্রামে পাঁচ মাস পরে মা-বাবার খবর নিতে হাজির হয়েছিল। একা নয়। আরো ছজন সঙ্গীসহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারিদিকে জল থৈ-থৈ। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একটা নৌকা বাঁকাজোলের বাঁধে এসে ভিড়েছিল। পোড়া গ্রামের ক্ষত দুরন্ত বর্ষায়ও মুছে যায় নি।

নৌকা দেখে গ্রামের দশ বারো জন বুড়া, আধাবুড়া ছুটে এসেছিল। হয়ত কোনো সংবাদ আছে। কিন্তু সকলে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। পাঁচজন নামল। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। পাঁচজনই জওয়ান। কিন্তু গোঁফ-দাড়ি বোঝাই মুখ।

মুনশীপাড়ার নাসির মুন্‌শীর বয়স ষাটের উর্ধ্বে। চোখে খুব ভালো দেখেন না। আর যারা ছিল তাদের দৃষ্টিশক্তি অটুট। এখানে আগন্তুকগণ সকলেই অপরিচিত।

কিন্তু জামিরালি যখন কদ্‌মবুসির (প্রণাম) জন্য নাসির মুন্‌শীর পায়ের উপর উবুড় হয়ে পড়ল, তখন সে অবাক।

'আমাকে চিনলেন না, চাচা?' ধরা গলা উচ্চারণের পর তার বুকে যেন ঢলে পড়ল এবং আবার বললে আগন্তুক, 'আমি জামিরালি।'

সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাউমাউ করে উঠল, কান্না এবং ফুঁপানিসহ।

জামিরালির সঙ্গীরা চুপচাপ নিজেদের রাইফেলে ভর নিয়ে দাঁড়িয়ে।

বুক থেকে আরেক বুকে, যেন জামিরালিকে নিয়ে লুফালুফি চলছে। নাসির মুন্‌শী একসময় হাঁফ-ফুকার কেঁদে উঠল, 'বা-জান বুড়া বয়সে এসব দ্যাহনের লাইগ্যা পাকিস্তান হৈছিল? তোমার বা-জান—।' বৃদ্ধ তখন জামিরালির গলা জড়িয়ে ধরে আর ছাড়তে চায় না।

কিন্তু জামিরালির চোখ মরুভূমি। স্তব্ধ দাঁড়িয়ে দুই হাত বৃদ্ধের গলায় রেখে বলল, 'কাঁদেন না, চাচা। কাঁদার সময় না। অহন দাদ (প্রতিশোধ) নেওয়ার সময়। চলেন একটু বাড়িটা দেইখ্যা আসি। এরা আমার সাথি। হগ্‌গলে মুক্তিফৌজ। মাঝি দু'জনও মুক্তিফৌজ। বন্দুক ছাইড়া বৈঠা ধরছে।'

রিক্ত গ্রাম। কিন্তু হৃদয়ের ঐশ্বর্যে অঢেল। সকলেই ছুটে এসেছে খবর— শোনামাত্র। আগুন সব গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল। বুকের উত্তাপ তারি খেসারৎ মেটাতে লেলিহান শিখা।

জামিরালির বাড়ি বলতে আর কিছু নেই। স্মৃতির ভার পাছে তাকে দুর্বল করে তোলে, তাই সে ভিটার উপর মাত্র তিন মিনিট থেকে তখনই সরে এল। একসময় বললে সে, 'চাচা, বা-জানের কবর।'

'ইসলামি রাষ্ট্রে হৈছিল, বা-জান। নসিবে কবরও লেখা নাই।' এক বর্ষীয়ান ধরা গলায় উচ্চারণ করলে।

বাঁধের যেখান থেকে তার বাপ-মাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল গ্রামবাসীরা সেখানে তাকে নিয়ে গেল। গোধূলী তখন প্রায় সমাপ্ত। মেঘনার বুক জুড়ে রঙের খেলা চলছে। যদ্দুর চাও, অন্তরের প্রবাহ। ঝাপসা ডিঙি-নৌকা ঘাস-বোঝাই বাড়ি ফিরছে। চালকের হাতের লগি মাঝে মাঝে আকাশের দিকে খাড়া, যেন কিছু ছেদ বা বাধা। নচেৎ দৃষ্টি হারিয়ে যাবে কিনারা খুঁজতে গেলে।

জামিরালি নতমুখ দাঁড়িয়ে রইল।

মুক্তিযোদ্ধা। ভাবপ্রবণতা যেন তার কাছে অশোভন। তাই স্তব্ধ অনড় দাঁড়িয়ে রইল সে। একটু মুখ খুললে না। বর্ষীয়ানরা শুদ্ধ স্তব্ধ।

অতীতের সাক্ষী মেঘনা এখানে সমতল জমিনের উপর মৃদু স্রোতা, পুরাতন কাহিনী এখানে কেবল সরব ছিল।

গ্রামের গলিপথে একবার ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা জেগেছিল জামিরের। কিন্তু শূন্য ভিটের পাশ দিয়ে হাঁটার কথা ভাবতেই পারে না সে। কাজেম মৃধার খবর লোক মুখেই শোনা গেল। যে-এলাকায় তারা গেছে তা বর্তমানে আদৌ নিরাপদ নয়, জামিরের সঙ্গীরা বললে। এক মেজর আছে, কাশেম না হাশেম নাম। তার জুলুমে গোটা এলাকার লোক ত্রস্ত। একদা জমজমাট জনপদ এখন প্রায় জনবিরল। গঞ্জের সঙ্গেই মেজরের আপিস। সেখানে কয়েকটা দালানে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আটক রাখা হয়। বিচারের ব্যবস্থা খুব সহজ। এক হপ্তা পিটে দুরস্ত করার পর ছেড়ে দেওয়া অথবা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে গুলি-করা।

জামিরালির জন্যে গোট গ্রাম রাত্রির কথা ভুলে গিয়েছিল। অতি বৃদ্ধেরা কেবল বিদায় নিয়েছে। নচেৎ সকলেই, যাদের শরীর অত কাবু নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে অনুবর্তী।

জামির বললে, 'প্রতিশোধ নেওয়ার দিন। প্রতিশোধ আমরা নেবই। কোনো ছেলে আমার চিঠি নিয়ে এলে তাকে খোঁজ-খবর দেবেন। আমি এই অঞ্চলে কাজ করব।'

দীপ্ত মুখ জনতার। নয়ীম মুন্‌শী, তার নাতির হাত ধরে ধরে এক রাত্রে আবার উপস্থিত। সে বললে, 'চাচা, দ্যাশ স্বাধীন হোক, আর কিছু চাই না। আল্লা যেন তোমারে সহি-সালামতে (নিরাপদে) রাখে।'

বৃদ্ধ হাত তুললেন আকাশের দিকে। সকলেই প্রাণের আকুলতা দেখানোর জন্য ব্যাগ্র।

একসময়ে রাত্রি দুপুর ঈষৎ ঢলে যাওয়ার পর জামির এবং তার সঙ্গীদের বিদায় নিতে হলো।

জোছনায় চতুর্দিক আবছা।

নৌকার উপর দেখা গেল, সাতটি ছায়ামূর্তি বসে আছে। নৌকা তরতর এগিয়ে চলেছে। তীরে একদঙ্গল মানুষ দাঁড়িয়ে। তারাও ছায়ামূর্তি অপর দলের কাছে। হৃদয়ের যোগসূত্র এইভাবেও প্রতিভাত।

রাত্রে যাতায়াতের সময় কথা বলা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। তাই মুক্তিফৌজবৃন্দ সবাই চুপচাপ বসে ছিল।

জামির নিজের চিন্তায় বুঁদ। কয়েকমাস পূর্বে তার জন্মভূমির কী ছবি ছিল, তা-ই মনেমনে আঁকতে লাগল।

আরো ভাটি-পথে সাত মাইল নেমে এক খালে ঢুকতে হবে। সেই এলাকায় কয়েকটা পুল আছে। কাল সুযোগমতো তা ধ্বংস করাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য।

দুরন্ত বন্যা। মেঘনার বুক। কত দিন এমন পরিবেশে ঘুরে বেড়ানোর কথা মনে হয়েছে জামিরের। আজ পরিবেশ হাতে। কিন্তু অনেক উপাদান খসে গেছে। তাই কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করে না। সীমাহীন অনড়তার মুখে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে সেদিন জামির শুধু দৃষ্টি মেলে রেখেছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

'কাজির চর কতদূর কইতা পারেন?'

পেছন থেকে ডাক। তাই লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকায়। তার হাঁটা থেমে গেছে, বলা বাহুল্য।

জামিরালি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল পথিকের মুখ-বরাবর এবং আবার জিজ্ঞেস করলে, 'কাজির চর কতদূর কইতা পারেন?'

'চার মাইল হৈব।' কিন্তু উল্টা সে আবার প্রশ্ন করে, 'কাজীর চর যাইতা চান ক্যান?'

'আমাগো বাড়ি।'

পথিক এবার জামিরালির অবয়ব বেশ রীতিমতো জরিপ করে। সাধারণ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। পরনে লুঙ্গি। বর্ষার কাদার জন্যে হাঁটু পর্যন্ত তোলা গায়ে আধময়লা হাফশার্ট, আর একটি লুঙ্গি-জড়ানো বুচ্‌কি বগলে। খালি পা।

পরদিন রাত্রির অপারেশান বেশ সফল হয়েছিল। এলাকা জামিরালির একদম অপরিচিত নয়। পরে সঙ্গীদের কাছ থেকে সে বিদায় নিয়েছিল, ক্যাম্প-কমান্ডারের নিকট দু-তিন দিনের ছুটির আবেদনসহ। আবেদন অবশ্যি মৌখিক। অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গীদের দিয়ে এই বেশ নিয়েছিল জামিরালি। পথিকের কৌতূহল অন্য কারণে।

'আপনার বাড়ি কাজির চর?'

'হ।'

'কদ্দিন বাড়ির খবর রাখেন নাই?'

'চার মাস।'

লোকটা তখন মাথা দোলায় এবং বিস্ময়ের জন্য অপেক্ষা প্রকাশ করে। পরে মুখ খোলে সে, 'তাই কাজির চরের কথা কন্। ওহানে যাবেন না?'

'ক্যান?'

'ওহানে কোনো মানুষ নাই।'

'ক্যান।'

'আপনে ছিলেন কুই?'

'ঢাকা।'

'হের তরে কিছু জানেন না।'

'মিলিটারির ভয়ে হগ্‌গলে পালাইছে।'

'গেছে কুই?'

'যার যেখানে সুবিধা। এক হালার পুৎ মেজর আছে, তার জুলুমে এই এলাকা প্রায় ফাঁকা।'

'কোনো লোক নাই?'

'আছে। খুব কম। আর রাজাকারে ওসব এলাকা ভর্তি।'

মনেমনে জামিরালি সিদ্ধান্ত ঠিক করলে তখনই, একবার গিয়ে দেখে আসা যাক।

সঙ্গী লোকটা আবার নিষেধ করলে, 'খোঁজ নেন আশপাশ থেকে, তারপর গাঁয়ে যান।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পর সঙ্গী অন্য পথ ধরলে। জামিরালি এগোতে লাগল।

চেহ্‌রায় সে আর যে-কোনো গ্রাম্য লোকের মতো। সাধারণ সৈনিকের মতো ট্রেনিং নেয় নি যে তার কাঁধের উপর বারবার রাইফেল তোলার দাগ থাকবে। হাঁটুর উপর সামান্য দাগ আছে, তা যে-কোনো মানুষ আছাড় খেলেও হয়। তাই সে নিঃশঙ্ক।

কিন্তু জামিরালি তার পিতার মত ভুল করেছিল।

বর্ষার গ্রাম। মেঘ ঝুলে আছে দিকে দিকে। যেকোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। ভাঙা ছাতা ছিল জামিরালির বগলে। গ্রাম্যতার ছোঁয়াচ দিতে কোনো কসুর করে নি সে।

খুব দ্রুত হাঁটছিল। বিরাট মাঠ এই বর্ষাকালে জনশূন্য। অনেক দূরে একটা বিলের রেখা। একজন লগি ঠেলে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে। পাটাতনের উপর উবু হয়ে বসে আছে কিছু যাত্রী। তা ছাড়া বিরান-বিরান মনে হয় চতুর্দিক। অনেক জমি দুপাশে অনাবাদ পড়ে আছে। নিড়ানির অভাবে ধান এবং ঘাস একত্রে প্রতিযোগিতা-রত এক ক্ষেতের ভেতর। এসব দিকে চোখ পড়ে। কিন্তু কিছুই ভালো ঠেকছিল না জামিরালির কাছে। অন্য সময় কী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত এসব দৃশ্য!

কাজির চর গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে, তখন জামিরালির সামনে পড়ল চারজন জওয়ান ছোকরা, মালকোঁচা-ভঙ্গি লুঙ্গি পরা। হাতে রাইফেল।

জামিরকে দেখেই তারা জিজ্ঞেস করলে, 'যাবেন কুই?'

কাজির চর।'

'আপনার বাড়ি?'

'বাঁকাজোল।'

'এহানে ক্যান?'

'আত্মীয়ের খোঁজ নিতা আইছি।

আপনেরা কে?'

'আমরা রাজাকার।' চারজনে একসঙ্গে জবাব দিয়ে উঠল।

হৃদ্যতা টেনে তুলতে জামিরালি তখন জিজ্ঞেস করলে, 'কহনও আসি নাই। আর কত দূর?'

'একমাইল।'

একজন কেমন রুক্ষভাবে জবাবটা দিল। তা জামিরালির কাছে আদৌ সহজ ঠেকল না।

রাজাকারেরা গ্রামেরই ছেলে। কোনো মার্জিত ছাপ কোথাও নেই। একজন বেশ সন্দেহের দৃষ্টিতে জামিরালির দিকে তাকাচ্ছিল। এতক্ষণে সে একটা কথাও বলে নি।

সে রাইফেলের গোড়ার উপর আঙুল রেখে বললে, 'গোয়েন্দা না তো? মুক্তিফৌজের গোয়েন্দা?'

'না। আমি সাধারণ মানুষ।'

'কে জানে, কোন হালা কী।'

সে চোখ ইশারা করলে অন্যান্য সঙ্গীদের এবং বেশ মিলিটারি কায়দায় হুকুম দিলে, 'সার্চ। হ্যান্ডস আপ।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামিরালি উপস্থিতবুদ্ধি হারায় নি। ইংরেজি অর্ডার মোতাবেক নিজের শিক্ষা অনুযায়ী হাত তুলে ফেলতে পারত। কিন্তু সে নির্বিকার। রাজাকার তিনজন তখন তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে।

অর্ডার-দাতা দেখা যায়, তেতে উঠেছিল, তার হুকুম ঠিকমতো তামিল হয় নি। সে জামিরালির মুখের সামনে আঙুল তুলে বলে, 'কথা শোন না?'

'কী কথা?'

'হ্যান্ডস আপ।'

'মানে—।'

'দুই হাত তোলো।'

জামিরালি তখনই আদেশ পালন করলে। তার বগল-দাবা ছাতা কাদায় পড়ে গেল।

তল্লাশির ফল আশাপ্রদ নয়। সন্দেহজনক তেমন কিছু কেউ পেল না। রাজাকার কম্যান্ডার নিরাশ। তা তার মনঃপূত হয় নি। তাই সে নিজের রাইফেল সঙ্গীদের হাতে দিয়ে খোদ ময়দানে নামলে।

ফল পূর্ববৎ। তবে এবার একটা সামগ্রী বাড়ল। জামিরালির হাফশার্টের ভেতরে দিকেও পকেট ছিল। তার মধ্যে একটা চিরকুট পাওয়া গেল। বোধহয় পাঁচ বাই তিন ইঞ্চি আয়তন কাগজটার। ভেতরে অপটু হাতে মেয়েলী ছাঁচে লেখা :

আমি তোমাকে—।
তুমি কি আমাকে—।
—হাজেরা।

রাজাকার দলপতি যেন পৃথিবী জয় করে ফেলেছে। কাগজটা উঁচিয়ে তুলে বললে, 'পেয়েছি।'

সঙ্গীরা উৎসুক। কোরাস প্রশ্ন, 'কী ব্যাপার?'

দলপতি সঙ্গীদের বলল, 'মজা দ্যাহো।'

তারপর জামিরালির প্রশ্ন।

—এটা কী?

—কিছু না।

—এসব কোড (সংকেত) না?

—কোড কী? জামিরালির প্রশ্ন করে।

—মারের চোটে সব বারাইব।

জামিরালি ভয় পায় না। সহজ গলায় বলে, 'আমাকে একজনে ওটা দিয়েছিল।'

—হেডা কেডা?

—আমার আত্মীয়।

—পীরিত করেন নাকি?

জামিরালির কথাটা এমন নোংরা শোনায় যে সে কোনো জবাব দেয় না।

দলপতির সঙ্গীরা হেসে উঠল এবং একজনে বলল, 'পীরিত করতে গরমেন্ট মানা করে নাই।'

AMARBOI.COM

অন্যদিকে দলপতির স্বর অতি রূঢ়। তবু ভদ্রতা রেখেই সে বলে, 'কিছু ঝুট কইছেন না?'

'না। খোদার কসম।'

এক রাজাকার কিন্তু অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে বিশ্বাসযোগ্য মন্তব্য মারফৎ, 'এই বয়সে এত দাড়ি রাখছে ক্যান?'

দলপতির সওয়ালের জবাব দিলে জামিরালি, 'বাবা-মা ইন্তেকাল (মৃত্যু) করেছে।'

'হতাশ প্রেমিকের দাড়িও হৈতে পারে', একজন রাজাকার ফোড়ন দিলে।

তল্লাশি তেমন লাভজনক নয়। মাত্র দশটি টাকা ছিল সঙ্গে। আর গামছা-লুঙ্গি। রাজাকারদের মধ্যে বোধহয় মদভেদ ঘটতে লাগল। কেউ বললে গোয়েন্দা, কারো মতে প্রেমিক বা মুক্তিফৌজ। তাই জামিরালিকে নিয়ে বেশ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো।

দলপতি আরেকবার ইলেম জাহিরের জন্য বললে, 'হাজেরা অহন কই আছে?'

'কাজির চরে।'

'বয়স কত?'

'পনেরো-ষোলো।'

এক রাজাকার জিহ্বাযোগে আচার-চাটা শব্দ করে হেসে উঠল। কিন্তু তারপরই দেখা যায়, সকলের মুখে কেমন যেন ঘোলাটে ছায়া। চোখে-চোখে ইশারাও খেলে গেল।

জামিরালি কারও চোখ বা মুখের দিকে চেয়ে নেই।

দলপতি শেষে রায় দিলে, 'হালা এসব বহস (তর্ক) করে লাভ নেই। মেজর হাশেমের জিম্মায় দিয়া আসি। যাহা করার হেই করবে।'

জামিরালি তখন একবার ভেবেছিল, স্বরূপ প্রকাশ-মারফৎ সে এদের কাছে আবেদন জানায়। কিন্তু ঘৃণায় সে আর মুখ খুললে না। যা-হয় হোক। দেশ স্বাধীন করার জন্য যেদিন থেকে সে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে, সেদিনই এই প্রাণ আর অত মুল্যবান নয়। জন্তু-জানোয়ারের কাছে করুণাভিক্ষা? অসম্ভব।

আরো দশ মাইল দূরে মেজর হাশেমের হেড কোয়ার্টার। সেখানেই এখন তাদের গন্তব্য।

দলপতির দুজন রাজাকার সঙ্গে দিলে।

ইতিপূর্বে দড়িযোগে জামিরের হাত বাঁধতে তাদের ভুল হয় নি।

৬

মেজর হাশেমের নামে সত্যি এই এলাকার লোক শিউরে উঠত। লোকটা দানব না কোনো রক্তভুক জন্তু, তার হদিস কেউ দিতে অক্ষম। ত্রাস-সৃষ্টি ছিল তার জন্যে বিরাট কৌতুকময় ব্যাপার। বুক থাপড়ে বলত, 'বাঙালিদের কী করে বুটের তলায় রাখতে হয়, তা সে ভালোভাবেই জানে।'এমন অহঙ্কার একদিক থেকে অত জঘন্য নয়। নিজের স্বার্থের কাছে বলি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে গর্ব করত, তার গুলির তেজ বিচিত্র। পেছন থেকে পিঠে গুলি করলে, পেটের নাড়িভুড়ি অন্তত সামনে দশ ফিট ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে উন্মুক্ত রাস্তায় সে হাতে-কলমে প্রমাণ দিত। খেয়ালমাফিক অযথা গুলি খরচের বিরোধী আবার মেজর হাশেম। তাই আসামিদের শুধু শ্বাসনালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেটে সে ছেড়ে দিত এবং আগে থেকে শিকারের দিকে চেয়ে বলত, 'এটা বিশ ফুট এগিয়ে পড়ে যাবে; ওটা তিরিশ ফুট।' এহেন মেজর হাশেম।

কয়েক মাস উত্তরবঙ্গে থাকার ফলে জামিরালি এই ব্যক্তির নাম শোনে নি। তবে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা আরো সামরিক অফিসার বাংলাদেশে ছিল। সুতরাং একজন অপরিচিত থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই ব্যক্তি তাদেরই গঞ্জের মাইল খানেক উত্তরে হেড কোয়ার্টার বানিয়েছে, মাত্র দুদিন আগে শোনা।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে জামিরালি কিন্তু দুর্বলতা দেখায় না। সাধারণ নিরীহ বাঙালি নাগরিক সে। বিচারকের সম্মুখীন হচ্ছে।

এইখানেই ভুল করেছিল জামিরালি। বিচারক কোথায়? আদিম পাশবতার পাঁকসিক্ত এক শ্রেণীর কৃমিকীট বাংলাদেশে পাকিস্তান এবং ইসলামের রক্ষার ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিচারক কোথায়?

মেজর হাশেম সেই চিরকুটের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিলে। মুক্তিফৌজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ত ওইটুকু কাগজে আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে জামির নতুন কোনো কথা বলে নি। পূর্বে রাজাকারদের কাছে কৃত স্বীকারোক্তি এখানেও অবিকল একই ভাবে উধৃত হলো।

বেশ কিছুদিন এই অঞ্চলে তেমন শিকার জোটে নি। মেজর হাশেম বেকার ছিল। তাই এমন নতুন কৌতুকের আমদানিতে উল্লসিত হয়ে উঠল।

পাৎলা, পেটা শরীর। একগুচ্ছ গোঁফে বোঝাই মুখ। চোখ দুটো ঠিক ঢেমনা সাপের মতো। জীবের মতো লেজ ও চোখে যোগাযোগ বড় দৃঢ়। এখানে চোখ এবং হাত। রাজাকারের মুখে শোনামাত্র একলাফে টেবিল ছেড়ে মেজর হাশেম জামিরালির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল?

তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণের পর সে বললে, 'সাচ বাৎ কহো। কুচ নেহি হোগা। আগার ঝুট বোল তো দেখোগে কিয়া হোতা।'

আপিসে এক বাঙালি ছোকরা বসেছিল। বোধহয় কেরানি। সে-ই এখানে সময়ে দোভাষীর কাজ করে।

মেজর। হাজেরা কৌন?

জামির। পাড়া সম্পর্কের বোন।

মেজর। মুক্তিবাহিনী কিয়া জান্‌তা?

জামির। জানি।

মেজর। কিয়া হ্যায় মুক্তিবাহিনী।

জামির। পাকিস্তানি সিপাইয়ের সঙ্গে লড়ে।

মেজর। আচ্ছা, তুমসে তায়াল্লুক (যোগাযোগ) হ্যায়?

জামির। না।

মেজর। ইমান-সে বোলতা।

জামির। হ।

মেজর গিরগিটের মতো থুতনি বার কয়েক উপরে তোলে এবং নিচে নামায় তার পর

পেন্সিল থুতনীতে রেখে কী যেন ভাবলে এবং বললে, 'আচ্ছা তোম যাও।'

জামিরালি ভাবলে, অল্পের উপর দিয়ে গেল। এবার সে মুক্ত।

তখন এক জওয়ান এসে তার হাতে ধরলে। মেজর আবার অন্য দিকে চোখ রেখে আন্‌মনা বললে, 'লে যাও, দেখো—।'

কী দেখবে? জামিরালি এবার কিছু বিচলিত হয়। কী দেখবে? হিন্দু মুসলমানের সমস্যা উঠলে একরকমের দেখাদেখি হয়। কিন্তু তার প্রসঙ্গে আর কী বাকি আছে?

কিন্তু বেশি বিলম্ব হয় নি জামিরালির টের পেতে। এই আপিস থেকে খুব বেশি দূরে নয়, তিন চারটে বাড়ি পরেই এক বিরাট হলের মধ্যে সে প্রবেশমাত্র দুজন সিপাই তাকে এসে স্লামালেকুম বলে সম্বোধন করার পরই এলোপাতাড়ি চড়-কিল-ঘুসি মারতে শুরু করে দিলে। সে একদম হতভম্ব। প্রতিবাদ করবে কী? হত-চৈতন্য ব্যক্তির পক্ষে হিসাব নিকাশ কত দূর এগোয়? জামিরালির আবছা মনে ছিল মেঝের উপর দিয়ে ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে তাকে কোথায় যেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরদিন সকালে আবার হুঁশ এসেছিল তার। সর্বাঙ্গে ব্যথা। হাত তুলতে গিয়ে বেশ কষ্ট পেল সে। চোখের উপর লম্বা চুল পড়েছিল, তা সরিয়ে দিতে সে ঈষৎ শান্তি পায়। জায়গাটা দেখা যাবে এখন। অকুস্থল সম্পর্কে সচেতন হতে পারলে সবসময় একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

জামিরালির চোখ পড়ল আরো দশ বারো জন মেঝের উপর শুয়ে আছে। একজন শুধু উবু বসা। তাকে ভালো করে দেখার জন্যে জামির উঠে বসার চেষ্টা পেলে। দুই হাত যেন অবশ হয়ে গেছে। তবু কোনোরকমে সে-ও বসতে পারলে। এবার অন্য উপবিষ্ট জনের দিকে সে তাকায়। সকাল হয়ে গেছে। মেঝের উপর আলো। এখন নিকটস্থ ব্যক্তিকে দেখতে কোনো অসুবিধা নেই। মাত্র আট-দশ হাতের ব্যবধান মাত্র।

চোখে চোখ পড়া মাত্র লোকটা হি-হি হেসে চিৎকার দিয়ে উঠল, 'কম্বল ধোলাই, কম্বল ধোলাই।' তারপর সে হাততালি দিতে লাগল।

জামিরালির সকল চিন্তা যেন লোপ পেয়ে গেছে। ধীরে ধীরে আত্মস্থ হয় সে। লোকটার মুখের দিকে তাকায় আবার। তারই মতো যুবক। সমস্ত মুখ যেন ছেঁচা বাঁশের মতো। গায়ের চামড়া কোথাও মসৃণ নেই। উদ্ভ্রান্ত চোখ। পরিস্থিতি জামিরের বুঝতে দেরি হলো না। ভ্যালভ্যাল সে তার দিকে চেয়ে থাকে।

যুবক এবার পাছা ঘষড়ে তার দিকে এগিয়ে এল। একদম পাশে। কোনো ভূমিকা না করেই সে জামিরের গায়ে আঙুলের খোঁচা দিলে এবং পরে তালি বাজাতে লাগল। জামিরকে চুপচাপ দেখে আবার জোরে খোঁচা দিলে অর্থাৎ তুমিও বাজাও। খামখা প্রতিবাদ এখানে অবান্তর। জামির হাততালি দিতে গেল। কিন্তু পারলে না। কনুইয়ের নিচে বিষম ব্যথা। তালি দিতে অক্ষম। উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের চোখ তার উপর ঠিক আছে। সে আবার চিৎকার দিয়ে উঠল, 'কম্বল ধোলাই, কম্বল ধোলাই।' তারপর ঘষ্‌ড়ে ঘষ্‌ড়ে নিজের আসনের দিকে এগিয়ে গেল বার কয়েক 'থু-থু' শব্দ করে। কিসের ঘেন্নায়, তা শুধু সে-ই জানে।

জামিরালির বসতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই সে আবার শুয়ে পড়ল। এই স্থানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিবাসীদের একএক করে ঘুম ভাঙছে সে টের পায়। একজন ঘুমের ঘোরে গোঙানি শুরু করেছিল। পাশ থেকে কেউ তার গায়ে হাত এবং নাড়া দিয়ে তা থামালে। আরো ছোট ছোট দু-এক কথার সংলাপ জামিরের কানে আসে। সে ভাবতে লাগল, এই হয়ত জীবনের শেষ কাণ্ড। অনুশোচনা একবার হানা দিয়ে গেল। খামখা এমনভাবে পথিকের বারণ ঠেলে দুঃসাহস দেখানো উচিত হয় নি। মা-বাবার স্মৃতি সে প্রায় মুছে ফেলেছিল। তাদের জন্য অন্য সময় আবার শোক করা যাবে। সারা জীবনে তাদের ছায়াছবি চোখের সামনে বইতে হবে। থাক্ না এখন বুকের গহনে চাপা। কত ছেলে তো শহীদ হয়ে গেছে বিভিন্ন অপারেশনে, কত সঙ্গী। মৃত্যু অত বড় কথা নয়। কিন্তু এই দুঃসহ নির্যাতন! একবার শিউরে উঠল জামির। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা সর্পিল কী যেন বয়ে গেল। কিন্তু কঠিন, দুর্মর সঙ্কল্প তখনই আবার তাকে পেয়ে বসে। যা-আসে আসুক সে এই বর্বরদের কাছে নতিস্বীকার করবে না।

আবার এক ময় ঘুমিয়ে পড়েছিল জামির। ঠেলা পেয়ে চোখ মেলে দেখল সে, তিন জন জওয়ান এবং মেজর হাশেম দাঁড়িয়ে আছে। কী চায় তারা?

কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল, 'এই উঠ্ঠো।'

জামির দেরি করলে না। উঠে বসে তাদের দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু আর কিছু তারা তাকে বললে না। কয়েক কদম এগিয়ে গেল আরেক শিকার সামনে। সে উঠে বসেছে। নগ্ন গা। কিন্তু তার গায়ে দগ্‌গগে ঘা। সেদিকে চোখ পড়তে জামির স্তব্ধ হয়ে গেল। কেমন বোঁটকা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারে। তা হতভাগার গাত্র-নিঃসৃত, সে সহজেই বুঝতে পারে।

তদারক শেষ করে সিপাইরা চলে গেল। জামির ভাবলে, এখন দু-এক জনের সঙ্গে কথা বলে, এখানকার হালচাল জেনে নেওয়া যাক। কিন্তু তখন তার মাথা দপ্‌দপ্ করতে শুরু করেছে। গায়ে কেমন যেন কম্পন। হাত দিয়ে দেখলে যে জ্বর আসছে। তার দাপট আর তাকে বসতে দিলে না। কিন্তু শোয়ামাত্র আবার ঘষ্‌ঘষ্ শব্দ কানে আসে। ঘষ্‌ড়ে-ঘষ্‌ড়ে সেই যুবক তার কাছে আসছে, সকালে যে হাততালি দিয়েছিল। কাছে এসে নিঃশব্দে সে তার কানে কানে ফিসফিস শব্দে বললে : জয় বাংলা। একদম স্বাভাবিক মানুষের মতো। জামিরালি সঙ্গে সঙ্গে 'জয়' শব্দ বলেছে কি যুবক তার মুখে হাত চাপা দিয়ে উচ্চারণ করলে, 'অত জোরে না। খামাখা কষ্ট পেয়ে লাভ কী? এমন করে কথা বলতে দেখলে, শান্ত্রী এসে চাবুক মারবে, আমি ফিরে যাচ্ছি।'

যুবক কী বলেছিল, তা আর কানে যায় নি জামিরের। চতুর্দিক তখন ঘোরপাক খাচ্ছে। বিগত পনর দিন এতটুকু অবসর ছিল না। প্রায় রোজ বিশ ঘণ্টা গোড়ালির উপর খাড়া। নানা রকমের আকর্ষণে শিরা-উপশিরা সদা টান-টান অবস্থা। তার উপর আহার-বিশ্রাম কিছুই নিয়মিত ছিল না। সব একসঙ্গে আজ হানা দিচ্ছে দেহের উপর, মনের উপর। হয়ত এই শেষ লড়াই। তারপর পার্থিব কোনো কিছুর আঘাত সইতে হবে না। একটু উঠতে পারলে কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলা যেত। তারও যো নেই। জ্বরের ঘোর মনের জোরে ঝেড়ে ফেলার জন্যে অনেক চেষ্টা করলে জামির। কিন্তু ইচ্ছা সবসময় শক্তি হয় না। হাত মুঠিয়ে, চোখ বুঁজে সে স্বাভাবিক চিন্তার জন্যে হন্যে হয়ে উঠল কিন্তু দেহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাপমাত্রা যখন একশ তিন তখন জবরদস্তি খাটানোর ক্ষমতাও আর থাকে না।

এই জ্বরের প্রকোপ আরো চব্বিশ ঘণ্টা ছিল। তার মধ্যে একবার সে উঠেছিল এক টুক্‌রো শুক্‌না রুটি আর জল খাওয়ার জন্য। এই ভাবে দুদিন। তবে শাস্ত্রীদের তদারক চলেছে, তা সে বুঝতে পারত। তা স্পষ্ট হতো এক দুবার হাঁক কিংবা ছোট লাথি থেকে।

চতুর্থ দিনে তার আবার ডাক পড়ল মেজর হাশেমের আপিসে। জেরা বেশ কিছুক্ষণ চলে। তার মধ্যে সামরিক অফিসার কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি। তবে চিরকুট থেকে তার মনে বলবৎ হয়েছিল যে এই লোক কোনো না কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত। আরো কয়েকদিন রেখে দেওয়া যাক, তারপর ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত ঠিক হবে।

মেজরের সঙ্গী সেদিন অবিশ্যি শেষে রসিকতা করলে, 'ইয়ে ইস্‌ক (প্রেম) করতা হ্যায় জরুর।'

'হ্যাঁ, ও ভি দেখ্‌না চাহিয়ে।' মেজরের মন্তব্য। জামিরালিকে সে আবার প্রশ্ন করলে, 'তোম ইস্‌ক করতা?'

কোনো জবাব দেয় নি জামিরালি। তা মেজরের কোনো বিরক্তি উপাদান করেনি। বরং হেসে বললে, 'হাজেরা আউরাৎ কা নাম। দেখা যায়েগা তোম কৈসা আসেক (প্রেমিক)?'

মানে-মানে অন্যান্য বন্দিদের কাছে ফেরৎ এসেছিল জামিরালি। কোনো দৈহিক নির্যাতন করে নি কেউ তারপর। অবিশ্যি তেমন কিছু হলে, জ্বরের পর তার প্রাণ সংশয়াপন্ন হতো।

মারের চোটে চলৎশক্তি-রহিত সেই উদ্‌ভ্রান্ত যুবক জামির পৌঁছানোমাত্র তার কাছে পাছা ঘষড়ে-ঘষড়ে এল এবং বললে, 'আপনার নসিব ভালো। এখান থেকে কেউ গেলে আর সহজে ফিরে আসে না।'

বেশ স্বাভাবিক মেজাজ যুবকের। জামিরালি কোনো জবাব না দিয়ে শুয়ে পড়ল। কী হবে আর কোনো কথা শুনে? নেকড়ের গর্তে ঢুকে দৈহিক অসুবিধা নিয়ে মন খারাপ মূর্খেরই মানায়।

৭

দূর থেকে জামিরালি দেখলে একটা ব্যা হাতে মেজর হাশেম কামরার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে আরো তিনজন জওয়ান।

তা-কে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আরো দুইজন জওয়ান পূর্বতন 'হল' থেকে। কী উদ্দেশ্য? তা জামিরালি জানে না। নিঃশব্দে সে সব সহ্য করে যাবে। এই প্রতিজ্ঞা তার মনে দৃঢ় প্রোথিত। তাই ভাবখানা, যা-হয় হোক। আমি আর নিজের উদ্যমের অপচয় করব না।

এই কামরাটি বড়। কিন্তু কারো শোয়ার ঘর বা আপিস নয়। জানালা প্রায় বারো ফুট উপরে।

সে ঢোকা-মাত্র মেজর হাশেম এগিয়ে এলো মুখে হাসি, 'আও, আসেক মিয়া আও আও (প্রেমিক মিয়া এসো, এসো)।'

বিদ্রূপ দিয়ে প্রারম্ভ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকটে আসা-মাত্র মেজর হাশেম উচ্চারণ করে, 'তোম ইস্‌ক (প্রেম) করোগা?'

জামির নিরুত্তর।

মেজর হাশেম ব্যা নাচিয়ে হাসিতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে এবং বলতে থাকে, 'তোম কো ইস্‌ক করনে পড়েগা? (তোমাকে প্রেম করতেই হবে)।'

তারপর সে ব্যা-যোগে জামিরালির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এই কামরায় উত্তর কোণে। জামিরের চোখ সীমাবদ্ধ। কোনোকিছু দেখার ইচ্ছা তার নেই। কিন্তু মেজর যখন বললে, 'দেখো' এবং ব্যা নাচালে তার দৃষ্টি সেদিকে ধাবিত হয়।

উবু বসে আসে সারি সারি, মুখে হাত, দশবারো জন মেয়ে!

'দেখো?' প্রশ্ন মেজরের!'

'হ্যাঁ।' জামিরের জবাব।

'ইস্‌ক করো গে?'

বন্দি তার কোনো জবাব দিলে না। তখন মেজর হাশেম হেসে হেসে আর গড়িয়ে পড়ার উপক্রম। পরে ঈষৎ সংযত বললে, 'সরমাউ মাৎ (লজ্জা পেয়ো না)।'

জামির নিরুত্তর। চোখ মেঝের মধ্যে পোঁতা।

এবার মেজর হাশেম জওয়ানদের হুকুম দিলে, 'চলো, আসিল জেগা পার চলো (আসল জায়গায় চলো)।'

জামিরালি মুখ যে নিচু করেছে, আর সহজে তুলতে চায় না। তার মুখের দিকে চেয়ে মেজর হাশেম নিজে তার থুতনী তুলে বেশ মোলায়েম কণ্ঠে বললে, 'দেখো। আউর পস্‌ন্দ করো। সরমাউ মাৎ।'

অপর দিকে রমণীরাও নতমুখ। মেজর হুকুম দিলে, 'ও লোক কা মুহ উঠাও। জৈসা ইয়ে সব দেখ্ সাকে (যেন সব দেখতে পারে)।'

জওয়ানেরা আদেশ পালনে লেগে গেল। একেক জনের চিবুক তুলে ধরে, যার সামনে হাশেম এবং জামিরালি গিয়ে দাঁড়ায়। স্বয়র সভা আর কী।

মহিলাদের বেশ জীর্ণ। চুল আলুথালু। মুখে যুগযুগান্তরের বিষণ্নতা স্তব্ধ বসে আছে অনড়। সিপায়েরা একেক করে মুখ তুলে যায়। জামিরালি দেখতে বাধ্য। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই তার দিক থেকে। অবিশ্যি জওয়ান এবং মেজর হাশেম জামিরালির গতিবিধি লক্ষ্য রাখে।

বসে আছে উবু, বাংলাদেশের জননীরা যাদের একদিন গর্ভে ধারণ করেছিল, তাদের দুলালি দুহিতারা। পনেরো থেকে পঁচিশ বয়স। মেজর হাশেম মিথ্যে বলে নি।

জওয়ানেরা একটি চিবুক তুলে ধরলে দুই হাতে। স্পষ্ট মুখ দেখা যায়। চোখ বন্ধ। সেদিকে দৃষ্টি পড়া-মাত্র জীমরালি বসে পড়ল এবং নিজের চোখ বন্ধ। হঠাৎ ঘটে যায়, জওয়ানদের হাত থেকে ফস্‌কে। নচেৎ তার অমন বসে পড়ার কথা নয়।

হাজেরার সামনে বসে আছে সে? নিজের সকল বোধ-শক্তি দিয়ে সেদিন জামিরালি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিল। কোনো জবাব পায়নি। এ কী যন্ত্রণার সম্মুখীন! কিন্তু তার মুখ থেকে শুধু একটি চিৎকার বেরিয়েছিল, 'আহ্'! আর কোনো শব্দ ছিল না তারপর।'

মেজর হাশেম উৎসাহিত উচ্চারণ করলে, 'আব সমঝা, ইসিকো পসন্দ হুয়া।'

জওয়ানদের সে হুকুম দিলে, এদের খাড়া দাঁড় করাতে।

চিত্রার্পিতের মতো তারা দুই জন জওয়ানদের ইচ্ছানুযায়ী পেশীসঞ্চালন করছে মাত্র। কারো চোখ জমিন-ছাড়া হয়নি।

মেজর হাশেম হেসে-হেসে বললে, 'নওজওয়ান তোমরা পসন্দ্ ঠিক হ্যায়। আব ইস্‌সে ইসক করো। চিজ বহুৎ উমদা।'

নিরুত্তর জামিরালি। 'কিয়া করোগে নেহি?' রূঢ় কণ্ঠে বললে মেজর হাশেম। এই সময় ককিয়ে উঠল জামিরালি। হঠাৎ দুই হাত জোড়, 'মাফ কিজিয়ে। নেহি, নেহি।'

'করো। ইস্‌ক করো। আওর হামরা সামনে করো', তারপর জামিরালির পিঠে স্নেহের থাপড় দিয়ে বললে বেশ রসিকতার সুরে, 'দেখো, নওজোয়ান। তোম মজা করো। হাম কো ভি থোড়া মজা উঠানে দে। হাম তো স্রেফ দেখ্‌নেওয়ালা।'

'নেহি নেহি মাফ কিজিয়ে।' আবার আর্তনাদ গোটা কক্ষময় মাথা খুঁড়তে লাগল।

'নেহি করো গে?'

'নেহি।'

'তোমকো দাওয়াই দেনে পড়েগা।'

মেজর হাশেম তারপর তিন ইঞ্চি পরিধি-যুক্ত গোল একটা মার্বেলের মতো জিনিস বের করলে এবং কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'দেখো, আওর না করোগা তোইয়ে চিজ তোমরা পিছে ঘুসা দুংগা।' (তোমার পেছনে ঢুকিয়ে দেব।)

'শালা, না-মরদ। ইস্‌কে করনে মাংতা?'

জামিরালি চুপ করে গেল। অন্যপক্ষ তখন মন্তব্য চালায়, 'আখেরি চান্স্। নেই তো মরোগে বেটা।'

জামির আর কোনো কথা বললে না। তেতে উঠল সঙ্গে সঙ্গে মেজর হাশেম, 'জওয়ান, ইয়ে শালেকা পিছে গুল্‌তি ঘুসাও।'

সহকর্মীরা যেন প্রস্তুত থাকে হুকুমের অপেক্ষায়। মেঝের উপর টেনে ফেলে দিয়ে তারা উর্ধ্বতন অফিসারের আদেশ তখনই পালন করলে।

জামিরালি রমণীসুলভ আচরণ বরদাস্ত করতে পারত না। পুরুষ পুরুষ। সে হঠাৎ গোঙানির পর চিৎকার দিয়ে উঠল, আল্লা...আল্লা রবে এবং ছটফট করতে লাগল, যখন দুই পাঞ্জাবি জওয়ান তার হাতে এবং পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে।

অসহায়ের শেষ আশ্রয়স্থল নাকি সৃষ্টিকর্তা। জামিরালির মুখ দিয়ে অদ্ভুত একধরনের গোঙানি বেরুচ্ছিল যার সঙ্গে আল্লা শব্দের যোগাযোগ স্থাপনও কঠিন। যদিও বোঝা যায় ঐ শব্দ—অদ্ভুত এই গোঙানি।

ওদিকে মেজর হাশেম শেষ হুশিয়ার ছাড়লে, 'ইস্‌ক করো গে? আভি। এঁহা?'

'নেহি।'

শেষ শক্তি দিয়ে বোধহয় জামিরালি উচ্চারণ করেছিল আধ ঘণ্টা যোঝাযুঝির পর। তারপর সে নিথর হয়ে গিয়েছিল, একদম চৈতন্যহীন।

এই পরীক্ষা তাকে আরো পর-পর তিন দিন দিতে হয়, ঠিক একইভাবে, এতগুলো সামরিক কর্মচারী এবং মহিলার উপস্থিতিসহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ দিনে কয়েকটি মেয়ে তার কাছে ছুটে এসেছিল, শান্ত্রীদের বারণ শোনে নি। ছুটে এসেছিল বৈইকী হাজেরা পরিচয়হীনই যে থাকতে চেয়েছিল। বাপ-মার মুখে কালি দিয়ে তাদের দুঃখ বাড়িয়ে আর ফায়দা কী?

মেয়েরা অনুরোধ করেছিল, 'ভাই আপনি যে-ই হন, আপনার কষ্ট আর আমরা দেখতে পারছি নে। ওরা যা বলে তা-ই করুন।'

হাজেরা তার কাছে বলেছিল 'আমার ইজ্জতের আর কী আছে। যা কয়, রাজি হন।'

প্রদিদিনই মজা দেখতে আসে বৈকি মেজর হাশেম। তার উপস্থিতি অবধারিত।

চতুর্থ দিনে নির্যাতন আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই জামিরালি সম্মতি দিলে।

যে দেহের জন্যে জামির স্বপ্ন দেখেছিল, বাসর-শয্যার চরম দাবির আনন্দ ও সম্মানের প্রত্যাশায়, যেখানে চিবুক স্পর্শ ছাড়া আর কোনো দুর্বলতা দেখায় নি কোনোদিন, সেই অঙ্গ-প্রস্তত আজ তার বুকের তলায় এইভাবে পড়ে রইল কংক্রিটের শক্ত মেঝের উপর— যখন বন্য উল্লাসে নিকটেই হাততালি-রত মেজর হাশেম এবং তারই ধমকে শরিক অন্যান্য জওয়ানেরা।

৮

'আমি বুঝি। কিন্তু জনমতের দিকটা খেয়াল রাখা উচিত।'

'কী বোঝেন?'

'পাকিস্তান এবং ইসলাম রক্ষায় আমাদের জওয়ানদের শৌর্যবীর্যের তুলনা নেই। তবে— '

'তবে কী?'

'তবে কি জানেন। গাট্টাগোট্টা মরদ। সাত-আট মাস বাড়ি ছাড়া আউরৎ-ছাড়া থাকে কী করে?

'আপনি ব্যাপারটা বোঝেন তা-হলে?'

'তা বুঝি বৈইকী। তবে কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, অবিশ্যি তা-ও স্বাভাবিক। এখন।'

'এখন একটা কিছু করা উচিত। যেন দেশের বাইরে খামকা আমাদের বদনাম না হয়।'

শেষোক্ত বক্তব্য মোসাহেব আলির। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। দেশে পাকিস্তানের বিরোধিতা মারফৎ খামখা গোলযোগ না ঘটে, তারই জন্যে অমন কমিটি প্রথম থেকেই গজিয়ে উঠেছিল মোসাহেবপ্রধান এই এলাকায়। মেজর হাশেমের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শের জন্য এমন যোগাযোগ স্বাভাবিক।

হয়ত আরো দুদিন পরে মোসাহেব এলে ব্যাপারটা অন্য কোনো দিকে মুখ নিতে পারত। কিন্তু তা হয় নি। অপরূপ মজা দেখে দুপুরে মেজর হাশেম আপিসে ফিরেছে। সেদিনই বিকালে মোসাহেব আলি হাজির হয়েছিল।

আরো কথাবার্তা ছিল বৈইকী।

তা এখানে অবান্তর।

শেষ পর্যায়ে মেজর হাশেম বললে, 'মি. আলি আপনি একটা কাজ করেন, দুপুর

AMARBOI.COM

তামাম গ্রামের দু'তিন শ লোক যোগাড় করুন। সবাইকে আমার আপিসে আসার নির্দেশ দিন। পারবেন না?'

'আপনার হুকুম থাকলে অসাধ্য কী আছে?'

'এই ব্যাপারে রাজাকার, আপনার কমিটির মেম্বারদের সাহায্য আশা করি পাবেন। দরকার হলে আমি কিছু জওয়ান পাঠিয়ে দিতে পারি।'

'তা আর দরকার হবে না।'

'থ্যাংকস। টুমরো— ফিন কাল।'

এতক্ষণ ইংরেজিতে সংলাপ চলছিল। শেষে মেজর আবার ভাষা বদলে ফেললে।

পরদিন মেজর হাশেমের আপিসের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ ভরে গিয়েছিল। বিশেষ জরুরি দরকারে ডাক। তাই প্রায় হাজার লোক এসে জুটেছিল। মোসাহেব আলি তো আছেই।

মেজর বারান্দায় দুটো চেয়ার টেবিল আগে থেকে বন্দোবস্ত রেখেছিল। কারণ, মামলার বিচার আছে।

প্রথমে মোসাহেব আলি জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করল। পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে ভারতের হিন্দুগণ এবং নামে মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানের একদল দালাল। পবিত্র ইসলামের যে অপূর্ব বিকাশ পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল, তা ধ্বংস হয়ে যাবে যদি পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যায়... অতএব...ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর মেজর হাশেমের পালা। সে খুব মোলায়েম স্বরে সম্বোধন করলে, পাকিস্তান কে সাচ্চা ইমান্‌দার ভাইয়েরা...তারপর সে বিনয় সহকারে বললে, 'মোসাহেব আলি সাহেব যা বললেন, তারপর আর কিছুই বলার নেই আজ একটি মামলা আপনাদের সামনে হাজির করব। তার রায় আপনারা দেবেন। মামলাটা আপনাদের বলছি। তার আগে কয়েকটি কথা আপনাদের জিজ্ঞেস করব। সবাই হাত তুলে জবাব দেবেন।'

একটু কেশে নিয়ে মেজর, তারপর আবার বলতে লাগল, 'আপনারা সকলে মুসলমান?'

'জি।' সমবেত রব। উত্থিত হস্ত।

'ইসলামের কানুন জানেন?'

'জি।'

মেজর তখন সকলকে হাত নামাতে অনুরোধ জানায় এবং পরে যোগ করে, 'আপনারা জানেন, পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র। এখানে 'জেনা' (ব্যভিচার) হওয়া উচিত নয়। কেউ যদি ব্যভিচার করে তার সাজা কী, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি জানেন এখানে এসে বলুন।' আসুন...।'

লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরা চুটুক-দাড়ি এক কৃশ চেহারা মোল্লা-ধরনের লোক উঠে এলো বারান্দায়। সে বড় সম্মানের সঙ্গে মেজরের সঙ্গে করমর্দন করে নিলে এবং বলতে লাগল, 'ভাইসব, ইসলামি কানুন অনুযায়ী 'জেনা' বা ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। তা পাথর মেরে মারতে পারেন, উভয়কে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে। অথবা অন্য উপায়। আসল কথা, মৃত্যু হচ্ছে ব্যভিচারের শাস্তি। স্লামালেকুম...।'

লোকটা নেমে পড়ল।

সূত্র ধরলে মেজর হাশেম, 'আপ্‌নে শোনা; কিয়া বোলা?' তারপর বললে যে এখনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সামনে ব্যভিচার-লিপ্ত দুই জনকে সে হাজির করছে, তাদের কী শাস্তি হওয়া উচিত যেন এখানকার সমবেত জনসাধারণ তার রায় দিয়ে যান।

অনেক মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কোথায় দুই আসামী? কে-বা তারা?

মেজর হাশেম এক সিপাইকে কানে কানে কি যেন বললে, সে তখনই চলে গেল। কিন্তু ফিরে আসতে পাঁচ মিনিট লাগল না। এবার সে একা নয়। আরো কয়েকজন জওয়ান। তাদের পরিবেষ্টনে বন্দি এক রমণী, ঘোমটায় মুখ ঢাকা। অন্য জন জামিরালি। উভয়ে নতমুখ। কোনো দিকেই তারা তাকাচ্ছে না।

মেজর হাশেমের টেবিলের পাশে আসামিদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। উভয়ের হাতে হ্যান্ডকাফ।

জনতার উদ্দেশ্যে এবার মেজর হাশেমের ভাষণ : "পূর্ব পাকিস্তানের প্রিয় ভায়েরা, এই সেই আসামি দুজন। এদের বন্দি করে আনা হয়েছিল পাকিস্তান-বিরোধী কাজের জন্য। তারই মধ্যে এরা কুকর্মে লিপ্ত হয়। তা আমি সহজে বিশ্বাস করতাম না। কারণ এমন অবস্থায়, এসব ঘটা খুব অস্বাভাবিক। যারা পাকিস্তান চায় না, এমনিতে তারা নীচ। কিন্তু এত নীচ হয়, তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। কয়েদখানার মধ্যেও তাদের কারবার বন্ধ হয় নি। আমি বিশ্বাস করতাম না, যদি আমি তা নিজের চোখে না দেখতাম। আমার সহকর্মীরা পর্যন্ত তার সাক্ষী। এমন বদ্‌কার মরদ বা আওরতের জায়গা পাকিস্তানে হওয়া উচিত নয়। দুনিয়া তা জানে। আমরা দেখিয়ে দিতে চাই, পাকিস্তানে আওরতের ইজ্জাৎ অত সস্তা নয়। এখন আপনারা রায় দিন— ।

জামিরালি যে মাথা নিচু করেছিল আর তোলে নি। মেজরের সম্ভাষণ শেষে জনতার ভেতর একটা আলোড়ন পড়ল। কিন্তু সকলে চুপচাপ। মুখ খুলে কেউ কিছু বললে না। হাজেরা ঘোমটার মধ্যে একবার ফুঁপিয়ে উঠেছিল মাত্র।

মেজর হাশেম একটু বিব্রত বোধ করে। সে একবার মোসাহেব আলির দিকে এবং আবার জনতার দিকে তাকায়।

সমস্ত জনতা যেন একটা অনড় স্তূপ।

এই অস্বোয়াস্তি ভাঙলে মোসাহেব আলি জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা মারফৎ। পাকিস্তান সরকার জনগণের সরকার। সুতরাং জনগণের রায় দেওয়া উচিত।

কিন্তু জনতা পূর্বের মতোই স্থির, অনড়।

মেজর হাশেম তখন বললে, 'আমি জানি, কেন আপনারা চুপ করে আছেন। অপ্রীতিকর রায় কেউ দিতে চায় না। কিন্তু আমি সরকারের গোলাম নওকর। আমার উপর এমন অপ্রীতিকর কাজ বর্তায়। আমি এদের মৃত্যুদণ্ড দিলাম।'

জনতার দিক যেন বিশাল বরফের পাহাড়। মেজর হাশেম আরো বললে, "ব্যভিচার চলতে দিলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর ভবিষ্যতে কেউ যেন এমন 'জেনা'-র কাজ না করে, তার জন্যই এই শাস্তি।...পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

জনতা এবার যে-যার পথ দেখার জন্যে আলোড়িত, তখনই মেজর হাশেম আবার সম্বোধন করলে, 'আরেকটু সবুর করুন। আমার মত নয়— ইসলামি মতে এদের পাথর মেরে ধ্বংস করা উচিত। কিন্তু তা কেমন অশোভন দেখায়। আমি রায় দিচ্ছি,

এদের মেঘনা নদীতে ফেলে দেওয়া হোক। বেশি দূর নয় এই আধ মাইল। ইচ্ছা করলে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন।"

কিন্তু জনতার কোনো আগ্রহ ছিল না সেই দৃশ্য দেখার জন্যে। যে-যার পথে সকলে সভা ভঙ্গ করে রওয়ানা দিল।

৯

শেষ পর্ব সেই দিনই গোধূলি-লগ্নে অনুষ্ঠিত হলো।

চোখে ফেটি বেঁধে আসামিদের তারা একটা জিপে চড়িয়ে নদীর ধারে এনেছিল।

মেজর হাশেম, আরো একজন পাঞ্জাবি অফিসার এবং আট দশজন জওয়ান আসামিদের সহযাত্রী। তার রায় যেন যথাযথ পালিত হয়, তাই কোনো গাফিলাতি দেখায় নি সে।

সামরিক কর্মচারীদের ব্যাপার একান্তভাবে। কিন্তু দুইজন বেসামরিক ব্যক্তির তবু প্রয়োজন হয়েছিল। আসামি যুগল তো আছেই। আর দুই জন নৌকার মাঝি-মাল্লা।

ইন্তেজাম একদম পাকা।

এত সিপাইদের থেকে আসামিদের পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দু'টি পাথর যোগাড় করা হয়েছিল। আট দশ সের ভারী। মিলিটারি গুদামে মোটা তারের অভাব ছিল না। জওয়ানেরা এসব যথাযথভাবে মজুদ, সঙ্গে এনেছিল।

মাঝি-মাল্লার প্রয়োজন নদী-তট থেকে একটু দূরে যাওয়ার জন্যে।

মাঝামাঝি সাইজের নৌকা।

তারি মধ্যে আরোহী মেজর হাশেম, আরো চারজন জওয়ান এবং দুই আসামি যাদের চোখ বাঁধা। তার এবং পাথর পলুয়ে।

মাঝি কিছুদূর নৌকা বেয়ে গেলে, মেজর হুকুম দিলে, ঠাইরো।

স্রোতে নৌকা এদিক ওদিক হয়, তবু মাঝি যথাসাধ্য তা অল্প বেষ্টনের মধ্যে রাখার চেষ্টা পায়।

মেজর তারপর সঙ্গীদের চোখ ইশারা করলে।

চারজন জওয়ান আসামিদের গলায় যথারীতি পাথর দুটো ঝুলিয়ে দিলে। হাজেরা, জামিরালি দুই জনে নীরব। হাত চোখ বাঁধা। পাথরের প্রতিমা উভয়ে।

পাটাতনের কিনারায় তাদের দাঁড় করানো হলো।

মাথার উপর গোধূলির আকাশ।

জলকল্লোল অব্যাহত রয়েছে দিকে দিকে।

মেজর হাশেম ইঙ্গিত দিলে, শেষ ইঙ্গিত।

এক ধাক্কায় দুই আসামি পাটাতনের কিনারায় চ্যুত হলো। তখনই সমস্বরে হাজেরা, জামিরালি চিৎকার দিয়ে উঠল : জয় বাংলা। জয়...।

অসম্পূর্ণ কথা। কয়েক সেকেন্ড মাত্র।

তারপর প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল রাক্ষুসী মেঘনার গর্জন-ক্ষুব্ধ অতলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতঙ্গ পিঞ্জর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১
আধা-গ্রাম, আধা-শহর নয়, নিছক মফস্বল এলাকা। ঘোড়া-টানা টাংগা আছে।

বাংলাদেশের অখ্যাত জরিপ-বহির্ভূত এই এলাকার অন্য পরিচয় আপাতত অবান্তর।

একদম নরকের কুণ্ড নেমেছিল গোটা গৌড়গ্রাম অঞ্চলে। এমনই কাঠফাটা রোদ্দুর। সকাল আটটার পর আর সূর্যের চাঁটি সামলানো দায়। সর্দিগর্মিতে বেশ কিছু লোক মারা গেল। সামান্য বেলা উঠলে রাস্তায় লোকজন কমতে থাকে। কিন্তু সবাই তো ঘরে বসে দিন কাটাতে পারে না। পেটের ধান্দা আছে। তা বাদ দিলেও বাজার-হাট আছে। ছ-মাসের রসদ বেঁধে কেউ সংসার চালায় না। তলা-ফাঁক চাষিমজুরের সংখ্যা অনেক। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তাদের জগৎ অন্ধকার।

অসহ্য গরম। ত্রাহি-রব ছাড়তে লাগল গোটা গ্রাম।

রহিম গাড়োয়ান প্যাসেঞ্জার আর মাল নিয়ে গিয়েছিল ভিন গাঁয়ে পাঁচদিন পূর্বে। এলাকায় ঢুকে সে অস্থির হয়ে ওঠে। বলদ জোড়া এক পা এগোতে নারাজ, হাজার চাবুকের চোট সত্ত্বেও। গাছতলায় সে শেষ বলদ দুটো খুলে দিয়ে জিরোতে লেগেছিল। কিন্তু ছায়া পর্যন্ত গরম। চারপাশে তাতা মাটি, ছায়া অসহায়। নির্বায় সমুদ্রে চতুর্দিক খাবি খাচ্ছিল। বুড়ো গাড়োয়ান আধঘণ্টার মধ্যে নিজে খাবি খেতে লাগল। আরেক গাড়োয়ান সেখানে পৌঁছায়। সঙ্গে জলের কলশ। তাই কোনোরকমে সন্ধ্যার দিকে তাপের প্রকোপ কমতে রহিম বাড়ি রওয়ানা দেয়। কিন্তু বেচারা ভিটের সীমানায় এসে সর্দিগর্মিতে মারা গেল। কেউ মুখে পানি দেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পায় নি। ওর জোয়ান ছেলে গফুর লাশের পাশে বসে ছিল একদম হাউড়ের মতো। গরমে তারও মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। পুকুরে স্নান করা দায়। জল তেতে থাকে। তার চোটে সব মাছ ভেসে উঠেছিল। গফুর বাপের জন্যে চোখের জল ফেলে নি। রাতারাতি লাশ দাফন হয়ে যায়। দিনে কে কবর খুঁড়বে? গফুরের বোনদের বিয়ে হয়েছে চার-পাঁচ মাইল দূর গ্রামে। এমন কী দূর? খবর দেওয়া যেত। জন্মের মতো বাপের মরা-মুখ একবার দেখে নেবে। কিন্তু অত সামাজিকতা করতে গেলে লাশ পচে উঠবে। আর খবর দিতে যাবে কে? সকলে হাল্লাক হয়ে আছে। রাত্রির ছায়ায় তবু কিছুটা আরাম। হেঁটে পরদিনের জন্য কাহিল হওয়ার বান্দা কম। লড়াই চলছে তপ্ত দাপটের বিরুদ্ধে। তাগদ জমা রাখতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যে। খামখা নষ্ট করা চলে না। বোনেদের খবর না দিয়ে ক্ষতি কতটুকু? মেয়েছেলে ইনিয়ে-বিনিয়ে ঘ্যানঘ্যান কিছু চোখের জল ফেলত। এই তো? তা ঘরে

বসেও ফেলতে পারবে। শোক আর তাপে তাদের অসুখ বাধত বৈইকী। তখন একটা বুড়োর দায়ে কত হাঙ্গামা। গফুরের বোনেদের বাচ্চাকাচ্চা আছে। মায়ের অসুখ মানে তাদেরও দুর্দশা। ভাইকে হয়ত সারাজীবন বোনদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাদের অবোধ মুখ গফুরকে কয়েকবার অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু নিরুপায়। লাশ নিয়ে বসে থাকা চলে না। মসজিদের ইমাম থাকে একমাইল দূরে। অন্তিমের ক্রিয়াচার কে করবে? একে আত্মা (রুহ্) একফোঁটা পানি পানি মরণের অক্তে, তার উপর দেহের পচন। রাতারাতি কাজ শেষ করাই উচিত ছিল। দুঃখ তো নানাদিকে। একটা মরা মানুষ না হয় অ-দেখাই থাকল।

গোটা এলাকার সমস্যা এইভাবে নতুন নতুন আকারে উপস্থিত হয়েছিল।

যারা ঘরে বসে ছায়া ভোগ করত, তাদেরও প্রাণ আইঢাই। হাতপাখা কতক্ষণ নাড়া যায়? টানা-পাখা আরো গরম বাতাস ঝেঁটিয়ে আনে। লড়াইয়ের আঁচ কোথাও কম নয়। গড়পড়তা স্বস্তির নিশান কোথাও কোথাও উড়তে পারে।

হঠাৎ বাজারে মাছ সস্তা হয়ে গিয়েছিল। বিলে পুকুরে খাবি খেতে খেতে ভেসে উঠছে, মরে যাচ্ছে আবার ভাসছে। জেলেদের কল্যাণে হঠাৎ মাছ কেনার ধুম পড়ে যায়। কিন্তু গেরস্থের ভুল পরক্ষণেই ধরা পড়েছিল। মাছ জ্বাল দিয়ে না রাখলে নষ্ট। তখন আবার আগুনের সামনাসামনি। একে গোটা ভূখণ্ড আগুন, তার উপর আবার আগুনের কিনারায়। অত গরমে হজমের সমস্যা আছে। দু-একটা ভেদবমি হতে মৎস্য আহার সিকেয় উঠল। একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় কত রকম আপদবিপদ এবং লেজুড়ে-লেজুড়ে নানা হাঙ্গামা, অসোয়াস্তি ডেকে আনতে পারে, তা মজকুর এলাকায় থাকলে আপনার বোধগম্য হতো। কেয়ামত তর্ক আর ভুলতেন না।

গরমে নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত দায় হয়ে পড়েছিল। হাঁসফাঁস দিনগুজরান সুখের নয়। দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে যায়। এই অবস্থায় ভেসে-ভেসে সোলার ছিপির মতো এদিক-ওদিক করা চলে। কিন্তু মাথার উপর দায়িত্ব থাকলে যতই ভাসমান থাক না কেন, কোথাও থই মিলবে— এমন আশা দুরূহ।

প্রৌঢ় কবি মোহাম্মদ আলী এবার কাব্যসাধনার নিভৃতি খুঁজে এই এলাকায় এক আত্মীয়ের অতিথি-রূপে এসেছিল। প্রকৃতির রাজ্য এখানে অঢেল। মন নানা রসদ খুঁজে পাবে। পাখির ডাক, বাতাসের সরসরানি, ঝিঁঝির চাঁচানি-ভেজা নিসর্গের আবেদন চিরন্তন। আলীর সেই সুবাদেই আগমন। কিন্তু গরমের চোটে ঘা খেয়ে গেল ভদ্রলোক। ভেবেছিল, পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাবে আর কোনো তপ্ততাশূন্য রাজ্যে যেখানে অবসর-মৌতাতে তার কবিতার ভাণ্ডার ভরে উঠবে। কিন্তু আটক পড়ে গেল। কোনো গাড়োয়ান এলাকার বাইরে যেতে নারাজ। রহিম গাড়োয়ানের অপমৃত্যুর নজির তো চোখের সামনে রয়েছে। মোহাম্মদ আলী তখন ভাবলে, ভাবের রাজ্যে ডুব দিয়ে এই দুর্বিপাক থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। জোর কাব্যসাধনার মন দিলে সে। কবির আত্মীয়বর্গ কিছু সংগতিপন্ন। টানা-পাখা আছে বাড়িতে। তার তলায় বসে আলী তন্ময়তার সবক নিয়েছিল। কিন্তু গা ঘেমে উঠতে লাগল। তখন মগজকে বিশেষ পর্যায়ে রেখে ভাবসমুদ্রে অবগাহন। কিন্তু মগজও ঘেমে উঠেছিল একদিনেই। তখন কবি ভেবেছিল, যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই বিন্দুর কোণের তুলনা থেকে কোনো বস্তুর উচ্চতা জানা যায়, শীতলতা এবং তপ্ততা থেকে সে তেমনি চিন্তার উচ্চতায় পৌঁছবে। কিন্তু মনে কিছুই স্থির থাকে না, জমা রাখা তাই দায়। প্রেম একধরনের পাথেয়। এমন পাথেয় পেলেও বিহিত হতো। কিন্তু বাড়িতে সব বিবাহিতাজন। সুতরাং ক্ষেত্র অনুর্বর। মোহাম্মদ আলী তাই ভেবেছিল, মানসিকতাসর্বস্ব প্রেমের সন্ধান করা যেতে পারে। কিন্তু মাতৃবৎ পরদারেযু। চিরাচরিত বিবেকের ধমকানি খেয়ে কবি চুপ করে গিয়েছিল। প্রকৃতিও বিরূপ। তার তামাটে খাঁ-খাঁ-মূর্তি এমন ভীষণতার প্রতীক আর পূর্বে সে দেখে নি। চিন্তার রণপা-যোগেই সব সমস্যা ডিঙিয়ে যাওয়া যায়। হঠাৎ এই এলাকা বেশ খটকা তুলেছিল। কদিনে নিজের উপর বিরক্তিতে ফেটে পড়ছিল কবি। বদহজমের ফলে চোঁয়া ঢেঁকুরে-ঢেঁকুরে তার মনে হয়েছিল, হয়ত সে পাগলামির দিকে এগোচ্ছে। মন ঝালাপালা, সেখানে নানা ডালপালা। এসব সাফ করা দরকার। নামাজ পড়লে কিছু হতে পারে। ধ্যানস্থ মৌনের দ্বারা পেটের ভুড়ভুড়ি, মনের ভুড়ভুড়ি সে দূর করবে। কিন্তু নামাজের ক্রিয়াচারে দুবার ওঠ্-বস্ করতে গিয়েই মাথা দপদপিয়ে উঠল। অসহ্য গরম আল্লার নাম নিতেও বাধা দিচ্ছে। প্রকৃতির জন্যে মনের নাগাল দূরধিগম্য রয়ে যাচ্ছিল। সংবেদনশীল এমন ক্ষেত্রে কোনো বিকৃতির দিকে ঝুঁকতে পারে। কিন্তু মোহাম্মদ আলী হুঁশিয়ার ব্যক্তি। পৈতৃকসূত্রে পাওয়া তার বিবেব আরেক কালের কাছে বন্ধক থাকে। সেখানে কোনো জটিলতা নেই। তার উপর মোহাম্মদ আলীর এমন অগাধ আস্থা যে মানুষ-যাচাইয়ের সে আর কিছু দেখে না। সে দেখে, ওই লোকটার তার মতো অবিকল বিবেক আছে কি না। অর্থাৎ সে যা বিশ্বাস করে, সংশ্লিষ্ট জনের বিশ্বাস মিলিয়ে দেখলে এদিক-ওদিক না হয়। দুনিয়া বৈচিত্র্যের সমুদ্র, পরিবর্তনের হিমবাহ। এসব প্রশ্ন তোলা নিষিদ্ধ। শুধু ছকে ছকে মেলাও। দেখে নাও। একটু এদিক-ওদিক হলে বাতিল। যদি সব সাদৃশ্য পাও মাপে মাপে, খালি কোনায় একটু গরমিল, তখন কবির রায় এক চিৎকারে : বাতিল। মোহাম্মদ আলীর তাই বন্ধু নেই, স্তাবক প্রচুর। তাদেরই ভালোবাসতে হয় স্নেহ-করুণা মিশিয়ে। ওই বিবেকের মাপকাঠি দিয়েই মজ্‌কুর কবি নিসর্গ দর্শন করে। দুদ্দাড়-বেড়ে-প্রবাহিত মেঘে তার মন উল্লাসিত বা ভাবমুখী হয় না। শান্ত জলধর তার সঙ্গী। এবং শান্ত মেঘে যদি দেবালয় কি তীর্থ গড়ে ওঠে— অন্যান্য আরো কিছু গড়ে উঠতে পারে— তখন মোহাম্মদ আলী হারিয়ে যায়, অসীমের ডাক শুনতে পায়। এক সমালোচক সম্প্রতি ঠাট্টা করে লিখেছিল, কবির অনন্ত মাত্র তিন-চার মাইলের মধ্যে ঠেকে যায়। মোহাম্মদ আলী গোস্‌সায় মন্তব্য করেছিল, শুয়ার-কা-বাচ্চা। কবি নিজের ইমানে এমনই অটল। দুনিয়ার উপর দিয়ে তাণ্ডব চলে যাক, ধ্বংস-মহামারী ছুটে আসুক, সে তখনো ছুটবে ছাঁচ হাতে। মানসিক রিরংসায় যে-ভুগছে তার কাছে সুন্দরী রমণী এগিয়ে ধরা বৃথা। মোহাম্মদ আলীর ধ্যান-সীমানা জ্ঞান-সীমানা এড়িয়ে চলে। গরমের চাপে কবি এবার ভয়ানক সিদ্ধ হচ্ছিল। ভিয়েন সিদ্ধির নয়, ঘামের। কবির মেজাজ খিঁচড়ানো তাই বেড়ে গিয়েছিল। অবিশ্যি অপরিচিত জায়গা, তাই ভেতরে সব চেপে রাখতে হয়। তাই মোহাম্মদ আলীর বর্তমান ধ্যান : "হেথা, নয়। অন্যত্র— অন্যত্র।"

কিন্তু কে তাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে?

এই এলাকার চতুর্দিকে বেবহা তেপান্তর মাঠ। এখন বলা যায়, মরুভূমি যেভাবে তেতে থাকে, কারো পার হতে সাহস হয় না। তার চেয়ে যেখানেই আছ, সেখানেই থাকো। মরলেও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে দরদের অভ্যন্তরে পৃথিবী ত্যাগ করতে পারবে। অপঘাত মৃত্যু কারো কাম্য নয়।

মোহাম্মদ আলী অসীমের দর্গায় অনেক মানত দিয়েছিল। হোক তা তৃণশূন্য সবুজের চিহ্নহীন যোজন-যোজন বিস্তার মাঠ। বর্তমানে এলাকার মাঠের দিকে সে আর চোখ মেলার চেষ্টা করে না। গা দিয়ে ঝরা ঘাম মুছবে, না, চিন্তার ঘোড়া দৌড়বে। গা তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ঘামাচি বেরুচ্ছে প্রতিদিন শত শত। যেন মুহূর্তে মুহূর্তে কদম্ব ফুলের প্রথম স্তর। ভাবে নাকি এরকম দেখা দেয়। এখানে তা ঘামাচি এবং গায়ে হাত দিলে টের পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ আলী কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা স্থৈর্য বজায় রেখেছিল। কেউ উপদেশের জন্যে এলে বলে দিত— দুনিয়ার অনেক রহস্য ঘোরাফেরা-রত। হঠাৎ গ্রীষ্মঋতুর যদি এমন মতিগতি খারাপ হয়ে যায়, সাধারণ মানুষ কিছু করতে পারে না। বিশ্বের সৃষ্টিকার বলতে পারে, তাঁর মহামহিম ইচ্ছা কোথায় নিহিত। হয়ত সকল শারীরিক কষ্টের পশ্চাতে অমোঘ মঙ্গলময় কিছু আছে। একদিন গাঁয়ের মাদবর আরো লোকজনসহ কবির নিকট সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। অখ্যাত জায়গায় খ্যাতনামা কবির আগমন কাকচিলও জেনে ফেলে। গাঁয়ের লোকে মোহাম্মদ আলীর আত্মীয়দের কাছ থেকে জেনেছিল, তাদের গ্রামই হবে কাব্যসাধনার পীঠভূমি। স্থানমাহাত্ম্যে বহু অখ্যাত জায়গা দেশের বিশাল ম্যাপের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় শোভা পায় তাদের গ্রাম যদি কোনো কবিকে অনুপ্রাণিত করে তোলে, তা সকলের গর্বের বিষয় বইকী। গ্রামাঞ্চলে পরিচয়-পত্তনের প্রয়োজন হয় না। নমস্কার কি সালামালেকুম দিয়ে শুরু হয়ে যায়। তারপর মানুষে মানুষে অপরিচয়ের বেড়া উধাও। কে কী করে, কত রোজগার, উপরি আছে কি না— এমনতর বাহ্য-গুহ্য সংবাদ স্বচ্ছন্দে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এসে যায়। তখন কেউ অপরাধ গায়ে মাখে না। সেদিন কবিকে দেখে সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। রাশভারী লোক নয়। পাতলা চিবুক। তার উপর কয়েক গাছি মাত্র দাড়ি। কিন্তু চোখ তীব্র জ্যোতিষ্মান। সমীহা এসে যায়। তা ছাড়া, গ্রামে চাপরাসিই সাহেব বা বাবু। এটুকু মনে রাখলেই পরিবেশ হাতের মুঠোয়। মাদবরের আক্কেল পর্যন্ত ঘুলিয়ে গিয়েছিল কবিসন্দর্শনে। কিন্তু সেদিন কেউ কাব্য শুনতে আসে নি। এই গ্রামেও কবি নয় কবিয়াল ছিল। শ্রীবাস বাগদী এবং রউফ মণ্ডল। দুজনেই পরলোকে। আজ তাঁরা বেঁচে থাকলে হয়ত এত গরমেও শীতলতা পরিবেশনে গান বেঁধে বসত। মনেমনে আফসোস করেছিল মাদবর দুই আত্মার জন্যে, জীবন্ত কবি যদিও সম্মুখে। দুই হাত প্রায়-জোড়, মাথা নিচু করে গ্রামের প্রধান প্রথমে উচ্চারণ করেছিল, — হুজুর। আপনের কাছে আইলাম। আর মুখ দিয়ে কথা সরে নি। কবি এগিয়ে এসেছিল মাভৈঃ স্বরে— কী চান, ভাইসব। এমন স্নেহময় আহ্বান। উপস্থিত গ্রামবাসী আরো ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারা মূর্খ মানুষ তবু সহজে এমন সম্পর্ক কজনে ছাড়তে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই পক্ষে বেশ অপেক্ষমান নীরবতার পর মাদবরই প্রথমে মুখ খুলেছিল— হুজুর! মোহাম্মদ আলী বাধা দিয়েছিল— আমাকে হুজুর বলে ডাকবেন না। আমরা ভাই-ভাই। মহৎ মানুষ মাটিতে মিশে গেলে মাদবর কেন, অনেকেই জবাব দিত— আপনে বড়। আপনেরে হুজুর বলতে দোষ নাই। আমরা আইছি— আর তো বাঁচিনে। ফসল মাঠে শুখায়, গতর চুলার লাহান জ্বলতেছে। কোনো উপায় বাৎলান, হুজুর। মোহাম্মদ আলী সেদিন আরো মাটিতে শুয়ে জবাব দিয়েছিল— ভাইসব,আমিও আপনাদের মতো মানুষ। কী উপায় বাৎলাব? প্রকৃতির খেয়াল। কী বলব আপনাদের?

— হুজুর, এমন খেয়াল হৈল ক্যান? আমার বাপে কহনও এমন গরম দ্যাহে নাই।

— গজব (অভিশাপ), ভাইসব গজব। একেই বলে গজব।

কবির উত্তর "গজব, গজব", কথাটা উপস্থিত সকলের ঠোঁটে ধ্বনিত হয়েছিল,অস্পষ্ট। গরমে ঘিলু তাতা। কথা বলার ইচ্ছা কারো ছিল না। কবির হাত-পাখা চলছিল। বেচারাকে তকলিফ দেওয়া অনুচিত। তাই দল বেঁধে গ্রামবাসীরা উঠে পড়েছিল অবিশ্যি শিষ্টাচার ষোলোআনা পূর্ণ রেখে। কিন্তু এই ভিটে পার হওয়ার পরই ডোবা-ঘেরা একটা গাছ-গাছলির ছায়ায়, যেখানে পূর্বে সবসময় বনজ শীতলতা মজুদ থাকত, বর্তমানে ঈষৎ বর্তমান— এমন জায়গায় মাদবর হেসে উঠেছিল। ব্যঙ্গ-করুণ হাসি। হয়ত মনের স্বতঃস্ফূর্ততা।

— চাচা হাসেন ক্যান?

সঙ্গী গফুর গাড়োয়ান তৃষ্ণার্ত তকলিফের মধ্যেও তাগদ সঞ্চয়ের পর জিজ্ঞেস করেছিল :

— হাসুম না? হালা গেলাম কবির নজ্‌দিগ। হে যা কইল, হে তো মসজিদের ইমাম-সাবও কইবার পারে। তয় কবির নিকট গেলাম ক্যান?

— ঠিগ্ কইছেন, চাচা।

— ঠিগ্ কইছি না। গরমে হের মাথা ঠিগ্ নাও থাকার পারে।

— টানা পাংখার তলে ঘুমায়। নেপথ্যে মন্তব্য।

— এ হালা ইমাম হৈতে পারে।

—না, মিয়াবাড়ির মেহ্‌মান। হেরা কয় কবি।

— চাচা, ফালসা কথা কইয়া কোনো লাভ নাই। চলেন ইমাম-সাব কী কয় দেহি।

তখন সকালের আচ্ছান্নতা কাটে নি। বেলা জোর আটটা। মসজিদের ইমাম বাৎলেছিলেন, মাঠে বৃষ্টির প্রার্থনাসূচক নামাজের ব্যবস্থা হোক। অবিশ্যি খুব ভোরে, রাত থাকতে। দিনে মাঠ তাতা কড়া। পরদিন গোটা এলাকায় মানুষ মাঠে ভেঙে পড়েছিল। মেয়েরা পর্যন্ত উঠানে জমায়েত, ধর্ম-নির্বিশেষে, আকাশের দিকে প্রার্থনার ভঙ্গি-উত্থিত দুই হাত— মেঘ দে— আল্লা পানি দে—।

ভয়াল পরিস্থিতি চতুর্দিকে। সন্ধ্যায় গাছে গাছে পাখির কিচিমিচির আর শোনা যেত না। অন্য এলাকায় বিবাগী বা আর কিছু। গোটা এলাকা যেন নির্বিহঙ্গ, নির্বৃক্ষ। সবুজ পাতা ঝলসে-ঝলসে ঝরে পড়ছিল শব্দের ঝঞ্ঝনা তুলে। কারণ, শুকনা মাটি একদম খটখটে। আল্‌তো বিচরণ ভুলে গিয়েছিল পাতার দঙ্গল।

AMARBOI.COM

আর্ত মানুষ প্রায়ই হাত তুলতে লাগল আকাশের দিকে ফরিয়াদ ছুড়ে।

শোকের মাতম এবং মোনাজাত (প্রার্থনা) হয়ত পৌছেছিল সব সৃষ্টিরহস্যের মূলে। তাই একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল। অবশ্যি তার পূর্বে বহু অপঘাত, অকালমৃত্যু ঘটল। হেতু সর্দিগর্মি, ভেদবমি, উত্তাপবিরোধী, অতিশ্রম ইত্যাদি।

হঠাৎ ঢেকে গেল সূর্যের মুখ।

তাতা লোহা যেন বরফ হচ্ছিল।

মানুষ আঃশব্দে আদুল বা বস্ত্র-জড়ানো গা নির্বস্ত্র করে হাঁফ ছাড়ল।

প্রভু, দয়াময় তোমার করুণা।

শোকর (কৃতজ্ঞ) মাবুদ (প্রভু) তোমার দর্গায়।

ছেলেপুলে বুড়ো-জওয়ান সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল আবার উন্মুক্ত ময়দানে। মসজিদে-মন্দিরে প্রার্থনার ঘটা। মেঘ যখন দেখা দিয়েছে, বৃষ্টি নিশ্চয় এবার নামবে। হয়ত দু-এক ঘণ্টার মধ্যে, এত পুরু মেঘ। গরম বিদায় নিচ্ছে।

গাছপালা নেচে উঠল।

রাখাল ছেলেরা গান ধরলে। যৌথ স্বর। সহস্র সহস্র কণ্ঠের ঐকতান।

ভগ্ন মন্দিরের পুরোহিত ঝাপসা আকাশের দিকে চোখ মেলে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ, উচ্চারণ করেছিল— প্রভু, দয়াময়, তোমার করুণা।

হাঁফ-ছাড়ার সুযোগ থাকলে নিঃশ্বাস হয় সংগীত, প্রাণ, প্রেম,সহস্র অভীপ্সা।

মাদবর আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল তার নাতিকে বুকে জড়িয়ে। পুরাকালে শিষ্য ইলেম গ্রহণের উপচার হিসেবে গুরুর বুকে বুক রেখে মন্ত্র উচ্চারণ করত। এইভাবে নাকি গুরুর পুনর্জীবন শুরু হয়। মাদবর সেই পদ্ধতিতে নাতির বুকে বুক।

কে কাঁদবে না, উল্লাসের এই ময়দানে?

AMARBOI.COM

২

প্রভু, দয়াময়!

পরদিন বৃষ্টি নামল না। কিন্তু মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত। বাতাস কেমন-কেমন ঠাণ্ডা। সকলে ভয়ানক খুশি। গরম গ্যাছে গ্যা। হালার গরম।

বাদলাক্ত অন্ধকার মনে মোহ বিস্তার করে। বিপদ-মুক্তির পর মানসিক এই অবস্থা চিরাচরিত ব্যাপার। চাষি চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। কবির মতো তার চোখ। কত স্বপ্ন, কত সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সবচেয়ে ফুর্তি লোটে কুচো ছেলেপুলের দঙ্গল। তামাম গৌড়গ্রাম এসরাজের তারে পরিণত। সকলে খোলা মাঠে, খোলা সড়কে ফিরে এসেছিল। আবছা-আবছা মেঘলা রঙের জন্যে চরাচর মায়াময় ঠেকে। যেখানে গাছপালার আলিঙ্গন সেখানে যেন দুপুররাত শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ছেলেপুলেরা জানে, আবছা অন্ধকার থাকলেও দিন চলছে। সুতরাং নির্ভয় প্রাণভরে ছুটোছুটি করো, লুকোচুরি খেলো। ভূত বিদায় নিয়েছে চিরদিনের মতো। বরং আর যেন সূর্য না ওঠে আকাশে। এমন অনন্ত দিই তোফা। গায়ে কত সুখের সুড়সুড়ি। অথচ ঘামাচির চোটে অস্থির ছিল কদিন পূর্বে। গায়ের এই বিন্দু-ব্যাধি ক্রমশ চুঁয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে। এখন কেবল দু-ফোঁটা বৃষ্টি নামলেই সব তোফা হয়ে যেত। আরো শীতলতা আরো নিরাপত্তা। মুরুব্বিরা বললে, একসঙ্গে এত সুখ ভালো নয়। না-ই আসুক বৃষ্টি আরো দু-চার দিন। এই মেঘ-ছায়া তো মসিবৎ থেকে নিরাপদ রাখার ঢাকুনি। বাদল যখন খুশি মাদল বাজাক।

তাপের দৌরাত্ম্যি হটে যাওয়ামাত্র গলায় গান আপনি এসে জুটেছিল। রাস্তাঘাট ছায়াময় থাকার ফলে কণ্ঠ বে-লাগাম। বেসুরো গাইতেও কারো লজ্জা নেই। কারণ মুখ আবছা রঙে ছোপানো। কে গাইছে ধরা পড়ে গেলেই না বিদ্রূপের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। এখন দেদার গাও, এন্তার গাও। গ্রাম গান হয়ে গেল নিমেষে। যারা চোখে কম দেখে তাদের অসুবিধা বাড়লেও অশেষ আনন্দিত। কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই কঠিন। এখন না হয় দৃষ্টিক্ষীণতার জন্যে কারো সাহায্য লাগবে। কিন্তু মানুষের মদত, ঈশ্বরের নয়। অন্য দুর্বিপাকে জীব অসহায়। অতি বৃদ্ধ চোখ, তেড়ে-তেড়ে যার ঠাওর করতে হয়, তারাও লাঠি হাতে বেরিয়ে এসেছিল হাওয়া খেতে। হয়ত হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা থাক। মন বা শরীর কাহিল করতে পারে না বর্তমান প্রাকৃতিক অবস্থা। তাই ঘরে বসে থাকা কষ্টকর। ফলে, রাস্তা গমগমে। আরো আশ্চর্য, সবাই যেন কাজ-পাগল। একটা কিছু করার দাও। নচেৎ আকাজেই মেতে যাও। ইন্তার গান গাও।

মসজিদের ইমাম ঘোষণা করলেন— এবার মাঠে শোকরের (কৃতজ্ঞতা) নামাজ হওয়া উচিত। সকলে রাজি। যারা নামাজের ধার ধারে না তার আরো গলা চড়িয়ে বললে— ঠিক হ্যায়। একটা কাজ অন্তত পাওয়া গেছে। চাঁদা তোলো। মিষ্টি চাই। মাঠের জমি উঁচু-নিচু সমান করা দরকার। নচেৎ নামাজিদের মাথা প্রার্থনাকালে মাটিতে ছোঁয়ানোর সময় ঠিকমতো পড়বে না, আঘাত লাগতে পারে। এবার মিষ্টি না, কারো কারো অভিমত, ক্ষীর দরকার। সুতরাং আনুষঙ্গিক চাল, চুলো, গুড় ইত্যাদি। কাজের লোকের অভাব ছিল না। ওদিকে আকাশ আর দেখা যাচ্ছিল না মেঘের জন্যে। মনে হয়, আকাশ ক্রমশ নেমে আসছে, যেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বে। ঘনীভূত মেঘ তখন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখা যাবে। ছায়া বাড়ছে, তাই অন্ধকার বাড়ছে বাড়ুক। আরো ঘন হলেই বৃষ্টি নামবে। শীতল হবে গোটা বসুন্ধরা। ভাঙা মন্দিরের পুরোহিত পর্যন্ত মেতে উঠলেন। যেন কোনো সম্প্রদায়ের প্রার্থনার ফাঁক না থেকে যায়। বেচারা পুরোহিত ক্ষীণদৃষ্টি, এক বালক-ভৃত্যের সাহায্যে কোনোরকমে পূজাদি সারেন সেদিন তাঁর সহায়কের অভাব ছিল না। ভগবানকে ডাকতে হয় একযোগে একসঙ্গে। নরকাগ্ন থেকে যিনি এত সহজে মুক্তি দিয়েছেন, এত প্রাণীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, অপার তাঁর করুণা। হে প্রভু, তোমার সৃষ্টির মুখে উল্লাসের রঙ আরো রঙিন করে তুলতে এসো। পৃথিবী কলঙ্কশূন্য হোক। হোক ব্যাধিমুক্ত। পুরোহিত হঠাৎ যৌবনের দিনগুলো উল্টেপাল্টে দেখেন। মন্ত্রপাঠের তাগদ ও উন্মাদনা ফিরে পান। নিস্প্রাণ মানুষগুলোর সহসা হলো কী? একসঙ্গে একজোটে অভিশাপে প্রস্তরীভূত রূপকথার রাজ্য যেন মন্ত্রপূত জলসিঞ্চনের জেগে উঠেছিল একনিমেষে সকলে অতীত জীবনের স্বপ্ন-উজান বিস্ময়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। এমন স্রোত কোনো আবিলতা টিকতে দেয় না, জমতে দেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি মোহাম্মদ আলী সারাদিন আর ঘরে থাকে না বললেই চলে। হঠাৎ প্রকৃতির ডাক তাকে অস্থির বিবাগী করে তুলেছিল। কাগজ-কলম হাতে সে গাছতলায় বসে পড়ে, কখনো মাঠে কখনো আকাশের নিচে। অনাগত সুখ যেমন দুর্দম অভীপ্সার ছাতা মেলে ধরে ঘোলাটে-ঘুর্ণি মাথার উপর, কবির মানসপটে তেমনই এক বিশ্বগ্রাসী আবরণ। আলীর আর কোনো শারীরিক দুর্বিপাক নেই। তখন মগজ ছুটে বেড়ায় অশ্বমেধের ঘোড়া। গুনগুন করে সর্বদা মোহাম্মদ আলী। খেতে বসে তার মন তরবারির পেয়ালায় থাকে না, উপচে পড়ে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর প্রচুর কবিতা লেখে সে। আহ্, কী স্নিগ্ধতা বিশ্ব জুড়ে। এমন অবগাহনের সুযোগ সে হারিয়ে ফেলত কোনোরকমে এই এলাকা থেকে পালিয়ে গেলে। কিন্তু আর কোথাও সে যাবে না, যদ্দিন না একঘেয়েমি লাগে। কয়েকটা গান লিখে ফেললে মোহাম্মদ আলী। সুরকার নিজেই। গাঁয়ে গলা-ও পাওয়া গেল। গ্রামবাসীর জন্যে এমন কবিসঙ্গ তো দুর্লভ। কবিও চারণের মতো তাদের সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতে লাগল নিজের দলবলসহ। হে পর্জন্যদেব,. পৃথিবী কালে শস্যশালিনী হয়ে উঠুক। তোমার শ্যাম-মনোহর স্পর্শ দাও। তৃষিতচাতক এতদিন তারই অপেক্ষার্থী ছিল.......ইত্যাদি-ইত্যাদি বৈদিক রণন উঠল এইমাত্র সৃষ্টির সম্মুখে। মোহাম্মদ আলী কয়েকটা সভার সভাপতিত্ব করলে, বক্তৃতা দিলে। সৃষ্টির রহস্যভেদ অত সহজ নয়। মাত্র কয়েকদিন আগে এই এলাকা ছিল পাতকী-পাচনের কুণ্ড, আর এখন স্বর্গোদ্যান। বিভু-লীলা বোঝার সাধ্যি সকলের নেই। শুধু নিজের চোখ তৈরি করো আর তা দিয়ে যত অঞ্জন মাখানো আছে সৃষ্টির নানা লীলার মধ্যে, তুমি তুলে নাও। বেশি প্রশ্ন তুললে তুমি ঠকবে। বেশি যুক্তির লাঙল দিয়ে চষলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। দ্যাখো, দ্যাখো, হাতে-হাতে তার প্রমাণ। এবার এসো বিটপীছায়ায়, এসো আকাশের নিচে, রাজতোরণ দ্যাখো। এখানে পার্থিব নৃপতি তুচ্ছ। কেবল তুমি নয়ন-কারিগর হও, সব তোমার হাতের নাগালে, সব তোমার পায়ের তলায়। কবির বাণী সহজে গাঁ মাতিয়ে তুলেছিল। এমন বাদল-ছাওয়া অন্ধকার। এখন কিছু কাবাব আর প্রিয়ার সঙ্গে মিলন ঘটলে মোহাম্মদ আলী ইরানের কবি হাফিজ ব'নে যেত। কাবাব গাঁয়ে কেউ তৈরিই জানে না। সুতরাং ও-পদ বাদ। মোহাম্মদ আলী তাই প্রিয়া-সন্ধানে তৎপর হয়েছিল। চাষিপাড়ায় এক চতুর্দশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল হঠাৎ। অস্থির পায়চারি, ঘোরাঘুরি-রত কবির চোখে পড়ে গিয়েছিল এক কিশোরী মাচাঙের নিচে। কয়েকটা লাউ ঝুলছিল ইতঃক্ষিপ্ত। সবুজের উপর আবছা প্রলেপ। কবিপ্রিয়া ডাগর চোখ মেলে সড়কের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ চোখে চোখ। মোহাম্মদ আলী আর দাঁড়ায় নি সেখানে। এই চকিত চাহনিটুকু অনন্তের পাথেয়-রূপে সে ধরে রাখবে। কিন্তু পরদিনই কবি আবার এই ভিটের চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। অনন্ত এগিয়ে যাচ্ছিল। আবার চকিত চাহনি। কিন্তু কিশোরী তখন ভীত হরিণী, ঘরের ভেতর চলে গিয়েছিল। কবি পরদিন চারণ-দলসহ গান করতে বেরোয়। বউ-ঝি বেরিয়ে এসেছিল উঠান ছেড়ে। সবাই শোনার অভিলাষী নেই তাপহর সংগীত। আবার ফসল দুলে উঠবে গোটা গাঁ জুড়ে। কবির গানের ধূয়ায় তার ইঙ্গিত। কোরাসের মধ্যে কবির গলা নেই। তার চোখ বউ-ঝিদের খুঁটিয়ে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁটিয়ে দেখার প্রার্থনা-মত্ত। কোথায় মানবী-অরণ্যে তার প্রিয়তমা চিকন লতার মতো জড়িয়ে আছে। অথবা হারিয়ে গেছে। কিন্তু আবছা ছায়া, প্রায়-অন্ধকারে তা আবিষ্কার কঠিন। মেঘ ক্রমশ পুরু হচ্ছে। যেন মাথার উপর এসে ঠেকবে। মোহাম্মদ আলীর মনে তাই অশেষ খেদ। হঠাৎ সাবেক সূর্য আবার তাপসহ ফেটে পড়ুক। একমুহূর্তের জন্যে। নয়ন সার্থক হোক। কিন্তু কবির দুর্ভাগ্য, ক্রমশ গ্রামের উপর মেঘ এমন জমা হতে লাগল যেন রাত্রি নামছে। দুপুরেই প্রদীপ জ্বালাতে হয়। তার জন্য কারো কোনো ক্ষোভ নেই। বৃষ্টির এখন একান্ত প্রয়োজন। মাঠ কাঠ-ফাটা। বিল শুক্না, নদীর জল তলায় ঠেকেছে। বৃষ্টির দরকার। কবির অসোয়াস্তি সেদিকে নয়। এমন বাদল-ছাওয়া অন্ধকার বৃথা যায়। প্রিয়ার মিলন স্বর্গসুখ। সেখানে একবার দর্শন ঘটলে অন্তত আপাতত প্রাণ বাঁচত। অতএব, বিশ্বময় তিলোত্তমাকে আবার তিল বানালে কবি। গাছে-পালায় অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে কবি তার দয়িতাকে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ কয়েকটা কবিতা লেখা হয়ে গেল এই বাবদ। যায় মধ্যে খালবিল, আমলকী গাছ, সজিনাপাতা বাদ গেল না। তমালের কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু কবি বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভুক্ত নয়। তাই ঘৃণায় হটিয়ে দিয়েছিল বেশ দূরে। এক গোপিনীর তল্লাসে গলদঘর্ম, ষোলো কোথা থেকে জোটাবে? লায়লী-মজনুর প্রতিও কবির বিরাগ। মজনু লায়লীর কুকুরের গায়ে চুমু খেয়েছিল থু, থু, ছিঃ ছিঃ। উন্মাদ ছাড়া জানোয়ারের প্রতি অমন আচরণ আর কে করবে? চারদিক ঘুরেও কবির অশান্তি দূর হয় নি। বিষাদ ছেয়ে আসে। তাই অন্ধকার মেঘের নিকট মোহাম্মদ আলী নিজেকে সমর্পণ করেছিল। অতি-আবছা মিশকালো মেঘই সঙ্গী। কালিদাসের মতো দূত পাঠাতে পারত কবি ওই আসন্ন বারিভাণ্ডারকে। কিন্তু কেমন যেন অনাত্মীয় গন্ধ তার মধ্যে। মোহাম্মদ আলীর স্থৈর্যহীনতা আরো বৃদ্ধি পায়। একবার সাহস-ভর বুকে চেপে ধরতে পারলে পাড়াগেঁয়ে প্রিয়া আর শরমে চিৎকার দেবে না। কিন্তু তার ঈষৎ সুযোগও নেই। মেয়েটির ডাকনাম জেনে নিয়েছিল কবি এক বালক-চারণ মারফত। হাবেরা। ওর সাবেরা নামে আরেক বোন আছে। সে নাকি আরো সুন্দরী। রোমান্টিক কবিরা যখন গাঁ হাতে পায় না, তখন গাছের দিকে ছোটে। মোহাম্মদ আলী বিটপীসজ্জিত সড়কে তাই পায়চারি আরম্ভ করেছিল। কখনো দ্রুত, কখনো শ্লথ। কাপড়চোপড় বিস্রস্ত। ভাবরাজ্যের মুসাফির। গাঁয়ের মানুষ গর্বের দৃষ্টি মেলে চেয়ে-চেয়ে দেখলে। এমনকি, যখন নোংরা কাপড়চোপড়ে কিছু দুর্গন্ধসহ মোহাম্মদ আলী সড়ক-জরিপ করতে লাগল, তখনো মন্তব্য উঠল— আমাগো কবি, আমাদের কবি......আমাদের কিনা তা-ই.....।

মাদবর আসন্ন সুদিনে মোহম্মদ আলীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পূর্বের সংকোচ গায়েব। গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না। হামেহাল কবিকে তারা হাঁটতে দেখেছে হেথাহোথা বনে-বাদাড়ে। সুতরাং সকলের চেনা বইকী। রহস্যের ভাব কেটে গেছে অতিপরিচয় মারফত। মাদবর তাই সাঙ্গোপাঙ্গোসহ কবির নিকট হাজির হয়েছিল। অন্যান্যদের কৌতূহল উচ্ছল। গাঁয়ের শ্রদ্ধার পাত্র মাদবর। তিনি আবার শ্রদ্ধা করেন, এমন মানুষও আছে। সমীহাজাত ভয়, কৌতূহল স্বাভাবিক। ওদের কথাবার্তা শোনার মতো কিছু হবে, এই হিসেবও সঙ্গে জড়িত। সঙ্গে থাকারও আনন্দ আছে। যারা

মনেমনে গাঁয়ের পরবর্তী মাদবর হওয়ার আশা পোষণ করে, তারা তো এমন মওকা হারাতেই পারে না।

মোহাম্মদ আলী সেদিন সকাল থেকে গগনবিহারী। কত কালো কালো রঙ ওই সুদূরে। এমন কাজল আভাস গ্রন্থিল চিন্তার খনি। মন বিবাগী হতে চায় সর্বদা। সকালে কিছু খেয়েই কবি বেরিয়ে পড়ে আর কী। সেই মুখে গ্রামবাসীরা এসে পৌঁছেছিল। সকলের মুখে মুখে-ফেরা কবির একটা জনপ্রিয় গানের কথা দিয়ে মাদবর খেই ধরেছিল। তোষামোদপ্রিয় নয় মোহাম্মদ আলী। কিন্তু সেদিন ভক্তদের কথায় বেশ বিগলিত হয়ে পড়েছিল। বাইরে বেরুনোর তাগিদ থাকলেও সে আসন গ্রহণ করলে বেশ জাঁকিয়ে। অনেক কথার বয়ান শ্রোতারা শুনলে। শহরে থাকলেও গোরু দেখলেই কবির গ্রামের কথা মনে পড়ে। বুধী নামে তাদের একটা গাই ছিল। বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাওয়া যেত, গুঁতোত না। হঠাৎ গাইটা মরে গেল। পেটে ব্যথা, বাথানে বার দুই গোঙানি, শেষে খতম। সজল চোখে কবি তার বর্ণনা দিলে। ওই দুর্ঘটনার পর মোহাম্মদ আলীর মনে বৈরাগ্য জন্মেছিল। ফলে, পশুচিকিৎসক হওয়ার শখ। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে তা সম্ভব হয় নি। কবিতা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আরেক জগতে। অবিশ্যি ভেটারনারি চিকিৎসার প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা। শহরে গোরু পোষা ঝামেলা বিধায় মোহাম্মদ আলী আর গোরু পোষে নি। বাগ্‌ধারা, চাষবাস, শাকসবজি ইত্যাদি কথা শুরু হয়েছিল। মাদবরের উশখুশনি থামে নি। একটা কথা তার মনে বিঁধছিল কয়েকদিন থেকে। কবির কাছে মুখ খুলতে সাহস পায় নি। চুল পেকেছে, বয়সে বড়। কিন্তু ইলেমে তো কবির কাছে সে গোরু। সংসারে রহস্য এত বেশি যে তলিয়ে দেখার তাগদ নেই তার। কত কথা মনে ওঠে। তারা মূর্খ। তাই বলে চোখে যেমন নানা জিনিস পড়ে , মনে কি সেসব সামগ্রী ধরা দেয় না? প্রথম ক্ষেত্রে, চোখ দেখে কিন্তু নাম জানে না। শেষ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। মাদবর সাহস করেই মুখ খুলেছিল। তার মগজে কিছু নেই, এমন কথা এই গাঁয়ে কেউ বলবে না। কত কাইজ্যা ফ্যাসাদ তার কথায় মিটে যায়। বহু বিয়া-শাদির হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয়। টাকা হয়ত বিয়েবাড়ির। কিন্তু আয়োজনের খুঁটিনাটি কার চোখে থাকে? কবি পারবে নাকি সেসব ঝামেলা পোয়াতে? মাদবরের সাহসের গোড়া সেইখানে। একফাঁকে মুখের কথা খালাস করে সে বড় লজ্জায় কবির মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

—কবি-মহাশয় (সম্বোধনটি শিখে নেওয়া) হঠাৎ যা হয় বা হওয়া উচিত, তার বাইরে কিছু দেখলে আমাদের কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগে। ভয় পাই।

— কী ব্যাপার, মাদবর সাহেব? মোহাম্মদ আলী আনাড়ি চাষির মুখে এমন আপ্তবাক্য শুনে তাজ্জব না, বেশ হয়রান হয়ে উঠেছিল।

— আমরা মুরুক্ষু মানুষ আপনাকে কী বোঝাব? যা হামেহাল ঘটে, তা না ঘটলেই আমরা অবাক হই।

— নিশ্চয়।

— ভয়ও পাই।

— তা পেতেও পারেন, যদি ঘটনার মধ্যে ভয়ের কিছু থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— অবাক হলেই ভয় পেতে হয়।

— তা তো বটেই।

— আপনি এসব কথা তুলছেন কেন? ভয় পেয়েছেন নাকি কোনো কারণে?

— তা পেয়েছি বৈইকী।

— কিসের ভয় পেলেন?

মাদবর এই সময় নিজেকে প্রায় মাটিতে মিশিয়ে জবাব দিয়েছিল— কবি-মহাশয়, আমরা মুরুক্ষু মানুষ। বুঝি না সুঝি না। আসমানের দিকে চেয়ে ভয় পাই। খুব গরমে কষ্ট পেয়েছি। এখন শুধু ছায়া আর ঠাণ্ডা। এই মৌসুমে কিছু গরম থাকা উচিত ছিল। তাই ডর লাগে....।

হেসে উঠেছিল মোহাম্মদ আলী। বাইরে প্রকৃতি ডাক দিয়েছে। আর বসে বসে ভালো লাগে না। এখন সংক্ষিপ্ত হোক। মাত্রা বজায় রাখতে মোহাম্মদ আলী মুখ খুলেছিল,— দুনিয়ায় অনেক রহস্য আছে। ভয় পাবেন না।

হুজুর, আমরা গরিব মানুষ। ভয়েই মারা যাই। কী থেকে কী হয়, কে জানে?

— ভয় পাবেন না। এমন ঠাণ্ডা জায়গা। কার কপালে এসব জোটে? আমার মতো বাইরের কত অতিথি আসবে এই গাঁয়ে। অভয়বাণী নিক্ষেপ করেছিল মোহাম্মদ আলী। মাদবর আর সেখানে অপেক্ষা করে নি। কবির আশ্বাসের মধ্যে কোনো উৎপ্রেক্ষা ছিল না। গ্রামের লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল তিন-চার দিনের মধ্যে। কারণ সকলেই আরো অনুকূল পরিবেশ চায়। যাদের গরমে বাস, আরো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গা তাদের পছন্দ। খামখা কেউ কষ্ট করতে চায় না। সেক্ষেত্রে, একদম ছায়া-এলাকা তো আশাতীত। কাজেই তীর্থযাত্রার মতো অনেকে এ-গাঁয়ে এসেছিল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতে। যাদের জমিজায়গা ছিল এই গাঁয়ে, তারা কেবল খাজনা আদায়ে আসে নি। ফাউ হিসেবে এমন শীতলতা পাওয়া যায়, মন্দ কী। তাদের কেউ-কেউ কাচারি তৈরির কথা ভাবতে লাগল, সময়মতো এসে থাকার জন্যে। এই এলাকার আবহাওয়া আরো মনোরম হবে, তেমন ভবিষ্যতের আর্কষণ স্বাভাবিক। একবার মোহাম্মদ আলী ভেবেছিল, গরমের চাপে যানবাহন (শুধু গো-শকট) চলাচল শুরু হলেই সে আর কোনোদিন এই অঞ্চলে ফিরবে না। একবার ছাড়া পেলে হয়। কিন্তু আবহাওয়ার খেয়ালি আবির্ভাবে সেও কম খেয়ালি হয় নি। এমন সহজ অবকাশভোগ সহজে মেলে না। বরফ-পড়া পাহাড়ি এলাকায় কল্পনায় মোহাম্মদ আলী বহুবার ছুটে গেছে। কিন্তু স্বল্প খরচায় এমন শীতলতা-মধুর জায়গা তো নসিব-গুণে মেলে। এই এলাকা ত্যাগ করার কথা তাই কবি ভুলে গিয়েছিল। নিসর্গবিলাসের জায়গা বটে। এখানেই ভদ্রাসন থাকা উচিত। প্রেমের নেশায় মোহাম্মদ আলী কৃষকপল্লীর আশেপাশে বিচরণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাদবরের চিন্তা কিন্তু তাকে সোয়াস্তি দেয় নি। অভিজ্ঞতায় প্রবীণ অমন মানুষকে সে শ্রদ্ধা করে। দুনিয়ার পাঠশালা থেকে তারা সবক পায়। আরেকভাবে তারা সৎ ইলেম অর্জন করে। হঠাৎ ছায়া মাদবরের কাছে অপছায়া। কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কা কেন তার মনে জাগল? মোহাম্মদ আলী মন থেকে এই দুশ্চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় দিতে তৎপর। তার প্রধান উপায়, নির্জন মাঠে গলা ছেড়ে গান। রাত্রে অন্ধকারে রাখাল বালকেরা এই ব্যবস্থা ধরে। কিন্তু কবি তো গো-

পালক নয়, উর্ধ্বচিন্তা-বিহারী। জীবনকে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল প্রবাহ হিসেবে ধরে নিলে আর কোনো ঝঞ্ঝাট থাকে না। দুঃখ, দারিদ্র্য, অবিচার, কষ্ট ইত্যাদি সব এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। মোহাম্মদ আলী গ্রাম্য মানুষকে এই পর্যায়ে পৌছানোর কৃতিত্ব দিতে নারাজ। অনেক দিন, অনেক অবসর দরকার হয় অমন মানস-গঠনে। আ'ম লোকের হাতে সময় কোথায়? তাই তাদের জন্যে কয়েকটা বাঁধা গৎ খুলে রাখতে হয়। সমাজে আইন, আপ্তবাক্য, আদবকায়দা ইত্যাদি নামে বিহিত। বাঁধা গৎ বাঁধা সড়ক। তবেই সমাজ, দেশ এগোয়। কিন্তু রাস্তা এক থাকে না, যখন মোড় এসে পড়ে। তখনই যত মুশকিল। সুতরাং মানুষকে জ্ঞান-হাতিয়ার যুগিয়ে যাও যেন সে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে পারে। সেখানেও সমস্যা আছে। সকলের কাছে কি তেমন সুযোগ আছে যে হাতিয়ার ধরে নিতে পারে। এই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি আবার তার নিজ বিশ্বাসে ফিরে যেত মোহাম্মদ আলী। যা ঘটে তাই সুন্দর বলে মেলে নিলে খামখা ভালো-মন্দের প্রশ্ন তুলে মেজাজ বিগ্‌ড়ানো থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সেখানে চিন্তার লড়াই নদারাৎ। অপরের ঘাড়ে সব সোপরদ্দ করে বুঁদ হতে পারা যায়। ধ্যানীরা তা-ই করে। অস্থিরতা চাপা দিতে আঙুলের গাঁটে নামকীর্তন-আবৃত্তি ঢের ফলপ্রসূ।

মোহাম্মদ আলী খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিল মাদবরের উপর। লোকটা তার চোখে এমন বিভীষিকা ছড়িয়ে গেল কেন? বেশ কয়েক ঘণ্টা অসুবিধা ঘটায় চারণকবির। যৌবনে মোহাম্মদ আলী তাড়ি খেয়েছিল শুঁড়ির দোকানে। নেহাত কৌতূহল। বহুদিন পরে তার আবার নেশার বাতিক চেপেছিল। একটু তাড়ি পেলেই সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যেত। অন্তত চোখে চোখে কি সংলাপে-আলাপে কোনো প্রেমের প্রতিমা (হাবেরা নামক কিশোরীর মতো) পেলে তার চিন্তা সঠিক রাস্তা ধরত। কবিতা আর এগোচ্ছিল না। কারণ, ভাব, শব্দ তালগোল পাকিয়ে যায়। অথচ হররা চলছে নানা জায়গায় নানা কাজ জুড়ে। ছোট ছেলেরা দোলনা বেঁধেছিল গাছের ডালে। অস্তিত্বের মজা আর কখনো এমন করে লুঠ হয় নি। মাঠ ফেটে চৌচির। তবু চাষিরা মনের বল হারায় নি। ছায়ার নিচে জমিন অথবা আবাদের ভূমিকা তৈরি করছিল। গুনগুন গান গায় চাষি-বৌ পুকুরঘাট থেকে যখন হাঁড়িপাতিল মেজে ঘরের দিকে এগোয়। রাজ্যের পাখি এসে জুটেছিল গাছে গাছে। কিচিরমিচির লেগেই আছে কোথাও না কোথাও। কোনো গোপন আনন্দের ঈষৎ ঝিলিক দিতে পাখির ডাক যেন ওত পেতে থাকে। গোধুলিলগ্নে ছায়াময় পৃথিবী। কৃতজ্ঞতায় অবনত প্রার্থনা করছিল কেউ-কেউ আকাশের নিচে বসে। খরার কোপ অব্যাহত থাকলে এতদিন বহু কবরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। এমন দুর্বিপাক থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে যদি প্রার্থনা না করে, তবে কিসে সুযোগ আসবে? হা-ডু-ডুর ডাক শোনা যায় মাঠে মাঠে— আমার খেলো, মরেছে, কাঠ দে না ভাই পোড়াতে। চুরে রাং তাং..... । যারা গাঁয়ে ছায়া উপভোগের জন্যে দু-চার দিনের অতিথি, তারা যেন না-ঘুমোনোর কসম কেটে বসেছিল। হাঁটছে থেমে-থেমে গল্প করছে। গাঁয়ে গোটা দুই ঘোড়া ছিল, মনিবেরা বেঁধে রেখেছিল।

নচেৎ দুষ্টু ছেলের দল কি ফুরসৎ দেবে? বিনা-গদি পিঠে সওয়ার এমন দম দেবে আর দশ সের ছোলা খাইয়েও চাঙ্গা করে তোলা যাবে না। তার চেয়ে আস্তাবলেই থাক। পুকুরের সমতলে মাছের মেলা। চিল উড়ছে। কাক ধেয়ে আসছে, তখন ভাসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাছগুলো চট করে ডুবে যায়। জয়শ্রী সে এক শোভা। মাছ জলের নিচে তখন নিশ্চিন্ত। কিন্তু উপরে নানা আলোড়নের নকশা। ছায়ার রাজ্যে নানা অস্থিরতা। তখন, কে-ই বা বসে থাকতে পারে? সব কাজ-কর্ম চুকিয়ে গাঁয়ের নতুন বৌ হয়ত বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে আকাশ দেখত, সেদিন তার খোঁজ সমবয়সীর জন্যে— বাপ-মার বিরহ-বিস্মরণে। মেঘে অন্ধকার চতুর্দিক। তাই গোরুর পাল শিগ্‌গির বাথানে তুলতে হয়। হঠাৎ বৃষ্টিও নামতে পারে। গফুর গাড়োয়ান বাপের শোক ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু অনুতাপ দূর হয় না। মাত্র কটা দিনের ব্যবধান। অমন দড়. শক্ত মানুষটা মরুভূমির হল্‌কায় খতম হয়ে গেল।

হঠাৎ সেদিন গফুরের সঙ্গে মোহাম্মদ আলীর সাক্ষাৎ। পূর্বে ভাড়া যেতে গফুর রাজি হয় নি। সেকথা মনে আছে। তাই কবির সান্নিধ্য এড়িয়ে চলত। সংকোচও ছিল তার উপর। নিজের পর্যায়ের লোক না হলে কে-ই বা অন্য গা ঘেঁষে? কবি এই ফারাক রাখতে নারাজ। তা ছাড়া গোরুর গাড়ি ইমেজ হিসেবে কবিতার পাড়াপড়শী। মোহাম্মদ আলীর অনেক লেখায় গো-শকটের উল্লেখ আছে। কবি এই প্রাগৈতিহাসিক বাহনের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। পাড়াগাঁয়ে অন্য গাড়ি যেন মানায় না। বহু দূরে যেতে কিছু নষ্ট হয়। অবিশ্যি ভেতরে খড়ের উপর গদি, আর তা না জোটে যদি, নিদেনপক্ষে কাঁথা বিছিয়ে নিলে, হাড়ে এবড়োথেবড়ো রাস্তা আর জানান দিতে পারে না। তখন, শুয়ে-বসে, সবচেয়ে ভালো হয়, কাত হয়ে মাথায় হাত রেখে চারিদিকে তাকানো যায়। অলস মন্থর গতি দূরের আমেজ বহন করে। প্রকৃতির রঙ যেমনই থাক, তা চোখের পর্দায় বিস্ময় জাগায়। এই স্পর্শ যেন জন্মজন্মান্তর লেগেই থাকে, মনের ভেতর যখন বিক্ষুব্ধতাজাত প্রশান্তি শুধু ধীরে ধীরে ঢেউ তোলে। মোহাম্মদ আলীর তাই ধারণা। এই গাঁয়ে সে ঢুকেছিল গোযানে। যখন ফিরে যাবে তখনো ওই বাহন হবে ব্যবস্থা।

রাস্তায় গফুরকে দেখে কবি এগিয়ে এসেছিল। সরল মানুষের সান্নিধ্য তার খুব পছন্দ। খুব বেশি বাক্যব্যয় করতে হয় না এদের সঙ্গে। মোহাম্মদ আলীর এই জাতীয় বাতিকের সূত্র ধরা কঠিন। বালককাল তারও গ্রামে কাটে। স্মৃতির ছোঁয়াচ হয়ত তখন লেগেছিল। এসব গবেষণাসাপেক্ষ।

সিলুয়েট গাছপালা। ছায়াস্তীর্ণ রাস্তা। মোহাম্মদ আলী গফুরকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠেছিল। প্রথমে সে-ই মুখ খুলে ফেলেছিল— কী ভাই গফুর, এবার গাড়ি ঠিক আছে তো?

গফুর ঘাবড়ে গিয়েছিল। জোয়ান মানুষ। সাধারণত তার মধ্যে বেশ জঙ্গি-ভাব আছে। কিন্তু কবির সম্মুখে সে 'থ'। সহজে মুখ দিয়ে রা বেরোয় না। মোহাম্মদ আলী পুরাতন ঘা খুঁচিয়ে তুলছিল। সেজন্যে তার আসোয়াস্তি হতে পারে। কিন্তু সে নিজেকে জলদি শুধরে নিয়েছিল।

— আপনি যেদিন বলেন, গোলাম তৈরি। এটুকু উচ্চারণ করতে তার বিলম্ব হয় নি। কিন্তু পরক্ষণে পাল্টা প্রশ্ন— কবে যাবেন, কবি সাহেব?

মোহাম্মদ আলী দিলখোলা হাসির পর ঈষৎ থেমে জবাব দিলে— আর যাব না এ গাঁ ছেড়ে। তোমাদের মেহ্‌মান (অতিথি) করে রেখে দাও। রাখবে না?

গফুর ভড়কে গিয়েছিল। তবে জবাব দিতে দেরি হয় নি— আমাদের নসিব। আপনার মতো মানুষকে কি আমরা রাখতে পারি?

— কেন পারবে না?

গফুর থমকে ভাবে, গোলমাল না হয়ে যায় এমন মানী মানুষের সঙ্গে,— কথাবার্তা বলার সময়। মাথা চুলকে সে উত্তর দিয়েছিল— হুজুর, আপনারা সেরা মানুষ। আমরা তো পায়ের খাক্ (মাটি)।

জবাবে বেশ বিরক্ত মোহাম্মদ আলী বাধা দিলে— ভাই, এসব আমার সামনে বোলো না। তুমি মানুষ হিসেবে কিসে ছোট?

গফুর চুপ করে গিয়েছিল। কবিই আবার তার উদ্ধারকর্তা,— জানো এমন কথা বললে গোনাহ্ (পাপ) হয়?

গফুর তখনো মুখ খোলে নি। ব্যবধানের খাদ যেন ক্রমশ হাঁ করছিল। অবিশ্যি লাফ দিয়ে সে তা পার হওয়ার চেষ্টা পায়— আমরা কত গরিব তো জানেন। আপনাকে মেহ্মান রাখার মতো অবস্থা খোদা আমাদের দেয় নি।

অবিশ্যি তখনই গফুরের মনে হয়েছিল গোটা গ্রাম মিলে তো কবির খাতিরদারি করা সম্ভব। অবিশ্যি বাইরের কবি বিধায় গাঁয়ের লোক বেশি মাতামাতি করছিল। নচেৎ তাদের গাঁয়েও কবি ছিল এবং বর্তমানে একজন আছেন— সুরত মণ্ডল। এখন আশির বেশি বয়স, চোখে দেখেন না। সংসারে একা, সবাই মরে-হেজে গেছে। প্রতিবেশীদের দয়ায় দিন গুজরান। জওয়ানকালে তিনি গোটা গাঁ মাতিয়ে রাখতেন। ছেলেবেলার কথা গফুরের আবছা মনে পড়ে। একমাস সুরত মণ্ডলের সঙ্গে তার দেখা নেই। সামনে এক জীবন্ত কবি দেখে সে উৎসাহিত হতে পারত। কিন্তু তার কথার ভঙ্গিমায় সে এমন অভিভূত যে কিছু ভেবে পাচ্ছিল না।

মোহাম্মদ আলীর চোখ হঠাৎ দিগন্তের দিকে ভেসে যায়। ছায়া, ছায়া। কত শীতল ছায়া ওইখানে। আর আত্মস্থ থাকতে পারে না সে। তাই সাক্ষাৎ সংক্ষিপ্ত করতে কবি বলেছিল— গফুর মিয়া, অতিথি একজায়গায় থাকলেই হলো। এই গাঁয়েই তো আছি। কয়েক দিন পরে ফিরে যাব। তবে তোমরা যা তোফা জায়গা বানিয়েছে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

— যেদিন যান, বলবেন। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব। গফুরের জবাবে আত্মশ্লাঘার সুর ধ্বনিত। কবিকে তা বেশ স্পর্শ করে। কিন্তু তখনই তার নিঃসঙ্গ হওয়া দরকার। তাই আবার সালাম বিনিময়ের পর মোহাম্মদ আলী পাশ কাটিয়ে রাস্তা ধরেছিল।

তখনো গফুর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। কবির দিকে আর তাকায় নি। গোটা গাঁয়ের ছবি তার সামনে ভেবে ওঠে। সত্যি, ছায়া-ছায়াময় কত রূপের না খোলতাই হয়েছে। প্রায় পাঁচ-ছ বর্গমাইল গ্রাম। খুব 'নাইওর' যাচ্ছে মেয়েরা। তার গাড়ির বলদ দুটোর বিশ্রাম নেই। কিন্তু সেদিন কোনো কাজ না-করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়েছিল সে। গল্পগুজবে এবেলা কাটিয়ে দেওয়া চাই-ই। হঠাৎ মনেমনে সে হেসে উঠেছিল। এমন ছায়ারাজ্য। সন্ধ্যার পর বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়? ছোট মেয়েটাকে মার হাতে সঁপে দিয়ে তারা স্বচ্ছন্দে বিবাগী হতে পারে। গফুরের বউ সখিনা এই গাঁয়েরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে। শুধু মেয়ে? গফুর মনেমনে হেসেছিল। ওকে পোষ মানিয়ে, বাড়ে আনতে বহুত কাঠখড় গেছে। ওদিকে আবার মেয়ের বাপ নারাজ। তাকে ঠাণ্ডা করা গেল, তখন আবার নিজের বাপ মাকু ঠেলতে লাগল...।

চাষির ঘরের মেয়ে, স্বাধীনতা তেমন ছিল না। কিন্তু ফন্দি সৃষ্টি করত বটে। আর গুরুজনদের চোখে ধুলো দিতে হয় না। বাপের চোখে তো আল্লা সেদিন মাটি ছিটিয়ে দিলে সর্দিগর্মির চোটে। ধীরে ধীরে মাটি হচ্ছেন তিনি। সখিনার বাবা নিরুদ্দেশ। সংসার-বৈরাগী। সে ঘটনা তাদের বিয়ের পরের বছর। শান্ত লোক এমনিতে। কিন্তু প্রথমে মেয়ের উপর ভয়ানক চটেছিল— কে কারে বিয়া কইরব হে মাইয়া পোলার হুকুমে হৈব? পুরাতন স্বর এখন চিৎকারে দীর্ণ। ভিটার পাশের হিজল গাছে ঝাঁকড়া ডালপালা গফুরের সামনে অতীতের ইঙ্গিতের মতো। সন্ধ্যার পূর্বেই সে হিজলগাছে চড়ে বসেছিল। সখিনা জানত বইকী। তাই নিচে ডোবায় হাতমুখ ধোয়ার অছিলায় সে-ও গাছে উঠে এসেছিল। গাছ-চড়নি মাইয়া। গাঁয়ে বদনাম ছিল যথেষ্ট। বেশ দেরি দেখে সখিনার মা এসে ডাকাডাকি করে, তারা চুপ করে গিয়েছিল। ফন্দি আঁটতে দেরি হয় নি। উপস্থিতবুদ্ধি ছিল, এখনো আছে বটে সখিনার! গাছ থেকে চুপিচুপি নেমে এসেছিল সে। মা দেখতে পায় নি। তারপর হুড়মুড় মাকে জড়িয়ে বাড়ির দিকে দৌড়। মুখে সারা দেহের কম্পনসহ 'ভূত-ভূত' চিৎকার। মার সঙ্গে একদম উঠানে। সেইসঙ্গে জ্যান্ত ভূতের পলায়ন। তখন সংসারের চাপ ছিল না ঘাড়ে, বাপ বেঁচে। সাহস প্রচুর। কত ছুতোয় না সে সখিনার কাছাকাছি হতো। পিটিয়ে বাপ সিধা করে ফেলত ধরা পড়লে। কিন্তু নসিবের জোর, খাদে পড়ে নি কখনো, তারপর শাদির পয়গাম অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাবপর্ব। এক পাড়াসম্পর্কীয় বৃদ্ধাকে নানা ঘুষ নিতে হয়েছিল। ঘুষদানের ক্ষেত্রেও দুজনে সমান শরিক। সখিনা বৃদ্ধার কত পাকা চুল না তুলে দিয়েছে। ফোগলা বুড়ি। পান খেত গাদা গাদা। হামানদিস্তায় তার পান ছেঁচে দিতে হয়েছে বহুত। কত কাণ্ড। তারপর না বিয়া।.....

হঠাৎ-খেয়ালের শিকার হলো গফুর; এই ছায়াস্নিগ্ধ অন্ধকারে বৌ নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরা তার বড় সাধ। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে সে। আকাশে চাঁদ আছে কোথাও, অনুমানসাপেক্ষ। মেঘের জুলুমে রোশনাই পষ্ট নয়। সকাল-সকাল খেয়েদেয়ে পায়চারি করা যেতে পারে। বেগানা কেউ সামনে পড়লে লজ্জার কী আছে? কোনো একটা বাহানা করবে এই বিবাগীপনার সাফাই দিতে। কিন্তু তখনই গফুরের মনে পড়ল প্রাচীন কবিয়াল সুরত মণ্ডলের কথা। বড় রসিক মানুষ। জীবনের সব খুইয়ে বসে আছেন, তবু জওয়ানদের পেলে বড় মজার-মজার গল্প ফাঁদেন। আর তিনি হাঁটতে পারেন না। চোখের দৃষ্টি কমে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধ মরে যান নি। এই ভরসাঁঝে মণ্ডলের কাছে যাওয়া উচিত। গ্রাম-সুবাদে সুরত দাদু বড় স্নেহের চোখে দেখেন সকলকে। তাঁর কণ্ঠস্বরেই কী যেন আছে। সেই ডাকে আপন-পর ভেদ মুছে যায়। গোরুর লেজ মলে মলে দিন গেল। নচেৎ এককালে তার বড় সাধ বা শখ ছিল দাদুর সাগরেদ হওয়ার। সখিনাকে বিয়া করার সময় বৃদ্ধ কী ঠাট্টা না করতেন। আশনায়ের ফাঁস/বাঘের ত্রাস/ বর্ষাকালে তরমুজের চাষ/.....নাকি একই কথা। মৃত্যুভয়, মেহনত,

দুরাশা— একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। বড় রসিয়ে-রসিয়ে বৃদ্ধ কবিয়াল ব্যাখ্যা দিতেন। বহুদিন মণ্ডলপাড়ার দিকে মুখ ফেরাতে পারে নি গফুর। লজ্জার বাধা সত্ত্বেও সেদিকেই আকষর্ণ বেড়ে যায়। ঘরের বউ সখিনা। সে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আজ না হয়, কাল হবে। কিন্তু দাদুর দিন ঘনিয়ে আসছে। পাকা ফল, যে-কোনো দিন বোঁটা থেকে খসে পড়বে। তখন আফসোসের অন্ত থাকবে না। বাপজান দাদুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। কবিয়াল মদত না দিলে বিয়ে নির্ঘাত ফস্‌কে যেত। অথচ অমন মানুষের কথা সে ক্রমশ ভুলে গেছে। বিয়ে ফুরোলে ছাঁদনায় লাথি মিথ্যে নয়। আবহাওয়ার কথা খোদা বলতে পারে। কখন কী হয়। এই ফাঁকে কবিয়াল দাদুকে দেখে আসা উচিত। সেদিন সংকল্প অনুযায়ী গফুর হনহন মণ্ডলপাড়ার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। পাড়াটা গ্রামের মাঝামাঝি পুব-কোণে। পথে একটা বড় দীঘি আছে। পাড়াটা রাজ্যের গাছপালা। এককালে গফুরই ওই আস্তানায় বহুত রাত-তক কাটিয়ে দিত। কত লোকের গুল্‌তানিতে মুখর। গফুর সেদিন সোজা মণ্ডলের পায়ে সালাম জানিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বৈঠকখানায় থাকেন কবিয়াল সুরত মণ্ডল। প্রতিবেশীরা সাহায্য করে। নিজে কখনো কোনো সঞ্চয় রাখেন নি। নিজের শুধু ফলকর গাছ আছে কয়েকটা। যারা অন্ন যোগায়, তারাই দেখাশোনা করে। সেখানে কিছু আয় হয়। তা ছাড়া গ্রামের অনেকে এটা-সেটা দাদুকে দিয়ে যায় খেতে। হরি জেলে এদিকে মাছ ধরতে এলে দাদুর জন্যে কিছু বরাদ্দ রাখবেই। কবিয়ালের সাবেক কালের খ্যাতি এখনো অনেকের কাছে টাটকা। অবিশ্যি প্রাচীন লোকেরা খসে আছে। নতুন ছেলেছোকরারা তেমন আমল দেয় না। সেদিন গফুরকে পেয়ে সুরত মণ্ডল এমন খুশি হয়েছিলেন যে বারবার উছলে-উছলে পড়ছিলেন। ওদিকে গফুর হাবুডুবু খেয়ে অস্থির। বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা আর নিজের লম্বা অনুপস্থিতির কৈফিয়ত দিতে থাকে। মণ্ডল কিছুই গায়ে মাখেন নি। অনুতাপহীন কণ্ঠ। মৃদুভাবে উচ্চারণ করেছিলেন— এ-ই দুনিয়ার নিয়ম। বুড়ো গাছ বাগানের আওতা।

—দাদু আপনার সময় কী করে কাটে? অন্যপক্ষ থেকে প্রশ্ন।

— কেন? আগে যা করতাম, এখনো তা-ই করি। তালপাতায় সব লিখে রাখছি। গাঁয়ের কেউ না কেউ একদিন এসব গান করবে। সুরত মণ্ডল তারপর আঙুল বাড়ান বৈঠকখানার এক কোনার দিকে এবং বলতে থাকেন—ভাই গফুর, নিজের মনে গুনগুন করি আর লিখে রাখি। সারাজীবন এ-ই তো কাজ ছিল। একটা দোয়াত, খাগড়ার কলম আর কিছু তালপাতা আমার কাছেই থাকে।

—এত তালপাতা পান কোথা থেকে?

— পাড়াগাঁ। (ফোকলা গালে মৃদু হাসি) তালগাছ যখন আছে, পাতার অভাব কী? সবাই আমাকে পাতা কেটে শুকিয়ে দিয়ে যায়। ঝাপসা চোখ। তবে পদ এখনো সোজা লিখতে পারি। আঁকাবাঁকা হয় না।

গফুরের তখন আফসোস হয়, একদম খালি হাতে তার দাদুর কাছে আসা উচিত হয় নি। কিছু আনা উচিত ছিল। বুড়ো মানুষের জন্যে অন্তত একটা ফল। সহজে খেতে পারেন, তালশাঁস আনা যায়। গফুরের চোখে পড়ল বৈঠকখানায় একটা বাঁশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাচাঙে অনেক তালপাতা ছোট ছোট আঁটি-বাঁধা। দাদুর সময় কাটার হদিশ বুঝতে তার বিলম্ব হয় না।

দেখা গিয়েছিল, মণ্ডল অতীতে ডুব দিতে নারাজ, অথচ গফুরের টান সেদিকে। মণ্ডল গ্রামের খোঁজখবর নিতেই বেশি উৎসাহী। তাই কাছি টানাটানিতে গফুর ঢিলা দিল। কারণ, দাদু নিজের কথা বলতেই চায় না, বরং চাপা দিতে পারলে যেন খুশি। সংবাদের যোগান আসে। কার সংসার কেমন চলছে, ওপাড়ার দু'ভায়ে কাইজ্যা ছিল মিটেছে কি না, এবার চাষাবাদ কেমন, কেউ গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল, কবে? ইত্যাদির প্রবাহ। বৃদ্ধ কবিয়ালের রেখাঙ্কিত মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। বাত আছে পায়ে। তা নিয়ে কোনো আদিখ্যেতা নেই। লক্ষ্য করা যায়, মণ্ডল শুধু কথা বলার জন্যে কথা বলছেন না, নিজেও তার মধ্যে হাজির আছেন। শেষে প্রসঙ্গ উঠল, গ্রীষ্মের এবং হালফিল মেঘলা ছায়ার। চোখ ভালো নয়। সুরত মণ্ডলের বড় আফসোস। নচেৎ তিনি একটা নিজ মন্তব্য দিতে পারতেন। গফুর কথা সংক্ষেপ করতে মনেমনে উশখুশ করছিল, তৎপূর্বেই করিয়াল জিজ্ঞেস পেড়ে বসলেন— ভাই, তোমার কোনো অসুখ আছে না কি?

— অসুখ? না। আঁৎকানো জবাব।

— তবে বুড়ার সঙ্গে এত পীরিত। ঘরে নাতবৌ আছে না? না, কাইজ্যা করে বেরিয়েছ?

গফুরের বিস্ময়ের কূলকিনারা থাকে না। রোগে শোকে জর্জরিত, তবু আশ্চর্য প্রাণশিখা। নজর সবদিকে ঠিক আছে। সমীহায় বিগলিত জবাব দিয়েছিল,— নাতবৌ তো আছে। তবে আপনাকেও দরকার।

— কেন?

— আপনি রসিক মানুষ। গোটা গাঁর মানুষকে কত হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন। আপনার ধার কত। একটা ছুরির ধার ক্ষয়ে গেলে অন্য ধারালো ছুরির সঙ্গে ঘষে নেয়, আপনি বুঝি জানেন না?

দুর্বল হাতে নাতির পিঠে স্নেহের থাপ্পড় কষিয়ে জবাব দিয়েছিলেন— ভাই, তুমিও কম যাও না। এখন বাড়ি যাও, না হলে নাতবৌ আমার উপর গোস্‌সা হবে।

— তা যাব। একটু ধার দিয়ে নিই। খিকখিক হাসি উঠেছিল তারপর দুই পক্ষেই।

— বসো, ভাই। আর একটা কথা জিগাই।

— বলেন।

— হঠাৎ গরম, হঠাৎ ছায়া হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী?

— মেঘ করেছে। বাদলা দিন।

— নিজের চোখে দেখেছ?

— হ্যাঁ।

— আমার চক্ষু নেই। ভাবছি, কী হলো? তোমাদের কথাই সম্বল।

— সবাই দেখেছে। গাঁয়ে এক কবি এসেছেন, তিনিও—।

— শহরের কবি?

— হ্যাঁ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— কী বললেন?

— সব ভালোর জন্যে।

— মেঘ ঠিক তো?

— হ্যাঁ, মেঘ। দেখেন না কত পুরু ছায়া। এতদিন গরম চললে বেবাক মরতাম। বাপ্‌জান—।

গফুরের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই তার চোখ ভিজে ওঠে। বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিতে থাকেন— ভাই, কেঁদো না। সংসারে মৃত্যু হয়ত থাকবে। কিন্তু অপঘাত, অকালমৃত্যু হয়, এই বড় দুঃখ।

বৃদ্ধও এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। দুই চক্ষু আর শুকনা নয়।

দুই পাশে দুই শতাব্দী। মাঝখানে যুগ-যুগান্তের স্তব্ধতা।

এই ফাঁকে হঠাৎ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কবিয়াল উচ্চারণ করেছিলেন— বাড়ি যাও ভাই। ফুরসুৎ পেলে আবার এসো।

গফুর তখনো নিজের দুঃখের জের কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ভারাক্রান্ত মনেই তাকে সঙ্গ ত্যাগ করতে হয়েছিল, অথচ আর কখনো এমন ঘটে নি। সুরত মণ্ডল কথা মারফত সব আসোয়াস্তি মুছে নিতে সক্ষম, যখন অপরকে হাসানও প্রচুর। অথচ তিনিই ঝিমিয়ে পড়লেন। গফুরের প্রথম মনে হয়, দাদু সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছেন। বুড়ো কী? দাদুও মরে যাবে। বাপজানের মৃত্যু ওকেও ঘায়েল করে গেছে। অকালমৃত্যু হয়, এই বড় দুঃখ। সত্যি বা-জান তো ওঁর চেয়ে কত ছোট ছিলেন।

সখিনাকে নিয়ে সেদিন ঘোরার কল্পনা মাটি। বেচারা সারাদিন কাপড়কাচা এবং গেরস্থালির অন্যান্য এত কাজ করেছে যে বেশি তাগদ বাকি ছিল না। প্রস্তাব পেশ করার ফলে সখিনা দুঃখিত। অমন অবকাশের লোভ সবসময় থাকে বইকী। বাপের বাড়ি একই গাঁয়ে। অথচ ক'মাস যেতে পারে নি। অতীতের মমতাস্রোত তোড়ের দিক থেকে কিছু কমতে পারে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী আঠা-কাঠি। জড়িয়েই আছে তারা। গফুরের বিপদ-অগ্রাহ্য বেপরোয়া শক্তির হদিস এইখানে প্রচ্ছন্ন। একেবারে কৈশোরেই সে গান বাঁধতে শিখতে চেয়েছিল। কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষীরা আর ওই পথে এগোতে দেয় নি। সুরত মণ্ডল নজির। জীবন সুখের হয় না। কারো মতে, গান শাস্ত্রবিরুদ্ধ। হয়ত তাদের কথাই ঠিক। বাপ প্রথম থেকেই এমন ধমক দিয়েছিল যে আর সাহস পায় নি, ওদিকে পা বাড়ায়। কিন্তু মণ্ডলের সঙ্গে তার সাহচর্য ছিল সবসময় অটুট। অনেক উপদেশ সে শুনেছে বইকী। অন্তত একটা ফল ফলেছে। গাঁয়ে গফুরকে সকলে খাতির করে। যেহেতু সচ্চরিত্র। অপরের বিপদ-আপদে ঝম্পদাতা। তার নানা কাহিনী মুখে মুখে চালু আছে। জওয়ানদের দলে গফুরের কথা তাই বিশেষভাবে খাটে। দু-বছর আগেও তার মিষ্টি গলা ছিল। সন্নিপাত-জ্বরে সে বেঁচে যায়, কিন্তু গলা বাঁচে নি। নচেৎ কত চাঁদনীরাতে একদঙ্গলে সে মাঠ গুলজার রাখত। এখন আর গলা ছেড়ে সে গান গায় না। মনেমনে গুনগুনায়। সুরত মণ্ডলের আফসোস তার আর সাগরেদ জুটল না। দিনকাল কেমন যেন হয়ে আসছিল। মানুষের প্রাণে ফুর্তি নেই, গানও গায়েব। কবিয়াল নির্জনতার সমুদ্রে থ' দেয়। অনুভূতির নানা রণ্‌পা যদ্দূর নিয়ে যায়, সেখানেই যত সোয়াস্তি। এবং তরুণ কেউ কাছে এলে বৃদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

মাদবর প্রাচীনদের দলে পড়ে। কিন্তু সুরত মণ্ডলের চেয়ে বারো বছরের ছোট। দুইজনে একটা মিল ছিল। উভয়ে গাঁয়ের সুখে-দুঃখে একাত্ম। যে যার ধান্দায় ব্যস্ত, দুজনে দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় নেতি। তবু অনেক সময় ভোররাত্রে মাদরব তার মণ্ডলকাকার কাছে হাজির হতো। মাদবরের জানা আছে, খুব ভোরে ওঠে মণ্ডল সাবেক অভ্যেস অনুযায়ী। তাই ছুটে যেত অমন অসময়ে। মাদবরের ঝঞ্ঝাট কম নয়। তার কাছে সকাল মানেই ঝামেলা। নানা জনের নানা ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হয়। সুতরাং ভোরেই কিছুক্ষণ প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। খরার সময় মণ্ডলকাকার খবর সংবাদ সে রোজই নিত লোক মারফত। মাদবরের মনে হয়েছিল, এই খরা-ছায়ার ব্যাপার বুঝ করতে একবার কাকার কাছে গেলে কেমন হয়? ছায়া চতুর্দিকে। ঠিক যেন বাদলা দিন। অথচ বৃষ্টি নামছে না কেন? কাকা অভিজ্ঞ মানুষ। একটা কিছু ভালোমন্দ বলতে পারবেন। কিন্তু মাদবরের তা দরকার হয় নি।

সেদিন রাত্রে স্ত্রীর আলিঙ্গনে সমাহিত গফুর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল :

...ঠাণ্ডা শিরশিরিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের উপর দিয়ে। যেদিকে তাকাও তাবৎ সবুজের বন্যা। কত ফসল, কত সব্‌জি। তার গোযান উড়ে চলেছে, শূন্য রাজ্যের তরুণ-তরুণী শিশুর দঙ্গল। গান গাইছে ছাউনিহীন গাড়ির আরোহীরা এবং নাচছে কোমর-জড়াজড়ি, করতালির শ্বাসাঘাতে চঞ্চল। তারও কণ্ঠ নীরব নয়। আবার সাবেক গলার গান শুনছে সে। তেপান্তরে পাড়ি, অসীম শূন্যে যেন মাটির জমিনের সহোদর— আঁকবাঁক আছে, নানা কারের বক্তৃতার অর্কেস্ট্রায় অন্তহীন, কেবলই ইঙ্গিতের তরঙ্গ ভাসিয়ে উধাও হয়ে যায়। তার গতিবেগ সম্বাদীস্বরূপে রক্ষার জন্যে মণ্ডল দাদু কখন পলিতকেশ নয় একদম জোওয়ান কালের চারণ-বেশে দলে এসে ভিড়েছেন কেউ খেয়াল করে নি, যদিও তাঁর করতালি হাজার অনুরণনের মধ্যেও নিজস্ব চারিত্র্যে ধ্বনিত। মানুষের কাছে শোনা, তাঁর যৌবনের সেই বাবরি-কুঞ্চিত দোলভঙ্গি আদল। ফুলের মালা তরুণীদের খোঁপায়, নিতম্বে ফুলেরই চন্দ্রহার। মাটির উপর শূন্যে একই সুর। তার গো-যানের উঁচোনো চাবুক যেন দূর-বন্দর অভিমুখী কোনো বিনামা জাহাজের মাস্তুল— সুরের ধাক্কায় ঈষৎ-ঈষৎ কাঁপছে. যখন আবীর-প্রমাণ বিন্দু-বিন্দু ইলিশ-ডিম বৃষ্টি নামল...

৩

এই গ্রামের ক্ষেত-খামার প্রায় এক-দেড় মাইল দূরে আরম্ভ। বিরাট মাঠ ক্রোশ দুই জুড়ে। জমি শুধু গৌড়গ্রামের অধিবাসীদের নয়। অন্যান্য মালিকও আছে। কেউ-কেউ গাঁয়ের ভেতর বসত-বাড়ি থাকলেও মাঠে খামারের সঙ্গে বসবাসের ব্যবস্থা রেখেছে, অধিকাংশ চাষি সন্ধ্যা হলেই গাঁয়ে ফিরে আসতে ভালোবাসে।

ঈশ্বর পণ্ডিত বহুকাল থেকে তার খামারবাড়ির অধিবাসী। গ্রামে রোজ-রোজ আসা তার পছন্দ নয়। তাকে আর এই পল্লীর অধিবাসী বলা খামখা। মাঠের সঙ্গে তার যেন গাঁঠছড়া বাঁধা। আজ নয়, যৌবনেই ব্যাপারটা ঘটে। অবিশ্যি ওকে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কুৎসা চালু আছে। শ্বশুরের অবস্থা ভালো নয়, এক বিধবা শালি এসে তার ঘরে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গে গোপন প্রণয় দানা বাঁধে। কৃষকপরিবারে মেয়ে বসে-বসে অন্ন ধ্বংস করত না। চাষের নানা কাজে সে ছিল পণ্ডিতের দোসর। বোনের কোনো কোনো দিন বাড়িতে ফিরতে দেরি হতো। রুগ্ন দিদি কিছু মনে করত না। এসবের বহু পূর্বে ঈশ্বর খামারবাড়ি তৈরি করেছিল। বহু রাত্রি সে একা সেখানেই কাটিয়ে দিত। ফসলের সময় তার ফুরসুত থাকত না। কাছে নদী। গঞ্জের ব্যাপারীরা নৌকা নিয়ে হাজির হতো মৌসুমি আনাজপত্র কিনতে। সেদিক থেকে ঈশ্বর পণ্ডিতের অনেক সুবিধা। যেমন, কুমড়ো গাঁয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মেহনত আছে। জনমুনিশ প্রয়োজন। মাঠে খামারবাড়ি থাকার ফলে এই খরচ আর লাগত না। বিধবা শালি মেহনতে যে-কোনো পুরুষের সমকক্ষ। আবাদের সময় নিজেই নানা কাজে লেগে যেত, রান্নাবান্না তো আছেই। তখন জনমজুরদের খেতে দিতে হয়। তারা গ্রামে খেতে গেলে তো সময় নষ্ট। এমনতর নানা সুবিধা। ধীরা ভগ্নীপতির ডান-হাত, বাঁ-হাত। এইভাবে দুই জনে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, যখন অঙ্গের সান্নিধ্য আর অশোভন কিছু নয়। ঈশ্বরের বারোমেসে রুগ্ন স্ত্রী ব্যাপারটা সহজে মেনে দিয়েছিল। অল্প বয়সে বিধবা বোন। তার প্রতি দিদির টানও ছিল প্রচুর। সারাজীবন নরকবাসের চেয়ে ভালোই হয়েছে। বোনের চেয়ে বয়সে বড়। তা ছাড়া নিজের ছেলেমেয়ে চার-পাঁচ জন। স্বামীর উপর ষোলোআনা ভাগ বসানোর কোনো লোভ বা জিদ ছিল না। চাঙারি মাথায় বোন মাঠে যাওয়ার সময় সে বরং তেলচুকচুক তার চুল বেঁকে দিত। গ্রামে সবাই আঁচ করত। কিন্তু কারো চোখে তো দেখা নয়। তখন অপবাদ খামখা। ফলিয়ে লাভ কী? ঈশ্বর যৌবনে ছিল ভারী জাঁহাবাজ। তাকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করত না।

অতীতের কথা।

ঈশ্বরের বয়স তখন সত্তরের বেশি। ছেলেরা গাঁয়েই থাকে। তাদেরও ছেলেমেয়ে প্রচুর। ঈশ্বরের স্ত্রী বহুদিন মারা গেছে। শ্যালিকাও তারপর খুব বেশিদিন বাঁচে নি, কিন্তু ঈশ্বর পণ্ডিত যমের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে বহাল-তবিয়ত মাঠ সরগরম রেখেছিল। ঠুকঠাক লাঠি হাতে বেশ হেঁটে বেড়ায়। গাঁয়ে আর পা দিত না। অন্তত গত দশ বছর। উন্মুক্ত মাঠের আলিঙ্গন বৃদ্ধ ভুলতে পারে নি। তার খামারবাড়ি কালে কালে সুন্দর গাছপালা-ঘেরা বসতবাড়িতে পরিণত হয়। চার-পাঁচটা তালগাছ ভিটের সামনেই। দু'টো বারো মাস ফলে। কিন্তু ঈশ্বর তালের নয়, তাড়ির প্রেমিক। সবাই বলত, নেশা করেই বুড়ো এতদিন বেঁচে আছে। ওর ছেলেরা অবশ্যি মাঠে এসে কাজ করত দিনে। সন্ধ্যায় আবার গ্রামে। বুড়োর সঙ্গে কোন না কোন এক নাতি থাকত। ছেলেরা সকলে খুব মেহনতে। স্বচ্ছল অবস্থা। বুড়ো মাঠে থাকার ফলে অনেক সুবিধা। ফসল পাহারা দিতে আর লোক লাগে না। বুড়োমানুষের ঘুম কম। তামাক টানছে আর কাশছে— এই তো রুটিন। ঈশ্বর পণ্ডিতের দেখাদেখি আরো কয়েক ঘর চাষি মাঠে বাস তুলে নিয়ে এসেছিল। তাদেরও কেউ-কেউ সন্ধ্যার পর চলে আসত বুড়োর সঙ্গে গল্প করতে। ঈশ্বর পণ্ডিত বলত— সাঁঝপহর আমার বেশ ঘুম হয় নেশার ঝোঁকে। তারপর তো জেগেই থাকি। তামাক নিজেই সেজে নিতে পারত সে। কোনো সাহায্য দরকার হতো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বর পণ্ডিতের খ্যাতির আরো হেতু ছিল। বিরাট বিরাট তরমুজ ফলত তার ক্ষেতে। আধ মন, তিরিশ সের ওজন একেকটার। গোটা তল্লাটে বিয়েবাড়ির উৎসবে, ধান-যৌতুকে পণ্ডিতের খোঁজ পড়ত ওই পেল্লায় তরমুজের জন্যে। অনেক চাষি মনে করত, পণ্ডিত মন্ত্রবিশারদ। তাই অমন ফসল। সে পালটা দিত, আসল তেজ মাটির, তারপর মেহনত। মন্তরটন্তর ফু-ফু...। ছেলেরা বাবার কাছ থেকে চাষের ইলেম শিখে নিয়েছিল। কিন্তু চল্লিশ বছর আগেকার বড় তরমুজ আর ফলত না। ঈশ্বর মন্তব্য করত, মানুষ বুড়ো হয়, আর মাটি বুঝি জোওয়ান থাকে? তবু তরমুজক্ষেতের প্রতি বুড়োর প্রেম ছিল অকৃত্রিম। মৌসুম এলে নিজেই ছেলেদের কাজ তদারক করত। মাথায় ছাতা, দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ কৃষক। এককালে অবিশ্যি তার মাথায় টোকা পর্যন্ত লাগত না। রোদ্দুর মধুর-মধুর। ছড়া কাটত পণ্ডিত। চেহারায় সাবেক জৌলুস পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু বুড়োর তেজোদ্দীপ্ত জোড়া চোখ স্পষ্ট জানিয়ে দিত, এককালে ওই দেহ থেকে কী বিদ্যুৎ চমকাত মাটির সঙ্গে লড়াইয়ে।

ঈশ্বর পণ্ডিত বহুদিন আর গ্রামে ঢোকে নি। লোক মশকরা-যোগে মন্তব্য করত— শালিকে নিজের হাতে শ্মশানে পুড়িয়ে এসেছে। গ্রামে বুড়ো আর কী করে যায়?

সেদিন রাত্রে ঈশ্বরের কাছে ছিল তার মেজো ছেলের ছেলে বুলান। বছর চোদ্দ বয়স, দাদুর বড় ন্যাওটা। মাঠে এলে সহজে গাঁয়ে যেতে চাইত না। তার লেখাপড়া আছে, বাবা বকাবকি করত। কিন্তু মাঠে টইটই করে চরে বেড়ানো বা দাদুর টান— যে-কোনো কারণেই হোক, সে নাছোড়বান্দা। একবার এলেই অন্তত তিন দিন। লেখাপড়া শিকেয় তোলা থাক। বাপ ধমক দিলে, পিতামহ উল্টে চোট মারত— চাষিবাসির ছেলে, পড়ে কী হবে কেউ জানে? তার চেয়ে মাঠের কাজ দেখুক...ইত্যাদি। সুতরাং পৌত্র-পিতামহ একাত্ম। ন্যাওটা কি সাধে!

সেদিন ভোররাত্রে বুড়ো তরমুজ-ক্ষেত তদারকে বেরিয়েছিল। যৌবনের এই বাতিক আর যায় নি। তরমুজের লতা কোথাও হেলে পড়েছে গর্তের ভেতর, পণ্ডিতের তা সহ্য হবে না। নিজের হাতে একটা আবছা আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে, তবে নিস্তার। বুলান বারণ করত, দাদু, কোনদিন আপনাকে সাপে খাবে। এত রাতে ওঠেন কেন? জবাব মজুদ ছিল, সাপ আমার সাঙাত।

বুলান জেগে গিয়েছিল। দাদুর সঙ্গে যায় নি। বুলানের লোভ হয়েছিল। কিন্তু তামাক সাজতে ভালো লাগে না এই ভোররাত্রে। দাদুর ফরমাশ সম্পর্কে সে বেশ ওয়াকিবহাল। তাই মটকা মেরে শুয়েছিল। বেশিক্ষণ যায় নি। হঠাৎ দাদুর তীব্র চিৎকার তার কানে ধাক্কা দেয়। ধড়মড়িয়ে উঠে লাঠি হাতে সে বেরিয়ে পড়েছিল। মাঠের সব ঘরেই ওই অস্ত্র মজুদ থাকে। সাপ মারতেও তো লাঠি প্রয়োজন হয়। বুলান তরমুজ-ক্ষেতের দিকে ছুটে গিয়েছিল। দাদুর বাতিকের সঙ্গে তার পরিচয় তো আজকের নয়।

— বুলান— বুলান— এদিকে আসিস না— পোকা— পোকা— গাঁয়ে খবর দে। দাদুর এই আর্তচিৎকার তার কানে স্পষ্ট বিঁধেছিল, সোজা। বিঘে-চার জমি দূর তরমুজ-ক্ষেত। দৌড়ে যেতে আর কতক্ষণ? কিন্তু ঈশ্বর পণ্ডিতের নিষেধ বাণীর জন্যে সে ত্রস্ত

থমকে দাঁড়িয়েছিল। শুক্লপক্ষের রাত্রিশেষ। আবছা চতুর্দিক দেখা যায়। চোখে যেটুকু ঘুমের আবেশ ছিল, তা বুলানের চোখ থেকে ছুটে যেতে দেরি হয় নি। হুঁশিয়ার কিশোর সে। সরেজমিন বুঝে নিতে তৎপর, কী ঘটছে।

বুলানের চোখে পড়ল, চাপবাঁধা কালো মেঘের স্তূপের মতো কী যেন ধেয়ে-ধেয়ে আসছে আর দাদু লাঠি ঘোরাচ্ছেন। তার চিৎকার তখন স্পষ্ট....বুলান— আসিস নে— আসিস নে। গাঁয়ে গিয়ে খবর দে—।

কিশোর বালকের আক্কেলে কুলায় না ভয় পায় সে। কী অমন দলে দলে উড়ে আসছে। কোনো হিংস্র বাদুড় নয় তো? রক্তপায়ী বাদুড়— বইয়ে যা সে পড়েছে।

দাদুর লাঠিনাড়া সে দেখতে পায়। তারপরই ঈশ্বর পণ্ডিত মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বুলান তখনো কর্তব্য স্থির করতে পারে নি। এখনই দাদুকে কোলে তুলে নেওয়া উচিত। কিন্তু শেষ চিৎকার শোনা গেল— পালিয়ে যা— গাঁয়ে খবর দে— আমার ক্ষেত খেয়ে ফেলেছে—। দাদু পাগল হয়ে যায় নি তো? যার ফলে, এসব বিকার-বক্তৃতা?

কিন্তু আবার চিৎকার শোনা গেল— যা পালিয়ে যা— এখনো দাঁড়িয়ে কেন? তখন আর কোনো সন্দেহ থাকে না বুলানের। অমন খনখনে গলা, টনটনে বুদ্ধি দাদু পাগল হয়ে গেলে দুনিয়ার আর সব মগজই ঘোলাটে হতে বাধ্য।

হিসেব-নিকেশ খুব দ্রুত। শেষবারের মতো দাদুর কণ্ঠস্বরের দিকে মনোযোগী হয়েছিল বুলান। কিন্তু সব ঝাপসা ক্রমশ। বাদুড়ের ডানার মতো তেমন কালোয়-কালোয় ঢাকা, আর কিছু দেখার যো নেই। একটা বিকট গোঁ-গোঁ আর্তনাদে তখন সারা মাঠ নাড়া খাচ্ছিল। গোঙানি কী মানুষের ভাষা নয়?

স্পন্দিতবক্ষ বুলান এক দৌড়ে নিকটস্থ খালের পাড় থেকে নিচে নেমেছিল। এঁকেবেঁকে সোজা গাঁয়ে ঢুকেছে এই সোঁতা বর্ষাকালে জোয়ার-ভাটা খেলে। তারপর এমন প্রাকৃতিক খেল কেবল কোটালের বানের উপর নির্ভর। খালের গায়ে গায়ে খাগড়া-বন। বন-বাদাড় ঠেলে বুলান দৌড়তে লাগল। পেছনে ফিরে দেখার অবকাশ কোথায়? দাদুর আর্তনাদ পিছু ধাওয়া-রত। বুলান চোখের জল মুছছিল। দিশাহারা সে দৌড়ায়, শুধু দৌড়ায়, শুধু—।

মেহনতি মানুষ সব। ভোরের দিকে ঘুমের ঈষৎ আয়েশ উপভোগ করে। গ্রীষ্মকালে চাঁদনীরাতে সকলেরই শুতে দেরি হয়। তখন সারাদিনের খাটুনির পর দাওয়ায় বসে তামাক খাওয়া আর খোশগল্পের চেয়ে মজাদার আর কী আছে এই এলাকায়?

কিন্তু বুলানের চিৎকারে তার বাড়ি কেন গোটা পাড়ায় ঘুম ছুটতে দেরি হয় নি। কাছেই গফুরের বাড়ি। সে কোনো বিপদ আঁচ করে একদম লাঠি হাতে বেরিয়ে এসেছিল। তার দেখাদেখি অনেকের হাতেই হাতিয়ার, যেন শত্রুর মোকাবিলায় বিলম্ব না ঘটে।

সকলেই তখন মাঠ-অভিমুখী, দৌড়-রত। এক-দেড় মাইল পার হতে কতক্ষণ আর লাগবে? দাদুর ন্যাওটা, তেজি বুলান ক্ষমতা বা যে-কোনো টানেই হোক— বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াচ্ছিল, যদিও একই পন্থায় তার একদফা পাড়ি আগেই দেওয়া।

একুনে দশ-বারো জন। তরমুজ-ক্ষেতের কাছাকাছি পৌঁছে সকলে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশ সেদিকে ফর্সা। একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মেঘ করে ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতদিন। তবে কি ওদিকে তা ফেটে গেছে? জোছনা অবশ্যি মাকড়া। কারণ, মেঘে ঢাকা থাকলে জোছনায় ফিন ফোটে না। কিন্তু ঈশ্বর পণ্ডিতের জমির উপর জ্যোৎস্না পর্যন্ত স্বরূপে প্রকাশিত।

থমকে দাঁড়িয়েছিল গোটা দঙ্গল। বুলানের বর্ণনা অনুযায়ী তারা ভয়ানক বিপদ আঁচ করেছিল। তার কোথাও কোনো চিহ্ন (আলামত) নেই। এই মাঠে বারো মাসই কোনো না কোনো ফসল থাকে। বর্ষার সময় নৌকা-চলাচল করে খাল-পথে। অপরিচিত জায়গা। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা তো আগে থেকে জানান দেয়। এখানে তার কোনো লক্ষণ নেই। তাই সকলে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তবু এগিয়ে গিয়েছিল গ্রামবাসীরা, মনের ভেতর হুটোপুটি যতই থাক। বুলান প্রথম কাতারে প্রথম জন। অবিশ্যি জমির উপর যাওয়ার পূর্বেই সকলকে থামতে হয়েছিল।

সম্মুখে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঈশ্বর পণ্ডিত! পাশে ইহলোকের সঙ্গী লাঠি মোতায়েন।

হাউমাউ বিলাপ শুরু করে দিয়েছিল বুলান, ঈশ্বরের ছেলেরা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যারা দলের সঙ্গী। বুলান ঠাওর করতে অক্ষম, চারপাশে কী ঘটছে। একটু আগে যে-দাদু সস্নেহে ডাক দিয়েছে সে আর কোনোদিন মুখ খুলবে না। মৃত্যু ছিল বুলানের নিকট অপরিচিত ঘটনা। তাই হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখের পানি পর্যন্ত বন্ধ। আত্মীয়স্বজনেরা শোকের প্রথম ধাক্কা সামলে কর্তব্যের মুখোমুখি শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এমন অপঘাত মৃত্যু। কারণ কী? এই হদিস প্রথমে তাদের জানতে হয়, এখনো যাদের ধড়ে প্রাণ ছিল।

ঈশ্বরের মুখ ঢাকা দেওয়ার পূর্বে এক আত্মীয় ভালো করে দেখে নিলে, দম হঠাৎ বন্ধ, ফলে মৃত্যু। মুখে তার চাপ রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কী ভাবে?

বুলানকে কয়েকজন জেরা শুরু করেছিল।

— তোকে পালিয়ে যেতে বলেছিল?

— শুধু পালিয়ে যেতে? চিৎকার দিয়ে বললে, পালা— পালিয়ে যা— সব খেয়ে ফেলবে।

— কী খেয়ে ফেলবে?

— তা আর বলে নি। হঠাৎ ঘুম-ভাঙ্গা। আমি হয়ত শুনতে পাই নি।

— তবে বিপদ কিসের?

— তা জানি নে। দাদুকে আমি লাঠি ঘোরাতে দেখেছি। আমার পষ্ট মনে আছে।

— কার বিরুদ্ধে লাঠি?

লাশ সামনে রেখে বেশি কথা-কাটাকাটি চলে না, অশোভন। গ্রামে খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল। দলে দলে লোক আসা আরম্ভ হয়। বুড়ো মানুষ মসিবতের কথা বলে গেছেন। তাই তালগোল পাকিয়ে যায়। নচেৎ মৃত্যু আবার কোন বৃদ্ধের হয় না? প্রচুর বয়স, সফল জীবন— আনন্দের মড়া। তার জায়গায়, সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

মানুষ নিয়ে সকলে মশগুল। পায়ের তলার মাটির দিকে কারো খেয়াল ছিল না।

ঈশ্বর পণ্ডিত ভোর-ভোর তরমুজ-ক্ষেত জরিপে বেরিয়েছিল। সবুজ ওই ফসলের উপর তার দরদের কথা অন্তত দশ হাটের ফড়ে-ব্যাপারীদের জানা। বুলান অকুস্থল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে আগেই বয়ান দিয়েছিল। তবু শোকের মতো বিপদে তলিয়ে গিয়েছিল অন্যান্য বিচারবুদ্ধি।

হঠাৎ গফুর পায়ের দিকে চোখ পড়ামাত্র আঁৎকে উঠে শুধিয়েছিল,— তরমুজ-ক্ষেত কোথায়?

লাশের কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে গফুর দাঁড়িয়ে। ক্রিয়াচারের প্রশ্ন আছে। তাই পরলোকবাসী বৃদ্ধের প্রতি সে প্রতিবেশীসুলভ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনে নিজে উত্তম জায়গা ঠিক করে নিয়েছিল।

উপস্থিত সকলের চৈতন্য তখনই নাড়া খায় একটি বিস্ময়ে— তরমুজ-ক্ষেত কোথায়?

তরমুজ-ক্ষেত এখানে কোনোকালে ছিল তাও কেউ বলতে পারে না। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জমিন তখন ধবধবে মাটির দাঁত বের করে হাসছিল সকলের দিকে বিদ্রূপ ছুড়ে-ছুড়ে। কত বড়ো বড়ো তরমুজ-ক্ষেত। তার চিহ্নমাত্র নেই। লাল লাল দানা কোথাও ইতঃক্ষিপ্ত। তাও বেশি নয় সংখ্যায়।

যুক্তির ধারা তখন অন্য খাতে বইতে শুরু হয়েছিল।

— কোনো মহাপতঙ্গ সব খেয়ে গেছে।

— কোনো হিংসুটে জন্তু।

— অথবা চোর।

— চোর তো তরমুজ নিয়ে যাবে। ক্ষেত ধ্বংস করবে নাকি

— তাই তো—।

— কোনো পোকার কারবার।

— এমন বাপের বয়সে শুনি নি।

সকলের দৃষ্টি জমিনের উপর, যদি কোনো হদিস পাওয়া যায়।

গফুর মাটির উপরে বসে খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখছিল। উবু বসেই সে ঘষ্টে-ঘষ্টে এগোয়। একেকবার মাটিতে হাত দিয়ে দেখে।

আকাশ ইতিমধ্যে ফরসা হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এই জমিনের উপর আর কোনো মেঘ-ছায়া নেই, যদিও অন্যান্য দিকে পুঞ্জীভূত স্তূপ বর্তমান।

গফুর উঠে পড়েছিল। সোজা খাড়া। হাতে কী যেন। একটা জিনিস। হাতের চেটোয় তুলে নিরীক্ষণ করে, পরে অন্য চেটোয় বদলি করেছিল।

স্তম্ভিত সকলের মধ্যে সে-ই প্রথম মুখ খুলেছিল— পণ্ডিত-ভাই, দ্যাখেন তো এটা কী? রহস্য আছে মৃত্যুর পেছনে। কাজেই সকলের কান খাড়া থাকা স্বাভাবিক।

ঈশ্বর পণ্ডিতের এক ছেলে গফুরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তার চেটো থেকে কী যেন নিয়ে সে মন্তব্য ছুড়লে— এ তো কোনো পতঙ্গের ডানা।

— আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।

তখন সমবেত জনতা দুটো পৌনে ইঞ্চির বেশি লম্বা না, আধ-ভাঙা পতঙ্গ-ডানার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, লাশের দিকে মনোযোগহীন।

— কোনো মহাপতঙ্গের ডানা। এই সিদ্ধান্ত সকলের মুখে।

— কিন্তু পোকা কি গলা টিপে মানুষ মারতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

— কে জানে, কী ব্যাপার।

— গাঁয়ে মাদবর, মৌলবি-পুরুত আছে, তাদেরই জিজ্ঞেস করে দ্যাখা যাক। ডানা দুটো ভালো করে গামছায় বেঁধে রাখো হে। নেপথ্যে এই সিদ্ধান্ত রূপ নিয়েছিল।

— হাতের লাঠি দিয়েই আমরা একটা খাট বানিয়ে নিই। বাবার লাশ তো গাঁয়ে নিয়ে যেতে হয়। ঈশ্বর পণ্ডিতের বড় ছেলে প্রস্তাব দিয়েছিল।

— তিনি তো মাঠে থাকতেই ভালোবাসতেন। আরেক মন্তব্য।

— কিন্তু বাড়ির মেয়েরা আছে—। এই যুক্তির উপর আর কথা চলে না। বুড়োমানুষ। কিন্তু মায়া-মমতার বয়স সাধারণভাবে পরিমাপ অচল।

বুলান তখন দাদু-দাদু রবে হাঁক-ফুকার কান্না শুরু করেছিল। হারানো চিজের জন্য আফসোস-অনুতাপ দমকা আচমকা ধাক্কা দিয়ে যায়। বুলান এতক্ষণ আনমনা ছিল, যেন কোনো তামাসার মধ্যে ডুবে।

অতঃপর ঈশ্বরের লাশ নিয়ে সকলে গ্রামের দিকে এগোতে লাগল। নিকটে একটা শ্মশান। কিন্তু দাহব্যবস্থা নিয়ে তখন কেউ পীড়িত নয়।

অপমৃত্যুর নিজস্ব ছায়া থাকে।

৪

হয়রান তামাম গ্রাম।

অমন জলজ্যান্ত লোকটা হঠাৎ নেই হয়ে গেল। হদিসের রেখা কোথায়? আকাশ তখনো ঝোলা-মুখ। কিন্তু বৃষ্টির নাম-নিশানা ছিল না।

ভাঙা ডানা দুটো বড় যত্নে কাগজের মোড়কে রেখেছিল গফুর। পণ্ডিতের সন্তানেরাও পরামর্শ দিয়েছিল, যদি কোনো শুলুক-সন্ধান পাওয়া যায় ঐ সূত্র থেকে।

বিজ্ঞজন মোহাম্মদ আলী। তদুপরি কবি। মাদবর দলবলসহ তার কাছে পৌঁছেছিল। তাদের সৌভাগ্য বইকী, গ্রামে অসময়ে এমন মানুষ পাওয়া। গুণীদের কদর আঁস্তাকুড়ে। প্রবাদটা খামখা আসে নি। রহস্যভেদের জন্যই হয়ত এমন ব্যক্তির আবির্ভাব এই পাণ্ডববর্জিত দেশে।

একটা লোক মরে গেল, জমিনের ফসল গেল, অথচ কিছু বুঝা গেল না। আপনি যদি কিছু পারেন। আমরা মুরুক্ষ মানুষ—। ভাঙা ডানা দুটো কবির হাতে তুলে দিতে-দিতে গড়োয়ান গফুর সভয়ে উচ্চারণ করেছিল।

অবিশ্যি ঘটনাটা মোহাম্মদ আলীর কানে গিয়েছিল বইকী। ছোট গ্রাম। চাপা থাকতে পারে না।

বৈঠকখানায় একদল গ্রামবাসী। জিজ্ঞাসু নেত্র, উৎকণ্ঠায় উৎকীর্ণ।

সম্মুখে সমস্যা।

মোহাম্মদ আলী ডানার দিকে তন্ময়-নয়ন, যেন গভীর সৌন্দর্যবোধে অভিভূত। সকল চক্ষু কবির মুখের উপর। সকলে লক্ষরত। মুখের রঙ কেমন হচ্ছে, চোখের পাতা কিভাবে পড়ছে; কপালে রেখা কী ধারায় জড়ো বা বিস্তারিত। ডানার কথা তখন গ্রামবাসী বিস্মৃত।

AMARBOI.COM

অন্তত পাঁচ মিনিট অতিবাহিত।

সকলে অস্থির, তবু বাহ্যত স্থির। ফাঁসির আসামি জজের রায়ের জন্য উৎকর্ণ, যখন সওয়াল-জবাব সব শেষ।

—আশ্চর্য, আশ্চর্য! তাজ্জব ব্যাপার! তন্ময়তার মধ্যে কবির বাণী।

গ্রামবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য, কিন্তু মাত্র কয়েক নিমেষ। আবার সকলে ওতপাতা গেরিলা সৈনিকের মতো স্তব্ধ। এ তো শেষ বাণী নয়।

কবি স্তব্ধ।

ডানার দিকে তন্ময় দৃষ্টি।

কাল বয়ে যায়।

গ্রামবাসীদের ভেতরে অসোয়াস্তি চাড়া দিয়ে উঠেছিল। প্রতীক্ষারও মেয়াদ থাকে।

মোহাম্মদ আলী তাদের নিরাশ করে নি।

—ভাইসব, এটা দেখে প্রথমত মনে হয় কোনো পতঙ্গের ভাঙা ডানা। কিন্তু আসলে সেখানে রহস্য শেষ হয় না। ডানার অক্ষর কোন ভাষার অক্ষরে— বুঝতে পারছি না— কী যেন লেখা আছে।

কবির এই উচ্চারণমাত্র গ্রামবাসীরা নেপথ্যে বলে উঠেছিল— সোবহান আল্লা...আল্লা (তোমার মহিমা)— প্রভু, তোমারই লীলা....। এই জাতীয় আরো উচ্চারণ।

কবি সকলকে আবার থামিয়ে দিয়েছিল— আমি ভেবে পাচ্ছিনে এটা কী। গম্ভীর মুখ, শূন্যদৃষ্টি মোহাম্মদ আলী।

মাদবর চুপচাপ বসেছিল। ঈশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে তার বহুদিনের খাতির। সমবয়সীদের মৃত্যু নানা ইঙ্গিত দিয়ে যায়। উচাটন মন মাদবর। শেষে বলেছিল— কবি মহাশয়, এ কোনো মসিবত, অমঙ্গলের লক্ষণ নয় তো?

— না, না। তা হবে কেন? ডানায় অক্ষর আছে। অক্ষর কারো ক্ষতি করে না। কবির প্রবাদ-প্রতিধ্বনি গমগম করতে লাগল বৈঠকখানায়।

সহজ ব্যাখ্যা মাদবের মনঃপূত নয়, ধরা যায়, যখন তার মুখেই আবার শোনা গেল— কবি-মহাশয়, মানুষ একটা মরে গেল। তাই ভাবছি—।

—খামখা কিছু ভাববেন না। তা ছাড়া মসিবত, অমঙ্গল আসে আমাদের উপকারের জন্যে। কবি মাঝখানে পঙ্‌ক্তি কেটেছিল।

—একটু বুঝিয়ে দেন, কবি-মহাশয়।

—বিপদে ইমানের পরীক্ষা হয় আপনারা জানেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে শোনেন, সংসারে রহস্যের শেষ নেই। সব সময় বুঝা দায়, কিসে কী হয়। হয়ত দেখছেন ক্ষতি, আসলে লাভ। মানুষের চোখ আর কত দূর যায়! ডানা দুটো পরে দেখব। আমার কাছেই থাক।

—তা থাক।

একজন প্রস্তাব দিলে— কবি-মহাশয়, একবার তরমুজ-ক্ষেতটা দেখতে চলুন না।

—আজ না। আর একদিন হবে। সরেজমিন মানুষ দেখতে যায় হুজুগের চোটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ যেতে পারব না। তবে কাল-পরশু যাওয়ার ইচ্ছে রইল।

এই জবাবের পর সকলের মধ্যে ভাব স্তিমিত।

গফুর শুধু মাথা-চুলকানি যোগে জবাব দিয়েছিল— বড় ডর করে। খরায় বাপ গেল। আবার এই ছায়া— আবার এই অক্ষরওয়ালা ডানা—।

—ভয়ের কিছু নেই। বেটাছেলে কত কী সহ্য করতে হয়। আর মনে রেখো, মসিবত আল্লাই দেয়। ভয়ের কী আছে? তুমি তো বেটাছেলে হে—। অভয় যুগিয়েছিল মোহাম্মদ আলী।

এমন প্রশংসা! গফুর কিছু শ্লাঘা অনুভব করেছিল বইকি। কিন্তু নিঃশঙ্ক হয় নি তবু। কবির উদ্দেশ্যেই সে আবার প্রশংসা ফিরিয়ে দিয়েছিল— আপনার ভরসাই আমাদের ভরসা।

গুঞ্জন উঠেছিল গ্রামবাসীদের মধ্যে বাড়ি ফেরার পথে। অস্বাভাবিক কাল, অস্বাভাবিক আবহাওয়া। এই মন্তব্যে সকলে একমত। তাদের মাথার উপর থমথমে ছায়া-মেঘ। অন্ধকার-পতনের পূর্বে আরো কালো কালির স্তূপ জড়ো হয়েছিল চতুর্দিক থেকে।

আল্লার আসমান। সেদিকে সকলে তাকাতে পারে, কোনো ফরমান প্রয়োজন হয় না। মাদবর ঊর্ধ্বমুখ চেয়েই থাকে আকাশের পানে। এবং তেমনই যোগাসনে থেকে সম্বোধন করেছিল,— গফুর, চেয়ে দ্যাখো তো, মেঘ যেন নড়ছে। বোধহয় বিষ্টি হবে।

সকলেই আসমানমুখী।

সত্যি অনেক উপরে মেঘদল নড়াচড়া শুরু করেছিল। বাতাসের শনশন শব্দ শোনা যায়।

মাদবরের মন্তব্য— উপরে মেঘের আনাগোনা। বোধহয় বিষ্টি নামবে। বেশ ঠাণ্ডাও লাগছে। চল জলদি বাড়ি ফেরা যাক।

—চাচা, ও-রকম মাঝে মাঝে হয়, আমিও নিজের চোখে দেখেছি। গফুর জবাব দিয়েছিল।

—দেখো বিষ্টি হবে।

—কিন্তু চাচা—।

—কী বাবা?

—মসজিদের ইমাম আর কবি দুজনে একই কথা বলে। দুজনে কোনো তফাত নেই?

—ওসব আর ভাবি না। যা-হয় হোক, পরে দেখা যাবে।

দলে একজন স্বল্পভাষী শান্ত চাষি ছিল। মাদবরের সমর্থনে সে প্রথম মুখ খুলেছিল— আমারও তা-ই মনে হয়।

৫

বর্তমানে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে যে-কোনো দিকেই যাওয়া যাক, অনেক সময় দিশাহারা হওয়ার একটা প্রচণ্ড লোভ পেয়ে বসতে পারে— যার তাল সামাল দিতে কোথাও ঠেকলেই সোয়াস্তি। কিন্তু ঘটনা সকল মিথ্যা, মিথ্যার মুরুব্বি বা যাচনদার— যে-কষ্টিপাথরে

তোমার চোখ, কল্পনা এবং বিচারবুদ্ধি একখানে না মিশলে সোয়াস্তি গায়েব।

গৌড়গ্রামের হালেচালে দু-এক দিনের মধ্যে তার জের এমন ধরা পড়ল, তখন 'ট্যা ফু' শব্দ উচ্চারণ করবে কী, তার পূর্বেই তুমি হতবাক এবং চেয়ে থাকবে শুধু একই দিকে ও নিজেকে ধিক্কার দেবে— বিশ্বাসের নৌকা কেন মাঝ-দরিয়ায় ছেড়ে দিয়েছিলাম।

প্রথম আর্তনাদের মালিক কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ, যে নর বা নারী— তার উল্লেখ এখনই করতে হবে, অপিচ তেমনি কৌতূহলে ডুব দেওয়া কোনো আক্কেলমন্দের কাম নয়। আর্তস্বর যে-কোনো প্রাণীরই হোক, তার মধ্যে যুগযুগান্তরের সেই অসহায় নিবেদন মাথা খুঁড়ছে— আমাকে মুক্তি দাও, আমি আর পারছি না। এমন ক্ষেত্রে তুমি কিছু ভেদাভেদ রচনার প্রয়াস যদি পাও, তা নিজের বুদ্ধির অহমিকার নিতান্ত পরিচয়-তৎপরতা ছাড়া আর কী! ভেক এবং সাপ উভয়ে যুগপৎ আহ্লাদ বা বিষাদের মুখোমুখি হতে পারে না, যেহেতু দুই বিপরীতে খাদ্য এবং খাদকের সম্পর্ক-সিংহাসনে তারা আসীন। কিন্তু আর্তির যন্ত্রণা তেমন হদিসের কাছ ঘেঁষে পা ফেলেছে, তা কেউ বলার সাহস রাখতে পারে, এমন কোনোদিন শুনি নি। জীবন-নলের দুই মাথা ফাঁপা বলে, বাঁশির মতো তা বাজে এবং সেইজন্য কিছু ছিদ্র অবশ্যম্ভাবী। যারা মেনে নিতে পারে, তাদের কাছে বাতাসে বিচরণ শুধু অসম্ভব নয়, ঘটনার শিং পাকড়ে-পাকড়ে তারাই যত ছিদ্র সৃষ্টি করে তত সুরের আমদানিও প্রবহমান রাখে। প্রথম চিৎকার তাই বৃথা যাবে কি, আলোড়নের মাত্রা এত ঘন এবং নিরেট হয়ে উঠেছিল যে সকলে অন্তত আর লাঠিমের মতো নিজের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে পারল না, বরং ছিটকে-ছিটকে পড়তে লাগল বোমার স্প্লিন্টারের পন্থায়— লক্ষ্যস্থলের চেয়ে বিদীর্ণতাই যেখানে আসল কথা।

বহুকাল স্বামীহারা উত্তরপাড়ার মতিবিবি নিঃসন্তান থাকলেও নিজের চিন্তার চেয়ে বেশি মগ্ন ছিল নিজের দৈনন্দিনতাকে কাদায় পোঁতা গোরুর গাড়ির চাকার মতো ধাক্কিয়ে-ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। ব্রাহ্মমুহূর্ত না ফজর— এসব মর্যাদা-মক্কর (রহস্য) নিয়ে তর্ক উত্থাপনের নির্বুদ্ধিতা মুলতুবি রেখে বলা চলে, অতিঊষাকালে মতিবিবির প্রথম আর্তনাদ গ্রামবাসীর হাড়গোড়ে এমন ঢুকিয়ে দিলে যে সকলে কেঁপে-কেঁপে ওঠার জায়গায় বেশ একচোট হেসে নিয়েছিল।

— কলা— কলা— ক....লা। অতিপরিচিত স্বর তীক্ষ্ম স্তর-পথে এমন দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল যে প্রথমে ভয় পেলেও শব্দার্থের চোটে ঈষৎ রসিকতাবোধ থাকলে হেসে গড়িয়ে পড়ারই কথা।

রমণীগণ ছলাবিশারদ, শাস্ত্রকারদের উক্তি। তৎস্থলে আনাজের খিস্তি-পর্যায়ভুক্ত সংস্করণ কারো কানে শব্দরূপে ধাক্কা দিলে কোনো পবিত্রভাব নিশ্চয় মনে উদিত হওয়ার কথা নয়। এই ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল এবং অপরকে সাহায্যের জন্যে যাদের হাত-পা নিশপিশ করে, তারা এক কান-পথে সবকিছু ঢোকালেও, অন্য পথে উগরে দিতে বেশি সময় লাগায় নি। অমন সময়ে অনেকে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমের রাজত্ব-ভোগের কাছে সব মিলিয়ে দিয়ে খোয়ার হতে রাজি থাকে। তারা কাঁথার সুতোয় হাসি মুছে চোখ আরো বেশি করে বুজলে তন্দ্রায় ছেঁড়া শিকল জোড়া দিতে। যারা হাই তুলে তুড়ি মেরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাঠি হাতে বেরুবে বলে আনচান করছিল, তারা ভোরের নক্ষত্র দেখে হতাশ, দ্বিধার ছাইগাদায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। আলো-অন্ধকার একত্রে মিশে থাকলে, যখন স্পষ্ট হদিস পর্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন ভীরু কাপুরুষ সাহসী জোয়ান এবং বৃক্কের ফারাক প্রায় মুছে যায়। একতরফা ব্যাপারের যতই ত্রুটি থাক, তার মধ্যে অনিশ্চয়তা ফুট কাটতে অক্ষম। কিন্তু ঘটনা এবং ঘটনাপ্রকাশে আয়োজিত শব্দরাজির নিজস্ব অবয়ব খুইয়ে বসলে অন্ধকারে হামা টানে না কেউ। এখানে চিৎকার ধাপে ধাপে এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে ঘুমের রাজত্ব-ভোগী একপলকে আলসেমির মাথায় পয়জার কষালে জোর-জোর। এক, দুই, তিন। শব্দের খেই ধরে-ধরে জনপদ একটামাত্র আছাড় খেয়ে অকুস্থলের দিকে এগোতে লাগল। পক্ষিকুল ভাবলে, গাছে গাছে আগুন লেগেছে এবং দাবদাহ কেবল ক্ষুদ্র খাণ্ডবের কোটায় আবদ্ধ থাকবে না।

বুলান প্রায় ভোরে উঠে ফলমূল বা ফুলজাতীয় কিছু সঞ্চয় করত— যা চৌর্যবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে বা পড়ে না— এমনই সব পার্থিব সম্পদ। কিন্তু সেদিন সে দেরি করে নি, তেজি বাচ্চা বলে শব্দ শোনার পর যখন বয়স্করা পর্যন্ত নানা অর্থ আবিষ্কারে সময় অপব্যয় করছিল। কারণ, চিরকাল মাঠবিহারী তার পরলোকগত পিতামহের কণ্ঠে যে-শেষ শব্দ উচ্চারিত হতে শুনেছিল, বর্তমান স্বরগ্রামে (মতিবিবির নাম সে জানে না) সে যেন তারই অবয়ব দেখতে পেয়েছিল, যদিও সংগীতজ্ঞেরই শুধু এমন জের মনে রাখার কথা।

মা বাধা দিয়েছিল— কোথা যাস? বুলান একটা জবাব যে দিতে অনিচ্ছুক, এমন অশিষ্ট অবাধ্যতার নিন্দালেপ তার মতো পিতামাতা-প্রাণ বালকের উপর বদরাগী বুড়ো কি আজব কায়দায় লেফাফা-দুরস্ত ভদ্র দুর্জন হয়ত মালিশ করতে পারে। কিন্তু বুলানের কাছে তখন সময় ছিল মুখ্য বাক্য এবং তার পরিমাণ আরো মূল্যবান। যেহেতু পিতামহের সতর্কবাণী যথাসময়ে প্রতিপালন না করলে, শুধু শিষ্টাচার অথবা মুরুব্বি-ভজনা দেখালে তার যে-অবস্থা হতো, তাতে নিশ্চয় স্বর্গীয় ঈশ্বর পণ্ডিতের মন-সন্তুষ্টির শাঁস থাকত তার নতুন ঠিকানায়। মায়ের মর্যাদা গৃহদেবীর তুলনায় অধিক বটে, কিন্তু জনক-জননীর সমাহারের নিকটে কি সে-মূল্য বেশি হতে পারে? বুলান চোখ কচলাতে-কচলাতে, সেই আরেকদিন যেমন করেছিল, তেমনই হন্তদন্ত দৌড় ধরেছিল পড়ি-কি-মরি গোছের শপথ চোখে তুলে নিয়ে। মা ভাবলে, ছেলেটা হুজুগে অবাধ্য অথবা নিজের জিদ বজায়ে সিদ্ধহস্ত কোনো দুর্জন— যে নিজের আবেগের মই যথা-খুশি যেখান-সেখান দিয়ে চালনা করতে পারলেই জয়জয়কার ঠাওরায়। অন্যদিকে, আর্ত চিৎকারের নিজস্ব অর্থ না থাকার ফলে, তা যে-যেমন পারে, তেমনভাবেই গ্রহণ এবং উপায় স্থির করে ফেলেছিল। বুলানের পূর্বে যারা অকুস্থলে জমায়েত হয়েছিল, তারা নিছক কৌতূহল মেটাতেই তা করেছিল— এমন অপবাদ দিলে ভুল হবে না। কিন্তু বুলান সেই ঘরপোড়া গোরু— সিঁদুরে মেঘ দেখে সে দড়িদড়া ছেঁড়াছিঁড়ি করে গোঠ থেকে পালিয়ে কোনো গৃহে নয় গোঠান্তরে যাওয়ারই অদম্য প্রয়াসে। সদ্য ভগ্ন-নিদ্রা এবং ভিড়ের আকারগ্রাসী জিভের সামনে ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া বুলান সেদিনও বুঝতে পারে নি, কোথায় কী ঘটছে বা সকল ঘটনাস্রোতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসভূমি কোথায় নিহিত। কিলবিল-রত মানুষের চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতার কেন্দ্র— লক্ষ-লক্ষ পায়ে যাদের জমিন-জরিপ, কিন্তু নিমেষে সাপের বিড়িশে পরিণত হয়। চিৎকার ভাষা বদলে ফেরার দরুন বুলান আরো দিকভ্রষ্ট। তার সরল সুবোধ চাউনি অর্থহীন দৃক-নার্ভের সঞ্চালন ছাড়া আর কিছু না।

মতিবিবির চিৎকার সব হুল্লোড় পেছনে ফেলে যেন দাবড়ে উঠেছিল— সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা...।

বুলানের ঘাবড়ানি মাত্রায় মাত্রায় এমন চড়েছিল যে তখন বয়োজ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ মরদের (আহা, নাবালক!) মুখের দিকে তাকিয়েই সে একটা অর্থ উদ্ধারে ব্রতী। দশানন-দশা, যদিও কেউ রাক্ষস নয়, বুলানকে আরো তিরিশ বাঁও জলে ফেলে দিয়েছিল, প্রবীণ বাঁশও যেখানে থ দিতে অপারগ। শব্দগুঞ্জনের কোনো অর্থ না বুঝলেও তার আন্তরিক দ্যোতনা জানান দিচ্ছিল, সকলেই কিছু করতে ব্যগ্র।

বুলান দেখেছিল, মতিবিবি ধুলোর উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, পিটুনি খাওয়ার পর প্রতিবাদসিক্ত অভিমানে সে যেমন করে। তারপরই তার চোখে পড়ে শোকান্বিত রমণীর আঙ্গুলিনির্দেশের নিশান যা অন্ধেরও দিব্যদৃষ্টি যোজনা করতে পারে। তাকে দ্বিতীয় দফা বিস্ময়ের চাবুক ভোগ করতে হয়, যেহেতু তার দুই চোখের উপর আস্থা সে খুইয়ে ফেলছিল। সবুজ। সবুজ পাতা। বাউরি বাতাস, বাতাস দিলে অথবা ঝামাল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে সে ওই বনে কতদিন না আশ্রয় নিয়েছে এবং নেমকহারামের মতো ফন্দি এঁটেছে; পাকধরা রঙ, এবার কাঁদি না হোক, ছড়া তো নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু কোথায় সে কদলীশোভিত উদ্যানের জেল্লা অথবা জৌলুস? খনার বচননির্দেশে অথবা নিজের বুদ্ধিতে মতিবিবি সত্যি তিনশ ঘাট ঝাড় কলাগাছ রোপণ করে তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত যোগাড় করত। সেই বাগানের উঠানে, হ্যাঁ উঠানই বলতে হয়,

ধুলো না উড়লেও কলাগাছের কটা গুঁড়ি শুধু উবু বুড়ির মতো বসেছিল— যেন উকুন-চয়ন-রত অথবা নিজের শোকের ভারে ভূলুণ্ঠিত মুখ গুঁজে ডুকরে কাঁদছিল এবং সেই জন্যে মনে হয়, মূর্তিটা আসীন, যদিও বাস্তবে তা নয়। শস্যশ্যামলা মৃত্তিকার যে-মূর্তি সুখ দান করে, বর দান করে, তার চিহ্নমাত্র অক্ষিপটে কোথাও জমা রাখা এখন দুঃসাধ্য। বুলান স্মৃতির দ্রুত পরিক্রমার শবরী কাঁদির কয়েক ফলা অপহরণের আনন্দ সমপরিমাণ যন্ত্রণার সঙ্গে বিনিময় করতে লাগল। এতক্ষণে সে ভিড়, মতিবিবি ও বয়স্কদের উদ্বেগের একটা স্বচ্ছন্দ হিসেব কিশোরসুলভ বুদ্ধি দ্বারা নিজের আয়ত্তে আনতে পারল আর তখনই সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঢেলা ছুড়তে লেগেছিল যেন আততায়ী ওই চাঁচর, তছনছ জমিনের উপর খাড়া রয়েছে। মার কাছে শোনা মতিবিবির শত-শত কাহিনীর মধ্যে সে একটা প্রতিমা গড়ে তুলেছিল এবং জেনেছিল, সত্যিমিথ্য যা জানে, মতিবিবির বয়সের গাছ-পাথর নেই— বর্তমানেও নির্জাত। বাগানের ফলমূল বিক্রিই যার জীবিকার প্রধান উপায় সে খরিদ্দারের মধ্যে নানা বেড়া তুললে ফলত উপোস মরবে। সাধারণ পশারিণীও জানে এই সহজ ব্যবসার নিয়মকানুন এবং রেওয়াজ। মার কথা, পিতার কথা, শত-শত বিংবদন্তীর রূপকাহিনীসুলভ জেল্লার তুফানে, বুলান জনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে, ভেসে যেতে লাগল একটা অন্ধ আক্রোশ বুকে পুষে— যার উত্তাপ সে বের করে দেবেই আজ হোক, কাল হোক।

আকাশ আরো ফরসা হতে কোলাহল-তামাসা জমে উঠেছিল। খুব নিকটে, যেথা কারো চোখ এতক্ষণ ধায় নি। গৌড়গ্রামের একটা অশথগাছ কত শতাব্দীব্যাপী পুরুষানুক্রমে মানুষ, জীবজন্তুকে দিয়েছে, ছায়া, পক্ষীদের আহার, নীড় এবং দুরন্ত-দামাল কিশোরদের ঝড়ের দিনে গুঁড়ির পাশে কোটরে গুটিসুটি আশ্রয়-স্নিগ্ধ নিরাপত্তার উত্তাপ এবং সম্ভব করেছে তুমুল বজ্রাঘাত ও শিলাবৃষ্টির আতঙ্ক-গর্ভ মনোরম দৃশ্য দেখতে। সেই বৃক্ষ ন্যাড়া তালগাছের মতো ন্যাংটা দাঁড়িয়ে আছে, না ওটা আর কোনো বৃক্ষ রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে, প্রাচীন বাসিন্দাদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে? সকলে দৌড় মেরেছিল সেই পানে, মতিবিবিকে এবার নীরবে কাঁদতে দিয়ে যেন অমন নাসিকা ক্রন্দনে কারো কোনো কিছু আসে যায় না। অশথগাছ। পত্রহীন। সত্যি! বাকলের গা দেখার জন্যে যতই চেষ্টা কর আর দেখতে পাবে না কারো চোখ, তা যতই দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হোক। কিলবিল করছে পোকা সহস্র, নিযুত, অর্বুদ— সংখ্যার প্রশ্ন তুললে এখানে, তুমি প্রতারিত হবে। অনেক। অশথের গা কুরে-কুরে খাওয়া। জমাট ভিড় থমকে নির্বাক দৃশ্য দেখতে লাগল দুর্দশার নয়, বরং বৃক্ষের— যা এই গ্রামে ঐতিহ্যের মতো দিগ্বিদিক শিকড় মেলে এতদিন ছিল কোনো প্রাচীন দেবতার মতো নিজের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেয়ে স্নেহে ও মমতায় উদ্ভাসিত।

বুলান এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল যদিও এক বিরাট চিৎকার তার অন্ত্রে অন্ত্রে ফুকার দিতে গিয়ে হঠাৎ বায়ুহীন। গলার শিরাগুলো দগদগে ঘায়ের মতো কাঁপল না শুধু ঝিলিক দিলে যন্ত্রণার নয়, নিঃসাড়তার।

অতঃপর সূর্যের আলোয় চোখ ফুটতে লাগল তেমনই শুধু কাহিনীর নয়, কত ঘটনার কুঁড়ির। কারো বাগান, কারো গাছ, কারো ফসল, কারো বাঁচার অবলম্বন বা আর কিছু— এমন এন্‌তার শুধু খেই টেনে যাও— শেষ হবে না সব শেষে।

মোহাম্মদ অলী কবির পূর্বোক্ত রায় বহাল রইল যদিও মসজিদের ইমাম যোগ করেছিল আরো এক উপাদান : গজব—অভিশাপ।

বৃদ্ধ সুরত মণ্ডলের চোখের দৃষ্টি তখন ঝাপসার পর্যায় থেকে আরো এত নিচে নেমেছিল যে তাঁকে অন্ধ বলা আর আদৌ বিদ্রূপ নয়। তার কাছে গফুর গিয়েছিল সংবাদ দিতে, যার জবাব তিনি এককথায় শেষ করেছিলেন, "পঙ্গপাল নেমেছে— পঙ্গপাল। ক্ষেত, জমিন, সবুজ আর কিছু থাকবে না, সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে— পঙ্গপাল, পঙ্গপাল।"

৬

নামে কিছু আসে যায় না, যারা বলে, তাদের বস্তু-মাহাত্ম্য সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞতা বহুৎ। এখানে অবিশ্যি মোহাম্মদ আলী, মসজিদের ইমাম, সুরত মণ্ডল প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি ছিল কোনো অজ্ঞাত জীবের নামকরণে, বিশেষত তা যদি দৈবাৎ এসে পড়ে। একেক জনের লম্বা ফিরিস্তি দিতে গেলে অনেক সময়ের অপব্যয় এবং তারপরও ব্যক্তির

AMARBOI.COM

সীমানা ডিঙানো যাবে কি না, তার নিশ্চিত আশ্বাস কোথায়? তাই সকল প্রশ্নের একমাত্র জবাব দেওয়ার রীতি অনুসারে বলা যাক, ওই জীবের নাম পঙ্গপাল এবং তা মানুষের মতো দলবদ্ধ জীবনযাপন করে।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ঝরনার লাফিয়ে-লাফিয়ে চলাকালে জলের ফেনবিন্দ্রর বিস্তার-লীলার সঙ্গে হাজার হাজার উড্ডীন মরালের সন্ধান পেয়েছিলেন। পঙ্গপাল এমন কায়দায় ওড়ে না। একথা যেমন সত্যি, তার দলবদ্ধতার হদিসও তেমন সত্যি। জীববিশেষজ্ঞদের মতামত পরে দেওয়া যাবে। তা পূর্বে থেকে বলে রাখা শুধু প্রতিশ্রুতি নয়— তা ছাড়া অন্যান্য বিকল্প অসম্ভব। একটা জিনিস আমরা যে-যার-মতো ধারণা করে নিতে পারলেই তো আর বৈশিষ্ট্যের অদলবদল হয় না। এমন ঘটলে স্বর্গ-রচনা এত সহজ হয়ে পড়ত যে তখন নিষ্ক্রিয় মনের লাগাম খুলে দিলে কাম ফতে, যদিও বা কী ঘটল তা বোঝার মতো তোমার শক্তি গায়ে থাক্‌তে পারে। ফলাফলের এমনতর উৎপাত বিধায় তুমি আমি সকলে এক ঘাটে এসে পৌঁছাই এবং একে-অপরকে চিনতে পারি। নচেৎ ভাসতেই থাকতাম যেমন আবেগ ভেসে যায় নিজের টানে যখন হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো বৃদ্ধির আহবান পেছনে খামখা গর্জায়।

ক্রমে ক্রমে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল হাতের চেটোর মতো, যেখানে আর সূর্যের আলোয় বাধা পড়ে না। এতদিনে সকলে যা মনে করেছিল ছায়া-শীতলতা, তা আকাশের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে সূর্যকে ঠেলে দিতে লাগল ক্রমশ উত্তাপের পথে। এসব নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এবং সেজন্য কারো কোনো উদ্বেগ ওৎপাতা বাঘের মতো ঝম্প দিয়ে উঠবে, তেমন কিছু হতে পারে না। বিপদের মাত্রা পরিষ্কার হয়ে উঠল যখন দৈনন্দিনতার পথে পা বাড়াতে গিয়ে দেখা গেল, চতুর্দিকে লিকলিকে সাপ কিলবিল-মত্ত।

তাদের গ্রামের বাইরে মানুষ আছে, গফুর সবসময় শুধু প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করত না, বরং আরো মনে করত যে আক্কেল বুদ্ধির ব্যাপারে দশজনকে জিজ্ঞেস করাই ভালো এবং তা কেবল গৌড়গ্রামে আটক রাখা অন্যায় এবং ডাহা মুর্খতা। অনেক সমস্যা, অনেক প্রশ্ন উঠেছে, অনেক অসুবিধা ঘটেছে, অনেক বচসা শুরু হয়েছিল ঘরের মধ্যে, পাড়ার মধ্যে, দুই দলের মধ্যে— এমনকি একই দলের শাখা-উপশাখার ভেতর। গফুর তার গাড়ি জুতেছিল। সফরের উদ্দেশ্য পেছনে যতখানি ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল আরো দশজনের কাছে সে জানবে, তার মতো মূর্খ মানুষেরা যখন কিছুই বোঝে না তখন তাদের বুঝিয়ে দিতে পারে— এমন মানুষের নাগাল কোথা পাওয়া যায়? বউ সখিনা মনে করত বাড়ির আঙিনার সীমানাই দুনিয়ার সীমানা হওয়া উচিত এবং একান্ত যদি তা না ঘটে, খুব-জোর পাড়া পর্যন্ত যথেষ্ট, না হলে গ্রামের চৌহদ্দিই চৌদ্দ ভুবন, দশদিগন্ত। তাই নারী-বিবর্জনের গুরুবাক্য স্মরণ রেখে গফুর এক অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়েছিল পির-পয়গম্বরদের নাম মুখে এবং দরুদ (মন্ত্র) জপে-জপে। ফৌত্ পিতার আত্মা তার সঙ্গী ছিল কি না, জানা না গেলেও, এই অনুমান মিথ্যে নয় যে সে জনকের অসহায় অপমৃত্যু আজও ভোলে নি এবং সেইহেতু বলদের পাঁচন বাড়ি কষাতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল অবোলা জন্তুর প্রতি অনুকম্পাবশত, যা পিতার জন্যে প্রথম উৎসাহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং প্রাণীর উপর অর্পিত। কিন্তু গ্রামসীমানার শেষে গোরুগুলো হাঁপিয়ে উঠতে লাগল এবং অনিচ্ছাকৃত একটা চাবুকেও আর এগোতে নারাজ, সোজা মুখ থুবড়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। পতঙ্গ উড়ছিল চতুর্দিকে শত, হাজার এবং পর্যায়ে পর্যায়ে যতই এগোও সংখ্যার পরিধি বর্ধমান। পাতলা কুয়াশা ক্রমশ ঘন হওয়ার কালে প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও আবছা কিছু দৃষ্টিগোচর অন্তত জানান দিয়ে যায়। তারপর আর নিজেকেও দেখা তো যায়ই না, বরং ভীষণ ধাক্কা বাড়িয়ে দেয়, যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান— সম্পর্কে সচেতন হও, কিন্তু তা আর চোখের প্রতিবেশী নয়। হাত আছে নাড়ছ। অথচ নেই। এই চেতনায় নিজেকে প্রেতাত্মা বানাতে হয় স্রেফ বায়বীয় আকারে নয়, বরং বাস্তব কাঠিন্যে— যা মৃত্যু সন্নিকটে করে। গফুরের বুকের পাটা সুমেরু-কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত কি না, তা নিয়ে ফাহ্সা তর্ক একটা না তুলেও সিদ্ধান্তে আসা যায়, সে দম থাকতে কম করে নি। হাজার হাজার পোকা যখন এপাশ-ওপাশ-রত ঠোক্কর খাচ্ছিল তার গায়ে বুকে মুখে, সে নতমুখ গোরুর গলার দড়ি ঠিক রাখছিল। হে-হে-শব্দ যথাসম্ভব অব্যাহত। কিন্তু অবলা জীবের উপর যতই নিষ্ঠুরতা দেখাক সে, তাদের 'জানু' জিভে এসে ঠেকছিল। গফুর ভাবে যদি, মাঠের ঠিক মধ্যিখানে তার বাহন আর এগোতে না পারে এবং গোরু দুটো মরে যায়, তখন কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকার (সুরত মণ্ডলের কাছে শোনা) দশা হবে। তখনো সময় বাগে, আয়ত্তের ভেতর এবং হুঁশিয়ারি হেঁকে যাচ্ছিল,'তফাত যাও, পালাও, দুঃসাহস দেখিও না।' বলদ দুটো ঈষৎ আস্কারার প্রত্যাশায় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, দড়ি একটু শ্লথ করা মাত্র। দুই প্রাণী একদৌড়ে একদম গাঁয়ের সীমানার মধ্যে— যেখানে নিরাপত্তা শতে শত না হলেও তিরিশ। গফুর একবার ভেবেছিল, সবাই মিলে, পোকাগুলোকে পিটোলে কেমন হয়? কিন্তু তখনই মনে পড়ে গিয়েছিল মোহাম্মদ আলী এবং মসজিদের ইমামের কথা। কিসে কী হয় তা মানুষ অত সহজে বুঝতে পারে না। সবুর করে যাও। এগুলো যে ছদ্মবেশী আশীর্বাদ নয়, তার জবাব কে দেবে? তাই গফুর হাঁফ ছেড়েছিল মাদবরের উঠানের ঠিক সাম্‌নাসামনি যেখানে ছেলেপুলেরা খেলছিল— দুনিয়ায় কোনো সমস্যা নেই, এমনই নির্ভাবনায়। একটা জিনিস গাড়োয়ানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আর বাইরের কারো সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটবে এমন সম্ভাবনা কম নয়, অতি দুরূহ।

গফুর তখনো গাছপালার সবুজে বিস্তারিত আকারে পতঙ্গের হামলা শুরু হয় নি জেনে পূর্বাভাসস্বরূপ প্রশ্নটা উত্থাপন করেছিল মাদবরের সঙ্গে। অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই—প্রবাদটি পরদিন থেকেই গৌড়গ্রামে আবার চালু হয়েছিল যেন এতদিন কোনো আপ্তবাক্যের প্রয়োজন ছিল না কারো। মাদবর গ্রামের প্রধান হলেও লেখাপড়া জানা মানুষের কাছে স্বভাবজ বিনয়ে এমন নুয়ে পড়ত যে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ধ্বংস করে দিতেও দ্বিধাহীন। এই নিয়ে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল গফুরের মনে এবং তা প্রকাশে ভীরুতা দেখালেও শেষ পর্যন্ত মাদবরের স্নেহাতিশয্যে সে কোনো খুঁত পায় নি। অবিশ্যি সে নিজে ভাবতে শুরু করেছিল ধীর-ক্রমিকতায়। যেহেতু গ্রামের বাইরে যেতে না পারলে রুজিরোজগার শুধু বন্ধ হয়ে যাবে না, মৃত্যু সত্বর না হোক ঈষৎ বিলম্বেও তাদের অর্থাৎ গ্রামের তার মতো বহু মানুষের গলা টিপে ধরবে। টিকে থাকার মতো যে-দুচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন আছে তাদের কর্তব্যের মধ্যে না-ফেলাই মঙ্গল। ছোটখাট উৎপাত বিরাট অমঙ্গলের বেশে দেখা দিতে কি অনেক-অনেক সময়ের অপচয় লাগে, না তেমন আশঙ্কা অমূলক। যেমন মাদবর তেমনই আরো বর্ষীয়ানদের গফুর ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে দেখেছিল বা শুনেছিল। হেন কর্ম গফুরকে বড় উত্তেজিত করে তুলত এবং সে সমবয়সীদের সহজ ভাষায় যা বলত, সাধু ভাষার তার প্রকাশ,'রমণ-কালের ঘনঘন শ্বাস দীর্ঘ হয়, যার অর্থ পরবর্তী মুহূর্তে চরম সুখ আসন্ন'। কিন্তু বৃদ্ধের দল কেন শ্বাসপ্রশ্বাসের অমন অমর্যাদা করে, বোঝা দায়। সঙ্গীরা হেসেছিল প্রাণদ হাসি নয় বরং চেষ্টাকৃত— যা একটা ছুতোর মতো মিথ্যের সঙ্গে অর্থবান বা শোভামণ্ডিত হয়। অবিশ্যি একা গফুর নয়, অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিল এই অমঙ্গলের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্যে। দিন বসেও থাকে না, শুয়েও থাকে না, যেহেতু চলে। তাই ভবিষ্যৎ শুধু অন্ধকার নয়, গতিশীল যন্ত্রের মতো তার সহজ পরিবহণ-ক্ষমতা স্বতঃসিদ্ধ, আবার ঠোক্কর খেয়ে আধার-আধেয় সবই চূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। মাদবর যে এসব ভাবত না, তা নয়ই, বরং সে তার পিতৃমাতৃহীন নাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে সব দিনক্ষণকাল মিলিয়ে দেখত। বর্তমান মাতামহের গলগ্রহ এই ছেলের মাও তার বড় ন্যাওটা ছিল। কন্যার স্মৃতি পুষে আছে বৃদ্ধ সেই কবে থেকে, ছেলেটা যখন কোনোরকমে হামা টানত। বর্তমানে আট-ন বছরের ফুটফুটে বালকের আকাশস্পর্শী আবদার মাতামহ রক্ষা করত বিনা-বিরক্তিতে। নতুন ঘটনা নয় এসব এদেশে। তারই জের টেনে চলছিল মাদবর শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। জীবনের সব আগ্রহ নিভে গেলে ছোট গণ্ডির উপর মন ঝাঁপিয়ে পড়ে। গফুর এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে অমঙ্গলের প্রসঙ্গে দৌহিত্রকে অনুপস্থিত রাখত না। একটা কথা যেখান থেকে উৎসারিত হোক, হোঁচট খেয়ে ঠেলে গিয়েছিল একটি মাত্র সিদ্ধান্তের গর্তে : আর কেউ গ্রামের বাইরে যেতে পারবে না।

মোহাম্মদ আলীর নিকট বার্তা পৌছলে সে প্রথমে তা হাসির হাওয়ালায় সঁপে আরো তন্নিবেশ কাব্যচর্চায় মন দিয়েছিল। যা ঘটে তা সত্য নয়। এই আপ্তবাক্য এবং কৌতূহলের আবেশে অন্যমনস্ক কবি অবহেলায় থুতনির উপর আরো তিনগাছা দাড়ি পর্যন্ত গজিয়ে ফেলেছিল। যেহেতু তিনের বাইরে যেতে চাইলে ওই মাকুন্দ-মুখে ঝোপের সম্ভাবনা স্বপ্নমাত্র।

৭

সশব্দে কান্নার মধ্যে কতরকম ফারাক থাকতে পারে, তার হদিস অনেকে ওলটপালট করে দেখতে অনভ্যস্ত। এখানে স্বতঃসিদ্ধ এবং চিরাচরিত সিদ্ধান্ত সব একাকার করে দেওয়ার মূলে সেই ইচ্ছাই বলবৎ থাকে যে সর্পাঘাত যদি শিরেই হয়ে তাকে, তখন গণ্ডদেশ না গর্দানের পাশে, তা নিয়ে আর কূটকচাল তর্ক তুলে মুনাফা কী? কিন্তু উন্মাদকুল যদি মনঃসমীক্ষণবিশারদ হতো তাহলে পাগলামি সেরে যেত, এমন কথা কেউ হলফ-সহ বলতে পারে না। তবে সম্ভাবনা যখন বর্তমান, আশা পোষণ বা বিশ্লেষণ করতে কারো অনীহা থাকা অনুচিত। অন্যপক্ষে, নীরব কান্না যা কেউ শোনে না বা যার লক্ষণ অশ্রুবর্ষণকারীর অবয়বে পর্যন্ত অনুপস্থিত, তখন সমস্যা জটিল। অথচ রাস্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোড় বা মোচড় ইত্যাদির মতো সব কান্নার জল শেষপর্যন্ত এক গন্তব্যে পৌছলেও, তাদের গতিপথ জানান দেবেই সূত্রপাতের ধারাটা কেমন। গৌড়গ্রামের দুঃখী মানুষরা চিরদিন ঊর্ধ্বপানে মুখ তুলে ফরিয়াদে অভ্যস্ত বিধায় দেখা গেল, যখন আকাশ থেকে গজব (অভিশাপ) নাজেল (অবতীর্ণ) হয়েছে তখন তার মধ্যে অস্বাভাবিক কেউ কিছু দেখে নি। কাঁদতে হয়, কান্নায়, কান্নায় চোখের মণি গলা সিসার মতো বুকপথে দরদর নামিয়ে দাও। কেবল চক্ষু উপরের দিকে সোজা রাখো। অপিচ তুমি দৃষ্টিহীন। কিছু আসে যায় না।

অবিশ্যি বুলানের মতো অল্পবয়সী যাদের কাছে অজ্ঞাত গজব এবং আশীর্বাদ একই স্থান থেকে উৎসারিত কিনা, তারা সীমাবদ্ধ করে নেয় নিজেদের কান্নার ফিরিস্তি। তাদের চোখ আকাশপানে যাওয়া দূরের কথা, মাটি ছেড়ে যেতেই শেখে নি। অভীষ্ট গন্তব্য সেখানে সংকীর্ণ হওয়ার ফলে, তার মধ্যে সেই বীজ লুকিয়ে থাকে যা মাটিতে বৃক্ষের মতো সকল শিকড় চালিয়ে দিতে পারলেই খুশি এবং সেই টানেই বৃক্ষের মতো তা আকাশ-ব্রজনার অভীপ্সা লাভ করে। বুলান কেন, যাদের বয়স আরো কম হাঁটি-হাঁটি-পা তারা নিজেরা অঙ্কুর বিধায় মাটির সঙ্গে লেপ্টে থাকতেই বেশি আগ্রহশীল। প্রকৃতির নিয়ম যেমন লতায় পাতায় তেমনই মনুষ ক্ষেত্রে প্রয়োগক্ষমতা জাহির করে, পণ্ডিতেরা বলেন।

অভাবের সংজ্ঞা দিতে গেলে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়, এমন মারপ্যাঁচ তারাই ফলাতে পারে অনটন যাদের স্পর্শ করে নি। শিশু-কিশোররা কিন্তু সহজেই হাদিস বুঝার তার বাইরে থেকে পায়, এমন ঘটে না। বরং তাদের ভেতরেই স্বপনবুড়ো ঠিক উল্টোমূর্তি ধারণ করে, সবক দিতে থাকে এবং পড়ুয়াদের বুঝিয়ে দিতে তার বিলম্ব হয় না :

শ্বেতশুভ্র দুগ্ধ।
অমল ধবল পাল।
শ্বেত রাজহংস
মেরু-তুষার।

গৌড়গ্রামে কিন্তু কচি ছেলেদের চেহারা শাদা হতে থাকে। চোখের কোণে আর রক্তকণিকা উত্তাল হয় না বা নিচে হাতেই দ্যাখো নখ পর্যন্ত লালিমা হারিয়ে ফেলেছে তলার চামড়ার সমর্থন-অভাবে। এই সময় কল্পনার পাল ফুটো হয়ে যায় এই জন্যে যে মরু-তুষারের শৈত্য মজ্জা ধরে টান দিচ্ছে, রাজহংস অন্যান্য বন্যহংসের ডানায় হেথা-নয়-হেথা নয় জাতীয় প্রচরণশীলতার মন্ত্র কানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সতর্কতা হিসেবে নয়, বরং বাঁচার ঐশী বাণী-রূপে। কিন্তু বিহঙ্গ যত দ্রুত নভো-সোপর্দ হতে পারে নিবাস-সন্ধানে, মনুষ্যসন্তান তত সত্বর ডেরা পরিত্যাগে যেমন অসমর্থ,বাঁধতেও তেমন অপারগ। মাটির সঙ্গে যোঝাযুঝি যেখানে নিত্যকর্ম সেখানে ঊর্ধ্বমুখী মেঘ দেখা চলে, তার চত্বরে পা রাখা যায় না। এই জায়গায় কল্পনা দরকার হয়, তা-ও কিন্তু মাটির উপর দাঁড়িয়ে।

ছেলেগুলো সব হাড়-জিরজিরে, ঘোড়া হলে, কেউ পক্ষীরাজ সম্বোধন দ্বারা রসিকতা করত। খড়ের গাদার নিচে পড়ে-থাকা ধানের যে চারা গজায়, তা যেমন বিনা সূর্যকিরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্যাকাশে, বাচ্চাদের মুখের আদলে সেই রঙ। অথচ শাদা দুধ পেলে সব ধুয়ে ফেলা যেত এত সচ্ছন্দে এবং সহজভাবে যে আর কিছুরই প্রয়োজন হতো না। বিষে বিষক্ষয়ের মতো শাদা দিয়ে শাদা তাড়ানোর কৌশল গৌড়গ্রামে এত অপরিজ্ঞাত যে মগজ খুঁড়লেও কোনো চিহ্ন মেলা দুষ্কর। তাই বালকেরা, বালিকারা কাঁদতে লাগল— লাগল— যখন উপায়ান্তর না দেখে তাদের বুকে কিছু লাগল না কেবল, পেটও জ্বলতে লাগল। অবিশ্যি আবার শক্ত ডাঙায় ফিরে গেলে দেখা যেত, ঘাসের অভাবই আপতত এই এক জায়গায় নানা সমস্যা গেঁজিয়ে তুলছিল। শস্যশ্যামলা, চিরসবুজ এলাকাগুলো রাতারাতি কখন পতঙ্গ-আক্রমণে ন্যাড়া আচোট জমিতে পরিণত হবে, তা কেউ বলতে পারে না। গোচারণ মাঠ আর মাঠ নয় যে ধুলো শুঁকেই হিল্লোল-কোকুদ জীবজন্তুর দল নৃত্য শুরু করবে বা আধেয়-ভর্তি স্তনাধার, গলকম্বল নেড়ে-নেড়ে বাড়ির দিকে ছুটবে— গৃহপালিত প্রাণীর যা অভ্যেস। রোমান্টিক ঘণ্টার আওয়াজ চাও সন্ধ্যাগমের অগ্রভাগে, এতদিন যাতে অভ্যস্ত ছিলে স-টেকুর, তাহলে তুমি ভুল করবে না— মূর্খতার পরিচয় দেবে। কারণ, আর গোধূলি নেই এবং নেই হওয়ার হেতু গো-পাল স্ব-স্বভাব হারিয়ে ফেলেছিল যেমন খুইয়েছিল মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার এইরূপ রোমান্টিকরা বুঝত ওই ঢেকুরের কাব্যিক সংযোজন হিসেবে, ভরা পেট থেকে যার উৎসারণ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

বুলানরা আর মাঠে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে না, প্রায় সদ্য-বিয়ানো চার-পাঁচ দিনের গোরুর বাছুরের সঙ্গে পাল্লা-দানের ভঙ্গিতেই এতদিন যার তুলনা বিধিবদ্ধ ছিল। এবার বিধি আছেন বটে,তবে বদ্ধ করে দিয়েছেন তাবৎ উপাদান যেখানে স্বতঃস্ফূর্ততা নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত। সবুজ-সবুজ ঘাস,সবুজ-সবুজ দেশ. সবুজ-সবুজ প্রাণ— সব বুঁজে গেলে অল্পদিনের মধ্যে, যদিও এমন ক্ষেত্রে শতাব্দী মন্বন্তর দশক প্রভৃতি টেনে আনেন ঐতিহাসিকরা। মোহাম্মদ আলী অন্তত ইতিবৃত্তের এই জের তখনো বজায় রেখেছিল, যে মনে করত, সময়ের পরিমাপ অনন্তের মাপকাঠিতেই হওয়া বিধেয়। কিন্তু বুলানরা বে-সবুর কাঁদত অকারণে নয়— জ্ঞাত হেতুর আশ্রয়ে অসহায় এবং অবুঝ।

কবি মোহাম্মদ আলী বলেছিল তার আত্মীয়দের কোনো একজনকে, যে আবার কথাটা চালিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় কানে এবং এই ধারায় শত-কান হওয়ামাত্র রব উঠল : কামধেনু, কামধেনু। একটা কামধেনু পাওয়া গেলে, শিশু কিশোর অসুস্থ রোগী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা— তাবৎ সকলের সমস্যা মিটে যেত। মুনি-ঋষিদের কথা কৃষিযুগেই অচল হয়ে যাওয়ার ফলে প্রকৃত ঘটনা আর প্রাকৃত থাকে না, বরং কিংবদন্তীতে পরিণত হয় যা মাদবর অগয়রহ এমনকি গফুর বা সুরত মণ্ডল বুঝতে পারবে— তা দুরাশা। চোখ-ঠারা যায় যেমন বিবেককে বা সৎ প্রত্যয়-জাত ইচ্ছাকে— তেমন স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিপদে আটক পড়লে অমন ভেদরেখা মুছে যায়। ঈশ্বর-স্মরণে কম্পিতকলেবর বন্যার সময় একই বৃক্ষে সাপ ব্যাঙ ইঁদুর বেজি এবং দ্রষ্টা মানুষ, যিনি হয়ত নাস্তিক। গেরস্থর ধেনু কামধেনু হয় কি না, তা বিচার করে দেখার জন্যে প্রচুর অবকাশ প্রয়োজন। অকালে ফুল ধরলে বৃক্ষের নাম হয় বারোমেসে। গৌড়গ্রামের মানসপটে এমনতর ভাবনার হাম্‌লা। মরীচিকা সাহারার মধ্যে বিভ্রান্ত পথিকের মৃত্যু সন্নিকট করে তোলে যে-মোহ-বিস্তার মারফত, তা আশীর্বাদ বইকী— যখন দগ্ধানির তুরপুন আর দীর্ঘ বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেধ-গভীর হয় না।

—মা।

—কী বুলান।

—আমার মাথা ঘুরছে।

—শুয়ে থাক।

—শুয়ে থাকব?

—হ্যাঁ।

—মরার সময় মানুষ শুয়ে থাকে কেন?

—বালাই ষাট,কী অলক্ষুণে কথা।

—না, মা। সত্যি শুয়ে থাকে কেন?

—মরা লোক কি খাড়া থাকতে পারে বাবা।

—তবে আমাকে শুতে বলছ কেন?

—দৌড়াদৌড়ি করলে আরো ক্ষিধে পাবে। তুই আবার দুধ-দুধ চিৎকার করিস।

—পোক্‌গুলো—।

—ছি ছি পোক্ বলতে নেই।

—তবে লোক বলব নাকি?

—কে জানে, ওগুলো কী। চুপ থাকাই মঙ্গল।

—জানো না, পাট-চাষ বন্ধ করার হুকুম।

—কেন?

—পোক বাড়ে।

—আবার পোক?

—খামখা ধমক দিও না। জমিন খেয়ে যাচ্ছে, চাল আর বাইরে থেকে আসবে না। তাই পাট-চাষ বন্ধ। মাদবর বললেন।

—ভালো কথা।

—কিন্তু আমাদের তো পাটের জমিনই বেশি। ধান হয় না।

—সকলের কপালে যা আছে আমাদেরও তা-ই হবে।

—কপাল না হাতি।

—তুই খেলতে যা।

—কেউ খেলতে আসে না।

—তবে শুয়ে থাক।

—তুমি মাঠে গেলে দেখতে কত ন্যাড়া। আর চাষ করে লাভ কী? কখন খেয়ে যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

আমি কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি, আমি পোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করব। মাদবরপাড়ায় আমার কাকা আছে গফুর। সে-ও তা-ই বলে।

—পোক— ছিঃ ছিঃ, বলতে নেই।

—আর কোনো শব্দ বেরোয় না তোমার মুখ থেকে। খালি ছিঃ আর ছিঃ।

AMARBOI.COM

—তোর গফুর কাকা কী বলে?

—সে যা বলে তুমি কানে আঙুল দেবে।

—ছিঃ ছিঃ।

—আমিও তা-ই বলি। পোকের চেয়ে লোকের দাম কম। এ হয় নাকি?

—কী সব যে শিখেছিস—?

—আমি দুধ খেতে চাই, মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে চাই। আমি—।

—খাবে বইকী বাবা। মসিবত আর কদিন থাকে।

—কদিন কদিন করে ক'সাল কাটিয়ে দিলে।

মা আর জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যখন কাঁদতে লাগল, পুত্র চুপ করে গেলেও তার নাকের ডগা ফুলে ফুলে উঠছিল। প্রতীয়মান হয়, সেও কাঁদছিল, যদিও নীরবে, এবং তা নিছক কান্না নয়, গুমরে-ওঠার এক নিঃশব্দ পর্যায়।

৮

বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হলে, কী প্রতিক্রিয়া ঘটে, সে সম্পর্কে গৌড়গ্রামের কেউই তেমন ওয়াকিবহাল না-থাকা বিধায় চাপবাঁধা অসুবিধা তখনো অপ্রকট ছিল। যে-যার গণ্ডির মধ্যে ধানাইপানাই করছে তো করছেই এবং তেমন সহানুভূতির প্রত্যাশার জন্যে দৌড় মারছিল না। অর্থাৎ অসুবিধা একসারিতে তখনো তেমন দাঁড়ায় নি যে একটা সেনাবাহিনীর মতো কুচকাওয়াজ-কালে জানান দিয়ে যাবে : এই আমরা চলছি সঙ্গীন, কিরিচ হাতে, যদি বাধা দাও, মঙ্গল নেই তোমাদের। বহু দীর্ঘশ্বাস একত্রে মিললে তপ্ত বাষ্পে পরিণত হয় না শুধু, তার একটা এমন গুণগত পরিবর্তন ঘটে যে কেউ আঁচও করতে পারে না, এই বায়ুর উৎসভূমি কোন বক্ষ-পঞ্জর। ধাপে ধাপে এগোনোর রেওয়াজ প্রকৃতি বেঁধে দিয়েছে বলে বোধহয়, এখানে সবকিছু বেশ বিলম্বে ঘটছিল। এমনকি যে-পঙ্গপাল রাতারাতি গ্রামকে-গ্রাম উজাড় করে চলে যায়, তা এই ক্ষেত্রে ঘটতে দিচ্ছিল না। একথা খুব সহজে বোঝা যায়, যদি লোকগুলোর দিকে তাকাও। অসোয়াস্তি আছে, কিন্তু মনের সেই অবস্থা নেই, যা দিয়ে মানুষ এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে গমনের বাসনা পোষণ করে। অথবা এমনও হতে পারে, পঙ্গপালগুলো বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল, বেশি চোটপাট চালালে প্রতিপক্ষ মরিয়া হয়ে ওঠে— যা আদৌ মঙ্গলজনক নয় এবং অন্যদিকে রসদ তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার কথা। তার চেয়ে ধীরে ধীরে বহুদিনের নিরাপত্তা বজায়ের জন্যে বরং কিছু শ্লথগতি হওয়া উচিত। এসব নিতান্ত অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত হওয়ার দরুন সোজাসুজি স্পষ্ট কিছু বলার দাবি নিতান্তই বুদ্ধি-অগ্রাহ্য। তবে লক্ষণ দেখে কবিরাজ যেমন চিকিৎসা চালায় রোগ সঠিক ধরতে না পেরেও, এখানে তেমন পন্থা বুঝবার জন্যে কিছু মদত দিতে সক্ষম। এসব প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু এই যে কোটি কোটি প্রাণী যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে সোজা রেখার মাত্র দু-একটির হাড়হদ্দ দেখে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তো নয়ই বরং চেষ্টা পাওয়া উচিত যেন খণ্ড খণ্ড হলেও আসল হদিসের রূপ যতটুকু ধরা পড়ে ততটুকুই মঙ্গল। একদম সর্ববিশারদের পাঁজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুলতে গেলে, হয় নিষ্ক্রিয় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা অথবা অন্ধের মতো হস্তী দেখেই গাঁয়ে গল্প ফাঁদার জন্যে বাড়ি ফিরতে হবে।

গফুরের বউ সখিনা নসিবের কথা হামেহাল উত্থাপন করে বলে এবারও সে ধরে নিয়েছিল, দুনিয়ার তাবৎ মসিবতের সে-ই হচ্ছে প্রথম শিকার। বাড়ির সীমানায় মাচাঙের উপর কিছু শিমের লতা তুলেছিল সখিনা একটা মানত মেনে। যদি গাছে ভালো ফল ধরে সে মসজিদে দুথালা মিষ্টি ক্ষীর দেবে এবং ইমামের জন্যে আধ সের মোটা-মোটা অথচ কচি-দানা শিম সওগাতস্বরূপ পাঠাবে। গোটা মাচা ভরে লতা উঠেছিল যদৃচ্ছা এদিক-ওদিক প্যাঁচের নানা কসরতসহ, গৃহকর্ত্রীর সাজিয়ে-সাজিয়ে দেওয়া কঞ্চি বা বাখারির উপর নির্ভর, যেন প্রেমিকের ইচ্ছার শত পাক। সখিনার মন সায় দিত না যে এইসব অবলা লতাগুলোর উপর কোনদিকে এতটুকু চোট আসবে যা তাদের নরম-নরম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কিঞ্চিৎমাত্র ব্যথা দেবে বা বর্ধনের ক্ষতি করবে। কিন্তু সে নিজেই এই প্রত্যাশা নিরুপায় ভঙ্গ করত, একচিল্‌তে ভিটের মালিক তো তারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে— যেখানে রোদ্দুর লাগে এমন জায়গায় শত টানাটানি, একটা ভিজে কাপড় শুকাতে দিতে। রীতিমতো মনের সঙ্গে লড়াই চালাতে হতো সখিনাকে, যখনই এমন-ধারা কাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাঁয়তারা কষত। কিন্তু উপায়হীনতার চোটে যখন সব যুক্তির হাড়গোড় চুরমার তখন খুব জোর একটু কালক্ষেপ করা চলে, অবশ্যম্ভাবিতার চাকার তলায় না শুয়ে চারা থাকে না। সখিনা তার রাত-বাসি ভিজে কাপড় মাচাঙের উপর মেলে দিতে গিয়ে ভেবেছিল, একটা পর্দা অন্তত টানানো হলো যা তার প্রিয় শিম লতার ডগাগুলোকে বদ্‌নজর এবং পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করবে না শুধু চড়া রোদ্দুর থেকেও রেহাই দেবে। কিন্তু রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে ব্যস্ততার দরুন উঠানের দিকে নজর দিতে সে ভুলে যায় নি কেবল, বরং বেমালুম মানত— তার কাপড় যেন ঘরে সিন্দুকে রাখা আছে এবং সে প্রচ্ছন্ন আনন্দের এমন রেশ আবার ভোগ করবে, যেহেতু কাপড় ধোওয়ার কাজটা তো অনুপস্থিত। গৃহপালিত গোরু ছাগল হাঁস মুরগি এবং তাবৎ গেরস্থালির খবরদারি সখিনা সেদিন নতুন করছিল না যে, আলস্য-জাত খোঁয়ারির উপর সে দিনগুজরানের ভিত্তি পুঁতবে এবং পায়ে-পা-দিয়ে-বসে থাকার প্রত্যাশায় গাফিলতি চালাবে। কিন্তু মাচাঙের দিকে তার চোখ কেন যে সারা দুপুর, সারা বিকেলেও গেল না, তার হদিস-খুঁজে সে বিফল হয়েছে পরে। অথচ সেদিকে দৃষ্টি যেতেই তার বুক থরথরিয়ে উঠছিল এত দ্রুত, যখন হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। তারপর ঈষৎ আশ্বস্থ চোখ কচ্‌লেছিল সে একবার, দুবার নয়, বহু শতবার, না আরো অনেক গুণ, কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একান্তে অবস্থিত একচিল্‌তে সবুজ দেখার জন্যে—যার আয়তন-মোহ কবির নিকট শস্যশ্যামল জন্মভূমি-রূপে প্রতিভাত হয়েছিল একদা। মাচাঙ-উজাড় শূন্যতায় নিজেকে সখিনা সোপর্দ করে এক নিঃশ্বাস ছাড়া অবয়বের অন্যান্য চাঞ্চল্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গড়খাই কেটেছিল যেন অশ্রুসহ সকল বেদনা নিঃসাড় পাথরে পরিণত হয়। তার জায়গায় খণ্ড খণ্ড ন্যাকড়া ঝুলছিল— আততায়ীদের নিশান যার মধ্যে ঘোষণা করে গেছে সর্বগ্রাসী সতর্কবাণী কেবল সবুজের সীমানাই আমাদের

সীমানা নয়। মাচাঙের বাঁশ, কঞ্চি, বাবলা বা অন্য গাছের সরু ডালপালা হঠাৎ গতিবন্ত সঙ্গীন বা কোঁচের মতো সখিনাকে খুঁচতে লাগল আষ্টেপৃষ্ঠে মুরগি-রোষ্ট করার প্রক্রিয়ায় যেমন প্রয়োজন। শাড়িটার ঐতিহাসিক আবেদন ছিল। পিতৃস্মৃতির স্পর্শ সুতার পাকে পাকে সখিনা বহুদিন অনুভব করত এবং আনন্দ-ডগমগ এই বসন সে লেপ্টে নিত সারা শরীরে। বস্তুধ্বংস শুধু কেবল অনড় পদার্থের বিলয় নয়, বরং মনুষ্যধ্বংসের মতোই তার তলায়-তলায় বইতে থাকে নানা জীবন্ত প্রবাহ, যদিও বাইরে ধকধকানি এতটুকু কারো চোখে পড়ার কথা নয়। গফুরের বউ তখন নিজেই পদার্থে পরিণত হয়েছিল এমনই পাষাণ-পর্যায়ে যে, সারা সাঁঝ সে গেরস্থালির সব শৃঙ্খলাপনা ধান-সারা-কালীন কুলোর বাতাসে তুষের মতো উড়িয়ে দিলে, তাকিয়েও দেখলে না কোন দিকে কী ধাইল। গফুর নিজের কাজ ছাড়াও সেই সময় উদ্বিগ্ন, নানা আশংকার তাগিদে এ-পাড়া সে-পাড়া ছুটে বেড়াত নিজের চালচুলো রক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, যেন ভূতে পেয়েছে এমনই। জমিনের ধারে, যা সামান্যই আছে, আর সে যেতে পারে না। তা নিয়ে মনের সঞ্চিত ক্ষোভ সে চেপে রেখেছিল এই ভেবে যে সে তো আসলে গাড়োয়ান, সুতরাং একদিকে না একদিকে পুষিয়ে যাবে। কিন্তু গ্রামের সীমানা বন্ধ হওয়ার ফলে, রোজগার চুলোয় যাক, আরো সমস্যা দেখা দিয়েছিল যেখানে তার একার চিন্তা আর পাহাড়-প্রমাণ নয়। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি-ফেরার সময় মুর্গিছানাগুলোর চ্যাকচ্যাকানি শুনে মেজাজ চড়ে গিয়েছিল, হঠাৎ বলতে হয়। গফুর সম্পর্কে গ্রামে কেউ অযথা দোষারোপ করার লোক আছে, এমন সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সখিনা তখনো বাঁশ-সংলগ্ন আরেক থাম বা ঘাস বিশেষ নতুন ঠেস দরকার মাচাঙের ফল-ভূরি বেশি বিধায়।

—খাড়ায়া কী করেন, লবাবজাদি?

নবাবপুত্রী বংশদণ্ডের মধ্যে তখন গভীর অনুপ্রবিষ্ট, অন্তত তা-ই ধারণা করা উচিত, যখন কোনো জবাব বা প্রতিক্রিয়া এল না অন্যপক্ষ থেকে।

— করতাছ কী?

—!!!

— করতাছ কী?

— মুখে ফুটো নাই, রাও নাই?

— !!!

—দু'ঘা দেওন পড়িবো?

তখন সখিনা এমন স-চিৎকার কান্না জুড়েছিল যে গফুরের মতো হুঁশিয়ার যুবকের পর্যন্ত ধারণা, পাগলামির প্রাথমিক স্তরের এই বুঝি প্রারম্ভ। সে আর মেজাজ চড়ায় নি বা মেজাজে জল ঢালতেও এগোয় নি। তবে সত্বর সে বুঝে নিয়েছিল,একটা ভীষণ কিছু ঘটে গেছে না ঘটতে যাচ্ছে, যার লক্ষণ-রূপে ওই চিক্কর-কান্না তখনো কানের পর্দায় মোতায়েন।

—কী অইল, কইবা না?

—কিচ্ছু না।

—কিচ্ছু না তো কাঁদোসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—লবাবজাদিও কাইন্দে।

—গোস্বার কথা না, অইল কী?

সখিনা তখন একবার মাচাঙের দিকে আঙুল বাড়িয়েছিল বটে কিন্তু সন্ধ্যাপ্রহরের অন্ধকার তো চোখ সম্পর্কে এমনই উদাসীন যে দৃশ্যপট সাজিয়ে রাখার কথা ভাবে নি। সুতরাং গফুর কিছুই দেখলে না, কিছুই বুঝলে না এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ব-কৃত জালে জড়িয়ে পড়ছিল, যখন অপর পক্ষ, আর তার উদ্ধারে আসবে না, সে জানত।

—কী হৈল কও।

— আমার কান নাই, তোমার চক্ষু নাই।

সখিনার তীক্ষ্নস্বর অন্ধকার কমতে তো দিলেই না, বরং দুজনের মধ্যেকার ফাঁকের আরো বিস্তার ঘটল।

সেদিন ডিপা জ্বালিয়ে আনার সময় গফুরের মনে হয় নি কেন, সেই জানে এবং জানা উচিত ছিল এমন ক্ষেত্রে যখন কান সজাগ থাকলেও কান নিষ্কর্মা।

—গোস্বা করছ?

—না।

—তবে কী অইছে কও না ক্যান?

—লবাবজাদার মেজাজ আমি ক্যামনে সামাল দিতাম।

—হে তো গতবছরের কথা।

—না, অহনের।

—আরে যাইতা দাও।

—হব গ্যাছেগ্যা।

—হব?

—যায় নাই, যাইব।

—কী যাইব?

—আমি যামু।

—কুথা?

—কবরে।

—কী আর কইছি অ্যাতো গোস্বা?

—একড়ু না।

সখিনা বিনা-বাক্যব্যয়ে লক্ষ্মী রমণীর মতো কয়েকটা মুর্গিছানা আঁচলে তুলে অনু-পদী ধাড়ীটাকে আয়-আয় শব্দে আশ্বাস দিয়েছিল, যখন গফুর আসন্ন বিপদের মুখ থেকে পরিত্রাণের আশায় মুখ খুলেছিল,— যাও কুথা, কইয়া যাও।

— আহি।

সখিনা এবার একা না এসে সঙ্গে বয়ে এনেছিল এতদিন উঠান উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে যার সাহায্য নিয়েছে প্রতিদিন সন্ধ্যাগমে। প্রদীপ নয় ডিপা। হাতে প্রদীপ কালিদাসের ইন্দুমতীর মতো সখিনা এগিয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে মাচাঙ-অভিমুখে, চোখে অঝোর জল এবং একরকমের চাউনি— যার ব্যাখ্যা দুই চোখ দিতে অসমর্থ।

AMARBOI.COM

গফুর চিৎকার দিয়ে উঠেছিল— অ্যাঁ— কাপড়ও খাইছে?

সখিনা মাথা নাড়লে না জবাব দিতে, বরং আরো অনড় হতে লাগল দীর্ঘশ্বাসে শরীরের স্ফীতি বাড়িয়ে বাড়িয়ে। গফুর এই ক্ষেত্রে কী করবে, তার স্থির-নির্দেশ পেতে এদিক-ওদিক ভাবলে : বাতাস নিরেট থেকে পাতলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। হাসি ছিটিয়ে সে উচ্চারণ করেছিল, যখন অপরপক্ষ কতকটা শান্ত অথবা চুপ হওয়ার পথে দ্বিধান্বিত, — হ হালা পোক্ বসন ধইরা টানতাছে। পোকা রসিক আছে।

সখিনা কোনো কথা না-শোনার ভান করে নিজের মনেই স্পষ্ট চিৎকার দিয়ে ওঠে,— মশ্‌করা থুইয়া রাখো।

কিন্তু গফুর তো বৌর সঙ্গে পয়লা দিন ঘর করছে না যে আসল হদিস পেতে অশেষ আয়াস প্রয়োজন। পাঁয়তারা সফল দেখে সে নিজের চরকায় আরো তৈল-সংযোগের পর জোরে জোরে সহাস্য উচ্চারণ করছিল,— হালা কেষ্ট ঠাকুর সাজছে। এইবার দ্যাখব হালারে।

কান্নার বেগ দ্বিতীয় দফা চেপে এলেও সেদিন পত্নী আর নিজের সড়কে স্থির থাকতে পারে নি। বরং আরো শান্ত গেরস্থালির কাজে মন সংযোগ করেছিল।

৯

সমস্যা বুদ্বুদের মতো এক, দুই— তারপর ক্রমশ জনতার আকার, এবং জনতা যেমন হুড়মুড় উত্তাল হতে থাকে মুহূর্তে মুহূর্তে, তেমনই তাগদযুক্ত জটিলতায় জুটতে লাগল। তখন তা আর শুধু হাহাশ্বাস বা চক্ষু-বন্ধ মারফত উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না এই জন্যে যে, তুমি যেমন ব্যক্তি এবং তোমার অভিঘাত আছে বস্তু-রূপে, তেমন বস্তুরও ব্যক্তিত্ব আছে। বহুকালের ঐতিহ্যে গৌড়গ্রাম বর্ধিষ্ণু-রূপে খ্যাত ছিল বলে প্রথম-প্রথম অভাবজাত চোটপাটে কেউ তেমন গা করে নি অথবা তার আঘাত এমন সুড়সুড়ি-পর্যায়ে ছিল, একটা বিরক্তি জাগতে পারত মাত্র। অর্থাৎ তুমি মশা-তাড়ানোর কায়দায় কামড়ের জায়গায় হাত বুলাতে, নিজের আসন পরিত্যাগ বা কামান-দাগার আয়োজন করতে না। এবার যো ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে গেল কয়েক মাসের মধ্যে এবং জের যখন ছুটল তখন তা বেগবান উন্মত্ত অশ্ব। এক, খাদ্যসমস্যার কথাই ধরা যেতে পারে অপিচ অন্যান্য সমস্যা স্ব-বৈশিষ্ট্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জঠরের স্বাভাবিক চাহিদা যখন দুরূহ হয়, ক্ষুন্নিবৃত্তির নানারকম উপায় কলম্বসেরা আবিষ্কার করে। অবিশ্যি এখানে আবিষ্কার-কর্তার অবয়ব নানা পর্যায়ে বিচরণশীল এবং উপায়ও ঠিক সেই অনুযায়ী আবর্তিত, বিবর্তিত বা অনুবর্তিত হয়। আদিমকাল থেকেই তা ঘটেছে বলে কেউ যেন মনে না করে, তা ঠেকে-শেখা গোছের কোনো অভিজ্ঞতায় মানুষ বিত্তবান। এমন হলে তো গৌড়গ্রামে একদা যা ঘটেছিল তা আর কোথাও ঘটত কি, তার সম্ভাবনার রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত। কানামাছি খেলার মতো শুধু আন্দাজে অনুমানে, তুমি চোর, আর কাউকে স্পর্শ করে তবে খালাস পাবে, তেমন পর্যায়েই গ্রহণীয় এবং চলছিলও তা-ই। গৌড়গ্রামে একে একে যা ঘটতে লাগল, তার পূর্ণ ফিরিস্তি আর কোনো দেশে বিধৃত হয়েছে বলে কেউ কোনোদিন বলে নি। এক স্বাতন্ত্র্যের মহিমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দিক থেকে উক্ত এলাকার কপালে বসে ছিল— রাজাধিরাজ, অথবা সর্পদংশন করলে যেমন ক্ষত জায়গায় সাপুড়ে বিষহর পাথর লাগিয়ে দেয়, এ-ও তেমনি। প্রাথমিক লক্ষণগুলো যেভাবে প্রকট হলো তা দেখেই পরবর্তী ধাপ অনুমান করা যেত। ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, বর্ষাকালে নর্দমায় মাছির ডিমের মতো অসংখ্য। পুণ্য সঞ্চয়ের অন্যতম পথ হচ্ছে করুণা। হ্যাঁ, তোমার বুক কাতরালে বা চোখের কোণ ভিজে উঠলেই তা থেকে রেহাইয়ের পথ বের করতে হয়। ওই রাস্তা তোমার আত্ম-পরিশোধনের উপায়, যেমন বালু-যোগে পানি ফিল্টার। তাই একটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে জীবনে কিছুই হারানো যায় না বা হারা হয় না। পৌষ মাস বা সর্বনাশের আকার বিভিন্ন, একথা শুধু নাস্তিকেরা বলতে পারে, যারা সর্বদা পুণ্য-অর্জনে অনাগ্রহী। কিন্তু যারা ভিক্ষাব্রতের প্রতি দুরন্ত ঘৃণায় চোখ লাল করে, তারা চোর ঠক দস্যু বাটপাড় পকেটমার বা আর কিছু নয়। এইভাবেই হিসেব নিলে শেষপর্যন্ত কিসের আবির্ভাব ঘটে তা ধার্মিকও বলতে পারবে না। অর্থাৎ প্যাঁচ, প্যাঁচ কষে যাও, ঘটনার পর ঘটনা এলোপাতাড়ি সাজিয়ে দেখবে দুনিয়ার জটিলতা নিয়ে বাড়াবাড়ি নাদানের কর্ম। এই চিন্তা বিজ্ঞাপন-দাতাদের কায়দায় হাজার হাজার হ্যান্ডবিল বা প্রচারক-মারফত বিস্তার করে দিলে তখন খাদ্য বাতাসে পরিণত হয় এবং যদিও সভ্য শহরে বায়ু খরিদ ছাড়া উপায় থাকে না, তবু বলা যায়, বাতাস-ভক্ষণ দ্বারা মানুষ বাঁচে বইকী। কিন্তু তখন সবকিছু ওই অদৃশ্য অথচ স্পর্শদা রাসায়নিক দ্রব্যের আকারে মনুষ্যদেহে সঞ্চারিত হয়। জীর্ণ শরীর তারই পরিণতি, যেমন স্বপ্নও তার হাত ধরে আসে, হয়ত সুখদ নাও হতে পারে। আঁতিড়ীর ভেতরে পর্যন্ত বাতাস ঢোকে এবং ক্রমশ অদৃশ্য করে তুলতে চায়। বার্নার্ড শ যে মানুষের নিছক চিন্তায় পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সহজ এ-ই এক উপায়। দুর্ভিক্ষ-কালের মড়ার খুলিগুলো শাঁসশূন্য নারিকেল-মালার মতো পথে ঘাটে বা কবরে পড়ে থাকার দরুন কেউ খুঁটিয়ে দেখে না। একটু মনোযোগসহকারে তাকালে চোখে পড়ত, হাড় পর্যন্ত কুঁচকে গেছে, যেহেতু মজ্জা পূর্বে শুষ্ক। গৌড়গ্রামে এসব নিদান কাউকে বাতলাতে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তা এসে জোটে এই জন্যে যে এলাকায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য শুধু মোহাম্মদ আলী এবং আর যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই পাঁড় নয় সব তিলে-ঘুঘুর শ্রেণীভেদে যা বলা হয়। বাতাসের চাহিদা সেবার এত বেড়ে গিয়েছিল যে আকাশ যোগান দিতে অসমর্থ— যে স্থল থেকে একদা কত ছায়ার বর্ষণ না ঘটেছিল। বায়ু এবং ছায়া একত্রিত হলে শরীর নির্বিবাদ জুড়িয়ে যায়, এমন কথা যুগ যুগ চালু আছে। শরীরের মতো সম্পদ শুকাতে থাকলে, ছোট ডোবায় গ্রীষ্মের দিনে অনেক ছেলের দাপাদাপি-স্নানে যে-ঘোলাটে অবস্থা হয় এবং মাছের চোখ কাদানির চোটে খাপসি খায়, এ তেমনই ব্যাপার ঘটছিল গৌড়গ্রামে। মনুষ্যে মৎস্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল বহু শতাব্দী পরে, সেই আদিম সৃষ্টির কালে যার সূত্রপাত। অথবা বলা যায়, ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে গড়াতে লাগল, গলিপথে অপ্রশস্ততার জন্যে মোটর-ড্রাইভারকে যে-পন্থা অবলম্বন করতে হয় কোনো-কোনো সময়।

মোহাম্মদ আলী যখন সত্যি হৃদয়ঙ্গম করে যে, তার পক্ষে এই স্থান-পরিত্যাগ

সম্ভব নয়, যদিও কাব্যসাধনার পাদপীঠ-রূপে সে এমনই জায়গার খোয়াব দেখেছিল, তখন সে মনেমনে প্রথম খুব বিচলিত হয় নি বটে, কিন্তু ইদানীং সে আস্থা হারাতে বসেছিল। বাইরে অবিশ্যি তেমন প্রকাশ নেই যদ্যপি লোকজন তার কাছে আসে এবং উপদেশ প্রার্থনা করে। তা ছাড়া কোনোক্রমে তার রসদের অভাব ঘটবে, এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না এবং থাকলেও হয়ত দূর ভবিষ্যতে। তবে অভিজ্ঞতা থেকে মোহাম্মদ আলী শিখেছিল, বাতাস কবিতার বিচরণভূমি হলেও মানুষগুলো বায়ুসেবী নয়। সে আরো আঁচ পেয়েছিল, লোকগুলো তার নিকটে সমাসীন হলেও আর পূর্বের মতো সমীহা-জাত ব্যবধান-রক্ষায় পরাঙ্মুখ। তার করস্থিত হুঁকা থেকে কল্কে তুলে নিতে ক'মাস পূর্বেও দশ দফা ইতস্তত করত বা হাত বাড়িয়ে মুখের দিকে তাকাত অনুমতির জন্যে। এসব ব্যাঘাত, তদুপরি নিজের মণ্ডল-থেকে-নির্বাসিত এবং আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহতা মোহাম্মদ আলীকে এমন ভাবিয়ে তুলছিল যে সে কবিতা মনেমনে আউড়াত আর খাতায় তুলত না। একধরনের নিষ্ক্রিয়তার হাতে বন্দি সে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল বাইরে বলিষ্ঠতার খোলস চাপিয়ে এবং হেন কর্মে তার মেজাজ হচ্ছিল ক্রমশ হন্যে— গোঁড়া ব্যক্তি নিজের আর্দশের স্ববিরোধী ঘটনা দেখলে যেমন হয়। গফুরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটলে মোহাম্মদ আলী পরিত্রাণের একটা আশ্বাস খুঁজে পেত এবং অনুষঙ্গের (সে তাকে একদিন গ্রাম থেকে বাইরে পৌঁছে দেবে বলে কত আশা-পোষণ) তাগিদ ডাক দিত— বড় সন্দেহ সম্বোধন। কিন্তু যদিও পাশ কাটিয়ে যেতে অক্ষম, তবু অভিবাদন দ্রুত সেরে পলায়নের মধ্যেই গাড়োয়ান গফুরের পরিত্রাণ।

—কেমন আছো মিয়া?

—আল্লার যা মর্জি।

—গফুর, তুমি বড় ভালো ছেলে।

—হুজুর, আমাদের তো মরার দশা।

—না— না। সবুর করো। ধৈর্য ধরো।

—আপনি কইলে তা পারি। কিন্তু—।

—কোনো কিন্তু নেই। ধৈর্য ধরো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সেই আশায় আছি।

—তুমি ইমানদার মানুষ।

সেদিন মোহাম্মদ আলী গফুরকে যে জোঁকের মতো লেপ্টে ধরেছিল, তা কেবল ভেতরের ভার নামাতে ছাড়া আর কী। কিন্তু গাড়োয়ানের তখন মনে পড়ছিল, আশায় মরে চাষা, প্রবাদটি— যা দাদু সুরত মণ্ডল প্রায়ই উচ্চারণ করেন। গফুরের আরেকটা বড় সাধ জেগেছিল, কেন সে নিজেও জানে না যদিও। দুই কবির সাক্ষাৎ। কিন্তু তখন যে-সমস্যা গফুরকে ঘিরে থাকত, বোধহয় ত্রাণের সেই খোঁচানি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, গ্রাম ও শহরের দুই কবি মিলে যদি উদ্ধারের একটা পথ বাতলাতে পারে। কিন্তু সুরত মণ্ডল আর চোখে দেখেন না বিধায় তার পক্ষে কোথাও যাতায়াত— বয়সও আশির কাছাকাছি, অতি দুর্বল— অসম্ভব। মজ্‌কুর ক্ষেত্রে মান-অপমানের প্রশ্ন আছে, ছোট-বড়র প্রশ্ন আছে, রুচিভেদের কথা আছে— এমন কত না বাগ্‌ড়া। গফুর তাই মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটে বলতে গিয়ে থেমেছিল এই জন্যে যে শেষ পর্যন্ত দাদুর না কোনো মানহানি ঘটে যায়। তা ছাড়া, কবিয়াল সুরত মণ্ডলের এত প্রশংসা মোহাম্মদ আলী শুনেছিল লোকমুখে, কৌতূহল থাকলে তো নিজেই হাজিরা দিতে পারত। গ্রামের প্রতি মোহাম্মদ আলীর প্রেম এমন স্পষ্ট যে শহর ছেড়ে নানা আরাম-আয়েশ মুলতুবি রেখে নচেৎ কেন এখানে পড়ে মরতে এসেছিল। গফুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এসব বাছ-বিচার করছিল, তখন রাস্তায় একদল ভিক্ষুক এসে পড়ে। সাত-আটজন, বোধহয় গোটা পরিবার। মোহাম্মদ আলীর কাছে হাত পাতলে সে কী করত। (যদি দেয় কিছু, শত শত ভিক্ষুককে ওর পেছনে লেলিয়ে দেব রোজ— পাঁয়তারা কষছিল গফুর) খোদাকে মালুম। ভিক্ষুকদের গন্তব্য সম্ভবত আর কোথাও। তাই কবির দিকে চাইলে মাত্র, মুখ খুললে না কেউ।

—মানুষগুলো লাশ হয়ে গেছে, গফুর।

—জি।

—আমি লাশের উপর একটা কবিতা লিখব।

—তাহলে লাশ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

—তা হবে বইকী। সচেতন মানুষ।

—লাশ কে বানায়, কবি সাহেব?

—আল্লা, তার যা মর্জি।

—আমার হাতে কাজ আছে।

—এখনই যাবে?

—হ্যাঁ।

AMARBOI.COM

মাদবরের সঙ্গে মোহাম্মদ আলী কবির কথোকথনের প্রাচীন প্রসঙ্গ গফুরের সেদিন মনে হয়েছিল না শুধু, একটা ক্ষুব্ধ চাপা আক্রোশ পেয়ে বসেছিল পর্যন্ত। ভিক্ষুকের কাতার ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছিল মাঠের বিস্তারের সঙ্গে তার চোখে পড়তে দেরি হয় নি। তখনই আশঙ্কিত গফুর আরো আতঙ্কিত এই ভেবে যে ওরা বোধ হয় গ্রামত্যাগ করে চলে যচ্ছে। যাবাবর জীব একদা-মানুষ খাদ্যান্বেষণে বনজঙ্গল-গিরিদরী পার হয়ে কত ক্রোশ-ক্রোশ পথ পায়ে রগড়ে যেত, যেন সকল অদৃশ্য আহ্বান তাদের জঠরের মধ্যে অর্থাৎ দেহে সীমাবদ্ধ এবং সেই আকর্ষণ তাদের দিগ্বিদিক উগরে দিত। গফুর দাদু সুরত মণ্ডলের কথাগুলো একবার চান্‌কে নিতে গিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল বুকের তোলপাড়-সহ : ওরা বোধহয়, গ্রামবাসীদের বিশ্বাস করে নি অথবা খোঁজ রাখে নি। পোকা, পোকা, পোক্, পোকা। হাজার লক্ষ কোটি অর্বুদ। সুঙো (যেন মানুষের নুলো) বাড়িয়ে-বাড়িয়ে উড়বে, ছোঁ-মারা কায়দায় নামবে বসবে, কুচকাওয়াজ করবে। তখনই আর নিঃশ্বাস ফেলতে অসমর্থ, তুমি নির্ঘাত মরবে। বাতাস খেয়ে বাঁচতে, এখন সেই বাতাসেরও অনটন ঘটবেই এবং আর তুমি কিছুই দেখবে না চোখে, শুধু হাঁসফাঁস করবে বুকের ভেতর পাঁজরের আছড়ানি নিয়ে। হে প্রভু, হে এলাহি মাবুদ, ও ঈশ্বর— উচ্চারণ করতে না পারার সহজ হেতু, বাতাসই আর নেই, যা দিয়ে শব্দের ঘর তৈরি হয়। গফুর সেদিন দ্রুত হাঁটছিল বাড়ির দিকে এবং পিছু ফিরে বারবার

তাকাচ্ছিল এক তপ্ত অনুতাপে। কবির জন্য সে মুখ তুলে সকল মুখ দেখতে পায় নি— কে গেল, কারা গেল? ওরা তখনো হাঁটছিল দিগন্তের কিনারায় ছায়া-মূর্তি— গোধূলিবেলার দূর থেকে চাষিদের কুঁড়ে বা বৃক্ষের যে-দশা হয়। পেছন থেকে গফুরের টান-টান মূর্তি শবরীর প্রতীক্ষার জঙ্গে তখন তুলনা অনর্থক। যেহেতু সে জানে না, কোন অভীপ্সায় কোন অভীষ্টের জন্য তার এই আন্তরিক আথালি-পাথালি? উদ্বাস্তু এবং ভিক্ষুককে এক তৌলদণ্ডে ওজনের নানা অসুবিধার নিমিত্ত এমনই যে যুগলের স্থান-বিনিময় এখন পলকে-পলকে ঘটে, তখন বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। গফুর চেয়েছিল, একবার সে দৌড়ে যাবেই যদ্দুর পারে হাঁক দিতে দিতে— কে তোমরা, কোথা যাও, একটু দাঁড়াও। আমার পড়শী হও বা না হও, কিছু আসে যায় না। আমরা যে একই এলাকার রৌদ্রবৃষ্টিস্নাত তরু ছোট-বড় বা বিভিন্ন জাতের— কিন্তু একই মৃত্তিকাসংলগ্ন ছিলাম এই দুর্বিপাকের পূর্ব পর্যন্ত। যেও না, যেও না। এসো, ফিরে এসো। অন্ধকারের গড়খাই তোমাদের সম্মুখে, জানা নেই তোমাদের। এসো, একসঙ্গে সকল দুঃখের বোঝার শরিক হই কাঁধে-কাঁধ। সেদিন মোহাম্মদ আলীকে অভিসম্পাত-রত গফুর গ্রাম-পথে জোরে জোরে পা ফেলছিল, যদিও দিগন্তের দৃশ্য তাকে বারবার টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আরব্য উপন্যাসের কাহিনী হাতেম বাদশার সেই আজগুবি পাহাড়ের ডাকের মতো। প্রচণ্ড মানের ভার মোছার অনর্থক চেষ্টার মধ্যে সে সুরত মণ্ডলের কাছে এসে কেঁদে ফেলেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বৃদ্ধের প্রশ্নে নিরুত্তর এবং সেই ধন্দের অবস্থায় দাদুকে ছেড়ে আবার মাঠের দিকে ছুট মেরেছিল উন্মাদের মতো বিড়বিড় আত্মসম্বোধনে,— তোমাদের মুখ দেখতে পেলাম না। চেনার প্রয়োজন কী? এই গাঁয়ের মানুষ এবং তোমরা মানুষ— আমার ভালোমতো জানা মৃত্যুসড়ক ধরে দল বেঁধে চলে গেলে, আমি রুখতে পারলাম না। আমি কিছু বলতে পারলাম না, আরো আফসোস। পেশার গাড়োয়ান আমার পিতা এলাকায় এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন নানা দিকে নানা যোগ— পুত্র-রূপে আমি তার পেশা তুলে নিয়েছি বলে আমারও যোগ দূর-দূর অবধি। আমার সতর্কতা পর্যন্ত মনে রাখলে না। এই সেদিন মাত্র আমি ফিরে এসেছি ঘৃষ্ট নিঃশ্বাস কোনোরকমে বাঁচিয়ে যেন একদম চেপ্টে না যাই চিরদিনের মতো....।

অতঃপর শবরী একদিন অহল্যার মতো পাষাণ হয়ে গেল যখন আকুলতা শিল্পীর আদর্শস্বরূপ ভাস্কর্যের অঙ্গ লেপ্টে রইল, কিন্তু হৃৎপিণ্ড-ধুকধুক মানুষটা রইল না।

সুরত মণ্ডল সেদিন তার চতুর্দিকে হাতড়াতে লেগেছিল গফুরের খোঁজে, যে একটু আগে আবার রাস্তায় নেমেছিল নিরুদ্দেশ দৌড় দিতে, ফুঁপানির জের বারবার পশ্চাতে রেখে।

১০

এক অভাবনীয় কাণ্ড দেখা দিতে লাগল। আরো কিছু দিন, কয়েক হপ্তার মধ্যে, যার জন্যে কেউ-কেউ প্রস্তুত ছিল বা প্রস্তুত ছিল না— এমন ধারণা খামখা না। রাস্তার পাশে যেখানে ঝোপঝাপ বা গাছপালার বেড় অর্থাৎ যেখানে ওৎ পাতা যায়, এমন জায়গায় দু-চারটে পঙ্গপাল মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মোহাম্মদ আলী, মসজিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমাম এবং গ্রামের বেশ কিছু বর্ষীয়ান আগে থেকেই বলে দিয়েছিল : কী থেকে কী হয় বা হবে, তা কারো জানা নেই। সুতরাং খামখা ওই পতঙ্গের গায়ে হাত দিয়ে কেউ কিছু যেন না করে বসে— হিতে বিপরীত হবে। তা ছাড়া, এই পতঙ্গ যে কোনো মানুষের ছদ্মবেশ নয়, যার কাহিনী শাস্ত্রে বহু জায়গায় উল্লেখ আছে, তা নিশ্চয় করে বলা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। এমনও হতে পারে, যেমন এককালের আকাশের ছায়া আবহাওয়ার তপ্ত কড়া থেকে সকলকে রক্ষা করেছিল আবার তেমনই কিছু আসছে যদ্দারা ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ সকলের ভবিষ্যৎ জেল্লাদার রোশনাইয়ে পূর্ণিত হবে। সুতরাং, ভাবিয়া-করিও-কাজ, করিয়া-ভাবিও-না গোছের প্রবাদ ভেবেই হাত দেওয়া উচিত যেন আখেরে কাউকে পস্তাতে না হয়। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যেত, যদি না মরা পতঙ্গের লাশ প্রায় তৎপরতা-যোগ্য জায়গার আশেপাশে ক্রমশ চোখে পড়ত। এবং সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়তে লাগল তা প্রমাণের জন্যে একবার অকুস্থলে গিয়ে দাঁড়ালেই যথেষ্ট, গণনার প্রয়োজন ছিল না। গাদা দেখলেই বোঝা যেত। এক দুই গনা যায়, যদিও বস্তু শত হাজারের মোকাবিলা। সুতরাং ঘনত্ব দেখেই আন্দাজ করে নিতে হতো, আর সকলে তা-ই করছিল। অন্যদিকে পতঙ্গ গোনার মধ্যে এমন কী মহৎ ব্রত লুক্কায়িত যে কেউ ফজুল সময় নষ্ট করবে। কিন্তু সকলে একমতের পোষক না হওয়ার ফলে, কারো কারো ধারণা দেখা দিল : ছদ্মবেশী এইসব পতঙ্গদের কবর অথবা দাহ ক্রিয়াচারে সম্পন্ন করা আশু বাঞ্ছনীয়। গ্রামের এক চিকিৎসক এমন মতবাদের পেছনে আরো ইন্ধন যোগালেন এই ব্যাখ্যা মারফত : পতঙ্গের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে না, বরং আততায়ীর দুষ্কৃতির ফলে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। প্রমাণস্বরূপ তিনি বললেন, শরীর থেঁতলে বা চেপ্টে রয়েছে বিধায় স্পষ্ট প্রতীয়মান আভ্যন্তরিক অঙ্গ-বৈকল্যের হেন দশা হওয়ার কোনো হেতু অসম্ভব তো বটেই, অন্য বিকল্পও অচিন্তনীয়। অতএব, ময়নাতদন্ত দ্বারা সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ত্রাণকারী এইসব পবিত্রতাসিক্ত পতঙ্গদের কোন আততায়ী গৌড়গ্রামে দেখা দিয়েছে, যারা ওই পাপকর্মে লিপ্ত। নিজ নিজ সমস্যায় বুঁদ নিষ্ক্রিয় অনেকেই এতদিন ভেবেছে, কেঁদেছে নীরবে অথবা হতাশ্বাস ফেলেছে কি ঐ-জাতীয় একটা কিছুর ভেতর সেঁধিয়ে ছিল। তারা এবার কোমর বেঁধে হাতে ডাণ্ডা বা ঝাণ্ডা নিলে, এমনভাবে তৈরি হলো যেন দুরাচারদের মোকাবিলা না করা পর্যন্ত জীবন বৃথা। রাতে পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছিল, যখন নিঃশব্দে পতঙ্গেরা স্ব-স্ব-রসদ সন্ধানে ব্যস্ত থাকত বা স্থানান্তরে যেত। তখন অবিশ্যি অন্ধকারে আতঙ্ক দেখা দিল যে পতঙ্গ-রক্ষার জন্যে তাদের এই ব্যবস্থায় আলোর প্রশ্ন অর্থহীন। যেহেতু আলো এবং দিন সমার্থবাচক আর দিনে হত্যা অনুষ্ঠিত হয় না, তখন আলো দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঘুটঘুটে তমসা যেমন চোরের হেফাজত করে, তেমনই সাপের চলাফেরার সুবিধে যোগায়— যা আরেক অপমৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া ছাড়া কী? তবু চৌকিদারি কেবল শুরু হলো না, অনেকে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে পতঙ্গ-রক্ষায় এমন মনোযোগী হলো তা অন্যান্য সমস্যা খেদিয়ে দিলে। দৈনন্দিনতার খোঁচানি থেকে রেহাই পাওয়ার বহু উপায় আছে বটে কিন্তু বেশ উত্তাপ ছড়িয়ে হুজুগ-রচনার মতো আর কোনোটাই তেমন কার্যকরী নয়। রীতিমতো নিয়ম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাফিক আহারে অভাবে এই গ্রামে সচরাচর ক্লান্তি প্রত্যেকের ছিল এবং যাদের এমন দুর্দশা-মুক্ত তাদেরও ছোটখাট মশালা-বিহনে চুন-মুখ সদা শাদাই থাকত। কিন্তু দেখা গেল, অমন সমস্যা যেন ঝড়ে উড়ে গেছে, যখন রাত-পাহারার হাঁক বেশ দিক-দিগন্ত কাঁপিয়ে দিতে থাকল যার অনুসৃতি আততায়ীদের সতর্ক করে দিতে নয়, বরং তাদের ঘুম না এসে যায়, তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য। খরিদ্দারের মন-যোগানোর উপর উপার্জন নির্ভরশীল। এমন কথা জানা আছে বলেই গ্রামের চিকিৎসক দশজনের গণ্ডায় আণ্ডা দিয়ে বসে ছিল এবং সে কোনো উচ্চবাচ্য তোলে নি, যদিও বাইরের এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ-ছিন্নতার ফলে তার ওষুধের স্টক নিঃশেষ। তার আরো জানা ছিল, তুকতাক ঝাড়-ফুঁকে ভেষজ তেমন কিছু প্রয়োজনও করে না। মোহাম্মদ আলী কি কবিতা লিখেছেন, লিখতে না-পারার স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক পর্যায়ে, তা অপরিজ্ঞাত থাকলেও একটা হদিস স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সে আর তেমন বেরোয় না বা পথের লোক ডেকে ডেকে আলাপচারিতা মারফত তার সর্বচর মন সচল রাখে না। কিন্তু এই মওকায় তার সমর্থন কতদূর গড়াতে পারে, যখন দেখা গেল সে নিজে ডাণ্ডা হাতে পাহারাদারদের সঙ্গে হাঁটছে নিঃশব্দে চোখ তেড়ে তেড়ে এবং বেপরোয়া ভাব— সব বিষাদ ঝেড়ে ফেলে তেজি আরবি ঘোড়ার মতো— তখন তা অনুমান করা যায় অতিশয় বিস্ময়ে, যার মাত্রা শুধু কারো মৃত পিতার আকস্মিক উপস্থিতি ম্লান করে দিতে পারে সংখ্যায় এবং গুণে। বস্তুর ব্যাপারে যারা নির্বিকার, অ-বস্তুর ক্ষেত্রে তাদের আসক্তি বেশি। এই ধারণার বশবর্তী, মোহাম্মদ আলী বস্তুরাজ্যে নিজের দেহ ফেলে রাখে মাত্র— আত্মার দীপঙ্করেরা যা করে এসেছেন যুগ যুগ, মুহূর্তে মুহূর্তে। পূর্বে নিস্তেজ হয়ে যেত গ্রাম সন্ধ্যার পর-পর, খুব জোর প্রহর-রাত্রি সজাগ। কিন্তু পরিস্থিতির মোকাবিলায়, চলাফেরার শব্দে যেমন সরীসৃপ-কুল পাখপাখালিদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়, তেমনই তখন মনুষ্য-চরণ।

কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য ব্যাপার— পতঙ্গের লাশ অল্পবিস্তর সড়কে, গুপ্ত জায়গায় বন-বাদাড়ের পাশে দেখা গেলেও, আততায়ী টিকি রাখলেও হয়ত দেখা যেত না। কারণ, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হয়রানির সমুদ্রে একরকমের ঝড় হামেহাল ওঠে এবং এও ঘটে যে তার বিশদ বয়ান নেপথ্যে থাক। তখন নিজেদের মধ্যে সন্দেহের ভূত সওয়ার হয় রণ্‌পা নিয়ে, দ্রুত হেঁটে যায় এক ঘাড় থেকে অন্য ঘাড়ে যেন সকলে পিছনে ফিরে তাকায়, কে চরণ রাখল দেখার জন্যে, যদিও কিছুই চোখে পড়বে না ভূতের অদৃশ্যতার জন্যে। তখন পেছনের লোকের উপর সন্দেহে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, আবার ভূতের পা ঘাড়ে বিধায়, মনে হবে, সামনের লোকও এমন ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। এই প্রক্রিয়া তখন ঘুড়ির সুতোর মতো প্যাঁচ খেতে-খেতে এত জড়িয়ে যায় যে আত্মধিক্কার না হোক, আশেপাশে যাকে পাবে তাকেই গালাগাল দিতে হয় যেমন বড়ো সাহেবের ধমক খেয়ে বাবুর্চি মুর্গির ডানা ধরে আছাড় মারে— আর কিছু না-ই পারুক।

অভিযানে অনেক দলে যোগ দিলেও সামন্তপাড়া এবং মিয়াপাড়া, দুই পাড়া গোদার মর্যাদা মাথায় বাঁশতলা সারগাদা ইত্যাদি চষে ফেলছিল, যখন লাঙ্গলের কর্ম অনেক কর্মে গিয়েছিল ফসলের অনিশ্চয়তা-হেতু। আবার কাইজ্যা বাধল এই দুই পাড়ায় সন্দেহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিমুল তুলো ফাটিয়ে এবং জোরশোর— যার ফলশ্রুতি, পাহারাদারির কাজ যদিও গোয়েন্দাগিরির সামিল। এই পর্যায়ও রইল না, বরং শুরু হয়েছিল ভেতরে ভেতরে লাঠালাঠি তাপ কিছুদিন জমবার পর এবং একদলকে আততায়ীর টুপি পরিয়ে মা-চণ্ডীর থানে পাঠাতে লাগল বলির উদ্দেশ্যে। তারপর খাঁড়া দুই হাতে ঝলকে উঠল নৈরাজ্যের মন্ত্র হাঁকড়ে, যাকে পাও কোতল করো।

সেই সময় পতঙ্গের লাশ কিছু হ্রাস পাওয়াহেতু মানুষের মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই বিপরীত অনুপাত একটা নিয়ম রূপে চালিয়ে দিলে কোনো অশুদ্ধি ঘটবে বা ঘটতে পারে, তার চিহ্ন অন্তত গৌড়গ্রামে মিলল না। মোহাম্মদ আলীর কবি-চিত্ত মৃত্যুর ফলে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল বলে যদি ধারণা করা যায়, তা অমূলক বলার কোনো পথ না-থাকার হেতু দলভুক্তির পরিচয় অস্পষ্ট হলেও সে মজায় খেয়েছে-দেয়েছ এবং দল-পরিচালনার কৌশল বাতলে দিয়েছে অনেককে, যারা তার কাছে গেছে উপদেশ-আলোকে মুক্তিস্নান বা যুদ্ধজয়ের উল্লাসের জন্যে। গফুরের উপর, বুলানের উপর এবং জাতীয় কিছু যুবক-কিশোরের উপর নজর পড়েছিল, যারা আততায়ীর ভূমিকা-পালনে শরিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু হাতেনাতে কোনো প্রমাণ না-থাকার দরুণ তেমন মুখ-ফোটা দোষারোপ কেউ করে নি এবং তা না-করার কারণ, পাহারায় ওদের গাফিলতি ছিল না। তবে ঘূর্ণিস্রোতের অভ্যন্তরে যেমন আরো নানাকার স্রোত পাক খায় এবং স্ব-স্ব কক্ষপথে আবর্তিত অথবা ধাক্কায় কক্ষচ্যুত হয়, এখানেও তেমন ব্যাপার ঘটতে লাগল, সবই অবিশ্যি গতিসমন্বিত। পূর্বের নিস্তেজ ভাবমুক্ত এই আবহাওয়ায় অবিশ্যি দৈনন্দিনতার অভিঘাত আরো জানান দিতে লাগল, যখন হতাশা পর্যন্ত আরো ঢিমে-তেতালা নয়, বরং তেওড়া কি চৌতালে পর্যবসিত। যার ফলে, যেমন আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল তেমনই উল্টো-ফোঁসের বাষ্প— এইমাত্র ঝাঁপি থেকে মুমূক্ষু সাপের মতো হিসহিস শব্দ তুলে বাতাসে ঈষৎ হোক, আলোড়ন তুলছিল।

যেহেতু বুড়ো মানুষ পাহারাদারির তাগদ-বঞ্চিত এবং বয়সের জন্যে স্থির শান্ত দৃষ্টি মারফত সবকিছুই দেখতে অভ্যস্ত, মাদবর সেই সময় মোহাম্মদ আলীর নিকট গিয়েছিল, যদি কোনো পন্থা মেলে বা বিপদের উপর বিপদ ওই আত্মকলহ থামায় বা চোদ্দ পুরুষের ভিটে ত্যাগ-রত যে-যেদিকে পারে ছুটছে— তা রোধে সহায়ক হয়।

—আপনার কথা ঠিক মাদবর সাহেব। মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মোহাম্মদ আলী সায় দিয়েছিল গলায় দীর্ঘশ্বাস জমিয়ে।

—আজ্ঞে, আমি কই ক্যান?

—তার কারণ সোজা। মানুষ সবুর করতে শেখে নি। একটা কথা মন দিয়ে শোনেন। আপনি যখন চিন্তা করেন, আপনাকে চুপচাপ থাকতে হয়। তাড়াহুড়া চলে না।

—আজ্ঞে, তা-ই।

—সব কাজের এই ধারা হওয়া উচিত।

—জি।

মোহাম্মদ আলী ইতিহাস থেকে নজির দানের ইচ্ছার ইতস্ততায় দোল খেতে গিয়ে সামলে নিয়েছিল এই উক্তি দ্বারা,— কিন্তু ধৈর্য যদি ধাতে না থাকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে এই প্রথম মদবর সাহস-সঞ্চয় মারফত একজন জ্ঞানী মানুষের উপর কিছু চাপ এবং ঝাঁকি দিতে বেশি বিলম্ব করে নি।

—কিন্তু কবি-মহাশয়, পোলাবান ধুঁকে মইরব। হে কি বাপ বইস্যা দেখতে পারে?

"সমস্যার চোখে আপনি আঙুল দিয়েছেন", কবির জবাব যেন শানানো ছিল, ঝিলিকসহ বেরিয়ে পড়ল।

মাদবর বিস্ময়ে কবির মুখের দিকে তাকালেও চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল উচ্চারণ নিক্ষেপকালে,— "কিন্তু মানুষ কি শত শত বছর সবুর করতে পারে?"

—পারা উচিত।

—কঠিন কাম। সাধারণ মানুষের কাম না।

—পারা উচিত। নিজের ভিত্তিভূমিতে আরো শিকড় পুঁতে কবি যোগ করেছিল,— উচিত আলবত। সবুর দরকার হলে করতে হবে, হাজার এগারো শ, বারো শ কী আরো শত শত বছর।

—কিন্তু মানুষে বাঁচে কদিন?

—ষাট-সত্তর-আশি-নব্বুই।

—হুজুর, হে আর কয় জন। গত দু মাসে আমাগো গাঁয় কম-সে-কম দুশ পোলাবান মরছে। বয়স একমাস থেইক্যা সাত-আট বছর।

মাদবর কীভাবে অকস্মাৎ বুকের পাটা তৈরি করে ফেলেছিল, সে না জানলেও জবাব দিতে দেরি হয় নি।

—সকলে মরেছে।

—হ। কিন্তু ক্যান মরছে?

—কেন?

—দুধ পায় নাই, খাইতা পায় নাই।

—শুধু তা না। আল্লাও ওদের দুনিয়ায় রাখতে চায় নি।

একদম হঠাৎ জিভ-খসা ব্যক্তির মতো মাদবর নীরব হয়ে গেলেও বাকশক্তিসঞ্চয়ে তার বিলম্ব ঘটে নি এবং তখনই সে প্রশ্ন করেছিল— দুধের বাচ্চা দুধের অভাবে মরছে। আপনি কন আল্লার মর্জি?

এমন দুঃসাহস মোহাম্মদ আলীর প্রত্যাশায় নথিভুক্ত থাকবে সে ভাবতে পারে নি বিধায় চোট সামলে চোট মেরেছিল— আপনি বুড়া মানুষ বুঝবেন না। পবিত্র পতঙ্গ। ছোকরারা চোরাগুপ্তা মারছে। আল্লার হয়ত তা-ইচ্ছা নয়। গজব (অভিসম্পাত) কি সাধে আসে?

—কিন্তু কবি-মহাশয়—

—বলেন।—

—আপনি দ্যাখছেন—।

—কী—।

—বাপ-মার ভিটা ছাড়া কত মান্ষে চইলা গেল।

—হ্যাঁ দেখেছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হেরা জানে না কোথায় যাইতাছে। হগ্‌গলে (সকলে) পোকার চাপে মইরব।

—আপনি ওদের বোঝান নি?

—কত কইছি, হুনে কই।

—কেন শোনে না?

—হুজুর, আমি তাগোর পেট ক্যামনে সামাল দিমু?

আত্মজয়ের উল্লাসে হাসতে গিয়ে আবার ভারসাম্য-আয়ত্তে, কবি জবাব দিয়েছিল,— এই দেখেন— পেট আবার পেটের কথা। অথচ মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আপনি পেটের কথা তুলছেন।

—হুজুর, পেটও আল্লায় দিছেন। আমার কইতে দোষ?

মাদবরের গলা ঈষৎ চড়ে গিয়েছিল এমন পর্যায়ে যে লজ্জিত না হয়ে পারে নি। তা চাপা দিতেই অতি-খাদ কণ্ঠেই পরমুহূর্তে সরব,— "পেট না হয় বাদ দিলাম। খাওন তো বাদ যাইব না। হেরা যায় ডরে।"

—তা বলতে পারেন, ওরা যায় ভয়ে, ডরে।

—তা ঠিক।

—এই হচ্ছে কথা। মাঠে মরার চেয়ে ধরে মরা ভালো।

—আজ্ঞে—।

—ওরা তা বুঝল না।

—না।

—বুঝলেন, সবুর করতে পারছে না।

—জি, হাঁ।

—আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন। তা আমি প্রথমেই বলেছি।

মাদবর সেদিন মাথা হেঁট করেছিল, মনেমনে ভেবেছিল, জ্ঞানের সড়ক হয়ত বহুত এবং চৌমাথায় রাস্তার সংখ্যা এত যে, শেষে কোনদিকে যাব— স্থির করা কেবল কঠিন নয়, খোদ জ্ঞানও সেখানে হালে পানি পায় না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তখন পাগলা মেহেরালীর মতো চিৎকার দিচ্ছিল (যদি সামনা-সামনি কিছু বলে নি, বাইরে এসে বিড়বিড় করলে) এবং ঝুট-হ্যায়-ঝুট-হ্যায় রবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত— শুনতে পাচ্ছিল। আরো বয়সে বৃদ্ধ, তবু অগ্রজ-সুলভ প্রাচীন রেস্তা মাদবরকে ধাক্কিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সুরত মণ্ডলের আলিঙ্গনের মধ্যে— যখন সেই জরা কণ্ঠ গম্‌গমিয়ে উঠল,— মাদবর ভাই, আমি অন্ধ। অন্ধত্ব আমার কাছে অভিশাপ নয়। আমাকে আর কিছুই দেখতে হচ্ছে না, কিছুই দেখতে হচ্ছে না— এত দুঃখ, এত জনের যন্ত্রণা। এ-ই আমার সান্ত্বনা, মাদবর-ভাই—।

১১

জ্ঞানের ধর্ম ঠিক জলের মতো। বহমানতা খুইয়ে ফেললে প্রাচীন রূপ রক্ষায় অসমর্থ। বরং আরো ময়লা গজাবে আঁশের উপর এবং পরিশেষে, এই ক্রম চালু থাকলে চেনাই যাবে না, অজ্ঞানতা থেকে তার ফারাক কী? শুধু জ্ঞান নয়, সর্বপ্রকারের ভালমানুষিয়ানার

AMARBOI.COM

ধারা একই খাতে চলে, যার অচলতা, অ-মেরামতি ঠিক তার বিপরীতের সঙ্গে সখ্য পাতিয়ে বসে অজানিতে। গৌড়গ্রামের বিচ্ছিন্নতা নানা দিক থেকে তার সাবেক বনিয়াদ ধরে টান দিতে লাগল, যখন বিপদের প্রতিষেধ পর্যন্ত ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কারণ, মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রশ্ন আর আক্কেলের পিঠে আরোহী নয়। বরং জঙ্গলে হাতির পিঠে যেমন বানর বসে থাকে, উপরে চলাফেরার সুযোগে, এখানেও তা-ই ঘটে, যদি বিচারবুদ্ধিকে মর্কট কল্পনা করা যায়। একটা উদাহরণ দিলে অনেকের কাছে কিছু খোলসা হতে পারে। সব না বুঝলেও মোটামুটি মাদবরের সাহায্য অন্তত বৃহৎ কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে অক্ষম।

পতঙ্গ কখন দাওয়ায় হামলা করবে, কখন যাবে বা আর কোন জায়গায় যেখানে চিল্‌তে সবুজ ঝিলিক দিতে পারে তখন একটা পূর্ববর্তী সতর্কতা আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত। তাই হঠাৎ বর্ষীয়ানদের মস্তিষ্ক-নিঃসৃত এবং মোহাম্মদ আলী অগয়রহ-সমর্থিত ফরমান হেঁকে উঠেছিল— বাড়ির উঠান আশপাশ পরিষ্কার রাখো, কোনো অসুবিধায় পড়বে না। 'সামনে সাফাই' অভিযানের একটা ফল দেখা গেল। সকালে অনেক ধুলো উড়তে লাগল। তার কারণ, সকলের একসঙ্গে ঝাঁটানাড়া— গৃহিণী, বিপত্নীক নিজে, অথবা দাসদাসী ইত্যাদির। এই ক্ষেত্রে হয়ত স্বাভাবিক চালু না থাকার হেতু, নতুন কাকের বিষ্ঠাহারের মতো সকলের উদ্যোগ, শক্তি রাতারাতি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং ফলে সবকিছুর প্রবল আকারে আবির্ভাব ঘটে। ধুলোরও। অবিশ্যি গৌড়গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশ যে নোংরা এমন দোষারোপ অচল, যদিও দু-চার ঘর ব্যতিক্রম থাকা কিছু বিচিত্র নয়। ওই উপদেশ অনেকে গ্রহণ করেছিল এই ভেবে যে, কিসে-কী হয় তা সবসময় কারো জানার কথা নয় এবং হেন পন্থায় একটা সুফল ফলেও যেতে পারে। সাফাইয়ের সঙ্গে পতঙ্গের সম্পর্ক-স্থাপন করা মাথায় খেলেছিল, তা অনুমানের ব্যাপার এই জন্যে যে তখন সবাই প্রতিষেধের আবিষ্কার-কর্তা বলে দাবি করবে। তাই বলা যেতে পারে, হয়ত পতঙ্গের তরফ থেকেই ঐ রহস্য-সূত্র পাওয়া, যখন দেখা গেল, পরিস্কার জায়গায় তাদের আসন পড়ে না। কার্যকারণের এই সম্পর্ক বিশ্বাসযোগ্য, এবং তালি বাজে না, যদি দুই হাত একত্র না হয় সমান তালে। বিপন্মুক্তির আশায় রোগীর কত কী কল্পনা এবং যে-যা বলে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে সে কেবল চিকিৎসা-সংকট সৃষ্টি করে না, আস্থাহীনতার ফলে মৃত্যুকে আস্কারা দিয়ে বসে। রোগ যখন মুখ্য বিবেচ্য তখন ঔষধ-আবিষ্কারকর্তার নামধাম জাত-পাত নিয়ে বচসা পাকানো স্রেফ মূর্খতা ব্যতীত আর কে বিশেষ্য দ্বারা ব্যক্ত হতে পারে? পরিচ্ছন্নতার অভিযান গ্যাস-বেলুনের মতো বিদীর্ণ; অন্য কোনো দুর্গন্ধ সৃষ্টি করবে কি না, তা কেউ ভেবে দেখে নি। কারণ, জ্ঞান সীমাবদ্ধ। প্রাচীর চতুর্দিকে। অধিবাসীদের ব্যাহত-কৌতূহল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ঘোড়ার মতো হ্রেষা তোলে, ঠ্যাং তুলতে অক্ষম— যার সাহায্যে সে দৌড় দেবে এবং শিবিরে পৌঁছলে চিকিৎসকের চোখে ধরা পড়বে। বোধহয়, নিদানে খুঁত থেকে গিয়েছিল অথবা কিসে কী-হয় ইচ্ছামতো ঘটে না, পতঙ্গের অরাজকতা যেমন বেড়ে গিয়েছিল, চোরা-গোপ্তা হত্যাপর্ব তেমনই অব্যাহত থাকল। পাহারার পর্যায় থেমে যাবে কি, তোড় আরো বেড়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সন্দেহ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলাদলির ভিত পাকা হতে লাগল। সুতরাং ঐ সাফাই-পর্ব সোডা পানির মতো অনেক বুদ্বুদ তুললে এবং যখন দেখা গেল, প্রতিষেধের গুলি ফাঁকা গেছে, তখন কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামায়। উপদেষ্টাগণ দেখলেন, নিজের চরকায় তৈলপ্রদান অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত অপরের উক্ত যন্ত্র ধরে টানাটানি অপেক্ষা এবং উপদেশকে যদি আদেশ বানাতে হয় অথবা আদেশকে উপদেশ তাহলে তার পেছনে অনেক লাকড়ি নয় শুধু মগজও খরচ। কার এত সময় আছে বা হাজারটা চোখ আছে যে সদা সক্রিয় রাখবে। অতএব, যা চলে তা চলুক বা না চলুক— হঠাৎ-হঠাৎ দাবড়ি দাও অথবা নৈশ চৌকিদারের মতো হেঁকে ওঠো যেন ভীরুজনের পিলে চমকায়। এইভাবে বিপন্মুক্তির তামাসায় বহু তরুলতা জেরবার হয়ে গিয়েছিল, তেমনই বহু মানুষ— যাদের সংখ্যা কমেছিল প্রাকৃতিক নিয়মে।

গফুর এবং তার বন্ধু রাখাল শেষে মন্তব্য করেছিল,— সামনে সাফাই মানে জোয়ানকাল থেকে একটাই শিখেছি— লোম—। উভয়ে হেসেছিল এবং আরো অনেকে যারা এই দঙ্গলে জমায়েত হয়ে সুখদুঃখ বোনাই করছিল সহানুভূতির উত্তাপে। অস্বাভাবিক মনে হতে পারে এমন হাস্যচ্ছটা, দুর্দিনে খেয়াঘাটে যদি মাঝি এবং নৌকা কিছুই না থাকে এবং ওপারে বন্যাপ্লাবিত এলাকা থেকে পরিত্রাণের আশায় আর্ত হাঁক দেয় পরিবারবর্গ। শামুকের মতো অনেককেই শক্ত আবরণ সৃষ্টি করতে হয় চতুর্দিকে যেন বুকের ঠোকর কি অন্য উৎপাত সহজে প্রাণকেন্দ্রে না পৌঁছায়। গফুর, রাখাল, বুলান এমন অনেকে হাসবে বইকী— যারা নিজেদের চারপাশে খোলস দিতে শিখেছিল এবং প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে ওঠা ছাড়া অন্য পথ নাস্তি— এমন চিন্তা যাদের মনে হয়েছিল স্বতঃসিদ্ধ।

গৌড়গ্রাম ক্রমশ বিহঙ্গশূন্য হয়ে গিয়েছিল। যারা এসব লক্ষ্য করে নি, তাদের উপর দোষারোপ চলে না। নিজের দিকে তাকিয়ে যদি অষ্টপ্রহর কেটে যায়, তখন অন্য দিকে চোখ ফেলার সময় কোথায়? গাছ থাকে, ফল থাকে, পাখি থাকে এবং যখন মানুষ থাকে গাছ থেকে— যদিও কাটা এবং রোপণও তার দায়িত্ব। এখানে নির্বিহঙ্গতার কারণ, আকাশবিহারের প্রয়োজন যদি না মেটে বরং পদে পদে বাধা পড়ে ডানায় বা পায়ে, তাহলে পতঙ্গের ঝড়ে নভোলোক নাকচ হয়ে যায় এবং যখন নীলিমার বিস্তৃতি নষ্টভ্রষ্ট, বায়ুর সীমানা সংকোচন মারফত দীর্ঘশ্বাসের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ, তখন ওড়ার প্রশ্ন ক্রমশ প্রলাপ ও শেষে অবান্তর হতে থাকে। ঘুঘু ছেলে বা মেয়ে হারিয়ে কাঁদতে পারে সমগ্র দুপুর বা বিষণ্ন বৈকাল এবং মানুষ তা থেকে সান্ত্বনা অথবা অর্থ একটা খুঁজে বের করে। সন্তান হারানো পিতামাতা প্রাণীর ডাকে সহানুভূতি খুঁজে পায়। গৌড়গ্রাম বিহঙ্গহীন, কাকজ্যোৎস্নার কথা ভাবতে পারে না যেমন প্রহর, বোঝে না পেঁচা কি শেয়ালের অভাবে। নেই, মিলতে গিয়ে ধাক্কা খাবে নেই, নেই।— নেতির শন্‌শন বাতাস যখন উঠুক, যতই উঠুক বুকের শ্বাসে যেমন বাঁধা পুকুরে বন্যার জল— সব ঢুকলেও থাকতে অক্ষম।

গফুর ভাবতে শুরু করেছিল, গানের দল-গঠনের প্রাচীন স্মৃতি যদি ভর করে বসে ভূতের মতন সে কী নিয়ে গান বাঁধত (পাখি নেই) বা কে তার গান শুনত? অমন

বাসনার প্রতি তার বিরাগ ছিল না কিন্তু মেজাজ তিরিক্ষি, প্রায়ই বে-কাতর; পতঙ্গের গ্রাস, দাঁতের অন্ধকার কাপড়চোপড় পর্যন্ত কুটিকুটি— এমন পরিস্থিতির বক্রতা ও জটিলতা। ট্যানাধারী গৃহিণী ভামিনী কামিনী রমণী রাণী...ফসল...ভিটেমাটি— এমনই একটানা অনুষঙ্গে জেরবার গফুর নিজের উপর মমতাদর্শনের সুযোগই পেত না— যখন মেজাজের ঘোড়া দূরপাল্লার দৌড়ে মত্ত।

সেদিন সুরত মণ্ডলের চক্ষুকোটরের মতো অন্ধকারে ঘর, গফুরের ঘর, ডুবে ছিল, একথা গোধুলি-সংলগ্ন সন্ধ্যায় বলতে কিছু দ্বিধা থাকা উচিত। কিন্তু পিদিম পর্যন্ত ছিল না যখন, তখন কোনো মন্তব্যই আর অশোভন নয় বিধায় গফুর পরিস্থিত যাচাই করতে এগোয় নি। ভিজা কাপড় শুকাতে দিয়ে অন্ধকারে এমন বসে থাকে স্ত্রী সখিনা, দিগম্বরীর আদিম সংস্করণ যার প্রাণ ধড়ে নয় আল্‌নায়— যেখানে বস্ত্র সজীবতা পেয়েছে রমণীর হাতে।

—কুথা বইস্যা?

গফুরের এমন অন্ধকার-প্রীতির হেতু ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন যদি থাকত, বরং মঙ্গল ছিল। রসিকতা গফুর অনেক কমিয়ে দিলেও কালেভদ্রে নিরন্ন স্মৃতির-চাগানে অতীত-সাঁতার— কিন্তু কোন কূলে তরী ভিড়ত, সে জানত না।

—কুথা বইস্যা?

বস্ত্রহীনতার লজ্জা ছিল গোপিনীদের বটে, তবু দুঃখ না থাকার হেতু ছিলেন স্বয়ং মুরারি, যিনি অভাবকে পূর্ণতার মর্যাদা দিতে সক্ষম। মজকুর ক্ষেত্রে যদি তেমন সুযোগের অবকাশ দেখা দিত, গফুর হয়ত আবার ডাক দিত,— কুথা বইস্যা? কিন্তু স্মৃতি যতই জোরদার হোক, বর্তমান নিষ্ক্রিয় বেতো ঘোড়া, তা মনে ঠাঁই দেওয়া মূর্খতা। গফুর আর বাক্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং কর্মে মনোযোগের সংকল্প নিয়েছিল। কিন্তু অভীষ্ট বস্তুর স্থানভূমি যদি জানা থাকে, তখন হোঁচট খেতে হয়। এই ক্ষেত্রে ছোট্ট ঘরে একটা মাটির পেয়ালাও যদি ভাঙে, ক্ষতিপূরণ অনেক কিছু ধরে টান মারবে, যার পরিণামে আর যা-ই হোক, ভালোবাসার ফুল ধরবে না। মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ এবং উত্তাপ, যে-দুই উপাদান সেখানে বর্তমান, তার খোঁজ করা যেতে পারে। গফুর চিন্তা করছিল, কান-খাড়া— যদ্দুর সম্ভব উৎকর্ণ, যদিও বাইরে কয়েকটা ঝিল্লী বেশ তারস্বরে ডেকে ডেকে বাগড়া দিচ্ছিল। উত্তাপের কথা, গফুরের মনে উদয় হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। আধপেট উপোস যারা থাকে, তাদের শরীরের তাপমাত্রা একমাত্র জ্বর ব্যতীত, আর কদ্দুর এগোতে পারে? পিদিমের খোঁজ আরো দুরূহ এই জন্যে, সখিনা তার ভাটিতে যেদিন কাপড় শুকানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, সেদিনই সে সতর্ক হয়েছিল, ট্যাটা স্বামী থেকে রেহাই পেতে আলোর হাতিয়ারটা লুকিয়ে রাখা দরকার যেন সহজে কেউ নাগাল না পায়। গফুর সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয়, যদিও আরো কয়েকবার অতি মোলায়েম কণ্ঠেই সে ডাক দিয়েছিল,— কুথা বইস্যা আছো? ছোট ঘর। একবার হাতড়ালেই সব উদ্ধার হয়ে যাবে— গফুর এই সমস্যা-সমাধান জানলেও সহজে ঘৃত-উত্থাপনের পন্থায় বিশ্বাসী ছিল। একবার সামান্য হাত বাড়িয়ে সে পেছিয়ে নিয়েছিল এই ভেবে যে, হয়ত মেজাজ ভালো থাকলে কাপড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়াই অভীষ্ট সামগ্রী বুকে এসে বাঁধা পড়বে এবং ফিসফিস-রব তুলবে,— দরজা বাইন্দা থুইছে ত? (খিল লাগিয়েছ ত)। কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে, শেষ-মাথা থেকে লোকে গোড়ার দিকে এগোয় কখনো স্মৃতির সাহায্যে, কখনো আগেকার কর্মের ধারায়, পাওয়ার একটা সম্ভাবনায়। গফুর অন্ধকারে রোমাঞ্চিত-দেহ ঠিক তেমনি ফিসফিস-শব্দে উচ্চারণ করেছিল— দরজা বাইন্দা থুইছি। কিন্তু এই রীতির আশ্রয়-গ্রহণ খামখা। খামখা স্মৃতির উপর চোটপাট, যখন জানা কথা, অভীষ্ট বস্তু ভঙ্গুর এবং তা পাওয়া গেলেও আর আস্ত থাকবে না। গফুর বুঝেছিল, তার গুলি লক্ষ্যস্থলে লাগা দূরের কথা, রেঞ্জের ভেতরই যেতে পারে নি। তাই সে বারবার হাতের মুঠি বাঁধছিল আর খুলছিল এবং অভ্যন্তরে-অভ্যন্তরে স্থির করছিল, যে-অভিমুখে সুরাহা প্রসারিত সেদিকে যাত্রাই যুক্তিযুক্ত। হন্তদন্ত কোনোকিছু যখন অশোভন ঠেকে, অথচ বুকের মধ্যে সর্বপ্রকার গুরুগুরু ডাক ঝঞ্ঝনা তোলে, তখন কর্তব্য সম্পর্কে বিমূঢ়তা না আসুক, হাত-পা সহজে এগোয় না। এই জড়তা যতটা বাইরে ততটা ভেতরের এবং উভয়ের সমাহার বিদ্যমান বিধায় অমন ক্ষেত্রে সক্রিয়তা এবং পশ্চাদপসরণের অনুপাত সমান। পুনরায় উৎকর্ণ গফুর কোন শব্দ-ধরার প্রার্থনায় ঘাড়ের রগ্ (শিরা) সাধারণ ত্বক-সমতল থেকে অনেকখানি ঊর্ধ্বে তুলে ফেললেও তাতে কিছু স্বাক্ষর পড়ল না— যেন বিকল রাডারের দশা। কানামাছি খেলার মতো অন্ধত্ব অন্ধকার পূর্ণ করে দিয়েছিল এমন পর্যায়ে যে চোর ধরা সহজ ছিল না। গফুর সিদ্ধান্ত-সংকটের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিল খুব ভয়ে ভয়ে, ভাঙা সাঁকোর উপর পারার্থী বোঝা-মাথায় হাঁটুরের মতো। একবার হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সে অনুভব করেছিল শূন্য তার হাতের মুঠোয় খাদের ন্যায়— বাদনমুখী, কিন্তু গ্রাসে অনীহা ষোলোআনা। শূন্য জাল তুলেছিল এই ধীবর যদিও পেশায় গাড়োয়ান এবং বিবস্ত্র কোথাও ওৎ-পাতা, যার তখন বাঘ বা সিংহের বুবুক্ষু হিংস্রতা থাকা উচিত ছিল শিকার দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। কিন্তু তখন শিকার এবং শিকারির পার্থক্য আদৌ স্পষ্ট নয় বলে এক দিক যেন অন্ধকার স্বয়ং, অন্ধকারে প্রবিষ্ট বা বিলীন। হঠাৎ স্তিমিত-তেজ গফুর ভাবতে লেগেছিল, হয়ত সখিনা গরহাজির, কারো কাপড় চেয়ে নিয়ে বেড়াতে গেছে পাশের বাড়ি বা আর কোথাও। কিন্তু এমন সম্ভাবনার কল্পনা অসমীচীন এই জন্যে যে বাড়তি বস্ত্র দেওয়ার মতো ধারেকাছে কেউ নেই এবং যেখানে আছে— কোন মিয়াবাড়ি কি বাবুবাড়ি এত দূরে; অধিকন্তু সখিনার আত্মসম্মানজ্ঞান এত টনটনে হাত প্রসারণে অসমর্থ— তখন যন্ত্রণা বা প্রয়োজনীয়তার প্রসার যতই আসমানস্পর্শী হোক। দেশলাই নেই, যেহেতু সঙ্গে বিড়ি ছিল না। একটু আলো, একচিলতে আলো, খুব ধূসর অতি অস্পষ্ট— তাহলে আর এত ধৈর্যগিরি মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। প্রাবাদিক কবন্ধ যেমন অন্ধ আবেগ-আক্রোশে কম-কম বাহু খোলে আর বন্ধ করে কঠিন আলিঙ্গনের পন্থা-জালে শিকারকে পিষে ফেলতে, গফুর তেমনই ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ফলে, মেহনতের দরদ খেয়ে গেল, ইঁদুর পড়ল না। হয়ত লুকোচুরি-রত এক বিবস্ত্র রমণী। এই চিন্তা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত গেল, যার হেতু গফুরের নিকট স্পষ্ট; আহা, বয়স নেই ক'মাসে বুড়িয়ে গেছে সখিনা। ঘরের একদম উত্তর কোণ ঘেঁষে একটু সামান্য জায়গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারান্দার মতো বের করা ছিল বড় কুলুঙ্গির মতো এত বড় যে একটা ছ-ফুট লম্বা মানুষ স্বচ্ছন্দে খাড়া দাঁড়াতে পারে (বাড়ির গৃহিণী বলত, গরিব মানুষের ঘরের মধ্যে মসজিদ) এবং প্রয়োজনকালে ঘুঁটে, বস্তা বা ঐজাতীয় কিছু রাখা যায়। এতক্ষণ মশারির মতো ওই কুঠরির কথা গফুরের খেয়ালে আসে নি, বোধহয় স্ত্রী নামকরণ-অনুযায়ী সে নামাজি নয় বলে অথবা নিরক্ষরতা-হেতু আরবি শব্দ উচ্চারণে জিভের ডগা গররাজি বিধায়। গফুর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার পর সেদিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল, যা নিতান্ত দৈবী ব্যাপার। হ-য-র-ল-ব লোয়াজিমা যেখানে থাকে, সেখানে বাড়ির গৃহিণী আত্মগোপন করবে— ভাবা যায় না। গফুর গুনগুন সুর ভাঁজছিল যখন মানুষ অনাহার-অনিদ্রা প্রেমের কাছে শুধু তুচ্ছ হয়ে গেল না তাদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার স্তর থেকে নিচে নামতে-নামতে একটিমাত্র লয়ে তখন লুপ্ত। তাই গফুর যে নিজেই লয়-প্রাপ্ত এতক্ষণ অধৈর্যের গঙ্গায় মজ্জমান ছিল, ভেসে উঠল আলতো সমীরের সঙ্গ-সুধায় এবং হাত নয়, দুটো আঙুল শুধু বাড়িয়ে দিতে লাগল যতক্ষণ না তা স্পর্শ করে একটা স্তনের চুমুক— গোল এবং নরম, অতি নরম, সন্তানের সর্বদৌরাত্ম্যবঞ্চিত। সাপের গায়েও হাত পড়লে হয়ত এত দ্রুত আঙুল পেছিয়ে নিতে পারত না গফুর যেভাবে তার পশ্চাদপসরণ ঘটল। যেন সব অতৃপ্তিজাত কশাঘাত শুরু হয়েছিল তখনই। কিন্তু তৎমুহূর্তেই সে আঙুলের ডগা লাউডগার মতো, এখানে যদিও আলো নয়, বুকের দিকে ধাবিত করে— অতি শ্লথগতি, অতি মন্থর, এগোচ্ছে কি এগোচ্ছে না এমনই পারম্পর্য। পুনরায় পশ্চাদপসরণের সময় দুই জঙ্ঘামধ্য-স্থিত বদ্বীপে যখন আঙুল লাগল, তখন গফুর অদৃশ্যশক্তি-আকর্ষিত যেন রকেটের কোনো দাহ্য রসায়ন হঠাৎ জ্বলে উঠল না শুধু, গতির তোড়ে দিকভ্রান্ত আলিঙ্গনের খেপ্‌লা-জাল অনেকদূর ছড়িয়ে দ্রুত শামুক-মুখের মতো বদ্ধ হয়ে গেল। ধরা পড়েছিল, বক্ষ নয় কটিদেশ যেখানে গফুরের মুখ ঠেকে গিয়েছিল এবং তার পটল (বেঁটে খাটো নাদুসনুদুস সখিনার স্বামীপ্রদত্ত নাম) যেন নিমেষে শালবৃক্ষের উচ্চতায় অধিষ্ঠিত, তারই কচি শাখার মতো দোদুল, যেমন সিকেয় হাঁড়ি দোলে, দুলছিল, হিন্দোল-হিন্দোল রাগ হোলির উৎসবে। অস্বাভাবিকতার ধাক্কা গফুর সামলে উঠেছিল কি ওঠে নি এমন বাছবিচারের অবান্তরতার ফাঁক দিয়ে দেখা গিয়েছিল, সে পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীদের পিদিম (যার সামনে বসে একজন তামাক খাচ্ছিল, এবং সহসা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে চিৎকার পেড়েছিল, কে—কে?) এনে দেখেছিল গফুর— না দেখে নি, না দেখেছিল : তার সখিনা আপন মহিমার রঙে কত উর্ধ্বে উঠে গেছে এবং ঝুলছে সেই ভেজা বস্ত্রের সাহায্যে কড়িবাঁশ-সংলগ্ন। যে-বস্ত্র তার লজ্জা নিবারণ করত, সেদিন তা রমণীর তাবৎ লজ্জা কেড়ে নিয়েছিল অথবা ঢেকে দিয়েছিল ঠাণ্ডা নৈঃশব্দ্যে, হিম-তুষার শৈত্যে।

১২

জমা-শূন্য এবং মৃত্যু-খরচে বোঝাই জাবদা-খাতায় পরিসংখ্যানের নিয়মানুসারে শতকরা অনুপাত হ্রাস পায় গুরুত্বের দিক থেকে। ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি এমন ক্ষেত্রে বুদ্বুদ উত্থাপন করে বটে, কিন্তু তা সমজাতীয় বহু ফেনার সান্নিধ্যে আর তেমন লক্ষণীয় বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈচিত্র্যে মোহনীয় থাকে না। অনেক অভাগা একত্রিত হলে সাগর শুকিয়ে থাকে আগে থেকে এবং জেরবার চোখের পলকে জলশূন্যতার ভূমিকা থেকে তা রেহাই পায়। গফুরকে ব্যাপারটা বুঝতে হয় নি। পরিস্থিতি তার কাছে এমন স্পষ্টতা অবলম্বন করেছিল যে তার মনে হয়েছিল, ঘাড়ে বোঝা হালকা বিধায় সে যত্রতত্র জান-কবুল যে-কোনো দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে পারবে এবং পিছু-হটা জানবে না। দুই বিপরীত কাঠি তাকে যুগপৎ একই সময়ে ঘুম পাড়াত আবার জাগিয়ে দিত সহজ স্পর্শ মারফত, যখন সে অনুভব করত, সুখ-দুঃখের মোকাবিলার চেয়ে সহজ আর কিছু নেই দুনিয়ায়। রোজগারহীন অনিশ্চয়তা পূর্বে তাকে কাবু করে ফেলত গৃহপানে দৃষ্টিপাতের ফলে এবং একটা সোয়াস্তি তখন এমন খোঁচা দিত যে, তার কোনো মতামত আছে কোনো বিষয়ে তা সে বুঝে উঠতে পারত না। মাদবরের উপদেশ সে নীরবে পালন করেছিল। যেহেতু সে কারো উপর হুকুম চালায় না, বরং কাছে টেনে দূর-গমনের পন্থা বদলায়। এমন ক্ষেত্রে মতামতের প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। তা গফুর জানলেও বিনয়ে একদম ঘাসে রূপান্তরিত হতে-হতে হঠাৎ তার ভেতর সাপ পুষে ফেলত। এমন কয়েকবার ঘটেছে। সেকথা আর ধর্তব্যের মধ্যে, যেহেতু অতীতের ব্যাপার, মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু পরে সে নিজের মধ্যেই শক্তি অনুভব করছিল, যা মুরুব্বিদের মুখেও সব ব্যাপার তলিয়ে দেখার পক্ষপাতী। ঠিক বাচালতা নয়, সব কিছু বোঝার জন্যে আগ্রহ, নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও— যা ভেতরে ঘাই তোলে এবং পীড়া দেয়— এমন অস্থিরতা নতুনভাবে স্থিতি পেয়েছিল তার হালচালে। নিজের স্ত্রীর শোকবিরহ বিস্মৃতির গর্ভে জমা রেখে দেওয়ার হেতু এই যে, এমন যন্ত্রণার সঙ্গে তখন বহুজনেরই পরিচয় এবং তা সংখ্যায় বাড়ছিল, আদৌ হ্রাস পাচ্ছিল না। কিন্তু শোক যখন শ্রদ্ধার ভিত্তি-উত্থিত এবং জানার আগ্রহ-কৌতূহল যখন অপরিসীম অথচ উৎস রুদ্ধ, তখন যে-আঘাত আসে তার কাছে প্রেমের লাভ-লোকসান তেমন নিদারুণ মনে হয় কি? কারণ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধু সান্নিধ্যের অভাব ধাক্কা মারে, যে-জায়গায় প্রথম ক্ষেত্রে ওই বিয়োগ ছাড়াও অনুভূত হয় একটা মানুষের সারাজীবনের অভিজ্ঞতার ফসল-সৌরভের অনুপস্থিতি। সকলের জানা, গন্ধ ছাড়া পরিবেশের অঙ্গচ্ছেদ ঘটে না— শুধু স্বাদের তারতম্য আরো উৎকটরূপে দেখা দেয়। সদ্যকাটা টাটকা শশার গন্ধ শুধু বনজ-রসায়নের ব্যাপার নয়, যারা বোঝে মনজ আনন্দ, তাদের নিকট আর বয়ান বাহুল্য। গফুরের সকল তেজ, শক্তি একদিন এমন মিইয়ে গিয়েছিল সে ভাবতেই পারে নি, ঘাস আহারের মতো উত্থান-শক্তি আবার খুঁজে পাবে। পুরাতন দিনের কথা চোখের সামনে তুলে ধরতে সে শুধু অনিচ্ছুক নয়, উপরন্তু বিড়াল যেমন বিষ্ঠাত্যাগের পর চাপা দেয় এবং ভাসাভাসা চাপা নয়, বরং ধুলোর মধ্যে অক্লান্ত ডুবিয়ে ছাড়ে গফুর তেমনই পন্থাগ্রহণে বাধ্য হয়েছিল বহুৎ যন্ত্রণাসহ— যা সখিনার মৃত্যুজাত মর্মঘাতের নিকট তুচ্ছ। তখন কেবল সুরত মণ্ডলের কাছেই গফুর বসে থাকত একদম চুপচাপ অথবা বর্ষীয়ানের রেখাঙ্কিত লোল-চাম করস্পর্শের নিচে সেই মাভৈঃ মন্ত্র শুনত, যা সর্ববেদনাহর নিমেষে নিমেষে, যদিও জের সদা-বর্তমান। তখন কৃতজ্ঞতা সেই আধিপত্য বিস্তার করে বসত, যার ফলে শুধু মাথা অবনত নয়, একপ্রকারের

নিষ্ক্রিয়তা ভর করত। নিঃসঙ্গতার হাতে মার খাওয়ার দিনে অমন দোসর চিরদিনই আশীর্বাদ। অনাহার, উপবাস, নানা কৃচ্ছ্রতার উপর মৃত্যুর করাতে দ্বিখণ্ডিত গফুর প্রায়ই ভাবত, সে চারপাশের মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছিল শুধু সুরত মণ্ডল দাদুর কল্যাণে, হ্যাঁ, তারই পাকা চুলের মতো শুভ্র হৃদয়ের সৌরভে। বাইরে নানা কাজ, যদিও গাড়ি বন্ধ— ফাইফরমাস বা মুনিশের কাজ, যখন যা পাওয়া যায় কিছু করতে হতো বইকী। ব্যস্ত থাকলেও একেকবার সব ছেড়েছুড়ে সে দৌড় দিতে চাইত, সুরত মণ্ডল যেখানে প্রায়ান্ধ; নিজের তালপাতায় লেখেন, লেখেন এবং তার পূর্বে গুনগুন করেন নিজের মনে, সময় সময় মাথা দুলিয়ে অতি সন্তর্পণে যেন ঘাড় তা থেকে ছুটে না যায়, বৃদ্ধ বয়সে যে-ভয়ও থাকে। দুই পাড়ার দলাদলিতে একটা গুজব খুব দানা বেঁধেছিল যে, পতঙ্গের লাশ এখানে ওখানে মাঝে মাঝে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তার পেছনে গফুর, রাখাল, বুলান এবং আরো এই জাতীয় ছোকরাদের যোগসাজশ বা হাতযশ আছে, যার ফলে অমন ঘটনা এবং গুপ্ত ঘটনা ঘটছে, সহজে ধরার উপায় থাকছে না। মোহাম্মদ আলী, মসজিদের ইমাম এবং আরো গ্রাম-হিতাকাঙ্ক্ষীরা এই জন্যে এত চিন্তিত যে কয়েকবার সকলকে ডাকিয়ে তারা অনেক উপদেশ এবং সতর্ক করে দিয়েছিল, এমন অবুঝ কাজ আখেরে পস্তানির মালমশলা, প্রলয় সন্নিকট করে এবং একজনের পাপে তখন লক্ষ জন ভোগে। কিন্তু সন্দেহ জিনিসটা চাপা থাকার কারণ, চাপা থেকেই জন্ম বিধায় হাটেবাজারে চালু হলেও হাঁড়ির মতো ভঙ্গ হতে জানে না। এই পর্যায়ে একটা সুবিধা এই যে তখন অপরাধ-নিরপরাধ এমন একাকার হয়ে যায় (পরস্পর কাদা-ছোড়াছুড়ি আর হাওয়া— তা-ও চাপা) সত্যিকার দোষীজন পার পেয়ে যেতে পারে এবং তা খুব স্বচ্ছন্দেই ঘটে। যেহেতু কেউ পায়ের মাটি সম্পর্কে সুনিশ্চিত থাকে না। এইসব অপরাধের রাজ্যে, তদুপরি স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত, মনের যে অবস্থা থাকে তা বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই গঠন করে না এবং যদিও স্বাভাবিকতার কিছু বায়ু টেনে আনে, তার মধ্যে খাদ থাকে ষোলোআনা। গফুর কিন্তু রেহাই পেয়েছিল নানা দিকের যন্ত্রণা থেকে একমাত্র দিকে, যেখানে প্রতিশোধের স্পৃহা ধিকিধিকি তুষানলের মতো জ্বললেও দাউদাউ রূপগ্রহণের অপেক্ষার্থী, যখন সময় আসে বা সুযোগ তৈরি হয় আপনা-আপনি। সুরত মণ্ডলের কাছে তার যাতায়াত অনেক কমে গিয়েছিল। হেতু—, সে তখন এমন মানসিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যেখানে আর যেন কারো আশ্রয় প্রয়োজন নেই এবং মাঝে মাঝে ধাক্কা দিলেও আর তাকে এদিক ওদিক হেলতে-টলতে হয় না। ধীর ধীরেই সে নিজেকে এমন আত্মস্থ দশায় এনেছিল না শুধু নিজেকে বুঝতে চাইত সে, যদিও তার ইলেম নেই বা তেমন কোনো হাতিয়ার নেই যা তার মদত দিতে সক্ষম। কিন্তু চতুর্দিকে চেয়ে চেয়ে এবং পাড়াপড়শীদের জীবনের শরিক-রূপে সে কতগুলো সহজ বিশ্বাস রপ্ত করেছিল যা তাকে যেন পথ দেখাত, যখন অন্ধকারে হামাগুড়ি টেনে চলার কথা শুধু। হঠাৎ একদিন সে অতি বিচলিত হয়ে উঠল, তারই এক আত্মীয় খবর দিয়ে গিয়েছিল সুরত মণ্ডল দাদু নাকি পাগল হয়ে গেছে— বদ্ধ উন্মাদ। প্রাচীন রেস্তা নয়, স্মৃতির প্রবল ধাক্কায় গফুরের সেই মুষিকের দশা— যে জলভারে গর্তে পড়েও আর সাঁতার কাটে নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু নিঃশ্বাস বাঁচানোর জন্যে। সংবাদের কতরকম মাহাত্ম্য আছে, সেদিন গফুরের আর উপলব্ধির তেমন তাগদ ছিল না। তাই বোধহয় এক দৌড় দিয়েছিল মণ্ডলপাড়ার দিকে যেখানে সকল তাপহরণ ছায়া তখনো তার জন্যে অপেক্ষার্থী— চিরদিন যা পেয়ে এসেছে স্বাভাবিক দাবির মতো। থমকে দাঁড়িয়েছিল গফুর সুরত মণ্ডলের অতি-চেনা ছোট বৈঠকখানা-ঘরে এবং তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, যখন সে দেখলে, বৃদ্ধ কবিয়াল একটা মাদুরের উপর (কাঁথা বিছানো ছিল কি না দেখে নি) মুখ গুঁজে দুই হাতে কী যেন খুঁজছেন, খুঁজছেন। দুর্বল পেশীর সঞ্চালন শুধু অসহযোগিতার আঙুলগুলো নড়ছিল, কিন্তু কেমন দ্রুত নয়— শরীরের ঝাঁকুনিতে স্পষ্ট।

—দাদু।

বসে পড়েছিল গফুর একপাশে, যদিও পার্শ্বস্থ আত্মীয় স-বারণ জানিয়ে দিয়েছিল, গায়ে হাত পড়লে বৃদ্ধ আরো চিৎকার দেবে বা গোঙানি শুরু করবে— যার ফল, দুর্বলতা ও মৃত্যুকে আরো সন্নিকটে পৌঁছে দেওয়া।

—দাদু!

একটু গলা চড়িয়ে দিয়েছিল গফুর। কিন্তু তার ডাক বোধহয় অতদূর যায় নি, যার সুড়সুড়ি শব্দ হিসেবে বৃদ্ধের কানে কোনো তরঙ্গ তুলবে।

দাদু!

এক বিধবা আত্মীয় বাতাস করছিল খুব সাবধানে যেন পাখা রোগীর গায়ে লেগে একটা অঘটন না ঘটিয়ে বসে, যার পরিণতির মাত্রা প্রাণঘাতী। আর ইহকালে হয়ত কোনো জবাব পাওয়া যাবে না, এই ভেবে গফুর যখন চুপ করে গেল, তার দুই চোখ ডাক দিতে লাগল নিঃশব্দে দুই পক্ষ থেকে পানি ঝরিয়ে, কখনো বা সব দৃষ্টিপথের আচ্ছন্নতা মারফত।

—দাদু! ডাক, ডাক, ডাক দে! কিন্তু কে কাকে ডাক দেবে, যখন একেকজন নিজের কর্ণপটে একই দিকপ্রান্ত শব্দের সড়ক ধরে হাঁটতে থাকে এবং তা পরিত্যাগের কোনো উপায় বা পন্থা পাকড়াতে পারে না। কাছাকাছি উপবিষ্ট গফুর দাদুর মাদুরে গোঁজা মুখ সোজা করে দিতে গিয়ে বিধবার কাছ থেকে আবার বাধা পেয়েছিল— সেই আগেকার যুক্তি। অবিশ্যি অমূলক নয় : কিছু করতে যেয়ো না, বাবা। যখন নিজের মনে কিছু চায় বা বলে তখন এগিও।

দাদু!— বিধবার বারণ ঠেলে অতি আলতোভাবে মণ্ডলের পিঠে হাত রাখা-মাত্র মনে হয়েছিল, বৃদ্ধ যেন স্পর্শ-সচেতন নিজের সড়ক ছেড়ে অন্যদিকে পা-ফেলার মতলব তৎমুহূর্তে আঁটলেন এবং দৃঢ়-সংকল্প। হঠাৎ একটা হাত সশব্দ আছড়ে ফেলে, বোঝা যায় বেশ শক্তি দ্বারা, মণ্ডল চিৎকার দিয়ে উঠেছিল,— পাতা দাও, আমার তালপাতা দাও... তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে...তারি পাতা দাও... পাতা...।

পাতা!— গফুর যেন ধূয়া ধরেছিল, তেমনই স্বরে উচ্চারণ, বিধবার দিকে তাকিয়েছিল, কোনো ব্যাখ্যা থাকলে তৎক্ষণাৎ দিতে।

—পাতা...আমার পাতা দাও...পাতা...সব খেয়ে ফেলেছে...সব...পাতা দাও, আমি

লিখব...কালি দাও, কলম দাও। বৃদ্ধ মণ্ডল তৃষিত হাতের তালু যথারীতি চিৎ রাখে বটে, কিন্তু শীর্ণ শিরাগুলো স্থির থাকে না, বরং দেখা গেল, থরথর কাঁপছিল— যেখানে আকাঙ্ক্ষার তাগিদ এত প্রচণ্ড যে শিরা ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে, যদি নিকেট কোথাও দু-এক ফোঁটা অবশিষ্ট থাকে।

—দাও— । দিলে না, দিবি না হারামজাদি... দে দে... (ডাহা অশ্রাব্য গালাগাল। শ্রোতাদ্বয় কানে আঙুল দেয় না, লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে কৃপার দৃষ্টি মাটির উপর ফেলে, আসল পাত্রের উপর বর্ষণে অসমর্থ) দে— দে—। আমার পাতা, আমি লিখব গান...গান... লিখে যাব আর গাইব...কত...লোক শুনবে, হাসবে যেখানে কাঁদার কাঁদবে... দে— দে— তোদের সুখদুঃখই আমার গান...পাতা কোথায়?...আর গাইব না...ভাটির দেশে বিয়া করছিলাম...ও রংগিলা নায়ের মাঝি...পাতা, পাতা...।

মণ্ডলের চিৎকার মাঝে মাঝে গলার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যাচ্ছিল— যেন গোটা এলাকা তখনই ভূকম্পনে কাঁপবে, যখন কিছুই আর খাড়া বা স্থির থাকবে না। গফুর স্তব্ধতার মধ্যে ঈষৎ খোঁটা পুঁতে, বিধবা মহিলাকে সম্বোধন দ্বারা জানার কৌতূহলী, পাতা দিলেই কি দাদুকে চিৎকার থেকে নিবৃত্ত করা যায়— যা তার আয়ুর গায়ে কিছুটা বেমেয়াদি সুতো লাগাতে পারে। কিন্তু জানা গেল, আর কোনো তালপাতা-সদৃশ পাতা যতই দাও, বৃদ্ধ ঠিক ধরে ফেলে, এবং তাকে প্রতারিত করা অত সহজ নয়।

আদ্য কালি জাড্য কালি
কালি ঝলমল করে
সব দোয়াতের ঘন কালি
আমার দোয়াতে পড়ে।

হঠাৎ ছড়া গেয়ে উঠল শীর্ণকণ্ঠ মণ্ডল, একদা বাল্যকালে পাঠশালে অন্যান্য পড়ুয়াদের সঙ্গে লেখনী নেড়ে-নেড়ে কালির ঘনত্বের জন্য যে প্রয়াস পেত তারি জীর্ণ সংস্করণ— আদল আছে, কিন্তু ভেতরে আর মাদল বাজে না।

—পাতা...পাতা...। দুই শব্দে নিবদ্ধ চাহিদা ততক্ষণে আর তারস্বরে পৌঁছায় না। তা প্রতীয়মান, বৃদ্ধের কণ্ঠ-শিরার দিকে চেয়ে যা নীল-নীল লালচে সুতলি সাপের মতো নড়ছিল ঈষৎ কম্পনে এদিক-ওদিক।

বিধবার বয়ানে পরিষ্কার : সমস্ত তালপত্র পতঙ্গের জঠর-গহ্বরে প্রবেশ-হেতু আর তেমন কোনো যোগানদানের সম্ভাবনা রুদ্ধ বিধায় বৃদ্ধের মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দেয় এবং গান-বাঁধা ও তা লিপিবদ্ধ রাখার অভাবে এমন ঘটেছে— সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আত্মীয়া আরো কিছু কথনের প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু তখনই বৃদ্ধ সচিৎকার মাদুরের ভেতর গোঁজা মুখ তুলে চিৎ হয়ে পড়ল না শুধু, দুই চোখ মেলেও দুই পার্শ্ববর্তীদের দেখতে লাগল অদ্ভুত এক দৃষ্টির সাহায্যে, যেন কারো মুখ অবলোকন-মারফত সন্তুষ্ট নয়, বরং আরো গভীরে দেখার প্রয়াসী— যেখানে মানুষের সব সাধনা, কামনা, মায়া-মমতা একান্তে লুক্কায়িত থাকে। অতঃপর বিড়বিড় শব্দে সজ্জিত ও সঞ্চালিত দুই ঠোঁট। তখন স্বাভাবিকভাবে বোধহয় না, হয়ত ঈষৎ মনোযোগ দিলে শোনা যেত তার বক্তব্য : লিখতে দাও...গান বাঁধতে দাও। বাঁধো আসর, আমি গান করব। তার আগে পাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাও... পাতা।

গফুর তখন বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, কান অতিমাত্রায় খাড়া, অর্থোদ্ধার-দুঃসাধ্য সব বিড়বিড়ানি শুনতে, যার মধ্যে মণ্ডলের জীবনের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল ছবি দেখা যাবে তৎমুহূর্তেই। কিন্তু চোখে যেন শ্রবণ জায়গা পেল, তখন শ্বাস উঠতে লাগল এবং মণ্ডলের গ্রীবা স্ফীত, স্ফীততর হতে আরম্ভ করল। আত্মীয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ জল আনতে গিয়েছিল, শব্দ-তৃষিত ওষ্ঠে তারল্য বর্ষণে, যার জানার কথা নয়— বাতাস অদৃশ্য, নির্বস্তুক এবং সলিল বস্তুত দৃশ্যমান। বিধবার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মণ্ডল শেষনিঃশ্বাস ফেলেছিল আপন বুকের হাঁপর থেকে, যেখানে আর আয়াস ছিল বা ছিল না, তা গফুরের অপরিজ্ঞাত। সে তখন লাশের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদছিল ডুক্‌রে-ডুক্‌রে যেন সদ্য-মাতৃহারা বালক, দুই চক্ষু বন্ধ— যেহেতু আর কোনো মৃত্যুর মুখদর্শনে সে অক্ষম।

১৩

শেষ।

তা হয় না।

জিঞ্জিরের মতো ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় বাঁধা শৃঙ্খলা থাকে বলে শুধু একজায়গায় কোনো এক কাজের পরিসমাপ্তি ঘটবে, আশা করা অন্যায়। জীবন যেমন আরো জীবন-যোগে সক্ষম অনুকূল পরিবেশে— মৃত্যু তেমনই তহবিল বাড়িয়ে তোলে অন্য মৃত্যুর হাত-পাকড়ে, যদিও উভয়ের মধ্যে নানা ব্যবধান থাকতে পারে গঠনে ও বৈচিত্র্যে। গফুর কিন্তু সখিনার প্রয়াণের পর ধীরে ধীরে নিজের গুটি কেটে কেটে বেরিয়ে আসছিল, যা নিতান্ত বাইরে দৃষ্টিপাতের ফল এবং ঘাত-প্রতিঘাত সামলে নেওয়ার ক্ষমতা-সঞ্জাত। তাই একধরনের হন্যেমি তাকে পেয়ে বসেছিল এবং সে সর্বদা একটা-না-একটা কিছু করতে চাইত তক্ষুনি— অতি বেসবুর এবং আগাপাছা ভেবে দেখার জন্যে সময়-খরচের ব্যাপারে ঘোর অনিচ্ছুক। তখন মাদবর যেমন তাকে প্রকৃতিস্থ করতে পারত, তেমন আর কেউ না। একথা গফুরের জানা ছিল বলে সে বেশ বিস্ময় বোধ করত এবং ভাবত, মাদবর চাচা কি তার দাড়ি না মিষ্টি কথায় হেন অসাধ্য সাধনের জের মেটায়? ওই প্রৌঢ় ব্যক্তি, না, প্রায়-বৃদ্ধের ব্যক্তিত্বে একটা জাদু ছিল আকর্ষণের এবং সংলাপকালে অপর পক্ষকে বোঝার চেষ্টার, যখন নীরব মিষ্টি হাসি মুখে ফুটেই থাকত। মাদবর কবি মোহাম্মদ আলীর সীমানা থেকে অনেক ক্রোশ দূর ব্যবধানে চলে আসে নি শুধু, ও-পথ তার পায়ের ধুলো-বঞ্চিত এমনই যে সে অনেক ঘুর-পথে নিজের গন্তব্যে পৌঁছাত, তবু সহজ সড়ক ধরত না। গফুরের প্রস্তাব শুনে সে ইতস্তত করেছিল এড়িয়ে যাওয়ার কায়দায় এবং বলেছিল, "হ, ভাইব্যা দেহন উচিত। হুড়মুড়ের যাত্রা, যা করে বিধাতা, কথাডা কথার কথা। তাই আমি কই— কই—"। তখন মাদবরের চোখ কারো মুখের উপর নিবদ্ধ থাকত না, বরং মাটির উপর পতিত— যা বস্তুধর্ম বা প্রাণজ ধর্মে একদিকে ধাইবেই। তখন গ্রামপ্রধান যেন আরেক মানবে পরিণত; পাশ থেকে যার ছবি দেখলে মনে হবে আকাশ-রেখায়

মুখ-রেখা মিশে যায় খুব সহজে এবং তা সংগতি-রক্ষায় অশেষ সমর্থ। মানুষটার যেন এই আসল রূপ, যা বছরের পর বছর জীবন-সংগ্রামে, অভিজ্ঞতার কড়াইয়ে চোলাই একধরনের অমৃতবারি মারফত সে লাভ করেছিল, যা-তে ভেজাল কিছু নেই বা কেউ তার শরিক। স্ত্রী-কন্যার মৃত্যু এবং পরবর্তীকালে আট বছরের দৌহিত্রকে নিয়ে আয়ুর সড়কে হাঁটার সময় আত্মস্থ হওয়ার সাধনায় মস্তিষ্কের কলকজাগুলো এমন পালিশ করে নিয়েছিল যে তা আর পদার্থ-পর্যায়ে নেই, বরং তারই চেনাশোনা প্রতিবেশীতে পরিণত— যারা আয়ত্তে না থাকলেও জুলুম চালায় না, কথা শোনে, কিছুটা উৎকর্ণ-হৃদয়। মাদবরের কব্জির মোটা হাড় ঘৃণের দোসর— এমন মন্তব্যে সায় দেয় না কেউ বরং পালটা দেবে, "তাগদ আছে, আছে বইকী। হাতির গুপ্ত দাঁত, শত্রু-গ্রাসের সময় বেরোয়।" এই ব্যাপারটা গফুর একবার পরখ করেছিল প্রাক-পতঙ্গ আমলে পাঞ্জালড়ায়ে, যখন অবসর-বিনোদনে এমন সব খেলা-কসরত অনুষ্ঠানের সময়ও পাওয়া যেত রেওয়াজ-অনুযায়ী। এমন স্মরণ অর্থ, সঙ্গ সঙ্গে জড়িয়ে আসে বহু শ্যাওলার দল যেন দালান থেকে তোলার সময় : বৃক্ষ, সবুজ পাতা, মাঠ, গোরুছাগল, তরমুজের ক্ষেত, অঢেল-জল নদী— যার কিনারায় সবুজ ঘাসের আতিথ্যে উপস্থিত তৃণভোজী জন্তু, ক্লান্ত বিশ্রামবিলাসী চাষি কি রাখাল বালক। যেমন সখিনাকে কবরে চাপা দিয়েছিল গফুর তেমনই অনেক কিছু মাটি-ঢাকা করেছিল সে— এই জেনে যে যতই মাথা খোঁড়ো পাষাণে, পাষাণ থাকবে অনড়, নির্বিকার, নির্বাক, যদিও অবিকৃত নয়; যেহেতু তোমার ফাটা কপালের রক্ত ফোঁটা ফোঁটা অথবা চাপ-চাপ বসে গেছে প্রলেপের মতো তার গায়ের রঙ বদলে দিতে। একজায়গায় মাদবর ও গফুরের সংযোগ-ক্ষেত্র ছিল, তা প্রৌঢ়জনের মাতৃহীন নাতি, যে অক্লেশে কোল বদল করতে পারত এবং বলতে সক্ষম হতো কচি দাঁতের হাসি ছিটিয়ে "এই আমার মামা, গাড়ি চালায়, চাঁদ ধরে ধরে দিতে পারে। দ্যাহেন, দ্যাহের, নানু... ওই চাঁদ।" হয়ত অপত্যস্নেহ-বঞ্চিত অথবা দুমড়ানো জীবন যেমন স্বপ্ন আগামীদিনের এবং তৎহেতু কোনো বাহন ধরে, তেমনই জের হিসেবে গফুর বালক বেলালের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তাকে মাঝে মাঝে বাড়ি নিয়ে সখিনার জোরপূর্বক খোলা স্তনে মুখ গুঁজিয়ে আদেশ বর্ষণ করত ('খা ব্যাটা খা, মামির দুধ খা'।— 'আমার সরম করে'— 'তবে দে এক কামড়।"— 'আমার সরম করে'। বেচারা গ্রামবধূ প্রথমে নাজেহাল পরে সতেজ সর্পিনী কাটান দিত কথার,— 'মামা পারে না, অহন ভাগ্নে জুটিয়েছে') এবং কাতুকুতু-যোগে ওকে হাসিয়ে সারা বাড়ি পূর্ণ করে তুলত। মমতার স্রোত আজও প্রবাহিত যতটা না বাইরে, ভেতরে আরো বেশি, কেবল স্মৃতির শিকার-সন্ধানী নক্রবেশের জন্যে অথবা সম্পর্কের আরো শিকড় এদিক-ওদিক সঞ্চারিত ছিল, যা কারো বিশ্লেষণ-বহির্ভূত— এমনই জটিল সেই সড়ক। মাদবর গফুরের তপ্ত ব্রহ্মতালুর উপর হাত দিলে অনুভব করত, বরফের ঠাণ্ডা হিম বিষুব-রেখার উপর তাকে ঘুমন্ত দেখার জন্যে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে অতি সন্তর্পণে যেন মাত্রার তারতম্য সব উল্‌টো না করে বসে। গ্রামজীবনে সমষ্টির বেষ্টন যেমন কাউকে গোত্রচ্যুত করে আবার তেমনি টেনে আনে নিকটে— যখন কোনো পাষাণভার একা বইবার দায়িত্ব থেকে সে খালাস পায়। তবে বৃত্তের মধ্যে বৃত্তের অবস্থানের মতো খুব নিকট-পরিধিতে অনেকে এমন অক্ষ-রচনা করে, যার ফলে যন্ত্রণার ভাগী মেলে এবং তখন সমষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে বা নেই— অন্তত তত প্রকট থাকে না। প্রৌঢ় বা আসন্ন-বৃদ্ধ কি জোয়ানে এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্থানবিশেষ, কখনো জীবন যাপনের ধারা থেকে উৎসারিত বা বিশেষ সুবাদে পর্যাদে। অবিশ্যি মাদবর গফুরের চাচা ছিলেন না বা দূর আত্মীয়তার কোনো সামান্য সূত্রও উভয়ের মধ্যে আবিষ্কার কঠিন। আবার নাতি বেলালই নিমিত্ত— এমন সিদ্ধান্ত শুধু ভুল নয়, তার উপর জোর রাখলে দুজনের মানসিক আদলের সঠিক পরিচয় অপরিজ্ঞাত থেকে যাবে। মানুষে মানুষে ব্যবধানের উপর ঠেস রাখলে তাদের নৈকট্যের রেখাগুলো ক্রমশ ঝাপসা হতে থাকে এবং তা কোনো কালেই আর গোষ্ঠী-জীবন গড়ার পক্ষে অনুকূল নয়।

বেপরোয়া-ভাব বেলালকে ছেলেবেলা থেকেই পেয়ে বসেছিল আদরের আতিশয্য থেকে। হয়ত। আতিশয্য থেকে সূত্রপাত এবং স্বভাবের তাগিদে ক্রমশ স্ফুটমান। হয়ত। বনবাদাড় গাছপালা শুধু সবুজ রঙ দিয়ে বেলালকে প্রলুব্ধ করত, স্নেহজ ছায়ায়, মাতৃহারার পক্ষে যা লোভনীয়। হয়ত। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম : গোটা দুনিয়া যখন ঘর, তার বাসিন্দা থাকবেই। তা শহরের বেলা যেমন প্রযোজ্য, অরণ্যের বেলায়ও সেই খাতে বইতে থাকে, নড়চড় হয় না। তেমন ঘটলে, কীটপতঙ্গ যথা প্রজাপতি কি গঙ্গাফড়িং কি গোবরেপোকা অথবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীববৃন্দের বারবার যাযাবর হতে গেলে তা যেমন তাদের পক্ষে অনিষ্টকর, তেমনই তাদের পক্ষে— যারা এদের গোত্রীয় না হলেও, পাশাপাশি অবস্থান মারফত পরিচয় দৃঢ় করেছে, যদিও কখনো সুবাদ বা কখনো বিবাদ ছিল সম্পর্কের মধ্যে। প্রচরণশীলতাও নিয়মের বাইরে যায় না, যদ্যপি মৃত্যুর ক্ষয়ক্ষতি সেখানে প্রচণ্ড এবং অনিশ্চয়তা মোদ্দা কথা। বেলাল এবং বনবাদাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিবেশি গড়ে উঠলেও তা কোনো বালসুলভ প্রবৃত্তির ফলশ্রুতি-রূপে গ্রহণ না-করার পেছনে যুক্তি হচ্ছে, ওই পাশাপাশি বাস তো আদিম ব্যাপার এবং সেখানে যদি ব্যবধান ঘটে তা একটা মেয়াদে সীমাবদ্ধ। যেহেতু পঞ্চভূতের কাছেই আবার ধরা দিতে হয়, ইহকালের দানাপানি ফুরিয়ে গেলে। তা ছাড়া রক্তপিপাসুদের যে-পান-পাত্র প্রয়োজন, তার নির্মাণকাণ্ড যদিও দেহের ভেতর তবুও উপাদান শেষপর্যন্ত বহিরাগত এবং সেখানে গেলেই তৃষ্ণা মেটানো যায়, এমনকি, কৃত্রিম বর্ণ যতই বনবাদাড়ের বাইরে গড়ে তোলা হোক না কেন। বেলাল বালক বিধায় তার মনোরাজ্যে কী ঘটত এবং কী কী আকর্ষণে সে আকৃষ্ট হতো, অনুমানের কোন ফট্‌কা না খেলেও বলা যায়, সঙ্গীরা হয়ত তাকে জায়গার এমন স্বাদ দিয়েছিল এবং পরে তাদের বিনা উপস্থিতিই সে একা একা হাজির হতো নিজের মনে, সবুজের প্রতি সহজাত আকর্ষণে। কিন্তু যখন শস্যশ্যামল হরিৎখণ্ড ক্রমশ বিস্তার থেকে সংকীর্ণতার খাপে ঢুকতে লাগল এবং অতি অকস্মাৎ-অকস্মাৎ, তখন সে হন্যে হয়ে উঠত, কোথাও-যদি-কিছু-থাকের সন্ধানে। এমনকি উঠান বা কোথাও তার চোখের নাগালের বাইরে কোনো সঙ্গীহীন বৃক্ষ থাকলে চেয়ে চেয়ে দেখত যতক্ষণ না ঘাড় ধরে আসে বা চক্ষু আর কিছু ধরতে নারাজ হয়। পিতামহের বুকে মুখ গুঁজে সে দেখতে চাইত সেইসব খোওয়ানো মাঠ, ঝোপজঙ্গল— বেবাক সমারোহ-সমন্বিত— যা কিছুদিন পূর্বেও সঙ্গীদের সহযোগিতায় তোলপাড় করত পাখির ডিমের সন্ধানে,

ঝিঁঝিঁ পোকা ধরতে, কখনো আসন্ন সন্ধ্যায় জোনাকিপোকার পেছনে দৌড়-তৎপর— এমন শত শত খণ্ড অকেজো কর্মপরায়ণতার চলমান ছবি। বহু সঙ্গী মৃত, এলাকাত্যাগী, নিরুদ্দিষ্ঠ। কোথায়? কোথায়? এই প্রশ্নের জবাব যারা দিতে পারত, তারাও মৃত, এলাকাত্যাগী, নিরুদ্দিষ্ট অথবা ধুকছিল কোথাও নির্মম বিছানার রাজ্যে— কেউ-কেউ চলৎশক্তিহীন, বাড়ি গেলে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে উঠান পর্যন্ত এগিয়ে আসে বা ম্লান হাসি হাসে, ফ্যাকাশে চোখ, প্লীহাজাত ঢিবি-উদর। বেলাল অনেকটা সুস্থ মাদবরের আওতায় এবং তা সম্ভব হয়েছিল, গ্রামের মুখ্য ব্যক্তির অভাব অত প্রকট নয় অথবা থাকলেও সবাই তো চক্ষুসত্তা হারিয়ে ফেলে নি। তারা তাকে এটা-ওটা দিয়ে যেত, চিরদিন যেমন সম্মান দেখিয়ে এসেছে সেই স্রোত অক্ষুণ্ন রাখতে দারিদ্র্য সহজে মনে প্রবাহ ধ্বংসে অক্ষম একথা নতুন করে জানার বিষয় নয়।

বেলাল হঠাৎ কল্পনা করত, কোথাও হারিয়ে গেলে তার মাতামহ ও অন্যান্যদের কী প্রতিক্রিয়া হবে— তারই কিছু চিত্রাবলি। এই খেলার সূত্রপাত কিন্তু তার নিরুদ্দিষ্ট সঙ্গীদের দশা এবং মুখের কথা ভেবে-ভেবে— যখন সে ছাল-ছাড়ানো কই-মাছের মতো আথালিপাথালি করত তাদের সঙ্গ পেতে এবং তাদের সঙ্গ-পাওয়া মানে কোনো হরিৎ দ্বীপে আকস্মিক উপস্থিতি— যেখানে অফুরন্ত দৌড় বা ঝাঁপ দাও, চিৎকার করো, ইচ্ছামতো বৈঁচিবন থেকে ফল তুলে খাও অথবা জলাশয় থেকে পানিফল। কিন্তু বিধান জাঙ্গাল, ফাঁকা মাঠ, ঝোপ-ঝাড় ক্রমশ নিঃশেষ— শেষে কোথাও যদি এতটুকু থাকে সকলের আগে হাড়-জিরজিরে প্রায় ভাগাড়-যাত্রী গোরুগুলো ছুটে-ছুটে যায় একদম স্বাধীন। যেহেতু ওগুলোকে কেউ আর বাঁধে না, বাঁধার দরকার হয় না— খাওয়ার আছে কী? বেলালের বোঝার কথা নয় যদিও, কিন্তু এইভাবে একধরনের স্বাধীনতা মেলে, যার বিচার দুই প্রান্ত থেকে একই জায়গায় গিয়ে ঠেকে : তাবৎ গোরুর পাল এবং স্বাধীন। সজীব গোরুও একধরনের আছে, যা তাদের বোঝার সাধ্যির বাইরে। পশু ও মানুষ এইভাবে একঘাটে জল খায় এবং কাওয়ালি গায়, যখন গৌড়গ্রামের দশার মতো সব ঠাঁই। বেলাল হঠাৎ বর্ষীয়ানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাই কৈশোরকালের খোঁট পাকড়ে ফেলেছিল এবং সে পূর্বে যে-সহজ যুক্তিতে কোনো কিছু বুঝত বা বুঝতে চাইত— তা আর হয় না। বরং সেই হাই তুলে ভাবত যেন গোটা রাজ্যের চিন্তা তার মাথার ভেতর কিলবিল-রত এবং সেগুলো বেরুনোর পথ না পেলে তার মাথার খুলি চৌচির ফেটে যাবে। মাতামহের সান্নিধ্যেও সোয়াস্তি পাওয়া যেত না বিধায় ঘুম ভেঙে গেলে সে জানালার বাইরে চেয়ে থাকত এবং দেখতে চাইত সবুজ-কিছু— যা তার সব জড়তা তখনই হরণ করে তাকে অগাধ তাগদ দেবে গোটা গাঁ চষে ফেলতে। অথচ বাইরে ন্যাড়া-ন্যাড়া গাছ (যথা— খেজুরগাছে ফল তখন সবুজ থেকে ধীরে ধীরে হলুদ হতো এবং খুব ভোরে কাক বসত ঠোকর দিতে) কঙ্কালের মতো খাড়া রয়েছে, আর বাতাসে কিছুই দুলছে না। কোনো কুঁড়েমি-ভাবের আচ্ছন্নতা যদিও বেলাল ঠিক তলিয়ে দেখতে শেখে নি, তাকে ঘিরে থাকে, তা সে বোঝে এবং মাতামহকে দেখে মনে করে সে খেলার সঙ্গী হতে পারলেও তার পক্ষে যোগ দেওয়া অশোভন কি অসম্ভব। মাতামহ বৃদ্ধ হাড়েগোড়ে বেঁচে ছিল কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারো দয়ায়, যদিও মানুষটা তার জানার বাইরে।

মাদবর একদিন দুপুরের ঢলা-মুখে গফুরের নিকট ছুটে এসেছিল দৌহিত্রের খোঁজ নিতে, যদি সেখানে সে এসে বা কোনো অছিলায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে থাকে। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট বালক কি তেমনই কিছু করে বসেছিল আর দশজনের মতো— খুব নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও যে গ্রামের সীমান্ত পার হওয়ার যো নেই বা জান-কবুল করে এগোলেও কেউ তা অতিক্রম করবে— তেমন জামিন কেউ হতে চাইবে না। এই হেতু, মাদবর এবং ইনাম যদ্দূর পেরেছিল খোঁজাখুঁজি করলেও কোনো হদিস-সন্ধানের ধারে-কাছে যাওয়ার কথা কি যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ আবার গন্তব্য সেখানেই শেষ হয়েছিল। তখন সারা গ্রাম যারা মাদবরকে ভালোবাসত সমীহায় শরিক এগিয়ে যেতে লাগল একেক দল দিক ভাগ করে ঠিক জলের জালের কায়দায় যেন শিকার কোনো ফাঁক গলে না পালাতে পারে— সতর্কতার বেড় এমনই। মুহূর্তে মুহূর্তে মাদবর তখন তার প্রৌঢ়ত্ব পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল, পাকড়াও করছিল বৃদ্ধত্বের লক্ষণ, যেমন শাদা চুল, অল্পে ক্লান্ত ঘনঘন নিশ্বাসের হাপর টানা এবং দৃষ্টিক্ষীণতা। গফুর কঠিন রেখায় মুখ ঢেকে, যথা আহার-বঞ্চিত অর্ধশীর্ণ শরীরের কথা ভুলে কর্তব্য সম্পাদন করছিল যার— তাগিদ ভেতর থেকে এমনই প্রচণ্ড যে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সেও মুখ থুবড়ে জমিনের উপর পড়ে যাবে এবং আর উঠবে না কোনোদিন একবারের তরেও। শোনা যায়, বন্য বরাহ পর্যন্ত সন্তানের সন্ধানে হন্যে ছুটোছুটি করে এবং সম্মুখে যাকে পায় হামলা চালায় আক্রোশে নয়, বরং তল্লাসের জন্যে কেউ সাথি হচ্ছে না কেন এ-ই গোস্বায়। মাদবরের তাগদ ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল নাকি, কে জানে, গফুর তাকে নিরস্ত করছিল এই সান্ত্বনা দিয়ে যে, খোঁজ আপাতত মুলতুবি থাক, বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু মাদবর যেন মৃত্যুর কটু গন্ধ পেয়েছিল, যখন সে বারণ শুনতে নারাজ আরো তৎপরতার নির্দেশ দিলে, নিজের দশার কোনো তোয়াক্কা রাখলে না। এই সময় গফুরের মনে হয়েছিল, গোটা গ্রাম যেন কোনো মৃত্যু-পরিখার হাঁ-মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কোনো অদৃশ্য টানে যা থেকে মুক্তির আর কোনো উপায়-উদ্ভাবন অথবা চিন্তা-জাগা অসম্ভব। সে-ও স্বপ্নের ঘেরাটোপের মধ্যে হাঁটছিল, দুই-চোখ খোলা, যদি হঠাৎ তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে গোটা দিনের মেহনতের পুরস্কার কড়ায়-গণ্ডায় পুষিয়ে দিতে। কারো জানা ছিল না, বেলালের আকর্ষণ কোন দিকে বা কোন পথে, যার সূত্র ধরে তারা একটা সুরাহা করতে পারে। নিরুদ্দিষ্টের পেছনে সকলে যখন নিরুদ্দেশ হয়, তখন কানামাছির খেলা-কালে চোরের সকলেই চোখ বেঁধে মওজ চালু রাখলে যা হয়, এখানেও তা ঘটছিল। গফুরের চোখ শেষে মাদবরের উপর যতটা বেশি, রাস্তার বা রাস্তার আশপাশ, গলিঘুঁজি, পুকুর-পাড়ের (কলাগাছ নেই আর যার আড়ালে ছেলেরা খেলা করবে) দিকে ততটা নয়। এই সময় ঝড়-তুফানে দরিয়ায় শক্ত হাতে হাল-ধরা মাঝি, আর চর-দখলের লাঠিয়াল (মাদবরের নানা ভূমিকার সঙ্গে গফুর পরিচিত) মাদবর টান-টান এমন অবস্থায় যে কোনোদিন পড়ে নি, তা গফুরের উপলব্ধিতে এত দাগ কাটে, সে আর স্থির থাকতে পারে নি এবং এই পর্যায়ে অব্যাহত রইলে কার কী হতো কারো পক্ষে বলা অসাধ্য ছিল। কারো না

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারো— হয় গফুর অথবা মাদবরের ধড়ে প্রাণ অন্তত আর কোনোমতেই থাকত না— এমন সিদ্ধান্তের জন্য বহুত আক্কেল বা অনুমান অবান্তর। বন্যারোধী বাঁধের মাটি কাটার ফলে অনেক নিচে একটা জায়গায় কিছু ছোট ছোট লতাগাছ লতিয়ে-লতিয়ে অনেক দিনের বংশানুক্রম-সান্নিধ্যে একটা ঢিবির মতো সৃষ্টি করে রেখেছিল। মাটির নয়, লতার। সেখানেই একটা শিশুর পা দেখা যাচ্ছিল। হুড়মুড় জনতা সেখানে পৌঁছানোর পর আর বুঝতে কারো দেরি হয় নি কিভাবে গোটা ব্যাপারটা ঘটেছিল না শুধু, ঘটার পারম্পর্য সৃষ্টি করেছিল। শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা সবুজ ওই এক জায়গা, রাস্তার অনেক নিচে চোখের আড়ালে খানিকটা ছিল। তা-ও শুধু লতায়-লতায় সৃষ্টি, যার সামান্য সরিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে ভেতরে খরার দিনে শুয়ে পড়তে পারো, তোমার ঘুম ধরতে বেশি দেরি হবে না। অনেক দিনের শৈত্য-স্নেহ সেখানে জমাট যুগ-যুগ ধরে, হয়ত বহু মন্বন্তর, এবং এই মায়া হয়ত আরো বেশি সুখপ্রদ— যার পরিচয় ভুক্তভোগীই শুধু দিতে পারে। মনুষ্য-শিশুর উপর সবুজ, সবুজের উপরে শত শত উপবিষ্ট পতঙ্গ কুরে-কুরে খেয়ে-খেয়ে চলেছে এবং তৎপূর্বেই চতুর্দিকে জমাট চাপ, যখন বাতাস রুদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। নিঃশ্বাসও তখন পালিয়ে যেতে বাধ্য যমদূতের ভয়ে, যে ওৎ পেতে ছিল, ওৎ পেতে ছিল।

১৪

পর্যায় শেষ হয় পর্যায়ান্তরে যদিও, তবু সেখানে ঠিকুজির চিহ্ন পাওয়া যায় সহজে। যেহেতু গতির নিজস্ব ঘটন-পটুত্ব আছে এবং অজানিতেই সকল কর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, যখন কর্তা ও তার ক্রিয়া স্ব-স্ব বিন্দুতে থাকার সুযোগ পায় না বটে, কিন্তু সাবেক যাত্রাবিন্দুর একটা রেখাভাস রেখে যায়। গৌড়গ্রাম তো কোনো ব্যতিক্রম নয়, এক বর্তমান দুর্বিপাক ব্যতীত— যা যে-কোনো দেশেই হতে পারে এবং অতীতে অন্য দেশে ঘটেছিল, সুতরাং ছকের বাইরে যাবে কিভাবে? অবিশ্যি অভাবের মধ্যে যখন আর পথ থাকে না উত্তরণের, তখন তারি মধ্যে একটা শান্তি-সন্ধানের মন গড়ে তুলতে হয় এবং তাতেও যখন কুলোয় না, তখন অসোয়াস্তি ঘুমের মধ্যে ঢাকা দিলেও, মাটির অনেক নিচে জলের চুঁ মারার মতো— যা পরে ধসের কাজ করে— উপায় উদ্ভাবন অব্যাহত থাকে। মাদবর, একটা নমুনা ধরা যাক, যেমন আগে ছিল, তখনো পূর্ববৎ নিজের কেন্দ্রে অবস্থিত থাকলেও সে ঝুঁকে পড়ত এদিক ওদিক নয়— এক দিকে এবং সে-তরফ গফুর। এমন ঘটেছিল, কারণ, নিজের মধ্যে মগজে, রক্তে অনেক-অনেক নিজস্ব ছাপ এবং যদিও বাইরের রগড়ানি-ঘষড়ানিতে তার বহু জায়গা আর স্পষ্ট নয়, তবু একটা মোটামুটি পরিচয় ছিল, ঠিক মানুষের নামের মতো— যা তার বয়স বা বুদ্ধির পরিমাপ করে না, কিন্তু অনড় থাকে। তা না হলে পারস্পরিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেত কোনো ভাব নেই বলে নয়, আদানপ্রদানের আর কোনো সুযোগ থাকত না। এই রকম, অনেক সময় সুযোগ অ-যুক্ত পুষে রাখার সুবিধা এত যে তার ফিরিস্তি বহু দেওয়া যেতে পারে, যদিও মনের সায় এতটুকু কোথাও মেলা ভার। বেলালের মৃত্যু আর দশজনের মতো মাদবরকে এমন ঘায়েল করেছিল যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ত গফুরের মধ্যে সে সব সান্ত্বনার ছায়াভাণ্ডার না পেলে আর কিছু ঘটিয়ে বসত বা মসজিদের ইমামের সহবাসে দিনরাত বসে থাকত বুঁদ, নিশ্চুপ এবং নিজের অদৃষ্টের নিকট খেদোক্তি জুড়ত বাক্যে নয়, দীর্ঘশ্বাসে। কিন্তু যেহেতু সে মাদবর— আর দশজনের জীবনের শরিক এবং এইখানে তার একটা অহমিকা নয় আত্মশ্লাঘা ছিল— সে ধীরে ধীরে নিজস্ব মহিমায় আপন শূন্য আসনের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল এবং কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ উল্‌টো ঘুরপাক খেতে খেতে দেখল, গফুর দাঁড়িয়ে নয় শুধু, এতক্ষণ দেহরক্ষীর মতো ছিল পেছন-পেছন। তখন তার কাঁধেই হাত রেখে আবার সে অতিক্রম্য পথ পার হওয়ার আশায় পা ফেলতে থাকে। আসন চেয়ে আছে প্রতীক্ষায়। মাদবর তা জানলেও বুঝেছিল, আরো কাজ আছে যা সমাধার পূর্বে সে কোথাও বসবে না, বিশ্রাম নেবে না এবং সেইহেতু আসনের প্রশ্ন অবান্তর।

—মাদবর চাচা!

—কী ভাইপুত?

বহুকাল পরে সম্বোধনের এমন সহাস্য জবাব দিতে সমর্থ পিতৃব্য। তাই বিস্ময়াবিষ্ট বাক্যকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে আরো হতভম্ব হয়েছিল, যেহেতু দেখেছিল, মাদবরের দাঁত থেকে স্মিত হাসি ছিটিয়ে পড়ছে এবং প্রমাণ রাখছে— তখন সে নৌকার উপর, নৌকা তার উপর নয়।

—চাচা, একটা কথা কই।

—একটা?

—হ।

—আমি হুনতাম না।

—ক্যান, চাচা?

—তুমি একশটা কও, তয় হুনি। একটা না।

গফুর তখন অনুভব করেছিল, মাদবর মুরুব্বির আসন থেকে আত্ম-বরখাস্ত নিচে নয় যেন এক উঁচু দেওয়াল-আরোহী এবং সেখান থেকে প্রসারিত-কর সকলকে সম্বোধন-রত, "যারা নিচে আছো, আমার হাতে ভর দিয়ে উপরে উঠে এসো। এই খাড়াই— উচ্চতা— পার হওয়া কিছু না, খুব সহজ।"

—চাচা।

—কও ভাইপুত।

—পোকা—।

—পোকা—?

—হ্যাঁ, এগুলো পোকা।

—কোন্‌গুলো?

—আপনি জানেন না?

—পোকা নয়, ছারখার।

—সুরত দাদুর পাতায় লেখা সব গান খাইছে।

—ঐ পোকাগুলোর কথা বলছ?

AMARBOI.COM

—আপ্‌নে ওগুলারে পোকা মনে করেন?
—তা ছাড়া আর কী?
—তয় সবাইরে কন্‌ন না ক্যান?
—অসুবিধা আছে।
—আমি গাঁয়ের মাদবর। দলাদলির ডর।
—দলাদলির কি বাকি আছে?
—আরো বাড়বে। পোকের জ্বালায় অস্থির। আরো দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে।
—বেধে তো আছেই।
—ও ছোটখাট, প্রলয়ের আকারে শুরু হবে।
—আপনি মানেন, ওগুলো পোকা?
—আগে বুঝতাম না, অহন বুঝি।
—পোকা— পোক্।
—সর্বনেশে পোক্।
—আসুন, পিটিয়ে শেষ করি। আগুন লাগাই, কদিন টিকবে?
—হে করতা যাইও না। বাধা পাবে।
—তবে—।
—উপায় বের করতে হবে।
—আখেরে পেটানো ছাড়া পথ নেই।
—তা ঠিক।
—তবে।
—অহন না। সময় বুইজ্যা।
—কহন সময় আইব?
—আইব। ভাবা লাগে। তোমরা যারা চোরাগুপ্তা পোক্ মারছ, তাগোর সবাইরে জোটাও।
—চুপিচুপি দলে আমি নাই।
—তুমি আছো। ঝুট বলো না। তুমি আছো তাই কাউরে আমি কিছু কই না।
পিতৃব্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল বটে গফুর, কিন্তু তা শ্রদ্ধা-নিবেদনের ছলমাত্র এবং স্নেহে আপ্লুত বিধায় আর কোনো কথা উচ্চারণে অসমর্থ চুপচাপ বসে থাকতেই রাজি ছিল, যা মাদবর ভাঙা সাঁকোর মতো নাড়িয়ে দিলে, হিলিয়ে দিলে।
—জড়ো হও, তারপর অন্য কথা।
—কুথা?
—চুপিচুপি ব্যাটা।
—চুপিচুপি ক্যান?
—ব্যাটা, বেসবুর। কারণ আছে। আমার বাড়ি আইও মগ্‌রবের (সন্ধ্যা) বাদ।
পিতৃব্যের এবম্বিধ আচরণে গফুর এত তলিয়ে যাচ্ছিল যে দিশা পাওয়া তার পক্ষে কষ্টকর নয় শুধু, অসোয়াস্তিকর, এবং সে আকাশ-পাতাল ভাবছিল, এই প্রৌঢ় মানুষটির

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে কী আছে, যার সাহায্যে সে সকলের এত নিকটে আসে অথচ ধরা দেয় না সহজে। গফুরের উদ্দীপনা-উৎসাহের সঙ্গে এই আমেজ তাকে আরো কর্মঠ স্বপ্নচারী করে তুলছিল এবং সে ভেবে পাচ্ছিল না, এতগুলো লোক এসে জুটল, যদিও আসল ব্যাপার সম্পর্কে তখনো সকলে প্রায় অজ্ঞ— বলা চলে। পণ্ডিতপাড়ার কজন, সঙ্গে বুলান— যে কয়েক মাসে তার কৈশোরকাল সহজে বিসর্জন দিয়েছিল। কাজিপাড়ার কজন মুখে ফেটি-বাঁধা বসে গিয়েছিল আত্মগোপনের পরিপূর্ণতায়। এসেছিল মুনশীপাড়ার লোক। সংখ্যায় তারাই বেশি হওয়ার কারণ, সবাই পাটচাষি এবং সবচেয়ে ছারখারের খাররূপে তাদের জীবন অতি কষ্টে ধুঁকছিল অহোরাত্র শুধু টিকে থাকার উগ্র তাগিদে। গফুর জানত না, এত মানুষ রয়েছে তার জানার বাইরে এবং মুখিয়ে আছে একটা কিছু করার জন্যে— যা তাদের এই অবস্থা যেখানে খুশি নিয়ে যাক— আরো কোনো বিপদ-সমুদ্রে, তবু হেথা নয়। একটা সিদ্ধান্ত সকলের স্থির : অবিচ্ছিন্ন ধৈর্য আসলে কাপুরুষের ছুতা ভিন্ন অন্য কিছু না, যদিও কোথাও-কোথাও মেয়াদি সবুরের প্রয়োজন আছে এবং তা আক্কেল-সম্মত। এবং পতঙ্গ যে পক্ষী বা আশীর্বাদ-রূপী দেবদূত, সে বিষয়েও আর সন্দেহ-পোষণ অন্যায়। কেননা, তার লক্ষণ যখন কয়েক মাসেও অজ্ঞাত রইল তখন তা আবার স্পষ্ট হবে এবং যথাক্রমে ডিম পাড়বে কি আবির্ভূত হবে— এমন কোনো আশা-রক্ষা সুদূরপরাহত। অতএব, একটা কিছু করেই দেখা যেতে পারে এবং যেহেতু মৃত্যুর বাড়া গাল নেই, কী আর হবে বা হওয়ার বাকি আছে, এক নিঃশ্বাস চিরতরে বন্ধ ব্যতীত?

মাদবরকাকা অশিক্ষিত মানুষ হিসেবে মোহাম্মদ আলীদের নিকট মর্যাদাহীন হলেও একটা ব্যাপার ঠিক, পতঙ্গ-আবির্ভাবের পর তিনি গ্রামে সকলের নিকট প্রিয়পাত্র ছিলেন বটে, কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে অদ্বিতীয় এবং সকল ঝুঁকি তিনি গ্রহণ করেন, বর্তমানেও করবেন। এসব তার মুখের কথা, গলার আওয়াজে স্পষ্ট, অতি স্পষ্ট ছিল— সেদিনও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। শাদা দাড়ির উপর সঞ্চালিত-কর মাদবর হঠাৎ যেন ভাস্করের মূর্তিলোকে উপনীত, শুধু ঠোঁটের আন্দোলন অব্যাহত ছিল মাত্র।

বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান বলে চললেন— আমি অনেক ভেবেছি। আর তাই আমার মনে হয়, একটা জিনিস, তুমি আমি কেউ খেয়াল করি নি। এই পতঙ্গ নাজেল (আবির্ভাব) হওয়ার পর বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমরা বুঝতে পারি নি, কী করব। কী করা উচিত আমাদের জানা নেই। এগুলো পোকা না আর কিছু, তা নিয়ে নানান লোক নানান কথা বলছে। ফলে, বোঝার গোঁজামিল আছে, ভুল আছে। নানা গোলযোগ। জানা কথা, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে কোনো হদিস পাওয়া মুশকিল। ঘরের জানালার দিকে যদি ফাঁক না থাকে, তবে কি বাতাস ঘরে ঢুকবে? বাতাস যে-ঘরে সেঁধোয় না, সে ঘর আর চুলো এক। তার মধ্যে বাস অসম্ভব। একটা কাজ হয়। তুমি সেদ্ধ হতে পারো, মানুষ না হয়ে যদি আলু বা কচু হও। (সকলের হাস্য) আর মনে রাখতে হবে—।

—মাদবরকাকা। জনান্তিকে পণ্ডিতপাড়ায় একজন মনের-কথা-টেনে-বলার চোটে অস্থির হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠেই থেমে গিয়েছিল, যখনই তার খেয়ালে আসে, গোপনীয়তা সেখানে পবিত্রতা।

—আরো শোনো। আমরা বিছানায় শুই। যদি এপাশ ওপাশ করোট ফিরতে না পাই— কড়া নিষেধ থাকে, তাহলে কি ঘুম আসে? না ঘুম ধরে? না ঘুম হবে কোনোকালে? এপাশ ওপাশ মানেই ওই বাইরের জায়গা— যদিও সামান্য জায়গা— তবু তা একান্ত দরকার। তা ছাড়া—।

(জনান্তিকে।— মাদবরভাই।)

—থামো ভাই, পরে তোমার কথা শুনব।

—আচ্ছা।

—আমি তাই মনে করেছি, আমাদের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা উচিত, আসল ব্যাপার কী? সুরত মণ্ডল-ভাই (তাঁর আত্মার মুক্তি হোক) বলেছিলেন, পঙ্গপাল। যদি তা-ই হয়, তার দাওয়াই কী? জানা দরকার, কিভাবে ধ্বংস করা যায়। আমরা বহুত ধ্বংস হয়ে গেছি। জানি না— তার পরাচিত্তির (প্রায়শ্চিত্ত) করতেই হবে। তবে এখনো আমরা যারা কোনোরকমে বেঁচে আছি, তাদের কথা বাদ দাও, আমরা কিছু দানাপানি খেয়েছি। আমাদের আওলাদ— বংশধরদের কথা ভাবতে হবে। তারা যেন দগ্ধে-দগ্ধে, ধুঁকে-ধুঁকে না মরে। তারা যেন পাকা বয়স হওয়ার আগে কবর বা শ্মশানের দিকে না এগোয়। এসব আমাদের দেখতে হবে। দেখতে হবে, মা-বোন ইজ্জত ঢাকতে না পেরে যেন জান না দেয়। আমাদের পয়লা দরকার বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ। অসুবিধাটা অনেক। চতুর্দিকে ওই পোকাগুলো এতটুকু, জায়গা রাখে নি, নিঃশ্বাস ফেলা যায়। অসুবিধা কম নয়। আমাদের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। হ্যাঁ উপায়—।

—উপায়! উপায়!— আমরা পাটচাষি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।... সব পোক... হালার পোকা খাইছে... ।— পাটচাষ কমাও।— পাটচাষ বাড়াও।— কথার শেষ নাই।— অহন কিতা করমু চাচা।— একডা কিছু করন পড়ে। সবাই চ্যাতছে...অহন ভাবি আগে চেতলাম না ক্যান?— এইবার কিছু অইব, হোনেন চাচা কি কয়।—প্যাডে কিছু নাই।— লাঙল কে বানাইব, কামারপাড়া শ্যাষ।— অহনও সময় আছে, হোনেন, হোনেন, গোলমাল করেন না...।

মাদবরের গলা চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং তার স্বর থেকে পরিষ্কার, নানা মতভেদের বান ডেকেছে কিছুক্ষণের জন্য। ভাটার মুখে অনেকেই মাদবরের মুখনিঃসৃত কথা শোনার পক্ষপাতী, যদিও কিছু গুঞ্জন ছিল এদিক ওদিক, অবিশ্যি সবই গোপনীয়তার আব্রু বজায় রেখে। মাদবর শেষে মতামত দিয়েছিল,— বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ, এটাই আসল কথা। কিন্তু আমাদের অসুবিধা আছে। গ্রামে অনেকে তা পছন্দ করে না আর তা নিয়ে লাঠালাঠি হয়ে গেছে। ওরা মরবে, তবু লড়বে না। কাজেই আমাদের কাজ চালাতে হবে খুব গোপনে যেন কাকপক্ষীও না জানতে পারে। আমি তার আগে এই মাটি ছুঁয়ে— যে-মাটি আমাদের মা, যার ফসলের মতো দুধ খেয়ে আমরা বাঁচি, বেঁচে আছি সেই জন্মের থেকে— হ্যাঁ আমি নই সকলে মাটি ছুঁয়ে কসম— পিতিজ্ঞে করো— কেউ আমাদের হালচাল জানবে না, কথাবার্তার গন্ধ পর্যন্ত কেউ পাবে না। আমার মাথায় কথাটা এসেছে। এখন তোমরা ভেবে দ্যাখো, ফলাফলের কথা ভাবো। এখানে শত মাথা আছে, আমার মাথার চেয়ে দামি— নিশ্চয়। শুধু একটা মাথা দাবি হতেই পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটি।...
মাটি।...
মাটি।...

এই শব্দের মধ্যে মাদকতার গন্ধ (অনেকে খাটুনির পর গায়ের ব্যথা সারতে গঞ্জে ধেনো টানে) তা পূর্বে কেউ যেন অনুভব করে নি এবং ভাবতেও পারে নি যে বাঁচার এমন উপাদান ছিল এত নিকটে, এত সহজে লভ্য। গফুর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বেমাত্রা, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রতিপালনে সকলেই একত্রে একই জায়গায় মাটি স্পর্শ করলে। যে-যার স্বতন্ত্র, আবার একত্রীভূত মানবগোষ্ঠী সঙ্গ-উচ্ছলতার আরশিতে নিজেকে দেখছিল সবিস্ময়, এ কি সম্ভব? প্রশ্ন সরবে নয় নীরবে। দৃষ্টির শ্লেটে তোলা। ক্ষুৎপিপাসা যা মানবিকভাবে মানুষকে পীড়িত করে, মনে হয়, বহুদিন এই গৌড়গ্রামে প্রবেশই করে নি, মাঝে মাঝে অভ্যুদয় তো দূরের কথা। এক পাটচাষির কান্না এসে যায়, আনন্দের আতিশয্যতাকে ধারণার বাইরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করেছিল। লুঙ্গি কোমরে-আঁটা সে যেন হঠাৎ বধির চতুর্দিকে তাকিয়েছিল এক মুখ থেকে অন্য মুখে দৃষ্টি ছড়িয়ে এবং সত্যি আর মুখ খোলে নি, যতক্ষণ মাদবরের সভায় ছিল, যদ্যপি এই তল্লাটে আদিখ্যেতার ছিঁচকাঁদুনে হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ, যে ঘামাচি হলে বলে বেড়াত পাকা বিষফোঁড়া। থমথমে আবহাওয়া আরো ঘনীভূত হয়ে এসেছিল, যখন সকলে মাদবরের যুক্তি শোনার আগ্রহে মাটির উপর থেবড়ে-বসা থেকে উৎকর্ণ, উবু হতে লাগল।

—আমি ভেবেছি, আমাদের গাঁ এক ক্রোশ চওড়া— এক কোশ আমরা সুড়ং কাটব সবাই মিলে। তবেই বাইরের গাঁয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। পতঙ্গ থাক উপরে। আমাদের রাস্তা মাটির নিচে দিয়ে।

গফুরের গোরুগাড়ি বন্ধ থাকার দরুন আর বাইরে যেতে অসমর্থ বিধায় এক অস্থিরতায় ভুগছিল এবং তা স্বাভাবিক হওয়ার হেতু, সে আর দশজনের সঙ্গে মেলামেশা থেকে বঞ্চিত। রাস্তায় তৃষ্ণা পেয়ে বসলে উড়ুউড়ু-ভাব কেউ কোনোকালে সহজে কাটিয়ে উঠতে সমর্থ, এমন সম্ভাবনা কম। গফুর সম্পর্কে তা জানা ছিল মাদবরের। অমন প্রস্তাবে সে চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং সহজে শান্ত হতে পারে নি— যতক্ষণ না মাদবর তাকে নির্দেশ দিয়েছিল চুপ থাকতে এবং ধৈর্য ধরতে। যেহেতু কাজ ভেবেচিন্তে না করলে আখেরে এমন পরিণামে টেনে নিয়ে যেতে পারে যা পতঙ্গ-অবস্থানের সর্বনাশা অপেক্ষা হয়ত আরো দুর্বিষহ।

—কিন্তু আমাদের কাজ গোপনে। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে, জানা যাবে, তখন কী করা উচিত। তাই আমি বলছি, বাইরে অন্য লোকের সামনে কেউ কোনো উৎসাহ দেখাবে না। সব তাগদ, উৎসাহ জমা রাখতে হবে মাটি খোঁড়ার কাজে। আর মনে রাখতে হবে ওটাই আমাদের আসল কাজ।

—তবে আর দেরি কেন।— শুভ কাজে দেরি ভালো নয়।— হালা আমাদের সব্বনাশ করছে।— অহন আর তর সয় না— মারুম, বেদম মারুম—। আমি কই আগুন দিলে হালা পোক যায়।— মাদবর চাচা কয়, দাওয়াই আছে। —হালা রোগ আছে, আর

দাওয়াই নাই? কও কী?— তা হৈত ফারে না।—ও পাড়ার মানষে কয় ওগুলো লোক্— হালা পোক্‌রে কয় লোক্।— একটা সুড়ং খুঁড়বে কেউ জানবে না।

নানা ফিসফাস শব্দের মধ্যে যা গর্জনেরই পূর্বাভাস আবার ফেটে পড়ল মাদবরের জটিলতা উন্মোচনে ব্যস্ত, শঙ্কিত কণ্ঠ,— সবাই বুঝতে পারছ, অসুবিধা আছে। খোলাখুলি জমিনে এসব কাজ করা যাবে না। আমি তাই ঠিক করেছি, আমার ঘরের মেঝে থেকেই কাজ শুরু হবে। তোমরা ভাববে, আমার ঘর নষ্ট হয়ে যাবে। তা যাক। এটা দুনিয়ার নিয়ম। হাজার হাজার ঘর বাঁচাতে গেলে এক-আধটা ঘর বরবাদ করতে হয়, উপায় থাকে না।

—কাকা, আমার ঘর থেকে শুরু হোক।

—না, আমার ঘর থেকে।

—না, আমার ঘর।

—না।— তোমাদের বাচ্চাকাচ্চা আছে। আমার ওসব বালাই নেই।

—শুভ কাজে কিছু গায়ে আঁচ লাগলে কিছু আসে যায় না।

—আমার কাচ্চাবাচ্চা নেই— তোমাদের কথা বাদ দাও।

গফুর চুপচাপ বসে ছিল শুধু ভেতরের উত্তেজনা থেকে রেহাই পেতে এবং চিন্তা করছিল, কিভাবে অভিযানে অনেক কাজে আসতে পারে। কিন্তু মাদবরের একটি কথা বারবার শোনার পর, তার খেয়াল হয়েছিল, সেও তো গ্রামপ্রধানের মতো নিঃসঙ্গ, নিঃসন্তান, সে কেন প্রস্তাব দেয় নি তার ঘরও মজুদ।

—চাচা, আমার কচ্চাবাচ্চা নাই।

কিন্তু মাদবর অনেক বেশি বিচক্ষণ এবং তার বয়স তো শুধু দিনের মাপ-কাঠিতে গণনা হয় নি। উত্তর নিক্ষেপ করতে তার বিলম্ব ঘটে নি,— ভাইপুত তোমার নাই, হতে পারে। আমার হে-গুড়ে বালি।

গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে তখনই কিছু বাতাস বইতে লাগল, যখন সকলে হেসে উঠেছিল মায় গফুর পর্যন্ত। বহুদিন পরে একই আনন্দমেলার শরিক সকলে, কর্মে ব্যাপৃত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে আড়মোড়া ভেঙে নেওয়ার মতো। তা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল, যখনই দেখা গেল টান-টান কাঠিন্যে সবই খাড়া— যথা, মুখ চোখ কান, মগজ ও চিন্তার অন্যান্য কলকব্জা।

১৫

প্রথমে যা মনে হয়েছিল নির্বোধের অভিধানে-প্রাপ্ত শব্দ— অবিশ্বাস্যে অসম্ভব— তা-ই ঘটতে লাগল ধীরে ধীরে অস্পষ্ট এবং পরে দ্রুত স্পষ্ট যে তার সামাল দিতে বহুত কাঠ-খড় দরকার। মাদবরের ঘরের মেঝে থেকে শুরু, মাত্র কয়েকজন নিয়ে এবং তা স্বাভাবিক ছিল এই জন্যে যে গাঁইতি শাবল কোদাল চালানোর ব্যাপারে সহজ পরিসর ঘরের মধ্যে ছিল না। অমন সুযোগের সাক্ষাৎ মেলা ভার বিধায় অল্প লোকেই কাজ আরম্ভ করেছিল, যা সহজ কথায় কোদাল বা শাবল চালিয়েছিল। তবে পেছনে বহু মদৎগার-সমন্বিত পটভূমি কাউকে সহজে ক্লান্ত হতে দেয় নি। যখন সুড়ঙ্গ অনেকখানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসারিত, তখন বহু লোকের সাহায্যের নিঃশ্বাস এসে লেগেছিল ছোটখাট নানা কাজে। যথা, সুড়ঙ্গের গায়ের মাটি চাঁচা, কোথাও জল উঠতে পারে, তাই বালুযোগে দুর-মুশ-পেটাই প্রভৃতি প্রভৃতি। নৈশ অন্ধকারে-অন্ধকারে সর্বপ্রকার গোপনীয়তা রক্ষাপূর্বক অতখানি কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তা-ও স্বাভাবিক আহার শরীর বা বিশ্রামে নয়— কখনো পেটের ক্ষুধা পেটেই হত্যা করে অথবা মাথা রিমিঝিমি-রত তবু কোদাল চালিয়ে যাওয়া ঠিক স্বপ্নার্পিতের মতো— কত কঠিন তা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পর্যন্ত বহু দিন গিয়েছিল ঠাওর করতে। অনেকের বিশ্বাস হতে চায় নি তারা অসুরের কাজ সম্পন্ন করেছে পলকা শরীরে, কাঠবিড়ালীর মতো যদিও উৎসাহ-অস্থিরতার অভাব ছিল না। মাদবরের চুল পাকা শন হয়ে গিয়েছিল কয়েক দিনে, যার জন্যে দায়ী সে নিজে। একথা পাড়াপড়শীরা বলতে পারত বটে, তার কাছে স্বীকৃতি পাওয়া যেত না। দিন-রাত্রি পাহারা, বিশেষত দিনে না কেউ টের পায়, আবার রাত্রে কাজে শামিল হওয়া (হাজার বারণ সত্ত্বেও সহজে কোদাল ছাড়তে চাইত না মাদবর। খুব পীড়াপীড়ি করলে কোদাল ছেড়ে শাবল দিয়ে সুড়ঙ্গের গা চেঁচে-চেঁচে পেটা দিত যেন এদিক ওদিক ধসে না পড়ে) এই বয়সে যে-কোনো তরুণের সঙ্গে পাল্লা দিতে— এক ভূতে পাওয়া ব্যাপার ছাড়া আর অন্যভাবে ব্যাখ্যাদান অচল। কিন্তু ভূত একজনকে নয়, বহুজনকে এমন পেয়ে বসেছিল যে পরদিন সকালে যারা রাত্রে প্রচণ্ড খাটুনি খেটেছিল তাদেরই দ্যাখো যেন কিছুই হয় নি। নিদ্রাহীনতাজাত ছাপ থাকে, পিচুটি পড়ে, তাও এতটুকু বের করা দুঃসাধ্য। তখন মনে হবে, সকলেই যেন অমৃত বারি বা ফল-খাদক— ফলে, তাদের সর্ব-আসুরিক শক্তির উৎস সেই রস। বুলান, রাখাল, গফুর— এমন একশ নাম করা যায়, শারীরিক শ্রম বলে কিছু দুনিয়ায় আছে, যাদের কাছে প্রমাণ করা বড় কঠিন ছিল। সবই তারা শিখেছিল হেসে উড়িয়ে দিতে, এমনকি হঠাৎ যখন পেটে ব্যথা উঠত অন্ধকারে বা কোদাল চালিয়ে। ততদিনে কিশোর বুলান এবং গফুরের মধ্যে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল কেবল শ্রম-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে, যার প্রসারণ রসিকতায়।— আমার প্রসব-বেদনা উডছে, কাকা।— প্যাডে বেদনা।— এই হারামি তর মারে ডাক, নালে বাচ্চা ধইরব কেডা?— চাচা, আপনের বাবা আপনেরে অমবস্যার রাইতে জন্ম দিছিল।— তুই বুঝি ব্যাডা তহন দ্যেহার জন্যে ছিলি?— কাকা, হালা পোকে হগ্‌গল খাইছে, আমার দাদুরেও খাইছিল।— এইবার হালা পোকের— ম্যারে— হেই তরে সুড়ং বানাই।— আমি কী করমু কাকা? কাম কর, ব্যাডা।

মাদবরও ভাবতে পারে নি, তার গাঁয়ের এইসব ছেলে-ছোকরা এমন একটা কাজে হাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত উতরে নিয়ে যাবে বা অত উৎসাহ জীইয়ে রাখতে পারবে (অতি কষ্টে খাওয়া তামাক, পাতার অভাবে বিড়ি বন্ধ) শুধু তামাকের ধোঁয়ার সাহায্যে এবং কথার দ্বারা। কিন্তু হপ্তা বাদ, প্রাচীনকালে যা ঐশী-বাণীরূপে কথিত— এমন প্রতিধ্বনি উঠেছিল তার কানে : মানুষ যখন ঘুমায় সে মড়া। যখন জাগে সে ধরা (পৃথিবী)। নাকিকান্না (আর বাঁচুম না বুকে বেদ্‌না, তিনদিন উপাস আছি, হারে সোনার দ্যাশ য্যান কেয়ামত আইল) আর শোনা যেত না, যদিও তেমন খেদোক্তি এবং অসহায় করুণ অভিযোগের জন্যে সর্বদা কান প্রস্তুত রাখত। গফুর যত কথা বলত

তত কাজ, প্রমাণ দিতে— তার কথা ও কাজ নিশ্ছিদ্র। অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, কোথাও মাটি শক্ত কোথাও এত নরম যে জল উঠে পড়ে বা পাঁক বেরোয় নিচের দিকে টান দিতে। এসব তারা সামাল দিয়েছিল নিজেদের উপস্থিত ও সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে— যখন যেমন প্রয়োজন বা ধৈর্যের সঙ্গে পদে পদে অগ্রসর হওয়ার দৃঢ় পণের উপর নির্ভর। তাই কাজ এগিয়েছিল, যতটা ঢিমা থাকার কথা তা হয় নি, বরং দ্রুতই বলতে হয় সমগ্র অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী। প্রেতায়িত অন্ধকার কেবল সুড়ঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার বিস্তার ঘটেছিল সুড়ঙ্গের মুখ ছাড়িয়ে গোটা গৌড়গ্রামের অবশিষ্ট লতায় পাতায়— আততায়ীর দাঁত থেকে যেটুকু রক্ষাপ্রাপ্ত বা চোখের আড়ালে থাকার ফলে তখনো সজীব, অবিশ্যি অবহেলায় পরিত্যক্ত। এমনই ঘটে, যখন মানুষ নিজের উপর অবজ্ঞা ঢেলে-ঢেলে রাখে, সামনে আর কোনো উজ্জ্বল ইশারার অভাবে। তখন আশেপাশে যা থাকে তা-ই বিবর্ণ ধূসর, রঙছুট হতে থাকে বা যত্নের অভাবে অরণ্যস্বভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তখন সকলেই সাধ্যমতো রক্ষা করার চেষ্টা পাচ্ছিল যেন আখেরে কোনো না কোনো কাজে লাগে। এই মনোভাবের পরিচয় পরিষ্কার দেখা গেল, যখন অনেক উপরে নাগালের বাইরে আততায়ীদের জুলুম চালানো চোখে পড়লে, আর কিছু না হোক একটা অন্তত ঢেলা ছুড়ত। পূর্বে এসব চিন্তা ছিল দুরূহ কি অভাবনীয়, যে-কোনো পর্যায় থেকে। তারপর আরো পর্যায় শুরু হয়েছিল যার জন্যে এতদিন অহোরাত্র এত খাটুনি, এত উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা।

গ্রামগ্রামান্তরে গোশকট-চালক হিসেবে যেতে অভ্যস্ত বিধায় মাদবর গফুরকে ভার দিয়েছিল প্রথম সুড়ঙ্গ-মুখ-পথে অন্য এলাকার সাথে যোগাযোগকল্পে। পশ্চাতে মাদবরের মাভৈঃ বাণী : যখন ফিরবে, আমরা তোমার জন্যে সারি সারি পিদিম জ্বালিয়ে রাখব। সুড়ঙ্গ অন্ধকার দেখবে না।

AMARBOI.COM

সৌভাগ্যই বলতে হয়, সুড়ঙ্গের মুখ এমন এক জায়গায় গিয়ে ঠেকেছিল যেখানে গাছপালার ওৎ ছিল না বটে, কিন্তু প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়ি এবং মোটা মোটা শুকনা শিকড়, প্রায় শিলীভূত, এত জমেছিল যে বেশ গোপনে উপরে উঠে যাওয়া চলে, সকলের চক্ষু এড়িয়ে। প্রাচীন অথচ পড়ে আছে, কারো কোনো কাজে লাগে না— এমন সামগ্রীও, তাদের আশ্রয় দিতে পারে শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে। গফুর অবাক হয়ে গিয়েছিল। একজন দুরূহ কাজ-সমাপ্তকারীর বুক আরো বিপদের ঝুঁকি-লোভী এত স্ফীতি লাভ করে যে তার কাছে কোনোকিছুই আর দুরধিগম্য বা দুঃসাধ্য মনে হয় না। গফুর তেমনই প্রেরণা-বিস্তীর্ণ একা-একা উঠে গিয়েছিল ওইসব প্রাচীন আশ্রয়ের সিঁড়ির ধাপে ধাপে এবং অন্য এলাকায় পৌঁছেছিল, যে-গন্তব্যের জন্যে কত-কত মাস না তারা হা-পিত্যেশ বসেছিল দুই চক্ষু বন্ধ করে। কিন্তু দুই এলাকার মাঝখানে সে এক দৃশ্যে এমন স্তম্ভিত যে কাউকে কিছু বলবে না বলবে না— এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বে বহুক্ষণ মুহ্যমান ছিল। কয়েকদিন পরে অবিশ্যি মাদবর একমাত্র ব্যক্তি প্রথমে ব্যাপারটা সব জেনে অনেকক্ষণ ম্রিয়মাণ বসেছিল বিরাট এক খেদোক্তি-সূচক প্রশ্নচিহ্নের মতো,— "বড়ো দেরি হয়ে গেল, আহ্‌হ্‌..." উচ্চারণের পর।

সুড়ঙ্গ-মুখ বেশ চাপা দিয়ে হঠাৎ যেন কারো নজরে না পড়ে, গফুর একটা উঁচু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে সেদিন চতুর্দিক জরিপ করেছিল অন্ধের হঠাৎ-প্রাপ্ত দুই চোখ নিয়ে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল বারবার, যদিও বুক টান-টান, অনেক অনুভূতির ঝড়ের নিকট নিজে উৎসর্গীকৃত। অমন বাতাসও তার গায়ে বহুদিন লাগে নি। যেন অপরিজ্ঞাত স্পর্শের জননী-স্নেহে বহমান। গফুর দেখেছিল, মরুভূমি বানিয়ে ফেলেছে পতঙ্গদল সীমাপ্রাপ্ত জুড়ে, যেখানে চাঁচর বালুরাজ্য এবং তারই সমতলের উপর পতঙ্গেরা চলাফেরা-রত (হয়ত ডিম পেড়েছে অনেক) উড়ছিল শতে শতে হাজারে হাজারে— যার ব্যূহভেদ কঠিন। অন্য এলাকায় পৌঁছানোর একটা পোড়া বন-সদৃশ প্রান্তর দেখা যায় এবং সেই পথেই তাকে যেতে হবে, গফুর জরিপ করে নিয়েছিল। একদা-সবুজ-প্রবাহের চারণ-ভূমি এলাকাটা পতঙ্গ-দন্তের নিকট সকল-খোয়ার, কেবল অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল প্রাচীন মৃত গাছপালা এবং শক্ত লতার সান্নিধ্য বিস্তার মারফত। নিকটে একটা সরু খাল, যদিও মজা, তবুও বহমান ছিল ক্ষীণ ধারায়— অতীতের কোনো মহাপুরুষের বাণীর মতো। সামান্য এগিয়ে সে দেখেছিল, এক প্রাচীন বৃক্ষের দুই গুঁড়ির মাঝখানে, এক বালক শায়িত এবং পাশে উপবিষ্ট একটি মানুষ অপরজনের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি। গফুরের চোখে পড়েছিল, সারিসারি বহু কবর (দুর্বিপাকে শ্মশানও মহার্ঘ)— যদ্দুর দৃষ্টি যায় আর অন্য কিছু অক্ষিপট যোগান দিতে অসমর্থ। লোকটার চুলে জটা, দাড়ি ধুলোকাদায় নিরেট বস্তু এবং সে যে বহুদিন নানা কৃচ্ছ্রতায় হিংস্র পাগল বা আর কিছুতে রূপান্তরিত— সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিজনে মনুষ্য-সৌরভ গফুরের মতো সাহসী জোওয়ান-কে আরো বেপরোয়া করে তুললেও সে হাতে, বেগতিকে সহায় যষ্ঠি-সদৃশ্য একটা গাছের ডাল নিয়েছিল এবং বারবার দেখছিল, না, ভাবছিল : ওটা মানুষ কিংবা ভূত বা আর কিছু। বুকের পাটা মেলে এগোতে থাকলে লোকটা গফুরের দিকে তুরপুণ চালানোর পর হাউমাউ কান্না জুড়ে, কয়েক পলক, ঘৃষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি... রহিম গাড়োয়ানের পোলা না?

মানুষটা আর যা-ই হোক, ভূত নয়। একথা এত দ্রুত গফুরের বিচার-বুদ্ধির উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় যে সে যথারীতি কুশলাদির জায়গায় এমনি বলে বসে,— কত দিন এখানে আছো, ভাই।

—হেই পোকার বছর থেইক্যা।

এতটুকু উচ্চারণের পর, গফুরের (সে ডাল ফেলে দিয়ে পাশে উবু বসে গেছে) অস্তিত্ব-বিস্মৃত লোকটা শায়িত বালকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, —বাবা, কিছু খাবি?

—না।

জবাবের পর ছেলেটা আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি, উঠে বসার চেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু সক্ষম হয় নি। এই অকৃতকার্যতার চাপে যেন আরো অস্থির ক্ষীণকণ্ঠে সে উচ্চারণ করেছিল,— বাবা, বা-জান।

বাবার তখন গফুরের দিকে মুখ। যথারীতি কুশলালাপ শুরু হয়েছিল সাবেক রেওয়াজ অনুযায়ী। বিলম্বে নারাজ গফুর তখনই প্রস্তাব দিয়েছিল, রুগ্ন বালককে সে কাঁধে করে নেবে এবং পিতা সঙ্গে সঙ্গে যাবে, যতক্ষণ না নিকটস্থ এলাকায় কোনো চিকিৎসকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু তার উৎসাহে ঠাণ্ডা বরফ পড়ে গেল, যখনই শুনলে, সে আর কোথাও নড়বে না এবং তার হেতু সংক্ষেপে বয়ান করলে। গ্রাম ছেড়ে উপবাসী, পতঙ্গের দংশন ঠেলে-ঠেলে ক্ষতদেহ প্রথমে যখন তারা ওইসব এলাকায় পৌঁছেছিল, তখন তাদের কুষ্ঠরোগী ভেবে আর গ্রামে ঢুকতে দেয় নি এবং অনুনয়ের বদলে অনধিকার-প্রবেশের যে-শাস্তি সেই শাস্তি দিয়েছে— গলাধাক্কা, ঘাড়ধাক্কা।

গফুর তবু ছেলেটাকে কোলে তুলে নিতে গিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত, যখন সে দেখলে, রুগ্ন কিশোর অতি কষ্টে শ্বাস ফেলছিল, ক্রমশ অন্তিমের পথে। স্তব্ধ উপবিষ্ট দুইজন রোগী পাশ থেকে শুধু দেখছিল। দেখছিল, মুহূর্ত সেখানে কী উপদ্রব নিয়ে উপস্থিত হয়।

একসময় গফুরের বুক আরো ধস খায়, ঠিক বেলালের চেহ্‌রা ছেলেটা যখন মুখ খুলেছিল,— গাঁয়ে যাব।

—যাবে বইকী, কাকা। জবাব দিয়েছিল গফুর।

ছেলেটা তখনই পিতার দিকে চোখ ফেরাতে বাবা মুখ আরো কাছে নিয়ে গিয়েছিল সন্তানের গণ্ডদেশের সন্নিকটে।

বালক বিস্ফারিত, উদাস-নয়ন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিল,— বাবা, গাঁয়ে কি কবর দেওয়ার জায়গা ছিল না? তুমি কি আমাদের এখানে কবর দিতে আনছিলে?

একদা আরো সন্তানের জনক এই সময় চিৎকার দিয়ে উঠেছিল, যখন অন্যদিকে রুগ্ন বালক কয়েকবার দ্রুত শ্বাস টেনে নিথর হয়ে গেল একটা প্রবল ঝাঁকুনি তোলার পর ধীরে ধীরে ক্লিষ্ট মুখে চরম প্রশান্তির ছাপ রেখে।

গফুর চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল, লোকটার কাঁধে হাত রাখতে— সান্ত্বনা-দানের তাগিদে নয়, নিজেই আশ্রয় পেতে যেন তখনই মাটিতে সে মুখ থুবড়ে পড়ে না যায়। কিন্তু কার কাঁধে হাত রাখবে সে, শূন্যতা যেখানে আবার ছেঁকে ধরেছিল।

গফুরের সম্বিৎ ফিরে এসেছিল চিৎকারে। এই ধূসর অরণ্যের আরেক প্রান্তে ছুটে গিয়ে তখন লোকটা হাঁক দিচ্ছিল তারস্বরে,— হা— হা— হাহ্‌— কী কয়ে গেলে পুত— কী কয়ে গেলে— আবার কও—।

শব্দ বেজে-বেজে উঠছিল সমস্ত নীরবতা চূর্ণবিচূর্ণ করে এক প্রেতায়িত অট্টহাস্যের ধারায়। লোকটাকে ধরা দূরের কথা, আর দেখাই গেল না, যার ফলে কিছু করা যেত।

শুধু কণ্ঠস্বর বজ্রস্বরের মতো গিদ্বিদিক ছিন্নভিন্ন করতে লাগল বারবার স্থান বদলে, বিভিন্ন স্বরগ্রামে সকল নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে : হা, কী কয়ে গেলে পুত— পুত—।

১৬

রাজা মজুমদার সেইসব সাংবাদিকদের অন্যতম যারা শুধু ঘটনার অনুধাবন করে না, বরং তার স্বরূপ বুঝতে চায় এবং তার জন্যে যত রকমের ঝুঁকি আছে, মাথা পেতে নিয়ে এগোয় কোনোকালে পশ্চাদপসরণের কথা মনে জায়গা না দিয়ে। মজুমদার জানত, ওই এলাকা দুরধিগম্য এবং এতই কষ্ট-সাপেক্ষ যাতায়াত একমাত্র প্রাণ বলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে পারলেই হয়ত— তাও অনিশ্চিত— এসপার-ওস্পার করা যায়। দুরন্ত সাহসের অধিকারী, তাই যখন ঝুঁকি নিয়েছিল, সে ভাবে নি, অনেক ক্ষেত্রে শুধু ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তাই সব নয়, বরং তার সঙ্গে সম্ভাবনার একটা যোগাযোগ লাগে এবং তা মজকুর ঘটনার কেন্দ্রে আছে কি না— দেখতে হয়। সে-ও পতঙ্গ-ঝটিকার ব্যূহভেদ-অভিযানে চোখমুখে অনেক চোট ও দাগ নিয়েছিল, এতটুকু শঙ্কিত না হয়ে, যতক্ষণ নাসিকায় নিঃশ্বাস বর্তমান। মজুমদার অতঃপর দেখেছিল, শুধু দুঃসাহস কাউকে গন্তব্যে পৌঁছে তো দেয়ই না, বরং অহমিকা সৃষ্টি করে, যার স্পর্শ মনে হতে পারে কোনো সদ্গুণের শাখা, অপিচ তা নয়। এমন ক্ষেত্রে শেষে অভীষ্ট লক্ষ্য আর বড় হয়ে দেখা দেয় না এবং দিলেও আখেরে তার লুপ্তি ঘটে অহমিকার আচ্ছন্নতায়। রাজা মজুমদারও এগিয়ে গিয়েছিল পতঙ্গজাত দংশন-ক্ষত গায়েগতরে ছড়িয়ে— যা তার নিজের এলাকার লোকের কাছে কুষ্ঠরূপে পরিগণিত হয়েছিল। তার নির্ঘাৎ পরিণতি : মনুষ্যসমাজ থেকে নির্বাসন এবং উক্ত বিজনে কোনোরকমে বাঁচার চেষ্টায় হন্যে— যখন কৌতূহল-আদর্শ অনেকখানি ঝাপসা হতে বাধ্য। সাংবাদিক বুঝেছিল, কোনোরকম তদারকে ইচ্ছে সর্বেশ্বর তো নয়ই বরং তা উপলব্ধির মতো চোখ তুমি তৈরি করে না থাকো সাধনা-মারফত। হতজ্ঞান সাংবাদিক কয়েকদিন পড়েছিল এবং তারপর উঠেছিল অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের মতো এলাকায় ফিরে যেতে নয়, বরং আত্মগোপন দ্বারা ক্ষতস্থান সারিয়ে তুলতে যেন গ্রামবাসীদের উৎপীড়ন থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এমন দুর্বিপাকের মধ্যে পড়েও রাজা মজুমদার কিন্তু কৌতূহলের তাগিদ এতটুকু কমতে দেয় নি, বরং সব হদিস তলিয়ে চিন্তা করত এবং এই প্রত্যয়সিদ্ধ ছবি নিজের সামনে রেখেছিল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্যে। সাংবাদিক তাই ওই এলাকার দিকে চোখ রেখে-রেখে ঘোরাঘুরি করত এবং ভাবত, নিশ্চয় ওই এলাকা থেকে কোনো লোক আসবেই— না এসে পারে না। কারণ, মানুষ আছে এলাকায় এবং ওই অবস্থান প্রমাণ করে, মানবপ্রকৃতি চিরদিন একই জায়গায় একই খাতে ডুবে-ডুবে খাবি খেতে অনভ্যস্ত, যদিও সাময়িকভাবে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটতে পারে। রাজা মজুমদারের এমন দুর্মর বিশ্বাস ছিল বলে, পতঙ্গ-বিধৃত এলাকার কিনারা থেকে সে সাময়িক হতাশাকে ছোট করে দেখত না বটে, কিন্তু উড়িয়ে দিত প্রথমে কল্পনায়, পরে বাতাসে বাতাসে। এইভাবে সে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একটা উপায় করে নিয়েছিল, যখন সাধারণ উপাদান শুধু মৃত্যু-কীর্তনের মহিমাই চড়া গলায় গাইতে থাকত পূর্বপুরুষদের কণ্ঠ জীবন্ত করে বারবার সমাধি-দর্শন মারফত। রাজা মজুমদারের ধারণা আরো বলবৎ হয়েছিল যে পঙ্গপাল যেহেতু প্রচরণশীল পতঙ্গ এবং তার স্বভাব হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশযাত্রা বিনা অগ্রপশ্চাৎ-চিন্তা, বিনা পরিণাম-যাচাই— একদিন না একদিন তাদের ভূমিকা শেষ হতে বাধ্য। কেবল ধৈর্য, সুযোগ এবং সতর্ক পাহারার জন্যে শঙ্কিত উদ্বেগ পোষণ করে যেতেই হবে এবং তাই অবধারিত— যেহেতু নিয়মকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না, স্বয়ং ঈশ্বরও সেখানে অসহায়— তা বেশ জোর দিয়ে বলা চলে। তা না হলে দৈনন্দিনতার করিডরে যে-উৎপাত দেখা দিত, তারপর জীবনের আর কোনো অর্থই থাকত না এবং হাজার হাজার বছর মানুষ যে নিজেকে অতিক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে, জটিলতা থেকে আরো জটিলতায়, তা কোনো কালেই সম্ভব হতো না এবং পৃথিবী চিরদিনই আদিমতার গর্ভে নির্বাসিত থাকত।

সৌভাগ্য বলতে হয়, গফুর পড়বি-পড় একদম প্রথমেই পড়েছিল রাজা মজুমদারের সদা-জাগর চোখের সামনে, যখন সে অপর এলাকায় পা দিয়েছিল বুকে দুরুদুরু আশঙ্কা পুষে। আত্মার অমন নির্বাচন-ক্ষমতা আছে কি না, বলা দুরূহ, যদ্যপি উক্ত ক্ষেত্রে তারা উভয়ে উভয়কে দেখামাত্র একলহমায় চিনে ফেলেছিল। যেহেতু গফুরের গায়ে কোনো দাগ ছিল না, সাকিন জানার পর, রাজা মজুমদারে শুধু বিস্ময়ের উদ্রেক হয় নি, তার কৌতূহল তখন কড়ার উপর ফুটন্ত ধান অর্থাৎ খইয়ের মতো দিকভ্রান্তিবিলাসে এমন মত্ত হয়েছিল যে সে কী জিজ্ঞেস করবে সে-হদিস তফাতেই থেকে যায়। প্রাথমিকতা কাটে, কেটে গিয়েছিল ধীরে ধীরে এবং সহসা পুনরায় শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়েছিল এ-ও তার পাশ কাটিয়ে। গফুরের নায়ক হিসেবে যা জানা, রাজা মজুমদারও তা মগজের খাটালে খাটালে ভরতে থাকে এবং আফসোস করে, তার সঙ্গে প্রচুর কাগজ পেন্সিল থাকা উচিত ছিল। তবে এই উৎসাহ নিভে এসেছিল যখন সাংবাদিক মজুমদার আবার প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাইয়ের কথা ভাবে এবং সেইহেতু প্রস্তাব দিয়েছিল, সেও আবার গৌড়গ্রামে ফিরবে একসঙ্গে যেখানে যাওয়ার জন্যে সে কত দিন প্রতীক্ষা বা বেসবুর অস্থিরতায় ক্ষয় করেছে। এই স্থলে গফুরের ধন্দে পড়ে যাওয়ার হেতু ছিল। গ্রামে যে বহু ধরনের মানুষ দেখেছে এবং সেই জন্যে নানা দল, উপদল, সংঘর্ষ-বিবাদ— যার পরিণতি তাদের অতি গোপনীয়তা রক্ষার শপথ। রাজা মজুমদার কী ধরনের মানুষ? কয়েক লহমার মধ্যে গফুরের একটা ধারণা হলেও বিশ্বাসের রশি কতখানি ঢিলে দেওয়া যায়? শেষে সব ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। সে-আশঙ্কা মাদবর চাচার চোখে বারবার প্রতিভাত, দেখেছিল সে এবং যাত্রার পূর্বে শুনেছিল পুনঃপুনঃ তার সতর্কতামূলক কণ্ঠস্বর। কিন্তু একটা আশ্বাস বর্তমান, যদি কোনো ফলদায়ক যুক্তি পাওয়া যায়, যার পরিণাম তার চোখেই দেখতে পাবে। যেহেতু এখানে সমস্যা একটাই এবং তার মধ্যে কোনো ঘোর বা প্যাঁচ নেই : আততায়ী-নিধন। রাজা মজুমদার শেষপর্যন্ত গফুরের কূটনৈতিকতার নিকটে হেরে গিয়েছিল না কেবল, সে জানতেও পারে নি কিভাবে লোকটা সেখানে হাজির হয়েছিল অমন অক্ষত শরীরে। তবে রফা হয়েছিল ব্যবসা-সুলভ কায়দায় বিনিময়-মারফত, ভবিষ্যৎ আশা-পূর্তির উপর, যখন গফুর তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এবং অচিরে জোর একদিন বাদ।

গৌড়গ্রামে তুমুল হইচই পড়ে গিয়েছিল পরদিন কতগুলো আকস্মিক দৃশ্যে নয়, বরং দৃশ্যের সংখ্যাগত পরিবর্তনে এবং নানা দুঃসাহসিকতার বহরে। পতঙ্গ মরে পড়েছিল শতে শতে সড়কের উপর, যা দেখে মনে হতে পারে, কেউ ঔষধ ছড়িয়েছে কোনো একরকম এবং তারই পরিণতি এই মড়ক। বাতাসের গন্ধ বদলে গিয়েছিল। তার প্রমাণ, ফুলের আঘ্রাণ ফিরে এসেছিল, যা এতদিন পাওয়া যেত না দুষ্প্রাপ্য বলে নয়। (কোথাও আড়ালে ফুটলেও গন্ধ আসবে বইকী) বাতাসের মধ্যে কী যেন প্রবেশ করেছিল। একজায়গায় পোড়া কিছু লতা এবং জমিন দেখে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল, কোথাও কোথাও অগ্নিসংযোগ হচ্ছিল পতঙ্গ-নিধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এমন হঠকারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মাদের দল কোথা ওত পেতে ছিল যে তাঁদের কোনো সন্ধান মিলবে না— যা অতি অবিশ্যি দরকার শুধু অনাচার নয়, ভবিষ্যতের আরো গজব-রোধকল্পে। মোহাম্মদ আলী আর গৃহাবদ্ধ থাকে নি, বেরিয়ে এসেছিল গ্রামের আরো মাতব্বর এবং ভক্ত জোওয়ান সঙ্গে, যেন অমন খামখেয়ালিপনা, অনাচার আর না বাড়ে, যার ফলে গোটা গৌড়গ্রামের ধ্বংস অনিবার্য। কবি ভক্তপরিবেষ্টিত নতুন নতুন কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিয়েছিল যেন মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার পর তারাও আবার বাণীর বিস্তার ঘটাতে পারে। শেষে দরুদের মতো— মন্ত্রের মতো পাঠ হতে লাগল গ্রামের মরাশ্বসা আবহাওয়ার মধ্যে কবিতার গুচ্ছ, পুঞ্জ, পঙ্ক্তি-আবলী— এক অপূর্ব ভিয়েন, যা বহু পূর্বে সুরত মণ্ডল দিতে পারতেন। কিন্তু সবই বালুভর্তি বুলেটের মতো ফাঁকা যেতে লাগল, যখন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, পতঙ্গ-মড়ক অব্যাহত আছে গ্রামের বিভিন্ন দিকে। হয়রান মোহাম্মদ আলীর সৃষ্টিধারা বেগে প্রবাহিত হতে লাগল সেই অনুপাতে পতঙ্গের লাশ স্তূপীকৃত হতে লাগল আঁদাড়-পাঁদাড়ে, বনেবাদাড়ে, আঘাটায়, কুঘাটায়— মায় নিষ্ঠীবন ইষ্ঠিবন সামিল। যেন সুরাসুরের যুদ্ধে রাক্ষসকুল নিহত হচ্ছে অথচ অদৃশ্য দেবতাদের দর্শন মিলছে না— প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে যা বিধৃত।

সেই সময় একদিন মাদবরকে মোহাম্মদ আলীর ডাকার হেতু বোঝা না গেলেও সে বুঝেছিল, কবিতার জোর থাকলেও ঐতিহ্যের খুঁটি-সদৃশ ঐ বর্ষীয়ান ছাড়া তার উদ্দেশ্য এগোবে না।

—মাদবরসাহেব আপনি থাকতে গাঁয়ে এসব অনাছিষ্টি। এখন হয়ত গ্রামে আট আনার মতো লোক মরছে। কিন্তু যা হচ্ছে তাতে ষোলোআনার কিছু থাকবে না।

—কী, কবিমহাশয়?

—ধৈর্য ধরেন।

—তা ধরেই আছি।

—কিন্তু গাঁয়ে কিভাবে এসব হচ্ছে?

—আল্লা জানেন।

—তা ঠিক। তবে আমাদেরও জানতে হয়।

—সব আল্লার উপর নির্ভর।

—? ? ? ? ?

—তবে আপনাকে একটু দেখতে হয়।

—আসুন, রাত্রে আমরা পাহারা দিই।

—বেশ, কখন যেতে হবে, খবর দেবেন।

পারস্পরিক সন্দেহে গৌড়গ্রাম নিমজ্জিত। মোহাম্মদ আলী সুরাহা-প্রার্থী, বেশ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল যখন মাদরব প্রস্তাব দিলে,— আপনি জ্ঞানীগুণী মানুষ। আমার পাড়ার ছেলেরা খুশি হবে আপনে গেলে। তবে কী জানেন, পাড়ায় পাড়ায় বিবাদ। আপনি একা আসুন। আমরা দু-একদিন পাহারা দিলে হদিস বেরিয়ে যাবে। আমি মুরুক্ষু মানুষ অ্যাদ্দুরই বুঝি।

চাটুকারিতা বা আর কিছু। এই দ্বিধায় মোহাম্মদ আলী সরলভাবেই প্রতিবাদ করেছিল

AMARBOI.COM

বিনা সন্দেহ,— না— না।

কবির উদ্দেশ্য এবং কাব্যের উদ্দেশ্য যদি একখাতে প্রবাহিত না হয়, তখন কারিগরি হিসেব নিষ্ফল বাঞ্ছাজাত একরকমের তিক্ততা কবিদের মনে দেখা দিতে পারে। কিন্তু মোহাম্মদ আলী স্বতন্ত্র মানুষ বিধায় তার ধারে-কাছে যেতে না-পারার কারণ, মোহের সম্মুখে সে সেবাদাসীর মতো নিবেদিত হতে পারত। তাই সন্ধ্যার পরই একদঙ্গল লোকের মধ্যে, প্রায় ক্ষুদ্র জনতা, এসে পড়ে সে ভাবছিল, তার সাধনার একটা স্বচ্ছন্দ যাচাই চলে যাবে, যদি এদের প্রতি সমীহা থাকে।

মাদুর এগিয়ে দিয়েছিল মোহাম্মদ আলীর দিকে অতিথিকে সম্মান দিতে গ্রাম্য রেওয়াজে যা কতকাল ধরে চালু। গফুর, রাখাল, বুলান— এমন আরো চেনা মুখ বেরিয়ে পড়ে মোহাম্মদ আলীকে দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল যদিও এদের অনাহারক্লিষ্ট মুখে এমনিতেই কাউকে আনন্দ দেওয়ার কথা নয়। একথা, সেকথা, আসল কথায় যেতে আদৌ বিলম্ব না হওয়ার হেতু, খালি পেটে একমাত্র হারামজাদা ব্যতীত কে-ই বা আর কাব্যমাহাত্ম্য নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে? মোহাম্মদ আলী সোজা অস্থিরতাজাত অধৈর্য এবং তজ্জাত প্রাণহানির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিল। অকুস্থলে মাদবরের উঠান বটে, কিন্তু সুড়ঙ্গ নিকটেই মেঝের মাঝখানে একটা মাদুরে-ঢাকা।

কবি উচ্চারণ করেছিল,— মাদবর সাহেব, আমি আগেও বলেছি, না ভেবেচিন্তে কাজ ভালো নয়। আর তা ছাড়া—।

—কবিসাব, বহুদিন নয়, কয়েক মাস তো গেল। আপ্‌নে অহনও কন্‌—। মোহাম্মদ আলীর বাক্যসমাপ্তির পূর্বে হঠাৎ-উপস্থিত গফুর গলা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

কবি এমন ছেলেদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যেহেতু সচরাচর মার্জিতরুচি সভ্য মানুষের সামনে গ্রাম্যজন, এমন ভাব-দর্শনে অনভ্যস্ত।

—গফুর, চুপ করো। মোহাম্মদ আলী তাকে সঙ্গে সঙ্গে কুপিয়েছিল,— বোঝা যাচ্ছে, তোমরাই এসব অনাছিষ্টি করছ, আগুন লাগাচ্ছ, পতঙ্গ মারছ।

—মারছি। হ মারছি। মারুম না?

—তা আমার বুঝতে বাকি নেই।

—আমাগোও নাই।

—কী নাই?

—মাদবরসাহেব, আপনি এইসব ছোকরাদের আস্কারা দেন, বোঝা গেল।

মোহাম্মদ আলী মাদবরের দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু সে অবনত-মুখ, অপাঙ্গ-দৃষ্টি গফুরের উপর।

—বেশ সব জানা গেল। আমি চললাম। তবে—। কথা শেষ না করেই মোহাম্মদ আলী যেই পা তুলছে, গফুর চটপট এগিয়ে খামচি-যোগে তার পাঞ্জাবির গলা ধরে কটমট তাকাতে শুরু করেছিল।

—কী, মারবে নাকি? অভ্যন্তরে ভীত মোহাম্মদ আলী বাইরে রোয়াব স্থিতাবস্থায় বজায় রাখে।

—মারুম না আপনারে। তবে আর যাইতে দিমু না। গফুরই একমাত্র জবাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিল। আরো ইতিমধ্যে অনেকে উপস্থিত, মূর্তিবৎ স্তব্ধ।

—যেতে দেবে না?

—না।

—না?

—দ্যাশে পাঠামু আপনেরে।

—আমি এখন দেশে যাব না।

—পোকার ভয়?

—না। পরে যাব। আমার ইচ্ছেমতো যাব।

গফুর তখন কবিকণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীদের সম্বোধন করেছিল,— ধর হালারে। পঙ্গপাল চেনে না, হালা কবিতা লেখে। সুরত দাদু ঠিক কইছিলেন।

মাদবর কী একটা আপত্তি তুলতে গিয়েছিল এই ভেবে যে ছেলেছোকরাদের তখন রুখতে গেলে কবির নাজেহালি আরো বাড়বে বই কমবে না। হিড়হিড় তারা মোহাম্মদ আলীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ঘরের মেঝের উপর মাদুর সরিয়ে, যেখানে সুড়ঙ্গের মুখ হাঁ-হাঁ করছে, কেমন একটা গ্রাস-ভাব-রঞ্জিত অন্ধকারের সঙ্গে লেপ্‌টে।

গফুরের ব্যঙ্গস্বর— হালারে কইয়া দে, সুড়ঙ্গ কাইট্যা মানুষের কাছে খবর লইছি, ওগুলো পোক্, পোক্— লোক না। মারলে গুনা (পাপ) অয় না। তারপরই সে সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়েছিল,— সুড়ঙ্গে ঢোকা ব্যাডা রে। (কবিকে) ভয় পাইয়েন না কবিসাব। হাঁইট্যা চইলা যান, পোকে খাইব না।

এই সময় বাগ্ দেবীর বরপুতের মুখের আশপাশে বা ভেতরে কোনো বাক্য, রা, শব্দ ছিল কি না— এমন মনে উদয়ের হেতু এই যে মোহাম্মদ আলী শুধু বারবার মাদবরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, কিন্তু কিছু কইতে অক্ষম। তবু শেষে সে প্রায়-মরিয়া চিৎকার দিলে,— মাদবরসাহেব আমি যাচ্ছি। একটা অনুরোধ—।

অবনতমুখ খাড়া মাদবর এবার বেশ সলজ্জ কণ্ঠ উচ্চারণ করেছিল,— বলেন— বলেন, কবি-মহাশয়।

—আমার কবিতার খাতাগুলো এনে দিতে বলেন।

—যেহানে আছে সেহানেই থাকতে দিন। চাঁচাছোলা কণ্ঠ গফুরের। কিন্তু খেদোক্তি কবির গলায়,— না, না, ওখানে থাকলে পোকায় খেয়ে ফেলবে।

—মানুষকে পোকায় খাচ্ছিল, তাতে তোমার— হালা আপ্‌নের— কিছু তক্‌লিফ অয় নাই। অহন কডা কবিতার জন্যে শোক— মার হালা।

গফুর সত্যি কবির পাছায় এক লাথি মেরে বসেছিল এবং বড় বাড়াবাড়ি মনে হওয়ার ফলে মাদবর অসোয়াস্তি ভোগ করে। কিন্তু গফুর তখন পঞ্চমে,— কবিসাব, ওই কবিতা লেখার চাইয়া লোম ছিঁড়বেন অনেক কামে লাগবে।

বুলান হাসতে হাসতে সায় দিয়েছিল,— কাকা, হে কাম-ই করে কবি। দ্যাহেন না, হে-কামের পর কয় গাছি অন্য কোথাও বদনে লাগাইছে।

মাদবর বাদে আর সকলে যখন তুমুল হাস্যরত, সেই ফাঁকে গফুর মোহাম্মদ আলীকে ঠেলে সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অবিশ্যি তৎপূর্বে পাছায় আরেক লাথি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদান-সহ।

মাটি ফুঁড়ে যেন নির্গত, এতক্ষণ ওত পেতে ছিল রাজা মজুমদার, মন্তব্য পরিবেশনে বিলম্ব করে নি,— আপনারা ঠিক করেছেন। আমার দুঃখ এগুলো লেখাপড়া শিখে এত অন্ধ হয় কী করে? কিন্তু ভাইসব, বড় নাটকে কিছু ভাঁড়ের দৃশ্য থাকে। যাক সেকথা। আমাদের আরো ঢের কাজ বাকি আছে। প্রস্তুত হন।

১৭

দীপালি উৎসব না মশাল-মিছিল, তা আর বলার যো ছিল না, এমনই দিকে দিকে লকলকে অগ্নিশিখার জয়-জয়-রব উত্থিত, যখন বেরিয়ে আসছিল গ্রামের নানা প্রান্ত থেকে শত শত বালক-বালিকা কিশোর যুবক। কেবল চলৎশক্তি-বিরহিত-নয় বৃদ্ধ এবং সেই দৃশ্য দেখতে লাগল চটের আড়াল সরিয়ে উঠানের পার্শ্বস্থ বেড়ার ওৎ ফাঁক করে-করে অন্দরমহলের বধূ, তরুণী আরো পুরবাসিনীরা— যারা সহজে পর্দার দেওয়াল টপকায় না। সকলের হাতে আগুনের হল্কা স্থির থাকবে কী, এদিক ওদিক ধাইছিল, এতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে পঙ্গপাল বসে থাকবে বা বসে আছে নতুন কোনো হামলার জন্যে। সূচীভেদ্য অন্ধকার পটভূমি রচনা করেছিল ওই মনুষ্যযাত্রার— হাজারে হাজারে যাচ্ছিল না শুধু, জয়জয়কার ধ্বনি তুলছিল প্রতিধ্বনির মধ্যেও যেন সেই অনুরণন বজায় থাকে, অবিকল থাকে, আপন উৎপত্তিস্থলের মতো এবং সহজে তা আর নির্বাপিত না হয় নিস্তব্ধতার জঠর-গর্তে— যেখানে বোবা এবং কবর একত্রে গলাগলি-রত। কণ্ঠস্বর যে বজ্রস্বর হতে পারে শুধু তোড়ের মাহাত্ম্যে নয় বরং উদ্বেলিত বক্ষপিণ্ডের উপর কেলি-পরায়ণ রক্তের হিল্লোলে— তার পরিচয় এইখানে পাওয়া যাবে এবং তা পেতে তোমার নিকটে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কেবল কোথাও একটু দাঁড়াও, তোমার কান তোমার জন্যে প্রয়োজন নেই, কোনো নিবিষ্ট মনোযোগ পর্যন্ত অনাবশ্যক। কেবল নিজের বক্ষপিণ্ডে হাত দিলে, জানান দিয়ে যাবে : জনারণ্যে খাণ্ডবদাহন শুরু হয়েছে প্রচণ্ড বিক্রমে, তড়িৎ গতির সম্ভ্রমে এবং তুমি— বেশি বিলম্ব হবে না— তখনই তার মধ্যে নিজের সব কামনার মূর্ত রূপ খুঁজে পাবে বলে আর দুই কদম স্থির থাকতে পারবে না, বরং তখনই ছুটবে কোনো রণমুখী অশ্ব— দেহের ছন্দে উন্মাদ অথবা মাতাল। সড়কের ধুলো যা চিরদিন মাটির সঙ্গে মিশে থাকে বা ঈষৎ আলোড়নে সামান্য এদিক ওদিক উচ্চতা জরিপের পর প্রশান্তি পায়, তা-ও প্রাণবন্ত আর নিজের কেন্দ্রবিন্দুর তোয়াক্কা তো রাখেই নি, বরং উঠছে, ছুটছে এবং সকল স্থানই 'হেথা নয়' রবে তাদের প্রত্যাখ্যান করছে হেতু নিবেদনের পর :

প্রাণ, প্রাণের জোয়ার চতুর্দিকে, হে অন্ধ, কোটালবনার উন্মত্ততায় তীরভূমি গ্রাস করছে চোঁ— চোঁ— ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাই স্থির হতে যেও না, বেগের সামিল হও যেমন ঘাটের নৌকা মাঝদরিয়ায় তখন ভেসে পড়ে, তীরের সলিল-সমাধি থেকে নিষ্কৃতি পেতে। হল্লা-হুল্লোড় নয়, সংগঠনের আশ্চর্য রূপ নৈরাজ্যের কৃষ্ণভীতি ছড়িয়ে রাখে তাদের জন্যে, যারা আত্মপরায়ণ খোলসে গুটিসুটি, অল্প পরিসরে ঘোরাফেরা করেছে এবং যার পরিণতি ক্রমশ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা কেন, সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় (কোথাও ব্যাপ্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলেও তা আদৌ গভীরে নয়)— যা সন্দেহের বীজ বপন করে কোনোকিছুর স্বরূপ সম্পর্কে আবছা ধারণায় এবং এই সন্দেহ আগে ভীতি— যেমন স্ত্রীর উপপতি-কর্তৃক গোপনে নৃশংস অতর্কিত নিহত হওয়ার সম্ভাবনা। অথচ ভেতর থেকে তার লীলায়িত ছন্দ, সুর শুধু উপভোগের সামগ্রী নয়, উপরন্তু ধীরে ধীরে তার মধ্যে আত্ম-অবলুপ্তির উন্মাদনা জেগে ওঠে, আত্মহত্যাপ্রবণ কোনো যান্ত্রিক ইচ্ছায় নয়, বরং আরো-আরো সান্নিধ্যে নিজেকে আলিঙ্গন করার জন্যে, যখন নিজেই সকল সমষ্টির প্রতীক এবং কায়িক অসুবিধা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে, তা ছাড়া আর যে-কোনো পথ রুদ্ধ। জীবন-মৃত্যুর ফারাক এইভাবে অন্য কোনো ভেদরেখায় সীমাবদ্ধ না থাকার ফলে, তখন গতি কোথা থেকে এসে জোটে এবং সবকিছু দ্রুতায়িত করে তোলে যেখানে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, অধীরতা, অস্থিরতা এমন একাকার হয়ে যায় যে মনে হবে, সংগতির একটিমাত্র সুরে সব আবদ্ধ। রাগ-মেলে যে-বিবাদী ধ্বনি আছে নব-অর্কেস্ট্রার আয়োজনে তারও অবস্থিতি অপরিহার্য। নচেৎ কিছুই মিল্‌বে না যতই মেলাতে চেষ্টা করো। মিছিল-চালক এবং চালিত কোনো পৃথক পৃথক ধড়ে অগ্রসর হয় না। দুর্বল-সতেজের পার্থক্য সেখানে এত অবান্তর যে সাধারণ দৈনন্দিন যুক্তির বহর যতই স্ববিরোধ দেখুক না কেন, কোনোকিছুই ধরতে পারবে না, যদি না মিলিত অখণ্ডতায় সব দ্যাখো। চলমানতা যেখানে চাঁদোয়া টানায়, তার নিচের দৃশ্য দেখতে একজোড়া চোখ, কান বা আর কোনো সহায় অসহায়, এই জন্যে যে গতির পরিমাপ সহজ নয়। মিলিত হলে মিলনের মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়। এই সূত্র এখানে যেমন প্রযোজ্য তেমন আর কোথাও না। তাই ওদের বাইরের পদক্ষেপ, উল্লাস, উন্মাদনায়-অনুভূত বসুধার থরথর-কম্পন অথবা প্রথম বিশ্ববিলোকনের বিহ্বল-বিস্ময় সাধারণ দর্শকের চোখে কখনই ধরা পড়বে না, যদি শরিক-রূপে সে জমিনের উপর দাঁড়নো থামিয়ে, চলা শুরু করে। মাতল পেশী মাতালের সঙ্গে যে-সম্পর্কটুকু রাখে তা কেবল বহুদিনের অবস্থান-বাধ্যকতা। নচেৎ একই খাতে বাহিত হলে নেশা তো বেইজ্জত হয়ে দাঁড়ায়। স্ববিরোধের আলেয়া এমনই মশাল-মিছিলের সঙ্গ পেতে আরো দাউদাউ-জ্বলন্ত দিশাহীনতার মাত্রা বাড়িয়ে তুলছিল স্বয়ং বেপথু হতে, নিজের বৈশিষ্ট্য পরাভূত করতে। চিৎকার কিভাবে সুর হয়, এই প্রসব-দৃশ্যের জন্যে ঘরের বাঁধা-ধরা অচল উঠান সড়কের দিকে ইঙ্গিত-মারফত ক্ষান্ত থাকতে অসমর্থ, বরং ভূমিকম্পের স্তব করছিল— যা ওলটপালটের ধুনাইকর না হলেও কিছু স্থানচ্যুতির সান্ত্বনা অন্তত সুনিশ্চিত রাখে। পুরনারীবৃন্দের প্রার্থনা দেখা গেল, চটের পর্দার উন্মোচনে, যদ্দুর সম্ভব বেআবরু বেরিয়ে আসতে পারা যায়— এমন দুঃসাহসিকতায়। গৌড়গ্রামের ক্ষুব্ধ অগ্নিগিরি লাভায় লাভায় এগোচ্ছিল গ্রামের এমন ব্যাদান-মুখে যে জিহ্বায় অসহায়তা চাটা হয়ে যাবে, প্রত্যয়হীনতা সমাহিত হবে তপ্ত কর্দমের নিচে— যা সৌরভ-রূপে সুড়সুড়ি-দান-রত সড়কে শরিক হতে— যেখানে কুসুম-পল্লব পূর্ণ ভাণ্ডারে প্রতীক্ষমাণ। উপনিষদের চরৈবেতি আহ্বান যা যুগযুগান্তর কালের এঁটেল মাটির নিচে চাপা পড়েছিল, পুনর্বার মন্ত্রতরঙ্গে আছাড় খায় কর্ণচত্বরে, মর্মপথে— যার মূর্ছনায় আত্মপর-বিস্মৃত এই জনপদের অধিবাসীরা উধাও-বিবাগী। তার জন্যে আদৌ ক্ষুব্ধ নয়, বরং এগিয়ে যাচ্ছিল হাতের

মশাল যথাযথ রেখে, কাতার না ভেঙে, যদিও কেউ পেশাদার সৈনিক নয়।

মাদবরের হাতের মশাল সবচেয়ে উজ্জ্বল, এমনই কায়দায় মশাল-দণ্ড ঘোরাচ্ছিল সে যেন অগ্নিশিখা সমান তালে চতুর্দিকে পৌঁছায়। গফুর, রাখাল, বুলান এবং অন্যান্যদের চিৎকার সর্বকণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছিল তারুণ্যের মাহাত্ম্যে নয় শুধু, আবেগের অসহ্য তাগিদে, অঙ্কুশ-আঘাতে। অনেক লোক। সংখ্যার একুন নিষ্প্রয়োজন এই জন্যে, সংখ্যা যখন গুণে পরিণত বহু ভক্ত যখন কখন ভিড়ে গিয়েছিল এই হুল্লোড়ে তার খেয়াল তারা করতে পারে নি, এমনকি যখন জয়কার দিচ্ছিল,— 'দশ যেথা, খোদা সেথা, দশ যেথা খোদা সেথা' রবে। এইসব হুঙ্কারের পেছন-পেছন ঢাক-ডমরুর বাদ্যধ্বনি প্রচণ্ড আওয়াজে রণক্ষেত্রের সূচনার মতো বেজে চলছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কালো আকাশ জুড়ে উড্ডীন পঙ্গপাল পালাচ্ছিল জমিন থেকে, গাছপালা থেকে। শুঁড়ে সঙ্গীন, চরণে কাঁটা-কাঁটা নখর জীবগুলো আতঙ্কিত দিকজ্ঞান-শূন্য যখন এদিক ওদিক পাখনা-বিস্তার মারফত উপরে উঠছিল, অসংখ্য তার পূর্বেই ধরাশায়ী ঠ্যাঙানির চোটে, আগুনের হল্কায় ছাই অথবা পোড়া-ডানা। বনেবাদাড়ে আঁদাড়ে, জলাশয়ের ধারে তৃণলতাসন্ধানী ও মাঠঘাট মরুভূমি করার পর তারই উপর আস্তানা-নির্মাণকারী পতঙ্গগুলোর বহুদিনের মৌরসী স্বত্বে হঠাৎ এমনতর আঘাত লেগেছিল। তাই জীবসুলভ যেটুকু আক্কেলের অধিকারী, তাও খুইয়ে ফেলতে বিলম্ব ঘটে নি : ঝাঁপ দিচ্ছিল সোজা মশালের মধ্যে। আলোর পরিধি বেশি দূর যায় না বিধায় অনেকে আফসোস— অনেক আফসোস— চোখ তেড়ে-তেড়ে আর কদ্দূর দেখা যায়? অনেকের চলাপথেই অনুমান করছিল, পতঙ্গগুলোর আবির্ভাবকালে যেমন পুরু ছায়া পড়েছিল, কালো ছায়া অথচ আশীর্বাদ-রূপে সংগৃহীত— তেমনই সঞ্চরমাণ ছায়া এখন চতুর্দিকে। কিন্তু গোটা পৃথিবীর জন্য আদিখ্যেতা নিরর্থক, যখন নিজের অল্প পরিসরটুকু পরিষ্কার রাখা প্রায় সাধ্যাতীত। মশালধারীরা আকাশের দিকে চোখ তুলে মাঝে মাঝে দেখলেও আশপাশের ঝোপঝাপ কেউ বিস্মৃত হয় নি, বরং এগিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত কোথাও স্রেফ আগুন ধরিয়ে দিতে, যেখানে পোকা ছাড়া অন্য কিছু নষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা অনুপস্থিত। কেউ-কেউ পোড়া-পাখা, ভাঙা-ডানা পঙ্গপালের উপর লাথি মারছিল; বহুদিনের জমাট জিঘাংসা তখনই অকুস্থলে প্রশমিত করতে বেহুঁশ— নিজের গায়ে চোট লাগতে পারে এমনই অমনোযোগী।— 'খেদাও, মারো, আগুন লাগাও' ইত্যাদি আদিম শিকারিদের মুখ-ফুৎ-কারের সঙ্গে তুলনীয়, যার মধ্যে একাগ্রতা, ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন, ক্ষুধা নিবারণের-প্রত্যাশা-আনন্দ এবং পাশব-শক্তি আবাহন (যেহেতু জন্তু-বধে দরকার) সব মিলিয়ে থাকে। স্ত্রীপুত্রপরিজন হারানোর শোক, গৃহপালিত জীবন-খোয়ানোর খেদ, প্রতিবেশীর খাঁ-খাঁ ভিটার উন্মাদ-বিষাদ— এমন শত বিয়োগ-ব্যথার সমাহার যদি চোখের সামনে পলকে-পলকে ভেসে ওঠে, কার না প্রতিশোধস্পৃহা রণপা-পায়ে তুড়ি দেবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। কিন্তু স্থিতধী এক অন্তর্নিহিত বেগ সকলকে অভীপ্সা যোগাচ্ছিল, অথচ জ্ঞানশূন্যতার বিজনে কাউকে নির্বাসন দেয় নি। এত শব্দ, এত আলো, এত হৃৎকল্লোল! যাদের কাছে ওই পরিস্থিতি পঙ্গপাল-আবির্ভাবের মতো অপরিজ্ঞাত ছিল, তাদের স্বতঃই ভয় পাওয়ার কথা, আর চেষ্টাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায় না জানার— কিসে কী হয়। শুঁড়-সঙ্গীনহারা কতগুলো পঙ্গপাল পূর্বে থেকে রাস্তার উপর পড়েছিল, যাদের কুচকাওয়াজিরা তালভঙ্গের অপরাধ সত্ত্বেও লাথিযোগে আরো রগড়ে দিয়েছিল ঠিক শিলে নোড়া ব্যবহারের কায়দায়। বিরাট ঘূর্ণিস্রোতের চাকায় এমন ছোট ছোট বহু চাকা বা অক্ষাংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত, যদি হাজার হাজার জোড়া চক্ষুধারী কেউ থাকত সেদিন সর্বস্থলে সদা-উপস্থিত।

সুড়ঙ্গ নিচে পড়ে ছিল একান্ত একাকী নিথরতায়— যে-অবস্থান এক বিবৃতির শেষ সিদ্ধান্ত বলা যায়। যেহেতু নিঃশেষ প্রয়োজন। মাটির উপরেই যখন পা ফুর্তি লাভ করে অশেষ-অশেষ আলোর সঙ্গে তাল-রত, তখন অন্ধের মতো অন্ধকারে গুটিগুটি পদে পদে সতর্কতা-সহ কে আর হাঁটার পিয়াসী? একটা মশাল-বহর এই পথে এগিয়ে আসছিল যার পুরোভাগে মাদবর, বুলান এবং তাদের ছায়ানুসারী কয়েকজন উৎসাহ-আতিশয্যের যোগানদাতা-রূপে, যখন যা প্রয়োজন। যথা, কাতার ঠিক সমান রাখা বা কোনো ঝোপের অলিগলি যেন ফাঁক না যায়— সেদিক দৃষ্টি রাখা প্রভৃতি।

মিছিলের একভাগ সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, পরবর্তী যাত্রাপথ জরিপের জন্যে। অন্ধকারে দূরাগত কোনো বিস্ফোরণের শব্দের মতো শত শত পঙ্গপালের পাখনার আওয়াজই একমাত্র নিরিখ— যার সাহায্যে শত্রুর অবস্থান নির্ণেয়। মাদবরের চোখে পড়েছিল প্রথম এবং তারপর অন্যান্যদের, যখন শত শত মশাল পর্যন্ত স্থিরশিখা, যেমন দাঁড়িয়ে যায় যারা মশালের দণ্ডবাহী। তাদের সম্মুখে একটা লোক খাড়া। সে জটাজুটধারী, শালদীর্ঘ শীর্ণ চেহারা, যদিও গায়ে ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো। তার চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছিল বিশাল ঝুপো দাড়ির মধ্যে, যেন নিশীথের ব্যাঘ্রনয়ন। কিন্তু তাকে ভূত ছাড়া আর অন্য কোনো আখ্যায় কে অভিহিত করতে পারে, যখন জায়গাটা জনশূন্য এবং মনুষ্যবসবাসের পক্ষে অসম্ভবরূপে অযোগ্য। মশালের আলোয় তাকে দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছে স্থানু। কোনো শিল্পীর আঁকা চিত্র বা হঠাৎ-স্তব্ধ সমুদ্র-প্রবাহ। দুই পক্ষে বিস্ময়-নিমজ্জিত মনুষ্যবৃন্দ। মাঝখান জিজ্ঞাসামুখর চোখের দৃষ্টিতে-দৃষ্টিতে প্লাবিত— ছয়লাব।

প্রথম মুখ খুলেছিল মাদবর,— কে? শেখপাড়ার মেনা শেখ না? গফুরের কানে শব্দ-পড়ামাত্র সচকিত, অতঃপর স্মৃতির সমতলে পায়চারীরত : সেদিন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে একেই দেখেছিলাম।

লোকটা এগিয়ে এসেছিল ধীরে ধীরে এবং অনুভব করছিল, স্তব্ধ এক বাহিনী তার কার্যকলাপ নিরীক্ষণরত। কিন্তু সেদিকে তার আকর্ষণ নয়। প্রথমে ধীরে পরে অতিশয় দ্রুতপদ সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাদবরের বুকে এবং তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল,— এত দেরি করে আইলি, মাদবর? এত দেরি কইর‍্যা?

—মেনা শেখ, ভাই।

—মাদবর, ভাই।

—পণ্ডিতপাড়ার হেরা কোথায়?

—সব।

—তাঁতিপাড়ার মহেশ-রমেশরা?

—সব শেষ, আমিও শেষ।

—ভাই!

—ভাই। আর কাঁদুম না।

স্বয়ং আলিঙ্গনমুক্ত মেনা শেখ মাদবরের দুই কাঁধে রক্ষিত হাত, চোখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি উচ্চারণ করেছিল,— আমার মশাল কোথায়?

—এই নাও। কম্পিত-কর মাদবর।

মশালটা হাতে নিয়েই মেনা শেখ কিন্তু অন্ধকার মাঠের দিকে দৌড় আরম্ভ করেছিল, মুখে চিৎকার, পুত— পুত— কী কইয়া গেলি— পুত— ওরে পুত—।

শূন্যতা দীর্ণ হতে লাগল।

আকাশ-তসমায় তাড়াতাড়ি বৃক্ষ-ডেরায় ফেরার উদ্দেশ্যে আহত বাদুড়ের ভূমিকা।

সব স্তব্ধ।

সকলে স্তব্ধ।

মশালের শিখা এক ঋজুরেখায় অধিষ্ঠিত।

দংগলের মধ্যে কোনো এক জায়গায় রাজা মজুমদার ছিল, বোঝা যায়, যখন সে মাদবরের নিকটে এগিয়ে এসে ডাক দিলে, কাকা!

—কী বাবা?

—লাভ-লোকসান, ক্ষয়ক্ষতির হিসেব-নিকেশের সময় আছে। আজ আর তা করতে যাবেন না।

—ঠিক বলেছ। পঙ্গপাল আর নেই মনে হচ্ছে।

—কী করে থাকবে? অনেক দাওয়াই দিয়েছেন। মোক্ষম দাওয়াইয়ে সব কিছু দূর হয়। পতঙ্গ থাকবে কী করে?

—কোন দাওয়াই?

—দংগলের মিলিত দাওয়াই।

—বুঝছি, চাচা। লোকের কাছে শেষপর্যন্ত পোক্ টেকে না।

মশালবাহী যাত্রীদল আবার এগিয়ে যেতে লাগল, যদিও অনেকের সামনে ভাসে অন্ধকারে সহসা অদৃশ্য আগন্তুকের মুখ। বারবার।

"কাল খোঁজ করা যাবে।" হাঁটতে হাঁটতে মাদবর নিজের মনেই উচ্চারণ করে ফেলেছিল।

AMARBOI.COM

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

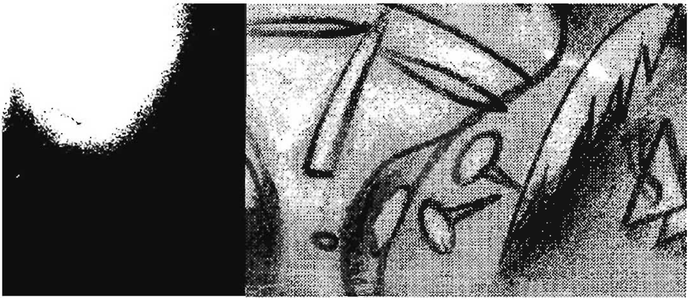

আর্তনাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরাস

বাসে সমস্ত প্যাসেঞ্জার চুপচাপ বসে আছে।

কিছুক্ষণ আগে যেন অনেক কথা হয়ে গেছে। অনেক, অনেক কথা। তারই তর্জনী উঁচোনো উদ্ধত শাসনে সব চুপ। পার্শ্বস্থ দ্রুতচারী গাছপালা থেকে আগত নীড়-সন্ধানী পাখিদের মিষ্টি চিৎকার শুধু ব্যতিক্রম। অনেক, অনেক কথা ছড়ানো রয়েছে জীর্ণ বাসের কাঠের ফ্রেমে। এখন তাই সবাই স্তব্ধ। বিরহী কান্নায় বুক হাল্কা করে দিয়ে চেয়ে আছে বিষণ্ন দিগন্তের দিকে। আর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বাতাসের মর্মর শুধু কাজ করে যাক অন্ধকারে গলে-পড়া পাতার ধমনীতে। পৃথিবী আর্তনাদ শুনুক। মানুষের মুখ বন্ধ থাক।

অস্পষ্ট আলো জ্বলছে বাসের ভিতরে।

কন্ডাক্টার ফ্রেমের শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্যাসেঞ্জার ডাকা আজ তার কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়। পাশাপাশি নানা গ্রামের নাম তার মুখ থেকে খইয়ের মতো ফুটে বেরোয় অন্যান্য দিন। আজ কন্ডাক্টারের ছুটি, অথবা কোনো প্যাসেঞ্জার নেই।

বাসের ঝাঁকুনির সঙ্গে সামাল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পা-দানির উপর। তারও দৃষ্টি অন্ধকারের দিকে বাসের জানালা ছাড়িয়ে। ওপাশে আকাশের গায়ে গাছপালা টিলারা কুঁজো হয়ে দৌড়ের বাজি ধরেছে বাসের সঙ্গে। পাশে কালো নিস্তরঙ্গ মেঘের পটভূমি। যার বুক ফুঁড়ে কোনো নিঃসঙ্গ খেজুর কি অন্য কোনো বুনো গাছ গোধূলি-হাওয়ায় দোল খাচ্ছে প্রবাহের সঙ্গ নিতে। কন্ডাক্টারের চোখে ঝাপসা আকার-আয়তন শুধু আঁকা হয়, তার কোনো বস্তু-নাম থাকে না।

প্যাসেঞ্জার দশ-বারো জন। ড্রাইভারের পাশে একজন। তার মাথায় হ্যাট। কোনো অফিসার হওয়া সম্ভব। ঐ মুখ দেখা যায় না। অন্ধকারে ড্রাইভারের সোজাসুজি গরাদের এপারে ঠিক মাঝখানে একজন বৃদ্ধ উপবিষ্ট। বাসের আলোয় তার মুখ স্পষ্ট। শাদা দাড়ি ঘন-চওড়া রেখায়িত মুখ, খাড়া নাক। ঈষৎ কোটর-গত চোখের দু-পাশেও রেখার ভিড়। মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় বৃদ্ধ একেকবার চোখ খুলছে, তখন কোটরের গভীরতা উবে যায় দীপ্তির আভাস স্বতঃই প্রকাশ পায়; নামাজ-কালীন তহরিমা বাঁধার মতো বুকে দুই হাত বেঁধে সে আছে। অবনত মুখ। দুই গণ্ডদেশের মাঝামাঝি নাক, আলো-ছায়ায় জাল বুনে রেখেছে। তাই এই মুখ মনে হয়, আদিম পাহাড়চূড়ায় খোদাই কোনো দরবেশের মূর্তি। গায়ে পিরহান ঝুলে পড়েছে পা-তক। কাঁধে লাল গামছা।

AMARBOI.COM

পায়ে সাধারণ চটি। বসে আছে সে মৌন। নিঃশ্বাস নিতে তার ফোকলা গালে আরো খাদ সৃষ্টি হয়। আলো-ছায়ার অগোছালো বিকিরণ কোনো কঙ্কাল-মুখ সৃষ্টি করে— যার গর্তে গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা যেন শাদা শণ গুঁজে দিয়েছে জীবন্ত মানুষ তৈরির লোভে।

সমস্ত প্যাসেঞ্জারের দৃষ্টি প্রায়ই এই বৃদ্ধের উপর নিবদ্ধ। অন্য সময় তারাও বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

বৃদ্ধের দুই পাশে দুই জন চাষি। সম্মুখে বাসের মেঝেয় একজোড়া বাঁশের বজ্‌রা পড়ে আছে। কোনো জিনিস নিয়ে শহরে বিক্রি করতে গিয়েছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে হাটের শেষে। এই দুই জনের পরণে লুঙ্গি। ঈষৎ শীতের আমেজ আছে বাতাসে, তাই গায়ে গাম্‌ছা-লেপ্‌টানো। তারাও চুপচাপ। দুই জনে বৃদ্ধের দিকে ঘন-ঘন তাকায়, তারপর মাথা নিচু করে কী যেন ভাবে। আবার জানালার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

বাম পাশের চাষি একজন অনেকক্ষণ উসখুস করছিল। তার গলায় অসোয়াস্তি; পাকা বিড়িখোর সে। কিন্তু বিড়ি ধরাতে সাহস পায় না। কোনো পবিত্র আস্তানায় যেন সে বসে আছে, সম্মুখে পীর-পয়গম্বর— এখানে বিড়ি ধরানো বেয়াদবি। এমন ধৃষ্টতা তার মনুষ্যত্বের বাইরে। দেশলাই-বিড়ি বাম হাতে ধরে সে এমন জড় বনে গেছে, যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বৃদ্ধের দিকে একেকবার চায় আর মুখ নিচু করে সে।

ড্রাইভারের সোজাসুজি পাশ-বেঞ্চির উপর একজন তরুণ। হাতে বই দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় ছাত্র। গৌরবর্ণ মুখে কৈশোরের ছাপ একদম নিঃশেষে মুছে যায় নি। তার কৃশ লম্বাটে মুখাবয়ব পাষাণের মতো স্থির। চুপচাপ সে-ও। হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে অনড় হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে পায়ের অসোয়াস্তি কাটাতে যখন সে হাঁটু বদলায়, তার পায়জামার নিচে বাদামি জুতোর ঘষ্‌ঘষ্‌ আওয়াজ হয়। কিন্তু এত মৃদু যে, স্টিয়ারিং আর ইঞ্জিনের তোড়ে তা থই পায় না। একটা বাংলা বই খুলে সে একঘেয়েমি ধ্বংসের চেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু চোখ আজ বইয়ের পাতায় শান্তি পায় না। সমতল মাঠ, নতুন অফিস কি কারখানা ঘরের আলো ছাড়িয়ে টিলার ঘন-কালো অন্ধকারই বোধহয় চোখের শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম স্থল। কিসের ঝাপটা যেন ঐ তরুণের মুখের র‍্যাঁদা চালিয়ে এবড়োখেবড়ো অকর্ষিত-জমি-জাত রুক্ষতা লেপে দিয়েছে। দাঁতে দাঁতে চেপে হাতের মুঠি শক্ত করে সে আজ মন-প্রবাহের উজানে গুণ টানছে।

ছাত্রটির সোজাসুজি সম্মুখের বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট একজন কেরানি ভদ্রলোক। উত্তরমুখী বাসের যাত্রাপথ। সে পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে ঘাড় একটু কাৎ করে। কোনো অসোয়াস্তি যেন নেই তার এমন আসনে। নিবিড় অন্ধকারেই বরং সোয়াস্তি জড়ো হয়েছে। উধাও-গতি বাসের সঙ্গে মনের সমতা রক্ষা অন্ধকার আঁকড়েই সম্ভব। একটু হাত-পাও নড়ে না তার। ভদ্রলোকের পাশে আরো কয়েকজন আছে। ছোট বাল্বের আলো ফিকে, সকলের মুখ দেখা যায় না। কিন্তু নিস্তব্ধতার ছোঁয়াচ তাদেরও রেহাই দেয় নি। ছাত্রের পাশে এমন আরো কয়েকজন। সবাই বোবা। কেউ কাশছে না পর্যন্ত। মফস্বলের উঁচু-নিচু পথে বাসের সফর সুখ-দায়ক নয়, গল্প-গুজবে এই অসুবিধা কিছু কমে। কিন্তু আজ কারো কোনো উৎসাহ নেই। একজন জানালার গরাদে মাথা চেপে ধরেছে জোরে। হয়ত মাথা ধরা, অথবা ক্ষোভে জ্বালায় হাত-পা ছোড়ার অশোভনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ এই পন্থা।

একটা লেভেল ক্রসিং পার হতে বাসের গতি ধিমিয়ে এল। রেল-লাইনের দুপাশে খাদ, জোনাকি উড়ছে হাজার হাজার। খেজুর ঝোপ শণচুল বুড়ির মতো বাতাসে উকুন খুঁজছে। ক্রসিং-এর পর একটু খাড়াই পথ। মোটরের ইঞ্জিন গিয়ার বদলের সাথে কঁকিয়ে উঠল। আবার পুরাতন স্পিড ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে গাছপালার সারি, ম্লান, ডিপা-জ্বালা অনিয়মস্তব্ধ চা-খানা, গেরস্থ ঘরবাড়ি, অন্ধকার-লুপ্ত ফসল-শেষ নাড়াবন। বর্ষা-ক্ষত পথের মধ্যস্থিত ছোট ফাটল পার হতে বাস বেশ ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। আরোহীরা জানালার রেলিং কি বেঞ্চ ধরে তাল সামলে নিল, কোন হইচই করল না কেউ— অথচ আনন্দের এমনি সুযোগ মফস্বলে কে কবে অবহেলা করে? পথের ক্লান্তি হইচই দিয়ে ঠাণ্ডা হয়, কে না জানে! আবার সমান পিচ পথ। বাসের গতি সমান। একটু এগিয়ে যেতে একপাশে ঝুলে পড়া মিঞ্জিরি গাছ বাসের গায়ে ডানা ঝটপট করে গেল। আজ কারো হুঁশ নেই। ড্রাইভারকে হুঁশিয়ারি ছাড়ছে না কেউ আগে থেকে। চোখে ডালপালা লাগতে পারে, এমন আশঙ্কাও নেই। হয়ত আজ কারো চোখ নিজের দিকে নেই। আর কোথাও— কোনো রক্তাক্ত রাজপথে, কি কোনো শোক-বিধুর গৃহ-প্রাঙ্গণে নির্বাক থেমে আছে। সমস্ত বাংলাদেশের গাছপালা নদী-নালা খাল-বিল ছায়াপথ বন-জঙ্গল পার হয়ে, দূরত্বের ব্যবধান উপেক্ষা করে, বর্বরতার সম্মুখে স্তব্ধ মিছিলের লক্ষ চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে— আজ একক চোখে তাই মনে হয় দৃষ্টি নেই। তাই তো পুরাতন অভ্যাস ভুলে গেছে যাত্রীরা। ড্রাইভারের বাম হাতে একটা হলুদ-পাতা ডালের হোঁচট লাগল, সে আত্মরক্ষায় হাত বাড়াল, না থামাল না ঐ তরু শাখা। স্পিড আরো বেড়ে গেল। পাতায় আলিঙ্গন-বদ্ধ অন্ধকারের খিড়কি তুলে নক্ষত্ররা তাকায়। আবার বোবা মাঠের বিস্তার, উপরে খোলা আকাশ, তখন তারারা অনির্বাণ জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো দেখায়। মৌন পূর্ববঙ্গ যেন ঐখানে জ্বলে-জ্বলে জিজ্ঞাসা করছে : আমার শষ্য-শ্যামলা হরিৎ প্রান্তর তোমাদের এই অন্নাতুর কান্না কেন? তোমাদের ভাষা কোথায়? তোমরা স্তব্ধ কেন?

কেউ জবাব দেয় না! বাসের অভ্যন্তরের সবাই মূক। খটখট ইঞ্জিনের শব্দ শুধু ফুঁসে উঠেছে, তারও জবাব দেওয়ার কোনো ভাষা জানা নেই।

লোকালয় পার হয়ে এলো যন্ত্র-শকট, এবার দু পাশে বে-বহা মাঠ। একদিকে গাছপালার শিরদাঁড়া থমথমে অন্ধকারে ঝাপসা। সমতল জমির গাছপালার ছোপ আঁধারের বিচিত্র স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করেছে। পাড় ভাঙা শুক্‌নো দীঘি ঝাউয়ের পাহারা-ঘেরা পল্লী-পথের আত্মগোপনের ফাঁদ হেড-লাইটের সম্মুখে ভেঙে যায়। আবার একাকার সব। টায়ারের নিচে মচ্‌মচ্‌ শব্দ শুধু জানান দেয়, এখানে বসন্তের হাওয়ায় অনেক পাতা ঝরছে, পাতায় পুরু এই পথ। কাঠের ব্রিজে চাকা ওঠার সময় ঢোলের মতো ডুগডুগ শব্দ হয়। এমন গতির মুখে ঝাউ-মর্মর বন-কলভাষ কোনো দাগ কাটতে পারে না কানে। বাস চলছে, চলছে। পৃথিবীতে এই মুহূর্তিক সত্য মাত্র জীবিত।

ছাত্রটির পাশে উপবিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে একটি লোক বিড়ি বের করল। হাতে দেশলাই। অতি সন্তর্পিত— যেন তার কাজ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বিড়ি ধরাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবছে সে। একটা দেশলাইয়ের কাঠিও সে বের করল খোল থেকে। সম্মুখের বেঞ্চি থেকে একজন হাত-ইশারায় বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর মাথা নাড়ে। বিড়ি ধরিয়ো না— তোমার লজ্জা করে না? এমনই ভাবখানা। নেশাখোরেরের আর নেশা করা হলো না। শার্টের পকেটে দেশলাই ঢুকল, দেশলাইয়ের কাঠি একাকী— ঢুকল। সন্তর্পণে ঐ ব্যক্তি আবার যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখে, কেউ তাকিয়ে নেই তো? শান্ত মুখে ভদ্রলোক অন্ধকারে নিজের দৃষ্টি ডুবিয়ে দিল। দুষ্কৃতি-নিবারণকারী এতক্ষণ সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন তারও চোখ জানালার বাইরে।

গোটা দুই বাঁক ফিরতে বাসের স্পিড সামান্য কমল। রাত্রির প্রহর শুধু কমে না। কমে না বাসের ভিতর স্তব্ধতার শাসন।

মাঠের সফর শেষ হয়ে গেল। আবার লোকালয় শুরু হয়েছে। দুপাশে ঝিমমারা ঘর-বাড়ি, দহলিজ, কলা বাঁশের বন। হেড-লাইটের আলো তীক্ষ্ণধার এই সড়কে। একদম শীত যায় নি। ফিকে কুয়াশা গাছপালায়। অন্যান্য দিন পার্শ্ববর্তী দোকানে কলরব ওঠে। আজ লোক বসে আছে, কিন্তু গলা-ফাটা চঞ্চলতা নেই।

এই লোকালয়ের পর ছোট মাঠ শেষে, বাসের একজন যাত্রী উসখুস করে কন্ডাক্টারের দিকে তাকায়। কিন্তু কোনো কথা বলে না। হবে-ভাবে মনে হয়, তার গন্তব্যস্থান নিকটে। কন্ডাক্টারের চোখে পড়ল একবার। সে একটু উঠে এল। ড্রাইভারের সোজাসুজি। তারপর গরাদের ভেতর হাত গলিয়ে চালকের হাতে একটু পিঠে দিল। আর কোনো কথা হয় না। বোবার রাজ্যে ঠোঁট থাকা বৃথা।

পল্লী-পথের মুখ বড় সড়কে এসে মিশেছে। দু-পাশে দুটো মোটা কদম গাছ। আঁকাবাঁকা ধুলি-ধূসর পথের সর্পিলতা ঐ দিকে অন্ধকারে উধাও। ঐ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে নেমে গেল। বারবার তার চোখ ঐ মৌন বৃদ্ধের উপর নিবদ্ধ হয়। শেষবারের মতো সে দেখে নিল বাসের দরজা থেকে। কন্ডাক্টার ভাড়া নিয়ে গলায় ঝোলানো ব্যাগে রেখে দিল। আলোর কাছে হাতের তালু চওড়া করে খুচরা পয়সা গোণা আজ নিষ্প্রয়োজন। প্যাসেঞ্জার ঠকিয়ে যেতে পারে? কিন্তু আরো বিরাট ক্ষতির দাগা খেয়েছে সে, তাই এই লোকসান তুচ্ছ। কন্ডাক্টারের স্বতঃই মনে হয়, আজ তাকে প্রতারিত করে যাওয়ার মতো কোনো শঠ এই এলাকায় নেই।

আবার ধাবমান পথ, চাকা, গ্রাম-গ্রামান্তর।

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একবার চোখ তুলে চাইল। কিন্তু চোখ তখনই বুঁজে যায়। বুঁদ হয়ে আছে সে চিন্তার কড়া ঝাঁঝে। কিন্তু তারপরই সমস্ত বাসযাত্রীদের মধ্যে স্তব্ধতা বেড়ে গেল। ছাত্রটি কী যেন বলতে গিয়ে থামল। বৃদ্ধের বদ্ধ মুঠি আরো শক্ত হয়ে উঠল। পার্শ্ববর্তী চাষি মাথা নাড়ল নিজের খেয়ালে— কোন আত্ম-কথোপকথনের বুদ্বুদের আঘাতে হয়ত। কেরানি ভদ্রলোকের মুখাবয়ব ঋজু কাঠিন্যে নিথর হয়ে এল। অন্যান্য যাত্রীদের দৃষ্টি তখন বাসের অভ্যন্তরে। কন্ডাক্টার বাসের দরজায় দাঁড়িয়েছিল সেও নিঃশব্দে উঠে এল।

শুধু মোটরবাস নিজের চলা-পথে নির্বিকার। তার অন্ত-আলোড়ন খট্‌খট্‌ রবে, দু-পাশের ফেলে আসা প্রকৃতির সমারোহে শব্দায়িত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার মৌনতার প্লাবন।

পাড়া-গাঁ এখন নিশুতি হয়ে যায় নি। পিদিম জ্বলছে উঠানে, ইটের পাঁজা তুলছে পাঁজারিরা খোলা মাঠে। কিন্তু এই সজীবতা বাসযাত্রীদের ছুঁতে পারে না। এখানে মরার রাজ্য। কঙ্কালের মতো সবাই বসে আছে। এত মানুষের নিঃশ্বাসও যেন মাথা তুলতে পারছে না নীরবতার বুকে। চাষির হাত থেকে দেশলাই খসে পড়ল খড়খড় শব্দে। কিন্তু তা তুলতে গিয়ে নীরবতার পবিত্রতাহানি, তার মনুষ্যত্বে বাধে। চাষিটার কণ্ঠনালীর উপরে একটু দোলা লাগল। হয়ত চোয়াল আরো শক্ত করতে বা মুখের 'আব' ঘুচাতে।

আরো দু-মাইল পরে বাসের গন্তব্যস্থান। নির্বিকার যাত্রীদল বসে আছে। কারো কোনো উদ্বেগ নেই, তাড়াহুড়া নেই বাড়ি ফেরার। বৃদ্ধের দুই হাত বুকে বাঁধা। সেও গন্তব্য-পথের হদিস জানে না। কিন্তু তার নিঃশ্বাস যেন দ্রুততর হচ্ছে। কয়েকজন যাত্রীর দৃষ্টি আবার বাইরে থেকে ঐ মুখের উপর পড়ে।

বৃদ্ধের নিঃশ্বাস আরো দ্রুত, আরো ঘন। যেন ডুবে যাচ্ছে সে। কুঁচকে ঢলে পড়ল, পা একটু সটান, প্রসারিত হলো তার।

হঠাৎ হাঁফ ছাড়তে দিয়ে বৃদ্ধের কণ্ঠনালী আর স্থির থাকে না। শক্ত কফ জমেছে যেন গলার দুপাশে। ফোকলা গাল বারবার ওঠানামা করে। ঠোঁট কেঁপে উঠল। অসহ্য কী যেন বুক থেকে ঠেলে ঠেলে উপরে উঠছে।

চোখের দৃষ্টি অপলক, বৃদ্ধ এইবার ডুকরে আর্তনাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল নীরবতার জগদ্দল।

—"কী দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলি করে মারল? কী দোষ— কী দোষ করেছিল সে? আহা!"

কী দোষ করেছিল সে? এই জিজ্ঞাসাচিহ্ন ভাসছে তার চোখের উপর। এখনই মুখ থুবড়ে পড়বে বৃদ্ধ বাসের মেঝেয়।

সমস্ত যাত্রী তখন নিজে জায়গা ছেড়ে বৃদ্ধের উপর ঝুঁকে পড়েছে। চাষি দুজন তার কোমর জড়িয়ে ধরল যেন পড়ে না যায়। ড্রাইভারের এক হাতে স্টিয়ারিং, অন্য হাত সে সবার আগেই বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

জোড়া-জোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি-স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। দমকে দমকে সিংহ-গর্জন এখনই ফেটে পড়বে। সকলের গলার শিরা কেঁপে উঠেছে। দমকে-দমকে।

নির্বিকার গাড়ি শুধু এগোতে লাগল।

একাকী

এত রক্ত, জননী বাংলা ভাষা, এত রক্ত ছিল আমাদের শীর্ণ শরীরে, যদি জানতাম পূর্বে, তাহলে কী অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কালক্ষয় সাড়ে চার বছর ধরে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত গড়িয়ে আনতাম বুকের দুর্দম্য বাসনা-কামনাগুলো, শুধু দেখে নিতে সঙ্গীজনেরা, চোখের স্ফুলিঙ্গ সূর্য-কিরণে বিপরীত পাল্লায় যথা-বিচ্ছুরিত যে-যার জায়গায় মোতায়েন

আছে কি না, তাদের পায়ের পেশী কি তড়পানো নেশায় অস্থির এবং সকল কাতার একুনে একটি জমাট পিণ্ডের মতো অনড় দেখালেও ভেতরে সঞ্চারিত বেগের আভাস কি স্বতঃই স্পষ্ট এবং সমাগত কুচকাওয়াজের বিলম্ব অর্থ অনর্থক কাল ও সুযোগ হরণ, যখন প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তাভাবনা স্বপ্নছায়া মাত্রা, এমনই সেখানে স্রোতের তোড় যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ খণ্ড খণ্ড রূপে লুটোপুটি খায় এবং তুমি তোমার অস্তিত্বের এক খেই পলকে ছেড়ে আরেক খেই পাকড়ে ভেসে যেতে পারো কতকটা চিররুগ্ন পঙ্গুর সাদৃশ্য, যদিও অহর্নিশ অবলম্বনের অন্বেষায় আবেগকে অবিচল স্থিতি সমর্পণে সে-ও হন্যে। এত রক্ত, এত রক্ত ছিল এ শরীরে জননী বাংলা ভাষা? চেতনার দিগন্ত ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসার পূর্বে এইখানে মাটির উপর, জননী, তোমার বর্ণমালার ফুলঝুরিগুলো একে একে জ্বালিয়ে দাও যেন নবযুগের ভীষ্ম আমি, আমার উপর আলোক-শরশয্যার আয়োজন শুরু হয় এবং তেমনই আকাশমুখী শয়ান আমি অগণন নক্ষত্ররাজির বেহায়া প্রতিযোগিতা দেখতে চাই, যদিও আমার বক্ষ স্পন্দন নীহারিকার স্পন্দনের কাছে ক্রমশ পরাজিত। গোধূলিবেলায় মরণোন্মুখ দিন কি শেষ আর্তনাদ একটিবারের মতো দিতে প্রস্তুত হয় অথবা আরো নিথরতায় মগ্ন ক্রমশ আত্মলীন কোনো অস্পষ্ট হাহাশ্বাস রেখে যেতে চায় পেছনে যা ঝিল্লি কি অন্য পতঙ্গেরা কণ্ঠে তুলে নেয় নিজেদের তাগদ-অনুযায়ী উচ্চগ্রামে পৌঁছে দিতে, আমার জানা নেই। তবু আমার অসংলগ্ন ছায়াচ্ছন্ন বোধের রেখার ইশারায় আঁকা কাহিনী নয়— আমার আর্তনাদ আমি রেখে যেতে চাই, এদেশের আগামীকালের মানুষের জন্যে যেন তাদের শ্রবণ-পট উচ্চকিত হতে পারে আমি কোন পথে হারিয়ে গিয়েছিলাম তা খুঁজে বের করার সহায়তায়। আমি নিজেকে খুঁজতে দিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম। এই মিথ্যে কথা নিরসনের জন্যে সব নিভে যাওয়ার পূর্বে ক্ষণিকের তরে আমার এই দহনপ্রচেষ্টা, আর্তনাদ সম্ভূত নিনাদ কিরণের এই ঝিলিক। এত রক্ত, জননী বাংলা ভাষা, এত রক্ত ছিল এ শীর্ণ শরীরে? তাই কুয়াশা-প্রলেপিত চেতনার এই সড়কেরও অনুভব একদম খুইয়ে যায় নি। আবছা সব দৌড়ে দৌড়ে আসে আবার মিলিয়ে যায়। ঠাহর করা অনেক সময় মুশকিল হয়ে পড়ে। আজ চোখ দেখে, অথচ সঠিক পরিচয় পায় না। তবু আমার কাছে সবই চেনা, অন্তত জানান দিয়ে যায় অতীতের রূপ-রস-গন্ধ-মুখর এক আবেষ্টনী। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ে বেড়াতে হয় অনেক সময়। তখন অনুমানেই অভীষ্ট দ্রব্যের আঁচ পাওয়া যায়। আজ এখন দেখতে পাই, সাড়ে চার বছর পূর্বে মাত্র সাড়ে চার বছর পূর্বে ১৯৪৭ সনে আমি তাদের দেখেছিলাম, আসছে যাযাবরের কাফেলা। তখন যদিও সংখ্যা চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো এবং তেমন গতিমুখর নয় এই মানসিক স্রোত। কিন্তু মাত্র দুবছর পূর্বে ১৯৫০ সন, আমি তাদের দেখলাম, আরো দলে দলে পূর্ববঙ্গের পথ প্রান্তর ছেয়ে ফেলল মাথা গোঁজার ঠাই যোগাড়ের একমাত্র উদ্দেশ্যে। জীবিকার প্রশ্ন অবিশ্যি আছে। কিন্তু সদ্য-সদ্য উপার্জনের পন্থা কে, কজন আর বের করতে পারে? আপাতত বাঁচার পন্থা তৈরি তখন সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত সমাধান। সেই পথেই সবাই এগোতে লাগল। 'রিফিউজি' শব্দ পূর্বে শুনেছিলাম। তখন চোখে দেখতে পেলাম তার প্রকৃত অর্থপরিচয়। ওরা মানুষ। নিজেদের আবাসভূমি ত্যাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে বাধ্য হয়েছে, তাই ত্যাগ করে এসেছে তারা নতুন আবাস রচনায় এবং এখানে জোরজবরদস্তি নেই কিছু। সবাই এসেছে নিজেদের অধিকারে। কারণ উপমহাদেশে তাদের নতুন রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে— যার নাম পাকিস্তান। তার দুই খণ্ড, চৌদ্দশ মাইল ব্যবধানে একদিক পূর্ব ও অন্যদিক পশ্চিম পাকিস্তান। প্রাচীন বসতভূমি ত্যাগকারীগণ তাই কোনো অনধিকারচর্চার পাশে অপরাধী নয়। তারা এসেছে আবার নতুন গৃহ নির্মাণে, নতুন জীবন-নির্মাণে। কিন্তু কোথায় তাদের বর্তমান আস্তানাশিবির পাতবে তারা? জায়গা তো কারো না কারো দখলে থাকার কথা। আছেও তা-ই। তখন দেশের সরকার মধ্যস্থ হয়ে দাঁড়ায়। সরকারই তখন রিফিউজিদের জন্যে ক্যাম্প তৈরি করে এবং তাদের দিনগুজরানের এখন প্রধান প্রশ্ন আহার— সেই আহার উপাচার যোগানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। যখন পাকিস্তান হয় উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে তখন আমার বয়স ছিল ষোলো বছর। মুসলিম লীগের পতাকাবাহী আমি কিশোরকাল থেকে। সামাজিক কাজে তখন আমার উৎসাহ ছিল প্রচুর। বারো বছর বয়স থেকে ভলান্টিয়ারের কাজে প্রচণ্ড উম্মাদনা পেতাম। রিফিউজি ক্যাম্পের দায়িত্ব পালনে ১৯৪৭ সনে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব তা বলা বাহুল্য তখনই উদ্বাস্তু এই সব মানুষদের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ি। তাদের এক নাম রিফিউজি। আরো অন্য নাম ছিল অর্থহীন। ওদের বলা হতো "বিহারি"। অথচ সকলে বিহার প্রদেশ আগত নয়। কেউ এসেছে উত্তর প্রদেশ থেকে কেউ উড়িষ্যা বা অন্য কোনো ভারতীয় প্রদেশ থেকে। কিন্তু এদের নামকরণ হয় এজমালি এক শব্দে বিহারি। অনেক রিফিউজি ক্যাম্প আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। যশোর, সৈয়দপুর, ঢাকা প্রভৃতি এলাকায়। কিন্তু চট্টগ্রাম ষোলো শহর রিফিউজি ক্যাম্পের কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। সেখানে কাজও আমি করেছিলাম কয়েক মাস। এই উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তখন দাংগা হয়, তার ফলেই প্রচণ্ড এই রিফিউজি প্লাবণ। অবিশ্যি তখন জেনেছিলাম এদেশী শব্দও আছে ওদের জন্যে। তারা পাকিস্তানে মোহাজের এবং হিন্দুস্তানে শরণার্থী নামে কথিত। কিন্তু এসব শব্দ যেন দেশী পির পুরোহিত, সিন্নি পায়নি। সিন্নি পেল এই দেশ-ভাগের অন্যতম আয়োজক, সেই ইংরেজের ভাষা রিফিউজি। এইসব ক্যাম্পের বিশদ বিবরণ আপনারা সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন বা শুনে থাকবেন। সব মুসলমান ভাই-ভাই এবং তাদের আবাসভুমি রচনায় পাকিস্তানের জন্ম। জন্মে প্রসববেদনা ভোগ করতে হয়। পাকিস্তান জন্মের পরও কিন্তু সহজে ওই বেদনা দূর হয় নি। তার এক রূপ রিফিউজি, আমি প্রথম টের পেলাম। হাজার হাজার লোকের দিনগুজরানের জায়গা করা কঠিন। কিন্তু তার পেছনে যদি আন্তরিকতা উবে যায়, তখন সমস্ত ব্যাপারটা যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায় সেখানে মানবিক কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শীতের দিনে সকলের বস্ত্র যোগানো পর্যন্ত সমস্যা। পেসাব পায়খানার সুষ্ঠু তরিকা না থাকলেও তো স্বাস্থ্য টিকবে না। ফল, নিজের চোখে দেখলাম। শত শত রিফিউজির ব্যাধিগ্রস্ত মৃত্যু। শোকাচ্ছন্ন, রোগদীর্ণ, যদিও বেশি দিনের কথা নয়, সেদিনের কাহিনী আজ মনে করতে চাইনে। ওদের যেমন দলে দলে আসতে দেখেছিলাম, তেমনি দলে দলে মরতে দেখলাম। ষোলো শহরের পাহাড়ের কোলে নির্বিবাদ বহু মানুষ শুয়ে আছে আজও মাটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গীভূত— পাকিস্তান রচনার স্বপ্নে যারা পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে এসেছিল বহু দূর-দূর মুল্লুক থেকে। মৃত্যুর সঙ্গে আমার এমন পরিচয় আর কখনো ঘটে নি। বুড়ি দাদি মারা গিয়েছিলেন ছেলেবেলায় আমার বয়স যখন আট বছর। একক মৃত্যু। কিন্তু বারোয়ারী মৃত্য এমনভাবে দেখার জন্যে আমি কখনো প্রস্তুত ছিলাম না। রিফিউজিদের পেটের অসুখ প্রায় পেয়ে বসত। আহার তো উদরপূর্তি, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপার নয়। রুচির প্রশ্ন তো পরিহাস। বিহার থেকে যে এসেছে তার তো দুবেলা গমের আটা দরকার। হয়ত দুদিন জুটল, তারপর আবার চাল খাও। এমনতর নানা গরমিল তো প্রতিদিনের ব্যাপার। শরীর কী দিয়ে থাকবে? কলেরা লেগে গেল কদিন। তখন মড়ক আর অল্প সংখ্যায় আটক রইল না। কবরও বারোয়ারী দেওয়ার বন্দোবস্ত। গর্ত খুঁড়ে ঢুকিয়ে দাও। কাফনের কাপড় কখনো জুটত, কখনো জুটত না। তিন দশক আগে এমন সব ঘটনাপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল এই ভূখণ্ডের উপর দিয়ে। কিন্তু তা-ই যেন একমাত্র প্রবাহ কেউ না মনে করেন। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। পাকিস্তান গড়ে উঠেছিল বৈইকী অন্য দিক দিয়ে। যদিও সরকারের দায়িত্ব বিদেশাগত এইসব রিফউজিদের নতুন জীবন গঠনে সাহায্য করা, তা বাধ্যতামূলক— পালন করতেই হবে, এমন কসম তো কেউ খেয়ে বসে নেই। সুতরাং অপরকে না হোক যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল তারা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নিজেদের এবং ভাই-বেরাদর, সাঙ্গ-পাঙ্গদের আখের মরজি আল্লার ঠিক গুছিয়ে চলেছিল। ভাঙা-গড়া এই তো ইতিহাসের নিয়ম। তখন বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে নালিশ তুললে, তারা ওই ধারা জবাব দিতেন। রিফিউজি ক্যাম্পের এক তত্ত্বাবধায়ক ছিল উত্তর পঞ্চাশ বয়স, পরহেজগাররূপে খ্যাত, তিনিও রিলিফের চাল তেল এদিকওদিক করতেন। এমন সব অব্যবস্থা এবং অপমৃত্যুর প্রতিবন্ধকতা ঠেলে অনেক রিফিউজি আপন আপন ভাগ্য নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। আমি নিজের চোখে দেখেছি, রিফিউজি ক্যাম্পের ঝুপুড়ি ছেড়ে শেষে অন্য কোনো জায়গা খুঁজে নিয়েছে। রেললাইনের ধারে বহুদিনের পরিত্যক্ত ওয়াগনেই গোটা সংসার পাতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আট-দশ বছর পূর্বে এই সব বগি এসেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ওগুলো খবরদারি তেমন করে নি রেল কর্তৃপক্ষ বা আরো অন্য কারণ থাকতে পারে। দেশবিভাগের পর দেখা গেল, বগি আর বগি নেই, রীতিমতো মনুষ্য-সংসার। পাঁচ সাত জনের পরিবারের জন্যে যদি এমন একটা আশ্রয় জুটে যেত, তারা ভাবত, আল্লার মেহেরবাণি। কারণ, মানুষের মেহেরবাণি নিঃশেষিত। অথবা, থাকলেও তা দিয়ে কোনো কাজ হয় না। জীবন সংগ্রামের বাকি ছবি যে-কেউ এঁকে নিতে পারেন, যদি সামান্য অভিজ্ঞতা থাকে সেই সময়কার। অবিশ্যি উন্মুল ভাগ্যাহত এইসব মানুষদের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা আমার গোড়া থেকে ছিল। কিন্তু ভাষা বড় বাধা। অন্য প্রদেশের মানুষ তারা। সব কথা গুছিয়ে বলার সূত্র কোথায়? তবে ওদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কিছু সামগ্রী আমি যদ্দূর সম্ভব যোগাড় করে দেওয়ার চেষ্টা পেতাম। ক্যাম্পের বিভিন্ন বিভাগের কর্তারা আমার চেনা। মিনতি মিনতি করে অনেক সময় বরাদ্দের বাইরে এটা-ওটা আমি এনে দিতে পারতাম। এক বৃদ্ধার মুখ আমার কাছে আজ ঝলক দিয়ে দ্রুত মিলিয়ে যায়। বয়স হয়েছিল সত্তরের বেশি। হয়ত বয়স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো কম হতে পারে। কিন্তু অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে জীবনের উপর দিয়ে, আর তার ভালো আহার জোটে নি। এই কৃচ্ছ্রতা বলিরেখারূপে ফুটে উঠে মুখে, দেহের উপর। এই বৃদ্ধা আমাকে ডাকতেন, বেটা। তার কণ্ঠস্বর আমাকে অভিভূত করে ফেলত। এত দরদ সেখানে। বৃদ্ধার বড় পরিবার। দুই ছেলে বিবাহিত, তাদের বৌ ছেলে মেয়ে। আরো ছিল তিন জন অবিবাহিত ছেলে এবং দুই মেয়ে। কলেরা লাগতে একদিন তিন জওয়ান ছেলে ছোট দুই নাতি শেষ হয়ে গেল। ওদের সান্ত্বনা দেব? কিন্তু তার ভাষা তো আমার কাছে নেই। বৃদ্ধার কাছে বসে তাঁর দুই হাত শুধু নিজের হাতে তুলে নিতাম। একদিন তিনি ডুকরে কেঁদেছিলেন। প্রথম দিন। তারপর আর ওঁকে কাঁদতে দেখি নি। গুম হয়ে বসে থাকতেন। রিফিউজি ক্যাম্পে দুতিন মাস কাটিয়ে দিতে পেরেছিলাম। কারণ, বাপের সঙ্গে কাইজ্যা করে আমি গ্রামছাড়া। তিনি আমাকে কলেজে পড়ানোর জন্যে জমি বেচেছিলেন। গাঁয়ে থেকে লেখাপড়া করতাম। জমির মূল্য আমার জানা আছে। জমি না থাকলে বাঁচা দায়, অথবা বাঁচলেও দরিদ্রের কশাঘাত এমনতর যে তুমি আর মানুষ থাকবে না। বাপের সঙ্গে তাই মতভেদ। তিনি আমার উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু আমি তা দেখতে রাজি ছিলাম না। জমির মূল্য সত্যি উপলব্ধি করেছিলাম কি না, আমার পক্ষে হলফ করে বলা কঠিন। উচ্চশিক্ষার প্রতি লোভ আমার ছিল মনের অনেক গহনে। কিন্তু জমি বেঁচে খাওয়ার পক্ষপাতি আমি ছিলাম না। কারণ, দায়ে দফায় বেচে বেচে মাত্র কয়েক বিঘায় ঠেকেছিল, যা-তে বছরের খোরাকি কোনোরকমে হয়। বাড়ি ছেড়ে এলেও বাপ-মার বিচ্ছেদ তো শুধু ঝোঁকের মাথায় সহ্য করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম। দুতিন মাসে আমারও গৃহমুখী মন। অবিশ্যি ক্ষতি একটা হয়ে গেল। সে-বছর ভর্তি হওয়ার সময় বয়ে গেল। বাপের সঙ্গে সন্ধি করলাম। শহরে এসে আমি দ্রুত সাবালক হয়ে উঠলাম। জটিল মানুষের এই সমাজ। তার কলকব্জা আরো জটিল। বাঁচার জন্যে সকলে দল বেঁধে থাকে। কিন্তু তারি মধ্যে স্বার্থের নানা সুতো জড়ানো। তখন শুরু হয় পরস্পরে দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-ফ্যাসাদ। এসব আমি ক্রমশ উপলব্ধি করছিলাম। রিফিউজি ক্যাম্প আমাকে ভয়ানক ধাক্কা দিয়েছিল। আরো রিফিউজি এসেছিল। কিন্তু তাদের সকলে ক্যাম্পে আসে নি। তারা শহরেই ছিল। অনেকে সুদূর মুল্লুক থেকে এলেও শহরেই তারা নিজেদের বাড়ি কিনে নিয়েছে। বাড়ি ভাড়া নিয়েও থাকতে শুরু করেছে বহু জন। রিফিউজি ক্যাম্পের অভিশাপ তাদের বহন করতে হয় নি। আরো একটি ঘটনায় আমি হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলাম, যখন বহু সমস্যাকীর্ণ প্রশ্ন আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে নভেম্বর মাসের শেষ কি ডিসেম্বরের প্রথম দিক ঠিক মনে নেই। বাড়ি আসছিলাম ঢাকা থেকে। হঠাৎ লোক বেড়ে গেছে পূর্ব পাকিস্তানের শহরে শহরে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসেছে। তা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। যাতায়াত নানা কারণে বেড়ে গেছে। কিন্তু ট্রেনের সংখ্যা আদৌ বাড়ে নি। দেশবিভাগের সময় যে-সব ইঞ্জিন ও বগি ছিল তাই দিয়ে কোনোরকমে কাজ চালানো। ফলে, যাতায়াত ছিল রীতিমতো কষ্টকর। ট্রেন-স্টিমারে একই দৃশ্য। এমন প্রচুর বোঝাই, যা প্যাসেঞ্জার ধরে তার দু-গুণ আড়াই গুণ লোক চেপে বসে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাদাগাদি ভিড়। একজন সামান্য নড়াচড়া করলে তার প্রতিক্রিয়া নানাভাবে চলে। সেদিন আমি ট্রেন ধরতে পারতাম না। ইঞ্জিন হুইসেল বাজিয়ে স্টার্ট নিয়েছে কয়েক সেকেন্ড আগে তারপর গতি ক্রমশ বাড়ার দিকে এমন সময় আমি স্টেশনে পৌঁছাই। হাতে একটা কাপড়ের ঝোলা, তার ভেতর খান দুই পাঠ্যপুস্তক লুঙ্গি জামা এবং বাড়ির জন্যে সামান্য চা চিনি— গ্রামে মাঝে মাঝে চিনি পাওয়াই যেত না— এই রকম টুকিটাকি। সুতরাং চলন্ত ট্রেনে উঠতে বেগ পেতে হয় নি তেমন। কামরার ভেতর ঢুকে কিন্তু আমি হকচকিয়ে গেছি। কোন ক্লাসে উঠলাম? তৃতীয় শ্রেণী নয়, তা ঠাওর করতে বোধসোধ দরকার হয় না। একদম সাহেব ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে বসে আছি। রীতিমতো অপ্রস্তুত। এখন আর কিছু করার উপায় নেই, পরের স্টেশনে নেমে যাব। আমি এসব ভাবছি সাত-সতেরো, হঠাৎ ডাক শোনা গেল, দরজাটা খুলে দিন। ট্রেন তখন রীতিমতো স্পিডে। বাইরে হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক। আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতে আরেক প্যাসেঞ্জার ঢুকে পড়ল! ভয়ানক হাঁপাচ্ছে এবং সে যে আমার মতোই শেষ মুহূর্তের প্যাসেঞ্জার তা চিন্তা না করলেও চলে। আমি এক অনধিকার প্রবেশকারী। দলে আরো একজন বাড়ল। না, আরো তিন চার জন আগেই কাচুমাচু ফার্স্ট ক্লাসের মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছে। শেষ প্যাসেঞ্জারের দিকে তাকাই। রীতিমতো চলন্ত ট্রেনে উঠল কী করে? এবার জরিপে এগোই। শীর্ণকায়, তরুণ সে আমার মতো। হাতে একটি পোটলামাত্র সম্বল বা বগলদাবা করেই যথাখুশি যাতায়াত কি দৌড়-ঝাঁপ করা যায়। আমরা কয়েকজন জানের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেন ধরেছি। তা নিয়ে মাথাব্যথা কারো থাকবে কেন? সম্পর্ক কিছু পাতা নেই। আমরা অনধিকার প্রবেশকারীরা রীতিমতো আইন ভেঙেছি। সুতরাং অপরাধী। এই চিন্তাই আমাদের সারা পথ মানে পরের স্টেশন পর্যন্ত বুঁদ রাখতে যথেষ্ট। রা করব কী? কিন্তু স্তব্ধতা খান্‌খান্‌ হয়ে গেল "এ-ই ছোক্‌রে—" শব্দে। ছোকরা শব্দ বুঝি কিন্তু ছোক্‌রে আবার কী চিজ। উচ্চারণের টান যেন কেমন। এবার আমরা সচেতন হই। শব্দের উৎসের দিকে তাকাই। গদি-নরম সিটে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন এক মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক নাদুসনুদুস চেহ্‌রা, ঠোঁটের উপর পরিপাটি সাজানো পাতলাছাঁটের গোঁফ, গায়ে ফুলশার্টের উপর সোয়েটার। একলহমা দেখলেই বলা যায়, এই আদমি খাদ্যভাণ্ডারের আশীর্বাদ-পুষ্ট। উচ্ছল মুখাবয়বে তার ঢেউ অহরহ আছাড় খায়। হেলান ছেড়েছেন তিনি 'ছোকরে' শব্দ উচ্চারণের সময়। সটান মেরুদণ্ড, সটান আসীন জনাব এবার অপরাধীদের দিকে চোখ ফেলে আবার সম্বোধন করলেন, "এই ছোকরে—"। কিন্তু কোন ছোকরাকে তার দরকার? সাত আট জন আসামি। তার পাঁচ জন ছোকরা, বাকি দুতিন জনের বয়স যৌবনসীমা উত্তীর্ণ। আমরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাই। কোনো সাড়া নেই এদিক থেকে। বোধহয়, কারো চোখে চোখ পড়ে থাকবে, ট্রেনের আলো খুব স্পষ্ট নয়, মজকুর জনাব এবার গদি পরিত্যাগ করে মেঝের উপর পা ফেলে এগিয়ে আসতে লাগলেন এবং সোজা দাঁড়ালেন শীর্ণদেহ পুঁটলিবাহী যে ছোকরা শেষে ট্রেনে উঠেছিল এবং যার ডাকে আমি সাড়া দিতে দেরি করি নি, ঠিক তারই মুখোমুখি। আমার— না, আমি ভাবলাম যাক, ঝড় অন্য খাতে প্রবাহিত। উদ্ধত-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তর্জনী ভদ্রলোক কী যেন বলতে গিয়ে কথা মুখে না আসায় আঙুল নামিয়ে হাতের মুঠি বন্ধ করেন আর খোলেন। এই ফাঁকে ট্রেনে আর কে আছে আমি চকিতে দেখে নিলাম। কামরায় তিন জন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। ওরা কৌতূহলী, কিন্তু নির্বাক। অসুবিধাভোগী কামরায় চার জন। অনাধিকার সুবিধাভোগী আমরা ছ-সাত জন। এতক্ষণে কথা বোধহয় ফিরে এসেছিল। ভদ্রলোক আমার পুঁটলিধারী সঙ্গীর দিকেই আবার তর্জনী তোলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, "এই তোম জানতা এ কোন নম্বর কা ডাব্বা হ্যায়?" শব্দ শুনে আমারই আক্কেলগুড়ুম, ও জবাব দেবে কী? কিছু দিন রিফিউজি ক্যাম্পে ভলানটিয়ার থাকার ফলে কিছু কিছু হিন্দি-উর্দু শব্দ আমার রপ্ত হয়েছিল। কিন্তু 'ডাব্বা' কোনোদিন শুনি নি। তা কী আব্বার কোনো প্রতিশব্দ? কিন্তু পূর্বে নম্বর আছে। বাপের আগে তো সংখ্যা একের বেশি বসানো না জায়েজ। আমার সঙ্গী তখন পুঁটলি বগলে চেপে দুই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে গেছে একদম নিশ্চল নির্বাক। বুঝতে দেরি হলো না, এই ভদ্রলোক পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছেন অন্য কোনো এলাকা থেকে যেখানে ভাষা বাংলা নয়। ফাস্ট ক্লাসের আইনত অধিকারী অন্য তিন জনাব এদিকে চোখ ফেলে বসেছিলেন, কেউ সমস্যা সমাধানে এগোলেন না। ধার্মিক লোকরা বলে, যিনি মুশকিল দেন, তিনিই আসান করেন। এখানে তা-ই ঘটল। ওই ডাব্বা আবিষ্কারক জনাব আবার বললেন, "ইয়ে কোন ক্লাস জান্‌তা?" এতক্ষণে আমি হালে পানি পেলাম। দৃষ্টিবিদ্ধ আমার সহযাত্রী অপরাধীও বুঝতে পেরেছিল, ভদ্রলোকের জিজ্ঞাস্য কী? কিন্তু সে এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে যে, তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। নির্বাক সে দাঁড়িয়ে ছিল বোগলে পুঁটলি গোঁজা। ভিন-এলাকার সেই জনাব আবার বললেন, "ইয়ে কোন ক্লাস জানতা?" আমি কনুই-যোগে পাশের সঙ্গীকে ইশারা করলাম, জবাব দাও। সে জবাব দিতে পারল না, এমনই ঘাবড়ে গিয়েছিল। তখন সে ভদ্রলোক কয়েক মিনিট স্থির থেকে হঠাৎ খপ করে তার পুঁটলি বগল থেকে খসিয়ে নিয়ে দ্রুত নিজের সিটের দিকে গেল এবং জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। অভ্যন্তরীণ আবেগ উত্তেজনাবশত পুঁটলির মালিক ভদ্রলোক পিছন পিছন গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু নিজের জিনিসে আর হাত দিতে পারে নি। ট্রেন চলছিল ফুল স্পিড। অন্ধকার রাত্রি। পুঁটলিটা নিশ্চয় বাইরে কোথাও ঠিকরে গিয়ে পড়েছিল। কিছুই দেখা গেল না। দেখা গেলে লাভই বা কী হতো? খোওয়া মাল তো আর ডাক দিলে ফিরে আসত না। গলায় একরকমের আর্তনাদ-পূর্ব শব্দ তুলে পুঁটলিবাহী সঙ্গী হাউমাউ কান্নার স্বরে কী যেন বলতে লাগল, যার খণ্ড খণ্ড অংশ দিয়ে একটা মানে পাওয়া যায় বৈইকী। ট্রেন চলছে ঘটর ঘটর শব্দ তুলে। সব কথা বুঝাও দায়। কিন্তু একপর্যায়ে সে স্পষ্ট কাঁদতে কাঁদতে প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠল, "আঁই ক্যামনে বাড়ি যাইতাম? আঁই— আঁই আঁআর বাজানের দাওয়াই... ওরে আল্লা, ও আল্লা রে।" এমনধারা আদিখ্যেতা কোনো পুরুষ মানুষের মুখে শুনলে আমার রীতিমতো গোস্বা চেপে যায়। পুরুষ মানুষ এমন ইনিয়েবিনিয়ে কথা বলবে নাকি? অনধিকার জমিনে দাঁড়িয়ে আছি, তাই দমে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য, ওর এই নাটকীয় স্বগতোক্তি মজকুর প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের কোনো বিরক্তি উৎপাদান করছিল না। সকলেই বোধহয়, হিসেব করে

নিয়েছিল, এখন কোনো কিছু করা বা বলা খামাখা। মেল ট্রেন পরবর্তী স্টেশনে পৌছতে একঘণ্টার বেশি তো লাগবে। আমি চুপ থাকতে পারলাম না। সঙ্গীকে ধমক দিয়ে বললাম, "মাইয়া মানুষের লাহান করতাছেন ক্যান? কী হৈছে আঁরে কুন। কী বাপজানের দাওয়াই ছিল পুঁটলির ভেতর?"

—হ।

—তা কুন না ক্যান?

আন্দাজে আগে যথাস্থানেই হাত দিয়েছিলাম। আরো জানা গেল, গাঁয়ে ওই ঔষধ পাওয়া যায় না। শীতের দিন উৎকট হাঁপানি রোগে বাপ শয্যাশায়ী। বাঁচার আশা কম। ঔষধ যোগাড়েই শহরে আসা। ব্যাপারের গোটা ছবি আমার কাছে আঁকা হতে আর বিলম্ব হয় না। বলা বহুল্য, ভেতরে ভেতরে আমিও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। আমার ধমক খেয়ে সঙ্গী চুপ করে গিয়েছিল। আরো চার পাঁচ জন ছিল তারা হদিস পাচ্ছিল না, কী করা যেতে পারে এই সময়। আর দেরি করার মতো ধৈর্য আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভিন এলাকার মানুষ বাংলা জানে না। হিন্দি বা উর্দু জানে। আমার সামান্য ইলেম দিয়ে ওকে কী বোঝাব? ভাষা একটা বিশেষ বাধা বৈইকী। কিন্তু বক্তব্য কিছু আছে। আর আছে, শরিফ আরো তিন জন বাংলাভাষী ভদ্রলোক। ওরা কিছু সাহায্য করবে বৈইকী, যদি ভাষায় যোগান দরকার হয়। ওরা সকলে ইংরেজি জানে, শিক্ষিত লোক, হয়তো সরকারের অফিসার, এই ভরসা ছিল। আমি দরজার কাছে থেকে সোজা ওই ভদ্রলোকের সিটের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর সোজা প্রশ্ন অবিশ্যি মোলায়েম গলায়, "আপ উস্‌কা সামান ফেঁক দিয়া কিঁউ?" ভ্রূকুটিসহ ভদ্রলোক আমার দিকে তাকান। তারপর চড়া সুরে জবাব দেয় না শুধু আরো প্রশ্ন তোলে, "হুয়া কিয়া?" অর্থাৎ হয়েছে কী? আমার মুখে এসে গিয়েছিল লড়কা ইয়া তো লাড়কি, পোলা অথবা মাইয়া— কিন্তু তা চেপে প্রশ্নের পাল্টা আমার প্রশ্ন : "উনকা সামান ফেঁক দিয়া কিঁউ?" তখন জবাব দিলেন, "ও ইয়ে ফাস্ট কেলাস মে উঠ্‌ঠা কিঁউ?" তখন আমার মেজাজ আরো তেতে গেছে, আমিও স্বর চড়িয়ে বললাম, "কিয়া কানুন আপকা হাত মে লিয়ে হ্যায় আপনে? আইন কী নিজের হাতে নিয়েছেন।" তারপর বাংলা হিন্দি উর্দু মিশিয়ে আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম, "ও টিকিট চেকার দেখেগা। আপ তো চেকার নেই আছে। আপ উসকা সামান ফেঁক দিয়া কিঁউ?" আরো তিন জন প্রথম শ্রেণীর বাঙালি যাত্রী এতক্ষণ মুখ খোলে নি। আমার উত্তেজিত অবস্থা দেখে একজন বিরক্ত বোঝা গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন না, পরামর্শ দিলেন, "যেতে দাও, ভাই। হঠাৎ হয়ে গেছে। যেত দাও।" আমি গলার স্বর না নামিয়ে বলে ফেললাম, "বেশ আপনার ইনসাফ? বেচারার মালপত্র ফেলে দিলে আর আপনি বলেন, যেতে দিন।" শেষের দিকে আমি 'যেতে দিন' ভদ্রলোকের স্বর নকল করার চেষ্টা পাই। আর দুই প্যাসেঞ্জার তখন চেতে না উঠলেও সঙ্গী ফাস্ট ক্লাসের যাত্রীর দিকে কিছু পক্ষপাত প্রকাশেই বললেন, যার মোদ্দা কথা, যেতে দাও। আমি কিন্তু যেতে দেওয়ার মেজাজে ছিলাম না। তার আরো কারণ ছিল। বিনা-টিকিটের আমার অপরাপর সঙ্গীরা চুপ করে থাকলেও আমার সাহসে যে তারা তপ্ত তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের মুখাবয়বে স্পষ্ট। অর্থাৎ, পেছনে তাদের মৌন সম্মতি ছিল, যদি হাতাহাতি লাগে, আমরা আছি পিঠ পর। ষোলো বছর বয়স। কিন্তু আমার গায়ে জোর কম নয়। তা ছাড়া ভদ্রলোকের সঙ্গে মরামারি ঢের সোজা। আমরা সাত জন ওরা চার। লেগে গেলে আমরা জিতব। পুঁটলি-হারা জন শুধু রোগা টিংটিংয়ে। কিন্তু সে যে কাজের সময় সাহায্য করতে পারবে, তা-তে কোনো সন্দেহ ছিল না। বাঙালি ভদ্রলোকদের দুজন আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ বহস করে নিল। একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, এখন আর এগোনো উচিত নয়। অবাঙালি ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। আমি আমার আদিম প্রশ্ন আবার নিক্ষেপ করলাম। তিনি জবাব দেবেন কী? সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকান। সেখানে উৎসাহপ্রদ কিছু লেখা তো ছিলই। তখন ভদ্রলোক আমার প্রশ্নে রীতিমতো ক্ষেপে চিৎকার করে উঠলেন, "থামুস। ফেঁক দিয়া ত কিয়া হোগা?" ছুড়ে ফেলে দিয়েছি, তো হয়েছে কী? তখন আমি আমার ইলেম অনুযায়ী নানা ধরনের জগাখিচুড়ি ভাষায় জবাবে বললাম, এই মানসিকতা নিয়ে কি তিনি পাকিস্তান গড়তে এসেছেন? হিন্দুদের শোষণে জেরবার নাকি মুসলমানেরা, তাই পাকিস্তান সৃষ্টি। কিন্তু তিনি কী করছেন? তার তো সমান্যতম মনুষ্যত্ব নেই। নুতন রাষ্ট্র। সরকারই বলে শিশুরাষ্ট্র। সব রকমের দায়িত্ব পালন তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সরকার বারবার আবেদন জানায় যে প্রত্যেক নাগরিক যেন অপরের সহায়তায় এগিয়ে আসে। পাঁচ মাস পুরো হয় নি নতুন রাষ্ট্রের বয়স। রেলের যাত্রী সব সুখ-সুবিধা সরকার দিতে অক্ষম। তখন একজন দেশপ্রেমিকের প্রথম দরকার, সহিষ্ণুতাবোধ এবং অপর নাগরিকদের সুখ-সুবিধার দিকে চোখ রাখা। যাত্রীর সংখ্যা বেশি। সেই অনুপাতে রেলের সামানা নেই। বগি কম, ইঞ্জিন কম। কয়লার অভাবে অনেক জায়গায় ইঞ্জিন চালু করা সম্ভব হয় নি। লেকিন আপ কিয়া করতে? আপ তো যো হিন্দু কা ডর সে পাকিস্তান বানায়া উসি কি তরেহ (ধারায়) ইহাঁ জবরদস্তি দেখাতে, আপনা হাত মে কানুন লে লিয়া। কিয়া আপ মুসলমান হেঁয়। আপনি কী মুসলমান? এমন প্রশ্নের পরও আমি থামি নি। আপ উসকো চিজ ফেঁক নেহি সাকতা। উসকা পাশ আভ টিকেট নেহি হ্যায়, সাচ বাৎ। লেকিন ও ফাস্ট ক্লাস মে চেঞ্জ কর সাকতা। ও টিকেট-চেকার দেখেগা। আগার ও গলতি (ভুল) কিয়া, ত আপ ভী ঠিক নেহি কিয়া। কৈশোরকাল থেকে বক্তৃতার একটা তাগিদ আমার ভেতরে ছিল। কিন্তু বক্তৃতা আমি করি নি, এমনকী স্কুলে একবার এক শিক্ষকের সহায়তায় ডিবেটিং ক্লাস চালু হয় সেখানে কোনোদিন মুখ খুলি নি, যদিও তিনি সকলকে বলার জন্যে উৎসাহ দিতেন। দেশপ্রেম, মুসলমান— এসব দোহাই বোধহয় কিছু ক্রিয়া করে থাকবে। চার যাত্রী মহোদয় তা শুনছিলেন মনোযোগ সহকারে। আমার 'ওয়াজ' শেষ হওয়ার পর তারা আর মুখ খোলেন না, অবাঙালি ভদ্রলোক তো মাথা নিচু, গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখার কোনো কৌতূহল যেন ছিল না। আমার বিনা-টিকিটের সঙ্গীরা কিন্তু আমার জঙ্গীপনায় উৎফুল্ল নয় বরং আরো উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। তা বুঝলাম, যখন একজন, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি তো, আমার গায়ে মৃদু চিমটি এবং ঠেলা দিলে, যার নির্গলিত অর্থ : থামলে কেন, আরো চালাও— প্রচণ্ড গর্জন এবং বর্ষণের

পর প্রশান্ত ধরিত্রী। কামরায় সকলে চুপ। আমাদের দলের চক্ষু কিন্তু ওদের উপর নিবদ্ধ। অবাঙালি ভদ্রলোক চোখ তুলতেই আমার চোখে মিলে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "যো হোনে কা হো গিয়া, আব কিয়া মাঙ্গতে?" যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন কী চাই? আমার জবাব "গুণাগারি দিজিয়ে।" অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দাও।

"গোনাহ্গারি! কেতনা রূপেয়া কি সামান থা?"

আমি পুঁটলি-হীনকে মুখ খুলতে বললাম। সে ওদিকে তাকাতে সাহস পায় না। আমাকে বলে, একশ টাকা। ভদ্রলোকের কানে কথাটা গিয়েছিল, বলা বাহুল্য। তিনি সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একদিকে হুক থেকে তার কোট ঝুলছিল। তিনি মানিব্যাগ বের করে একশ টাকার নোট তিন খানা মেঝের উপর আছড়ে ফেলে দিলেন। সমস্ত কামরায় আবার নিস্তবদ্ধতা ছেয়ে ধরে। এই অসোয়াস্তি থেকে যেন আর কেউ কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারবে না কেয়ামত তক। কিন্তু মজকুর জনাব সত্যি মেহেরবান, তিনিই মুক্তি দিলেন সবাইকে মুখ খুলে : লে লো। অর্থাৎ নিয়ে নাও। আমার মেজাজ তখন সপ্তমে, আমি গলা সেই পর্যায়ে তুলে উচ্চারণ করলাম, "কিয়া লেগা? কিয়া আপ ভিখ দেতা হ্যায়?" ভিক্ষা দিচ্ছেন নাকি? এই সময় ত্রয়ী বাঙালিদের এক শরিফ বেশ মধ্যস্ততার সুরে পুঁটলি-হীনকে লক্ষ্য করে বললেন, নিয়ে নাও, টাকাগুলো। সে হয়ত তাই করত। কিন্তু আমি তার হাত চেপে বললাম, "খবরদার ও টাকায় হাত দিবে না। এরা পেয়েছে কী?" আমাদের তরফ থেকে এতক্ষণ স্তব্ধ আর পাঁচ জনের দুজন প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, "ভদ্রলোক পাইছেন কী? হাচা কথা।" চারিদিকে আবার তপ্ত হয়ে উঠল। বাঙালি অন্যতম শরিফ ফোড়ন কাটলেন "জওয়ানদের ব্যাপারই আলাদা। যেতে দেয় না সহজে?" আমি প্রতিক্রিয়ায় চিৎকার দিয়ে উঠলাম, "চুরি কে চুরি, ফের সিনাজুরি। অন্যায়ের এই ইনসাফ নাকি। ওর টাকা আছে বলে কি উনি সকলের মাথা কিনে নিয়েছেন?" আমার চোটপাট বোধহয় ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল। অবাঙালি ভদ্রলোক নোট তিন খানা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সিটে গিয়ে বসলেন এবং একটু পরে মোলায়েম গলায় পুঁটলিহারাকে সম্বোধন করলেন, "এই ভাই, শোন।" সে ইতঃস্তত করছিল, যাবে কি না। আমার চোখ পড়তে আমি তা-কে সম্মতি ইশারা দিলাম। সে নিকটে যেতে তার হাত ধরে ভদ্রলোক বললেন, "যা হোনে কা হো গিয়া যানে দো। ইয়ে লো, ভাই। কুচ মন মে বুরা না মানো।" আমার চোখ অন্য বাঙালি মুখের উপর হেঁটে বেড়ায়। হঠাৎ অবাঙালি জনের মিইয়ে যাওয়া ভাব যেন তাদের মনপূত নয়। একজন এমন ঠোঁট বাঁকাচ্ছিল, ওকে গিয়ে এক থাপ্পড় দিতে পারলে আমার গায়ের ঝাল মিটত। সঙ্গী টাকা হাতে আমার পাশে এসে আবার দাঁড়ায়। কিন্তু কেন জানি হঠাৎ করে কঁকিয়ে উঠল, "কিন্তু আমি ওষুধ খড়ে পামু বা-জানের লাই।" কথা তো সত্যি। বাপজানের জন্যে ঔষধ কোথা থেকে পাবে। টাকা তো আর ঔষধ নয়। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। ভদ্রলোকদের দিকে কিছু ঠেস রেখে। "কী আর করা ভাই মুসলমানের দ্যাশ, মুসলমান রাষ্ট্র এই তো হালা শুরু। অহনই কারবার দ্যাহো। হালা আরো তো সময় আছে।" হালা শব্দ আমার কথার টানের রেশ নয়। তা জোরে উচ্চারণ করেছিলাম। পরে আরো বললাম, "তুমি শহরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাও ফিরতি ট্রেনে। তারপর দাওয়াই কিইন্যা বাড়ি যাইও। অহন তো কিছু করার নাই। বড় মানুষদের লগে পড়লেই নসিব কোন দিকে যায় কোনো হালা কইতে পারে না।" সব মিটমাট হয়ে গেল। কিন্তু ট্রেনের কামরায় আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল না। আমরা তো আসামী। নিজের অপরাধ চিন্তায় বুঁদ, হঠাৎ চেকার এসে যদি নামার সময় ধরে বা এই ভদ্রলোকেরা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু আইনত কামরায় অধিকারীগণেরও তেমন পরস্পর বাক্যালাপে মত্ত হতে দেখা গেল না। ট্রেনের এই ছোট ঘটনা। কিন্তু যত ভেবেছি, তত আমি শিখেছি। তাই স্পষ্ট খুঁটিনাটি আমার সব মনে আছে। তারপর কয়েক বছরে আশপাশের হদিস আমি বেশ উপলব্ধি করতে শিখেছিলাম। ন্যায় অন্যায়ের ব্যাপারে ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পারলে এবং তুমি যদি দলে ভারী থাকো বা দল ভারী করে নিতে পারো, তাহলে হেরে যাওয়ার প্রশ্ন সহজে আসবে না। সেদিন শরিফ লোকগুলো আমাদের সঙ্গে মাপপিঠ করার সাহস পায় নি। তারা গুমরে মরছিল তা তাদের মুখে স্পষ্ট। অন্তত আমি দেখতে পেয়েছিলাম। দেড় বছর পরে আবার অন্য এক স্টেশনে সেই পুঁটলি-খোয়ার তরুণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অনেক সচল এবং চটপটে সে আগের মতো ম্রিয়মাণ বিনয়ী নয়। ঔষধ কিনে সে গাঁয়ে ফিরেছিল আবার পরদিন ফিরতি ট্রেনে শহর থেকে। তার বাজান-কে আর সে জ্যান্ত দেখতে পায় নি। কে জানে, ঠিক সময়ে দাওয়াই পেলে প্রৌঢ়জনের কী দশা হতো! একটা ঘটনা তার পেছনে নানা ধরনের ঢেউয়ের রেশ রেখে যায়, আমি সেদিন থেকে লক্ষ্য করেছিলাম। আমাদের এলাকার এক ব্যবসাদার থাকতেন ঢাকার পুরাতন শহরে। তার বাড়িতে আমার থাকার বন্দোবস্ত বাপই করেছিলেন। আহার অবিশ্যি অন্যত্র নয়। বাপের সঙ্গে লেনদেনের কী বন্দোবস্ত হয়েছিল, আমার জানা নেই। কারণ, এ-ব্যাপারে দুইপক্ষ আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় ছিল। বাজান খুব বেশি স্নেহ করতেন আমাকে। সুতরাং আমার জন্যে তার কী খরচ হচ্ছে আদৌ জানতে দিতেন না। তার কারণ, জমি বিক্রির বেলা আমি বেঁকে বসেছিলাম। এখন সেই শিক্ষার ব্যাপারে তার আয়-ব্যয় কোন পর্যায়ে গেছে তা তিনি আমাকে জানতে দেওয়ার বান্দা নন। ওই আব্বা আমার কাছে তো জন্ম থেকেই পরিচিত। স্নেহের আতিশয্য কেন জানি ছেলেবেলা থেকে আমার কাছে ছিল অসোয়াস্তিকর। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার স্বাদ উপভোগ করতাম। শহরে আসার পর থেকে তা আরো টের পেলাম। চাক্ষুষ নয়, সকর্ণ প্রমাণও পেয়েছিলাম একদিন রাত্রে। দুই দম্পতি সংলাপ। মা বাবা-কে বলছেন, "জাফর মিয়ারে শহরে না পাঠাইয়া গাঁয়ে তো রাখতে পারতা খরচ কম অইত। হুনলাম বাজিতপুরের লগে নতুন কলেজ অইছে।" মা মানুষের মুখে শুনে থাকবেন। কলেজ হয়েছে ঠিকই তবে বাজিতপুরে নয়, তারই কাছাকাছি এক গ্রামে। সেখানে আমাদের আত্মীয়-বাড়ি ছিল, সেখান থেকেও লেখাপড়া করা যেত। বাপ জবাব দিলেন, "তুমি কিছু বোঝ না। শহরে গেলে জলদি চোখ খুইলব। পোলা চালাক-চতুর অইব। গাঁয়ে শেহে না। পাশ হয়ত দেয়।" তারপর ফিসফিস দুজনে কথা কাটাকাটি। আমার কানে কিছু ঠিকমতো সেঁধোয় না। তবে আসল কথা বুঝতে দেরি হয় নি। আমার পিতৃদেব তেমনই জন যিনি পুত্রস্নেহে কোরবাণি হতে পারেন। অবিশ্যি তার দূরদর্শিতার

মধ্যে গলদ কিছু ছিল না। দু-আড়াই বছরে আমি জগতের যে-পরিচয় পাচ্ছিলাম, তা পুরাতন সব রঙ মুছে দিচ্ছিল। অনেক জিনিস উপলব্ধি করতে পারতাম না ঠিকমতো, কিন্তু জিজ্ঞাসা থামত না তার জন্যে। চোখ খুলছিল বৈইকী। জননী বাংলা ভাষা, এত রক্ত, এত রক্ত ছিল এ শীর্ণ শরীরে। আঁখিপল্লবের গোড়ায় ক্লান্তির ঠ্যাঙাড়েরা বড় দ্রুত লাঠি ঘোরায়। দিন বছর যুগ এখন নিমেষের সূঁচ বিন্দুর ডগায় ঘন আবদ্ধতায় জমাট হয়। সব পাথর হয়ে যাওয়ার মুহূর্তের প্রাকক্ষণে, হে পথচারী, উৎকর্ণ একটু দাঁড়াও, দুইবার, উৎকর্ণ হও এই অস্পষ্টতার কুয়াশা ভেদে। কারো বাড়ি থাকা— যদিও গ্রামের লোক, সাক্ষাৎ রেস্তা না থাকলে স্বজনের মতো— আমার পছন্দ হচ্ছিল না। ক্লাসে আরো সহপাঠী ছিল, যারা পারিবারিক প্রাচুর্য-স্নাত, মটরে-রিকশায় ক্লাস করতে আসত, তাদের অনুকরণ আমাকে পেয়ে বসে নি। নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে মানুষের নিভৃতি প্রয়োজন। তা ওই বাড়িতে ছিল না। বৈঠকখানা ঘর। একদিকে আমার চৌকি আর ছোট কাঠের টেবিল বইপত্র রাখার। দড়ির আলনা দেওয়ালে কাপড় রাখার জন্যে। যখন-তখন লোক আসত ঘনঘন। লেখাপড়া অসুবিধা। তা-ও নয়। আমার অস্থিরতার ব্যাখ্যা আমার পক্ষে দেওয়া মুশকিল। বাইরে কত খরচ হবে, বাপজান তা বহন করতে পারবেন কি না, সে হিসাবও ধর্তব্যের মধ্যে আনার পক্ষপাতি ছিলাম না। তবে তাঁকে যেন কোনো অসুবিধায় না ফেলি, সেদিকেও আমি দৃঢ়-সংকল্প। পুরাতন শহরেই তখন একটা হস্টেলে ছিল আমাদের কলেজের জন্য কয়েকটা সিট বরাদ্দ। এক অধ্যাপককে ধরে আমি একটা সিট পেয়ে গেলাম। বাসা ছাড়ার দিন নাটক ছিল সামান্য। ব্যবসাদার মানুষ আদিখ্যেতা করলে, 'বাজান কী মনে করবে কে জানে।' আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, যে ব্যক্তি ছেলের লেখাপড়ার জন্য জমিন বেচতে পারে, সে লেখাপড়ার সুবিধার জন্যে এমন ব্যাপার কিছু মনে করবেন না। অবশ্যি আমি জানতাম, কথাটা ভুয়া। কারণ হস্টেলে এক কামরায় তিনজনের সিট। সেখানে গোলমাল কিছু কম হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া অন্য দুজনের মেজাজ খাসলৎ তো এখনো তেমন কিছু জানি নে। সুতরাং লেখাপড়ার কী হবে তা আল্লা জানে। কিন্তু ভয়ানক আত্মপ্রত্যয় ভেতরে অনুভব করছিলাম। অজানা স্বাধীনতার স্বাদ তখন আমাকে ঘিরে ধরেছিল। ব্যবসাদার ভদ্রলোককে চাচা ডাকতাম। তিনি উপদেশ দিলেন অনেক। কিন্তু আমি তখন রণ-তুরঙ্গ। যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। হস্টেলে আমার নতুন জীবন শুরু হলো। সঙ্গী তিন জনের একজন শান্ত এবং পড়ুয়া ছেলে। আড্ডায় গিয়ে সে বসত। কিন্তু তেমন যোগ দিত না এবং বেশিক্ষণ থাকত না সুতরাং তিন জনের দুই জন হলেই দল-ভারী। লেখাপড়ার ইচ্ছে থাকলে কে ঠেকাবে? অবিশ্যি আড্ডার বাতিক আমার কম নয়। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগের ক্ষতিপূরণ নিষ্ঠার সঙ্গে করা উচিত। করতামও তা-ই। রুমমেটদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া করা ছিল। তখন আমি একদম বলদের মতো খাটতাম। ওরা দুজন আমাকে আদৌ ডিস্টার্ব করত না। কিন্তু অন্য সময় আমার মন ছিল বিবাগী। শহরে এসে অনেক হোঁচট খেতে লাগলাম। সকলের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচ মিশতে পারতাম না, যদিও আড্ডার প্রতি আমার ভেতরে ভেতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোভ ছিল। গ্রামে ক'বছর পূর্বে ভোট পর্ব চলে। আইনসভা নির্বাচন। একচেটে মুসলিম লীগের সমর্থক সকলে। আমরা ভলান্টিয়ার। "মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিয়ে আবহাওয়া সরগরম রাখতাম। শহরে এসে দেখলাম একদল ছাত্র আছে যারা মুসলিম লীগের বিরোধী। আমি ভেতরে ভেতরে তেতে উঠতাম। ওই আহাম্মকরা বলে কী? মুসলমানের ছেলে মুসলিম লীগ ছাড়া আবার আর কোন দল থাকবে? বা, অন্যদল থাকা উচিত নাকি? একদিন দেখলাম, দুই দলে কলেজের কম্পাউন্ডে বেশ মারামারি হয়ে গেল। মারামারি করলে আমি পড়ে মার খাব না। নিজের তাগদ সম্পর্কে আমার বেশ প্রত্যয় ছিল। কিন্তু আমি সেদিন মারামারিতে যোগ দিই নি, যদিও আমার সহানুভূতি মুসলিম লীগের ছাত্রদের দিকে। ব্যাপারটা ঘটে আমার কলেজে ঢোকার দুতিন মাস পরে। তা এক দিনের ব্যাপার চুকেবুকে গেল। দেওয়ালে নানা ধরনের পোস্টার দেখতাম। অনেক সময় বিকেলে এক পোস্টার দেখে গেলাম, এর পরদিন সকালে চোখে পড়ল তা ছিঁড়ে ফেলে সেই জায়গায় আরেক পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছে। মারামারি না হলেও চাপা গুমোট টানাপোড়েন যে চলছে তা সহজে বুঝতে পারতাম। কিন্তু কেন এমন হয়? ছাত্রদের তো আদব কায়দা নীতিজ্ঞানের কথা মুরুব্বিরা অহরহ বলেন। সেখানে হঠাৎ এক ছাত্র মারমুখো হয়ে উঠব এ কেমন কথা? বিষয়টা আমাকে ভাবিয়ে তুলত। কিছুদিনের মধ্যে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বেচারা ছাত্ররা অর্থাৎ আমরা তো জ্ঞানশিক্ষার্থী। সব ব্যাপারে আমাদের বয়সে হদিস করার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের তো স্বতন্ত্র ইতিহাস। অথচ আক্কেল ঘুলিয়ে দেওয়ার মতো আলোড়ন এল সেই দিক থেকে। আমাদের এক অধ্যাপক ছিলেন ইতিহাস পড়াতেন। নাম নগীবউদ্দীন। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মতো বয়স। বেঁটে খাটো বদ কিন্তু বেশ পেশল-মাংশল এবং থরথর স্বাস্থ্য কম্পবান। কলেজের কাছেই থাকেন। খুব মিশুক মানুষ। অনেক ছাত্রই তার বাড়ি যেত এবং ফিরে এসে আতিথেয়তার গপ্প করত, কবে কী উপায়ে তিনি খাইয়েছেন। আমিও তার ন্যাওটা হয়ে পড়েছিলাম। প্রায় যেতাম। আমার আকর্ষণের চুম্বন অবিশ্যি তিনি। কিন্তু তার চেয়েও অধিক আকর্ষণ-শক্তিবিশিষ্ট চুম্বক আমার জন্যে ওই গুরুগৃহে ছিল : তদীয় সদ্য কৈশোর-অতিক্রান্ত কন্যা সিতারা। পৃথিবী মাঝে মাঝে এত মধুময় হয়ে ওঠে ওই দুঃসহ বয়স ছাড়া বুঝি তা আর পাওয়া যায় না। সিতারা খুব সুন্দরী ছিল না। উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, মাঝারি শরীরিক গঠন, কিন্তু চোখ দুটি অনুপাতে ডাগর এবং প্রচণ্ড ছন্দ ছিল অবয়ব হিল্লোলে। আমি মুখ-চোরা— শিক্ষকদের নিকট আরো— অনুভবে কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু সব চাপা থাকত। বাড়িতে পর্দা-প্রথা ছিল না। তবে বে-লাগাম মেলামেশার সুযোগও আবার অনুপস্থিত। স্যার যখন আলাপ আলোচনা করতেন ছাত্রদের সঙ্গে তখন সিতারা একপাশে বসে যেত। কখনো কোনো মন্তব্য করত না। কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে যে তার পরিচয়ের কৌতূহল তা তার হালেচালে বুঝা যেত। কোনো ছাত্র শিক্ষকের সঙ্গে তর্ক জুড়েছে তখন সিতারার মুখের দিকে তাকাও, স্পষ্ট দেখা যাবে, সে আদৌ নীরব শ্রোতা নয়। ছাত্রদের আনাগোনা নগীবউদ্দীন স্যারের সঙ্গে প্রায় লেগে থাকত। কিন্তু একদিন তার আসরে সন্ধ্যার সময়ে পৌঁছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম, তিনি কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে বেশ বহসরত এবং তার স্বর প্রায় উচ্চগ্রামে অন্তত বৈঠকখানা-শোভান নয়। আমি যেন কোনোরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি না করি এমন সন্তর্পণে একদিকে বসে পড়েছিলাম। উপস্থিত ছাত্র মাত্র চার জন। কিন্তু এতক্ষণ আমার চোখে পড়ে নি। খবরের কাগজে তাঁর মুখ ঢাকা ছিল এবং তিনি সংবাদপত্র পড়ছিলেন হয়ত এদিকে একদম নির্বিকার, আমাদের আর এক প্রফেসার, সালামত আলি। তিনিও ইতিহাস পড়ান। নগীবউদ্দীন সাহেব এক পর্যায়ে প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠলেন, "এইভাবে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। তারই রাস্তা পরিষ্কার করছ তোমরা।" গোড়ার হদিস আমার জানা নেই। সুতরাং কিছু বুঝে উঠতে পারি নি। ছাত্ররা আমাদের কলেজের। তবে উপরের দিকের বি.এ. ক্লাসে আছে বা পরীক্ষা দেবে। তাদের মধ্যে একজন আমার চেনা। সে কলেজে বেশ মাদবর গোছের ছাত্র। তাকে প্রায় দেখা যায়, কলেজের বিভিন্ন ফাংশানে, ভালো বক্তৃতা করে। তার বিনয়-নম্র স্বর, কিন্তু বেশ দৃঢ়তা আছে কথার মধ্যে। আমার ধরতে দেরি হয় নি, যখন সে বললে, "কিন্তু স্যার একটা জাতির ভাষা ধ্বংস করে কী উন্নতি হবে দেশের।"

"ধ্বংস তো কেউ করছে না।"

"রাষ্ট্রভাষা রাখছেন একটা। বাকিগুলোর গুরুত্ব তো এমনি চলে যাবে। তখন আর সে-ভাষা, টিকবে? শুনেছি পৃথিবীতে বহু ভাষা লোপাট হয়ে গেছে।"

"কে বলেছে?"

"আমাদের বাংলার অধ্যাপক বলেছেন।"

"এখানে ভাষা বেঁচে থাকার কথা নয়। এখানে বেঁচে থাকার কথা রাষ্ট্র। বাঁচলে তবে তুমি বাঁচবে, তোমার ভাষা বাঁচাবে। ব্যাপারটা কী খুব ভেবে চিন্তে দ্যাখো। অর্থাৎ, পাকিস্তান থাকলে সব আছে, নচেৎ কিছু থাকবে না।"

"কিন্তু বুঝলাম না স্যার।"

"বুঝতে চেষ্টা করো। একবছর হয় নি পাকিস্তান রাষ্ট্রের বয়স। এখনই আমাদের সব দুশমনরা আবার নতুন করে জোট বেঁধেছে।"

"স্যার, আমরা পাকিস্তান আনার জন্যে জান লড়িয়ে দিয়েছি, আর আমরা পাকিস্তানের শত্রু?"

"হ্যাঁ শত্রু। এখন এই রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজ হচ্ছে আসল কাজ। এখন এই ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করা উচিত নয়।"

"গণ্ডগোল কোথায় স্যার? বাংলা আর উর্দু— দুটোই রাষ্ট্রভাষা হলেই তো সব গোলমাল চুকে যায়। উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে— আমরা ছাত্র-মানুষ, কিন্তু গণতান্ত্রিক ধারায় আমার তো মনে হয়, তা কী করে হতে পারে? আর সংখ্যায় তো আমরা বেশি।"

আমরা কয়েকজনে বহস শুনছিলাম। মাদবর ছাত্রনেতা কিন্তু সহজে নতিস্বীকার করছিল না। যুক্তি-খণ্ডনে সে-ও যা ছাড়ছিল, তা আদৌ কমজোর নয়। বেশ উপভোগ্য হচ্ছিল ব্যাপারটা। আমার কাছে আরো উপভোগ্য এবং আনন্দময় হয়েছিল। কারণ সিতারার উপস্থিতি পিতার পাশে। নগীব স্যারের বাড়িতে মেয়েরা পাজামা এবং ওড়না ধরেছিল তারই নির্দেশে। সিতারার সঙ্গে একবার মাত্র আমার চোখাচোখি হয়ে গেলে সে

নিমিষে চোখ নামিয়ে নেয়, গালে সলজ্জ টোল। তা আমার দুচোখ এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু দুই দিকে তর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ডুয়েলে দুই দ্বৈরথই সমান। কেউ কারো বাঁয়ে বয় না। কেউ উর্দু হওয়া উচিত, তার সপক্ষে বারবার নগীব স্যার প্রায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলছিলেন। মুসলমানের জীবনে 'কওমিয়াত' আইডেনটিটি বড় কথা। তা চলে গেলে জীবনে আর কিছু থাকতে পারে না। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে সেই জন্যে। সেই জন্যে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা এত ত্যাগস্বীকার করেছে। কত দাংগা হয়েছে হিন্দু মুসলমানে। মরেছে কত শত শত। আজ শত শত মানুষ নিজের বাপ-মার পূর্ব-পুরুষের ভিটা ছেড়েছে শুধু নিজের 'কওমিয়াত' নিয়ে নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্যে। সেখানে ভাষার প্রশ্ন বড় কথা নয়। ছাত্র-নেতা তখন বেশ উত্তেজিত স্বরে হেঁকে উঠেছিল, "স্যার আপনার কথা অস্বীকার করছি না। আমি নিজে দু-এক জায়গায় দাংগার পর রিলিফের জিনিসপত্র নিয়ে গেছি। কিন্তু রাষ্ট্র গড়া মানে তো মানুষ গড়া, না আর কিছু। এখন দেখছি, আমরা মানুষরূপে বেড়ে ওঠার পথে বিশেষ বাধা হবে পাকিস্তান।"

"কেন?"

"রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। সুতরাং উর্দু যার মাতৃভাষা বা যাদের বাড়িতে উর্দু ভাষার চল আছে, তাদের সঙ্গে আমি পেরে উঠব কী করে? সে তো সব জায়গায় আমার চেয়ে বেশি ইজ্জত পাবে। একটা দরখাস্ত অনেক সময় ভাষার জন্যে সফল আবেদনমুখী হয়ে থাকে। কিন্তু আমি বাংলা ভাষাভাষী, আমার তো জায়গাই সেখানে!"

"কেন হবে না?"

কম্পিটিশনে আমি পেরে উঠব না। স্যারদের মুখেই শুনেছি, ইংরেজরা এদেশে এসে একটু গুছিয়ে ওঠার পরই তাদের প্রথম কাজ হলো রাষ্ট্রভাষা ফারসি তুলে দিয়ে ইংরেজিকে পাকাপোক্ত করা। তার ফল তো দেখছেন। আমরা অর্থাৎ মুসলমানরা ইংরেজি শিখি নি হিন্দুরা শিখেছে, তাই চাকরিবাকরি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর।"

"অতীতের কথা ছাড়ো। এখন বর্তমানকে ধরো। তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এই রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্তান-কে টিকিয়ে রাখা। পাকিস্তান হলো কিসের ভিত্তিতে?"

"আমরা মুসলমানরা আলাদা জাতি এই ভিত্তিতে।"

"বেশ। কাছে এসো। তা হলে এই দ্বি-জাতিতত্ত্ব অর্থাৎ আমরা এক জাতি এবং হিন্দুরা অন্য জাতি— এটাই হচ্ছে আসল বনিয়াদ। আর মুসলমান এক জাতি ধর্ম ইসলামের জন্যে। সুতরাং যেখানে ইসলামের কোনো অবমাননা হবে, সে-পথ তোমার জন্যে পরিত্যজ্য। পাকিস্তান রাষ্ট্র ইসলামের প্রহরী— মোহাফেজ। উর্দু ভাষার মধ্যে ইসলামের ভাষা আছে। সুতরাং আমার পক্ষপাত হবে সেদিকে। একবছর হয় নি পাকিস্তানের বয়স। এখনই ভাষার প্রশ্ন কেন?"

"দ্বি-জাতিতত্ত্বের পরীক্ষা হচ্ছে।" কথাটা নেপথ্য ধ্বনিত হলো। কারণ, সালামত আলি স্যার এতক্ষণ খবরের কাগজ পড়ছিলেন ওই কাগজেই নিজের মুখ ঢেকে। তেমন পজিশন থেকেই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। সকলের চোখ তখন শব্দের উৎস পানে ধায়। কিন্তু কারো মুখ দেখা যায় না। গলার আওয়াজ তো চেনা। কাজেই সকলে

উচ্চারণকারী-কে চেনেন।

"সালামত— ", ডাক নয়, প্রায় হাঁক দিলেন নগীবউদ্দীন সাহেব। অন্য দিক থেকে তখনই সাড়া এল, "বলুন, হুজুর।" ইতোমধ্যে সালামত স্যার মুখের উপর থেকে কাগজ নামিয়ে নিয়েছেন। আমরা তার দিকে তাকাই। তিনি মিটিমিটি হাসছেন, সকলের মুখ পানে তাঁর দৃষ্টি। কিন্তু তাঁর নির্বিকার হতে এতটুকু বিলম্ব হয় না। আবার খবরের কাগজে ডুব দেবেন তিনি। তখনই ডাক নয়, হাঁক প্রতিধ্বনিত হলো, "সালামত!" এবার তিনি বাধা পেয়ে নাকমুখ কুঁচকে সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার? মনে হচ্ছে তুমি ভেতরে ভেতরে 'হট' (গরম) হয়ে উঠেছ?" নগীব স্যার আরো তারস্বরে চেতে উঠলেন, "সালামত, গত কবছর ধরে তুমি জ্বালিয়ে খেয়েছ। এখনো তোমার স্বভাব গেল না।" চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন সালামত সাহেব, এবার তিনি সোজা হয়ে প্রশ্ন ছোড়েন, "স্বভাবের কী দেখলে? আমি তো গোড়া থেকে বলেছি, টু-নেশান থিয়োরি ইজ এ থিম, দ্বি-জাতিতত্ত্ব একটি কল্পকাহিনী। এখন তার পরীক্ষা হচ্ছে।" নগীব স্যার জবাব দিলেন, "পাকিস্তান তো হলো শেষপর্যন্ত। যদি মিথ হতো পাকিস্তান হতে পারত?" নগীব স্যার চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষের দিকে তাকান। "শোনো নগীব, পাকিস্তান হয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু তাকে চলতে তো হবে। তখনই আসল পরীক্ষা। ভাষা নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। আল্লা জানে, কোথা শেষ হবে? কারণ— "। আর নগীব স্যার ওকে কথা শেষ করতে দেন না, যোগ করেন, "এ-সব সাময়িক ব্যাপার সাময়িক সমস্যা। তোমার কাছে দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভুল হতে পারে। এই উপ-মহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের কাছে ভুল ঠেকে নি। ভবিষ্যতেও ঠেকবে না।" সালামত স্যারের কণ্ঠ এবার নির্বিকার নয়। পাল্টা ছুড়লেন অধ্যাপক নগীব, "পাকিস্তানের দুশমনেরা যা বলে তুমি তা-ই বলছ। তোমার মতো রাষ্ট্রদ্রোহীদের পাৎলুন খুলে চাবকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত।" বক্তার চোখ-মুখ অসম্ভব লাল হয়ে উঠেছিল। "শোনো— নগীব", এবার মুখ খোলেন অধ্যাপক সালামত "তোমার মতো মূর্খের সঙ্গে তর্ক বৃথা। ধর্ম যদি জাতীয়তাবাদের এমমাত্র ভিত্তি হতো তা হলে য়ূরোপে একটা রাষ্ট্র পেতাম। আর ইসলাম ধর্ম যদি মুসলমান সমাজের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র ছুতো হয়, তাহলে পাকিস্তান আন্দোলন শুধু ভারতবর্ষের ভূখণ্ড নিয়ে কেন?" আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক মায় গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে দাও। আফ্রিকাও বাদ যায় কেন?" দুই সহকর্মী চার চক্ষুর মিলন ঘটে। দুই দিকের উত্তাপ এবার বোধহয় সমান। "তুমি আমাকে মূর্খ বানালে এইসব ছাত্রদের সামনে।" "তোমাকে মূর্খ বানাই নি। আমি বলছি তুমি মূর্খের মতো তর্ক করছ। না আমাকে তুমি মূর্খ করেছ।" "আদৌ না।" "শুনে রাখো, আমি মূর্খ হতে পারি, কিন্তু আমার পূর্বপুরুষেরা কেউ মূর্খ ছিল না। ইউ হ্যাভ ইনসালটেড মি পারসোনালি, তুমি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করছ।" সালামত স্যার যেহেতু তার বাপ ছিলেন নিরক্ষর এবং তাচ্ছিল্য সেইসূত্রে তখন কাগজ ছেড়ে উঠে পড়েছেন মুখ সরব, "তোমরা কল্পনায় খাবি খাও। তোমাদের সঙ্গে কথা বলা অন্যায়।" তা এত দিনে বুঝতে পেরেছ, গোপাল ঠাকুর", ব্যঙ্গ শাণিত কণ্ঠে এই কথাগুলো উচ্চারণের পর অধ্যাপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগীব আরো জুড়লেন চোখ-মুখ বিকৃতিসহ, "ডোন্ট কাম টু মাই হাউজ এগেন— আমার বাড়ি এসো না— গেট আউট, গেট আউট— ।" এবার নগীব স্যারের হাতের ভঙ্গি একদম বাক্য বরাবর। সালামত সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং কারো দিকে আর না তাকিয়ে সোজা ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত আবহাওয়া আমার কাছে এমন তিক্ত হয়ে উঠল যে, সিতারার উপস্থিতি তা এতটুকু ফিকে করতে পারল না। দুই মুরুব্বি তর্ক জুড়েছেন এবং দুই জনের নিজের কাছি এমন শক্ত করে ধরে আছেন যে হিসেবে পাওয়া দায়, কে মিথ্যে কে সত্য, কে সত্য ঝুট। তা ছাড়া মতভেদ এমন স্তরে যাবে কেন? দুই জনে সহকর্মী এবং অধ্যাপক এমন আবরণ এবং ছাত্রদের সম্মুখে নিশ্চিত শোভন নয়। সেদিক থেকে নগীব স্যার ঠিকই বলেছেন। গুম হয়ে আমরা সবাই বসে। এই নীরবতা জগদ্দলের মতোই। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। যাক, নগীবউদ্দীন সাহেবই শেষে মুশকিল আসান করলেন। মুখ খুললেন তিনি প্রথমে, "দ্যাখো তো কাণ্ড। এইসব লোক ছাত্রদের মানুষ করবে নিজেই আহম্মক।" আবহাওয়া কিন্তু তরল হলো না। কারণ আমরা কেউ সায় দিতে এগোবো তার যো কোথায়? এক শিক্ষক আর শিক্ষকের মূল্য যাচাই করছেন। নগীব স্যার, হয়ত কিছু আঁচ করে থাকবেন। তাই লাইন বদলালেন। এবার তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "আলি জাফর, তুমি কিন্তু আমাকে খবর দিও ভাষা সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষ কী ভাবে। ওদের সঙ্গে মিশে কথা বলে দেখো। পাকিস্তানের সবেমাত্র পত্তন, এখনই সব বাগড়া ভালো নয়।" মাদবর শ্রেণীর ছাত্রের নাম আলাওল। সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল দুই মুরুব্বির মাঝখানে পড়ে। তার যে ফাটা বাঁশের মধ্যে পড়ার অবস্থা, তা আমার বুঝতে দেরি হয় নি। কারণ সে তো রীতিমতো বহস লড়ছিল এবং অনেক আগে থেকে, যার ফলে সালামত স্যারের সামান্য ইন্ধনে হঠাৎ এমন দাউদাউ হুতাশন-পর্ব। আলাওল এবার গলা যথাসম্ভব নামিয়ে জিজ্ঞাসা নয় প্রস্তাবের ভঙ্গিতে বলল, "স্যার আমার মনে হয়, ঝগড়া-ঝাঁটি গোড়াতেই হয়ে যাওয়া ভালো। আখেরে তাহলে আর কোনো বিপদ থাকবে না।" কথাটা নগীব স্যারের মনঃপূত হয় নি বোঝা গেল, যখন তিনি জবাব দিলেন : "শোনো, এটা রাজনীতির ব্যাপার, রাষ্ট্রের ব্যাপার। এখানে পরিপার্শ্বিক অবস্থা হচ্ছে আসল। পাকিস্তান কচি বাচ্চা রাষ্ট্র। তার শত্রু চতুর্দিকে। বিশাল ইন্ডিয়া! মাদার ইন্ডিয়া ভারত মাতা-কে দু-ভাগ করেছে, তারা সহজে মেনে নেবে না কি? তাই এখন ভাষার মতো ছোটখাটো কোনো ব্যাপার নিয়ে বিতর্কে যাওয়া উচিত নয়।" আলাওল কিন্তু শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের গণ্ডীর ভেতরে থেকেই এবার রেখা ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টা পেল। সে বেশ নরম গলায় বললে, "স্যার, ভাষার প্রশ্ন আপনি ছোট করে দেখছেন, কিন্তু আমার ছোট আক্কেলে মনে হয়, ব্যাপারটা অত খাটো নয়", "ঈষৎ বিরক্ত হলেন অধ্যাপক নগীবউদ্দীন। তার জবাব বিলম্ব হয় না, "আলাওল", সম্বোধন বেশ মধুসিক্ত। মনে হয় না, এতক্ষণ এখানে তাপমাত্রা অতি উচ্চ ডিগ্রিতে উঠেছিল। কিন্তু আমার কাছে কিছুই আর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। আড়চোখে এবার সিতারার দিকে চেয়েছিলাম। ওই শ্যাম মুখায়ব পানে চোখ ফেলেই নামিয়ে নিতে হতো সামাজিক শাসনের ভ্রুকুটির

AMARBOI.COM

জন্যে। সেদিন অমন চোরা দৃষ্টি আমার মনে কোনো ভাবান্তরের ছায়া ফেলতে পারল না। বিস্বাদ লাগছিল চতুর্দিক। শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এমন মতভেদ কেন? যা সত্য তা তো সকলের জন্যেই সত্য। কল্যাণকর, মানুষের জন্যে মঙ্গলকর, তেমন ক্ষেত্রে মতভেদ হবে কেন? তা আবার দুই গণ্ডমূর্খের মধ্যে নয়, দুই শিক্ষিত বললে কিছু বলা হয় না, এমন শিক্ষিতদের মধ্যে যাদের ভার দেওয়া হয়েছে দেশের শত শত তরুণদের শিক্ষিত করে তুলতে তাদের মধ্যেও বাকবিতণ্ডা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে, তখন সাধারণ মানুষরা যাবে কোথায়? কেন এমন হয়? প্রশ্নটা বারবার আমার সামনে ঘুরতে লাগল। আলাওল এবং নগীব স্যারের মধ্যে আলোচনা ঢিমে তালেই চলছিল, যদিও কেউ কারো সীমানার খুঁটো ছাড়তে রাজি ছিল না। কিন্তু আমার আকর্ষণ সব কিছু থেকে তখন চলে গিয়েছিল। একফাঁকে সিতারা উঠে চলে যায়। অন্যদিন তার শূন্য জায়গা অতল পরিখায় পরিণত হতো এবং আমি ক্রমশ তার গর্তে তলিয়ে যেতাম। সেদিন আমি আপন ঠাঁয়ে সম্রাট। নগীব স্যারের উৎসাহ কমে নি, কিন্তু আমার নয় শুধু অন্যান্য ছাত্রদের নিকট আসরের স্বাদ চলে গিয়েছিল। আমরা ছুতো খুঁজছিলাম বেরিয়ে আসার জন্যে। একসঙ্গেই সবাই উঠলাম। আলাওল আগে মুখচেনা ছিল। সেদিন আরো নিকটে এসে পৌঁছল। তার মুখে আরো অনেক খবর পাওয়া গেল। নগীব এবং সালামত সাহেব দুজনে এক এলাকার লোক। সেইসূত্রে পরিচয় ছাত্রজীবন থেকে। পাকিস্তান আন্দোলনের শুরু থেকে দুজনের যাত্রাপথ আলাদা। সালামত সাহেব রাজনীতি সম্পর্কে তেমন উৎসাহী ছিল না। কিন্তু সামাজিক তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানো তার নিকট বাতিকে পরিণত হয়। অন্য দিকে অধ্যাপক নগীবউদ্দীন ছিলেন গোড়া থেকে মুসলিম লীগের তাত্ত্বিক বা থিয়োরিটিসিয়ান ও মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী। অবিশ্যি ছাত্রপর্যায়ে। তবে তার দহরম মহরম পুরো ছিল লীগের নেতা উপ-নেতাদের সঙ্গে। সালামত সাহেব সেদিক থেকে নিঃসঙ্গ জন, যিনি চিন্তা করেন। তার বেশি কিছু না। দুই অধ্যাপকের বিষয়ও ইতিহাস। কিন্তু একযাত্রায় পৃথক ফল। দুজনে বচসা হত মাঝে মাঝে। কিন্তু আজকের মতো বাড়াবাড়ি নাকি কখনো হয় নি। আলাওলের কাছে আরো শোনা গেল লীগের উচ্চমহলে নাকি ভাষা সমস্যা নিয়ে বেশ মতভেদ দেখা দিয়েছে। রাজনীতিবিদদের মতভেদ আমাকে তেমন বিচলিত করত না। দুই শিক্ষকের মধ্যে নাটকীয় কথা-কাটাকাটি এবং ব্যক্তিপর্যায়ে অশোভন আচরণে আমি রীতিমতো অসোয়াস্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। দুই জনে পণ্ডিত। সুতরাং দুই জনের কাছে সত্য-কে চেনার হাতিয়ার আছে। তবু এমন কেন? সত্য দুজনের কাছে দুই ভাবে প্রতিভাত। সত্য সকলের কাছে সমান। তা মানুষ হিসেবে আলাদা হতে পারে না। পৃথিবী ঘোরে। এই সত্য একেক মানুষের কাছে একেক ধরনের মনে হবে তা হতে পারে না। সত্যের আশ্চর্য রূপ আছে যার কাঠামো চিরন্তন। এমন সব চিন্তা তখন আমার মাথার ভিতর ভর করছিল। যদি একেক মানুষের কাছে ভাষা সমস্যা স্বতন্ত্রভাবে ধরা দেয়, তাহলে আসল সত্য কোথায়? কী তার হদিস? আলাওলের সঙ্গে আলাপে জানা গেল, মুসলীম লীগের ছাত্রফ্রন্টে স্কুলজীবন থেকে কাজ করলেও এখন সে ভাষা সম্পর্কে নেতাদের কথা মেনে নিতে পারে না বিনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিধায়। ভাষার সমস্যা আলাওল খুব সামান্য ব্যাপার নয়, নগীব স্যার যা ভাবেন। এই কথাগুলো অজানিতে সায় পাচ্ছিল আমার মনে। কিন্তু তখনই আবার দ্বন্দ্বের উদয়। সালামত আলি সাহেব সত্য হলে নগীব স্যার সত্য হতে পারেন না। এই বাঁধার একটা হেস্তনেস্ত হওয়া উচিত। হস্টেলে নানারকমের ছাত্র থাকে। রাজনীতি কারো কারো নিকট চব্বিশ ঘণ্টার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। আবার কারো কাছে অপাঙক্তেয় কিছু। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ অবিশ্যি ভালো ছাত্র। বই নিয়ে থাকে। আবার অনেকে আছে কোনোদিকেই তেমন আকর্ষণ নেই। ভবিষ্যৎ আছে। আর সেই জন্যে বাপ-মা পয়সা খরচ করে। অতএব, কিছু লেখাপড়া করা উচিত। আমি কিন্তু অজানিতে রাজনীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। তার হেতু আমার কাছে জানা নেই। অনেক সময় তা ভাবার অবকাশ থাকলেও মনের কছে কল্কি পেত না। কিন্তু লেখাপড়া বাদ দেওয়া বা অবহেলা করা আমার কাছে অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার ঠেকত। আমি দুই দিক সামাল দিয়ে চলতাম। কোনো সামাজিক ব্যাপারে আলোচনার জন্যে হস্টেলে বা আর কোথাও জমায়েত হবে, এ খবর নোটিশ খবরের কাগজ কি আর কোনো কিছুর মারফৎ পেলে অবশ্যি হাজির হতাম। নিকটে পরীক্ষা থাকলেও ওই দিকে আকর্ষণের কোন ঘাটতি দেখা দিত না আমার। আমার কাছে ক্রমশ রাজনীতি মনে হতো, সামাজিক কোনো সমস্যার সমাধানের পথ। সুতরাং তার ভেতর খারাপ কিছু থাকবে কেন? তবু লোকে বলে, 'ডার্টি পলিটিক্স' নোংরা রাজনীতি। আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল ঘোরালো, রাজনীতি ডার্টি হয় কী ভাবে। এই গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজের ক্রীতদাস ছিল, আমার জন্ম পাকিস্তানের পূর্বে। সুতরাং আমিও ইংরেজগোলাম হয়ে জন্মেছিলাম। রাজনীতি ছাড়া স্বাধীন নাগরিক হওয়ার উপায় কী ছিল? কোটি কোটি লোক যুগ যুগ যেমন ক্রীতদাস ছিল, তেমন থেকে যেত। আমিও গোলাম হয়ে থাকতাম। এখন পাকিস্তানি আমি। কিন্তু স্বাধীন নাগরিক। রাজনীতি ছাড়া কোটি কোটি মানুষের মনুষ্যত্বের পথ আর কোন উপায়ে আসত? অথচ লোকে বলে 'ডার্টি পলিটিক্স?' কয়েক মাসের মধ্যে ভাষা আন্দোলন বেশ দানা বেঁধে উঠল। যারা রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষপাতি ছিল না, তারা উর্দুর ওকালতি করত। আবার এক দল আরবির সমর্থক হয়ে উঠল। মুসলমান রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রভাষা হবে আরবি। কারণ ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই পাকিস্তানের জন্ম। লীগ নেতাদের মুখে সে কথা তো একদিন শোনা নয়। অর্থাৎ এক কথা বলা চলে, রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা শিক্ষিত সমাজকে বেশ উচ্চকিত করে তুলল। বহু মানুষ আছে যারা একদম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার ছাড়া আর কোনো সামাজিক ব্যাপারে সাড়া দেয় না— তেমন লোকের কিছু কমতি ছিল না। শুধু ছাত্র নয় আরো অন্যান্য মহলে ভাষার 'ইস্যু' বেশ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছিল এবং তার প্রসার কিছু দ্রুত মনে হলো। একদিন হস্টেলে সন্ধ্যায় বেড়িয়ে এসে দেখি তুমুল উত্তেজনা। আমাদের সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছেন। ছাত্রদের জটলা উঠানে, বারান্দায়। কী ব্যাপার? দুজন বোর্ডারের বিছানা-বইপত্র তাদের অনুপস্থিতিতে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে অন্য কয়েকজন ছাত্র। কাণ্ডটা সত্যি গর্হিত। কিন্তু এমন সামান্য পক্ষপাত দেখানোর পরই আমি জবাব পেলাম, যার

নির্গলিত অর্থ : দালাল ওরা। উর্দুওয়ালাদের টাকা খেয়ে প্রপাগান্ডা করছিল। দালালদের এই হস্টেলে থাকার অধিকার নেই। ওরা ডার্টি পলিটিক্স করে। ডার্টি ব্যাপারটা নিশ্চয়। কারণ টাকা খেয়ে সমাজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া যদি 'ডার্টি' নোংরা না হয়, তাহলে নোংরা আর কোন জিনিস? সেখানেও বেশ খটকা হয়ে গেল। একজন স্রেফ যে-বিশ্বাসে এবং যে-বিশ্বাসকে ধ্রুব সত্য মনে করে, তা থেকেও তো একটা কাজ করে যেতে পারে। ধরা যাক একটি ছেলে বিশ্বাস করে যে, যেহেতু পাকিস্তান ইসলামি রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রভাষা হবে আরবি অন্য কিছু হওয়া মানে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি এবং সে তার বিরুদ্ধাচারীদের সদয় চক্ষে দেখে না, বরং তাদের নস্যাৎ করতে তৎপর— তখন সেই ছেলেকে কি অপরাধী ধরা যেতে পারে? সে তো তার ইমান থেকে কাজ করছে। আবার অন্যদিকে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না, যেহেতু তা অগণতান্ত্রিক এবং কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চনার ষড়যন্ত্র, এই বিশ্বাস থেকে যদি কেউ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচারী হয়, তাহলে তাকে কি দোষী মনে করা হয়। ইমানে ইমানে এমন ঠোকাঠুকি লাগে কেন? শিয়া-সুন্নী দুই মুসলমান। অথচ তাদের কাইজ্যা শত শত বছরে মেটে না, আজও মেটে নি। এইসব সমস্যা তখন আমাকে মাঝে মাঝে বেশ বিচলিত করত। দুনিয়া নিশ্চয় জটিল জায়গা। একে যারা সোজা ভেবে এক আধ আপ্তবাক্য বা উপদেশের বড়ির মধ্যে এনে মানুষের মধ্যে বিলি-বন্টনের খাহেস রাখে, তাদের কি আক্কেলমন্দ বলা যায়? হস্টেলে গরহাজির। এই সুযোগে যে-দুজন বোর্ডারের মালপত্র ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তাদের একজন বেশ চালাক-চতুর। ভাষার প্রশ্নে কারো কারো সঙ্গে বচসায় লেগে যেত। কিন্তু অন্যজন গোবেচারা। তবে দুই জনে বন্ধু এবং এক রুমে থাকে— এই তো তার অপরাধ। তার শাস্তি তো বড় চড়া হয়ে গেল। সে বেচারা কেঁদেই ফেললে এবং বললে, অতি কষ্টে তার বাড়ি থেকে টাকা পাঠানো হয়, আজও সব বই কেনার তার সামর্থ্য নেই, এই অবস্থায় জিনিসপত্র-বই খোয়ানো তো মাথায় বজ্রপাত। ব্যাপারটা আমাকে বেশ পীড়িত করছিল। সুপারিনটেনডেনট সাহেব ছেলেদের শান্ত করার জন্যে আবেদন ছাড়েন। ক্ষতিগ্রস্তদের রিজার্ভ ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা দেওয়ার ওয়াদা করলেন। মোটামুটি মিটমাট করে গেলেন তিনি। কিন্তু গোটা পরিস্থিতি আমি সহজে মন থেকে মুছতে পারছিলাম না। কারো সঙ্গে বহস করা তখন আমার সাহসের বাইরে। ফলে, ভেতরের ধোঁয়ানি বেশি। অনেক সময় রাত্রে আমার ঘুম হতো না। কদিন পড়াশোনায় ইস্তফা দিলাম। আড্ডার দিকে ঝোঁক বেশি। কিন্তু সেখানে দলে থাকা ছাড়া আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। নানা জনের মন্তব্য কানে আসত। উর্দুর সমর্থক ছিল সংখ্যায় কম। কিন্তু তারা ছিল। শিক্ষকদের মধ্যে উর্দুর পক্ষে সোচ্চার নগীব স্যারের কথা কলেজের ক্যানটিনে করিডোরে আলোচনা হতো। একটা ব্যাপার তখন আমার ভেতর বেশ দানা বেঁধেছিল। আমার মন সহজে কিছু মেনে নিতে নারাজ। দুই গুরুজন শিক্ষক যেন আমার দুই পাশে ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এককথায় ধাঁধার মধ্যে আটকে গিয়েছিলাম। ছাত্রনেতা আলাওলের কাছে শুনলাম, সালামত ও নগীব স্যার দুজনের চিন্তাভাবনা আলাদা হলেও সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে বেশ দৃঢ়। নগীব সাহেবও মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে যান সালামত স্যারের বাড়ি। অবশ্যি নগীব স্যারের বাড়িতেই আড্ডা বেশি হয়। সেখানে ছাত্র ছাড়া আরো নানা কিসিমের মানুষ আসে : সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ লেখক কবি, ব্যবসাদার ইত্যাদি। সুতরাং আড্ডার দিকে তা জমজমাট। কারণ লোকের আনাগোনা। সালামত সাহেব সে তুলনায় বিরাণ ময়দান। ছাত্রদের সঙ্গে মেলেন, কিন্তু মেশেন না। গুটিকয় ছাত্রের নাকি তার বাড়ি যাতায়াত আছে। রাজনীতিবিদ কোনোদিন সেখানে পায়ের ধুলো দিয়েছে, কেউ সাক্ষী দিতে পারবে না। অবিশ্যি রাজনীতিমহলে নগীব স্যারের দহরমমহরম আছে তা আঁচ করতে কোনো চেষ্টা অবান্তর। সিট কম, ছেলে ভর্তির তদবির বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং কি মেডিক্যালে, কোন অধ্যাপকের বদলি কি প্রমোশন জাতীয় ব্যাপারে নগীব স্যারের হাত প্রচণ্ড, একথা শিক্ষা বিভাগের লোকজন ও অন্যান্যরা জানে। অর্থাৎ তিনি প্রভাবশালী অধ্যাপক। সেদিক থেকে সালামত স্যার দুর্বাঘাস। দুই দিক থেকে কাছি টানাটানির খেল। তার মধ্যে আমার অবস্থান। নগীব স্যারের জানা আছে। সালামত স্যারের মেয়ে আছে কি না, কে জানে। পরে জানাজানি হলো তাঁর মেয়ের সঙ্গে পিতার রেস্তা ধরে। কিন্তু আশ্চর্য, সে আমাকে টানতে পারল না সিতারার মতো, যদিচ তুলনায় সে সিতারার চেয়ে বেশি সুন্দরী। নাম বসিরন। কিন্তু তার মধ্যে বশীকরণের কিছু নেই। পৃথিবী এমন সব আজব ধাঁধায় ভর্তি। অন্যদিকে দেখা গেল, আমার কিন্তু সালামত সাহেবের দিকে আকর্ষণ বড় দ্রুত বাড়তে লাগল। তাঁর পাণ্ডিত্যের হদিস করা আমার কাজ নয়। কিন্তু তিনি যে-ভাবে যুক্তির খেই ধরিয়ে দেন তা একজনের কাছে অজানাকে জানার পুলক এনে দিত। সে-তুলনায় নগীব স্যার যত গলা চড়ান, যত সামনের টেবিল বা টিপয় থাপড়ান। একসময় তার যুক্তির অসারতা আমিই ধরতে পারতাম অপর অধ্যাপকের কল্যাণে। কিন্তু কোন তর্কে যেতাম না। কী জানি, হঠাৎ মেজাজ বিগড়ে গেলে যদি আমাকেও তাঁর ড্রয়িংরুম থেকে চিরতরে বিদায় দেন। তেতো যুক্তি গেলা এবং মিষ্টি সিতারার দর্শন বা সান্নিধ্য দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হয়। আমি শেষোক্ত বেছে নিয়েছিলাম। দিনের রুটিন এইসব সাত-পাঁচের ভেতর দিয়ে ঠিক হতো। ষোলো-সতরো বছর বয়সে পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে উত্তেজনাময় হয়ে উঠতে পারে এমনকি দুঃখ-কষ্টের ভেতরে। তখন আশা সহজে নিস্তেজ হয় না। বুকের পাটায় শত শত স্বপ্ন রেখা টেনে যায়, সালামত স্যারের কাছেই কিন্তু আমার মুখ খুলতে শুরু করে। শুধু শ্রোতা হয়ে থাকার পক্ষপাতি নই আর আমি। আমারও তো একটা মন্তব্য আছে। সালামত সাহেব সেদিক থেকে আদর্শ শিক্ষক। তিনি আমাকেই জিজ্ঞেস করে বসতেন, এ-ব্যাপারে তোমার কী মনে হয়? প্রথমে কাচুমাচু করতাম। সাহস হতো না। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, প্রবাদটা মনে ছিল। রপ্তে রপ্তে সাহস হলো। আমিও নিজের আক্কেল-অনুযায়ী যুক্তি খাড়া করতাম বা যা যুক্তিযুক্ত মনে হতো বলে ফেলতাম। তিনি খুব খুশি হতেন বৈইকী। তাঁর মুখাবয়বও হালচাল জানান দিত। আমার কাছে আশ্চর্য লাগত, তিনি শিক্ষক-ছাত্রের ব্যবধান বজার রেখে কথা বলতেন না। এই বন্ধু-সুলভ আস্কারা আমার কাল হলো। না, ঠিক কাল নয়, সামাজিক ইস্যুর দিকে আমার ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা বেড়ে গেল। হস্টেলে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ল আমার এক রুম-

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেট লেখাপড়ায় অমনোযোগহেতু। না, একদম ঠিক তা নয়। তবে আশপাশের চাঞ্চল্য আমাকে নাড়া দিত। ভাষার সমস্যা যে বেশ জটিল সামাজিক সমস্যা তা যুক্তি দিয়ে বুঝার চেয়ে আবেগই যেন সহজ হয়ে উঠত। তবু যুক্তির জন্যে আমার হাতড়পাতড়ের অন্ত ছিল না। দুই শিক্ষক পেয়েছিলাম দুরকম। ফলে আমার নিজের বিশ্বাস আত্মরূপে পোক্ত হয়ে উঠেছিল। তা আমি বুঝতে পারতাম, প্রতিপক্ষের সঙ্গে বহসে। তর্কের সময় প্রচণ্ড এক আত্মপ্রত্যয় আমার মধ্যে জেগে উঠত। আলাওল একদিন অবাক আমার কথাবার্তা শুনে। নিজেই স্বীকার করলে, ওই বাড়িতে দেখে আমাকে নগীব স্যারের চেলা-ছাত্র ঠাউরেছিল। "ওই বাড়ির জামাই হলে আপনি অমন ভাবতে পারতেন। আমি তেমন আপত্তি করতাম না। কিন্তু ছাত্র হিসেবে আপনি গেছেন আমিও গেছি, তেমন ভাবনার কোনো কারণ আছে?" আমার জবাবের ধরন দেখে তো ছাত্রনেতা থ। হয়ত স্বরের আস্পর্দ্ধা ওকে আঘাত করে থাকতে পারে, কিন্তু সে আবহাওয়া তরলের উদ্দেশ্যে বলল, "তা হলে একবেলা মোগলাই খানা আগেই খাওয়া থাকত।" তারপর আলাওল হাসতে লাগল। আমি তার আচরণে বেশ বিগলিত। বয়সে বড়— নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তদুপরি আমার ঘটকরূপেই তার আবির্ভাব। এত উপাদানের সংযোগ। দ্রবীভূত না হয়ে উপায় আছে। আমি আলাওলের ভক্ত হয়ে পড়লাম। একদিকে পিতার আকর্ষণ, অন্য বাড়িতে কন্যার আকর্ষণ। কিন্তু সজাগ মনে তা নিয়ে হিসাব-নিকাশ আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়বস্তু। অথচ হঠাৎ-হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে ব্যাপারটা সামনে খাড়া হতো, আমি একা থাকলে হেসে উঠতাম নিজ মনে। এই হুল্লোড়ময় দিনে সালামত সাহেব কিন্তু আমার কাছে আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ালেন। ছাত্রদের মিটিং-এ মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়ে বসতাম। পরে নিজের অভিনয়-লীলার যাচাই করতাম। হয়ত কেউ নিজের থেকে মন্তব্য দিলে। নচেৎ নিজেই জিজ্ঞেস করতাম, "কেমন হল সেদিন?" কারো প্রশংসা পেলে আত্মসন্তুষ্টি বেড়ে যেত। তবে সবসময় মনে হতো আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। কোথায় কী উদ্দেশ্য— এসব আমি জানতাম না। কিন্তু বুকের মধ্যে তাগিদ অনুভব করতাম। অন্য দিকে নানা প্রশ্ন চোখের সামনে খাবি খেত। কপালের দোহাই মেরে যারা সব বুঝার ইতি ঘটায়, সে-ধাতই আমার ছিল না। একদিন সালামত সাহেবের বাড়ি গিয়ে উত্তেজনার মুখে পড়লাম। পুরাতন শহরে ওঁর বাসা। সরু গলির ভেতরে। গলি এমনই চওড়া যে একটা রিকশা ঢুকলে পাশে একহাতও খালি থাকে না। হঠাৎ দুই রিকশা মুখোমুখি হয়ে গেলে, একটিকে পিছিয়ে পিছিয়ে আরেক গলির ভেতর ঢোকা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই। সালামত স্যারের বাসা দোতলা, সামনে দু-তিন কাঠা ফাঁকা ছোট উঠান ছিল দেওয়াল-ঘেরা। এইখানে সতরঞ্জ পেতে আসর বসেছে। আরো দশ-বারো জন লোক। তাদের চেহারা দেখেই বুঝা যায়, এই শহরের বহু পুরাতন বাসিন্দা। পরনে লুঙ্গি। একজন তো গেঞ্জি পায়ে বসে আছে। সালামত স্যার একদিকে কোনায় দাঁড়িয়ে বলছেন, "ভাইসব, আমার জানা ছিল না বা আমার স্ত্রীও জানত না যে এ-তে কোনো সামাজিক অপরাধ হতে পারে। তবে এখন জানলাম। ভবিষ্যতে কখনো অমন ত্রুটি আপনারা আর দেখবেন না।" এই সম্বোধন শেষ হওয়ামাত্র কয়েকজন বলে উঠল, "সোবহান আল্লা, সোবহান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লা। প্রফেসার সাব, মাফ কইরা দেবেন।" সালামত সাহেব জবাব দেওয়ার পরিবর্তে বরং অন্য কথা বললেন,"আরেক কাপ চা।" না, না আর না। শুকরিয়া (ধন্যবাদ)"। উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল। হঠাৎ উপস্থিত, আমি। কোনো কিছু গোটা হাদিস পেতে অক্ষম। তবে এইটুকু বুঝতে পারলাম পূর্বে একদফা চা পান হয়ে গেছে। সালামত সাহেব ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন, কোনো অপরাধ করে থাকবেন। কিন্তু অন্য পক্ষও যখন ক্ষমাপ্রার্থী, তখন সব ঘুলিয়ে যাক। কে অপরাধী? কে বিচারক? স্যারের সদর দরজায় একপাশে দাঁড়িয়ে যাই। আমি তাঁর চোখে না পড়ে গেলে সহজে কেটে পড়তাম। কিন্তু তিনি আমাকে দেখেছেন, এখন বিদায় না নিয়ে তো যেতে পারি নে। তাই তখন আমিই অপরাধীর মতো একপাশে দাঁড়িয়ে থাকি। একেক করে আসর খালি হয়ে গেল। শেষ দিকে দুই জন পাতা সতরঞ্জ তুলে চ্যাংদোলা বয়ে নিয়ে যায়। বস্তুটি এজমালি বা পাড়ার কোনো ব্যক্তির। তবে চেহারা দেখে মনে হয়, মহল্লার কাজেই লাগে। গাঁয়ে চাঁদা করে এসব জিনিস কেনা হয় বারোয়ারি ব্যবহারে। অনেক ধনী ব্যক্তি আবার দানও করে থাকেন। শহরে সেই রেওয়াজ চালু আছে দেখলাম। এখানে যে সালিশ বসেছিল সে-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। সালামত স্যার আসর থেকে সকলে বিদায় নিলে আমাকে বললেন, "আলি জাফর, ভেতরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসো আমি আসছি।" স্যারের ড্রয়িংরুম দক্ষিণে উঠান-সংলগ্ন। অন্দরের কামরাগুলো উত্তরে। তিনি সেদিকে চলে গেলেন। অবিশ্যি বৈঠকখানার ভেতরে অন্দরের সঙ্গে সংযোগের দরজা আছে। পাঁচ মিনিট কেটে গেল। আমি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। কী হচ্ছিল এখানে? কার অপরাধ? কী অপরাধ? সব তালগোল পাকিয়ে যায়। আরো পাঁচ মিনিট কেটে গেল, স্যার এলেন না। এলো বসিরন। দুকাপ চা হাতে। সেদিন সে আকাশী নীল শাড়ি পরেছিল। দীর্ঘ আড়ং ওর। চলাটি সবসময় ছন্দময়। আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় ঠেকছিল বসিরন। দৃষ্টি সুধা-পানের লোভ ভেতরে। কিন্তু স্যার এসে পৌঁছলেন। নির্লজ্জের মতো আর তাকানো চলবে না। ফাঁকে ফাঁকে বসিরনের সঙ্গে কিছু সংলাপ বিনিময় ঘটে। সেদিন হয়ত প্রলম্বিত হতো। কিন্তু অধ্যাপকের আগমণে আমারও মোড় ফিরল। সালামত স্যার বললেন বড় ক্লান্ত জনের মতো, মেয়েকে ইংগিত করলেন হাত নেড়ে একটা চেয়ারে আসন নিতে। আমিই চায়ের কাপে আগে চুমুক শেষ করেছিলাম। প্রথমে মুখও খুলে গেল, "স্যার, বেয়াদবি নেবেন না, কী হয়েছিল জিজ্ঞেস করতে পারি?" "চা শেষ করতে দাও", অধ্যাপক জবাব দেয়ার পর বড় দরদের সঙ্গে ঠোঁট নামালেন কাপের কিনারায়; রোদ-পোড়া চাষি যেন নদীতে গা ডুবাতে তৎপর। বসিরন পিতার জন্যে অপেক্ষার্থী, তথৈবচ আমি। দুজনে এক রেখায় সেদিক থেকে। স্যার চায়ের কাপে চুমুক দিতে গেলে মাথা নিচু করেই, সেই ফাঁকে আমি তাঁর কন্যার দিকে তাকাই। সেদিন কী হয়েছিল জানি নে, বসিরন জিতে গেল সিতারার সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। একবার চোখাচোখি হলো। বসিরন চোখ আর নামায় না। কিন্তু আমি পাছে ধরা পড়ে যাই গুরুজনের কাছে, তাই দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাই। খুব দ্রুত আড়চোখে একবার আশপাশ দেখে নিলাম। বসিরন অপলক দৃষ্টি। এমন খেলা বেশ জমে যেত সেদিন। কিন্তু

সম্মুখে পিতৃতুল্য শিক্ষক। চা শেষ করে অধ্যাপক সালামত বললেন, "উঃ একটা বিকেল গেল বটে।" বাপের কথার পাল্টাপাল্টি যোগ করলে বসিরন, "আব্বা আমি বাসা নেওয়ার সময় বলেছিলাম, এখানে বাস করা যাবে না। সেদিক থেকে নগীব চাচা বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।" "আরে মা, বাসা কি ইচ্ছে করলেই মনমতো পাওয়া যায়। পয়সাও তো মনমতো থাকা দরকার।" "আব্বা আপনার জন্যে স্কুলে যাতায়াত করছি ছালাবন্দি হয়ে। কিন্তু এখান থেকে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করুন। নচেৎ আমি আর স্কুলে যাব না।" আমি একবার পিতার মুখে আবার দুহিতার মুখের দিকে তাকাই। তুলনায় শেষ মুখে দৃষ্টিক্ষণ একটু বেশি স্থায়ী। কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারি নে। তালগোল পাকানো এই রহস্য জাল। কী হয়েছে ব্যাপার, যার জের এইভাবে প্রতিভাত। বসিরনও আজ আমার কাছে বড় মোহনীয় ঠেকছিল। বাবার সঙ্গে কথা বলে সে কিন্তু কোনো সঙ্কোচ-কম্পন নেই গলায়। কয়েক মিনিট মেয়ের সঙ্গে পিতার এই মাকু ঠেলাঠেলি চলল। আমি স্বাদ পাই, এক তরুণীর সপ্রতিভ অঙ্গ আলোড়নের মধ্যে। কিন্তু আমার ভেতরে আরো অসোয়াস্তি জমা কৌতূহলবশত। এই যবনিকার আড়ালে কী ঘটেছিল? বেশিক্ষণ আমাকে এই ভোগান্তির ভেতর হাঁটতে হলো না। সালামত স্যার হালে পানি পাওয়ার জন্যে বিস্তারিত বয়ান শোনালেন। এই গলির উত্তর দিকে স্যারের বাসা। ঠিক লাগালাগি দক্ষিণে আরেক আমদানিকারক— ইমপোর্টারের বাড়ি। দোতলার জানালা পথে সালামত স্যারের ও প্রতিবেশীর স্ত্রী দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়। সাত-আট ফুট ব্যবধান, জানালার পর্দা তুললেই এক কামরা থেকে দেখা যায় অন্য কামরায় কী ঘটছে। প্রতিবেশীসুলভ হৃদ্যতা দুই মহিলার গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। তারই তোড়ে ইমপোর্টারের স্ত্রী মিসেস সালামতকে দাওয়াত দিয়েছেন : এক সন্ধ্যা তিনি যেন তাদের সঙ্গে কাটিয়ে যান। এখানে অস্বাভাবিক কিছু নেই। পাশাপাশি বাড়ি গলির এপার-ওপার। সালামত স্যারের সদর-দরজার সোজাসুজি ইমপোর্টারদের সদরের দরজা। এপার থেকে দুই লাফে ওপারে যাওয়া যায়। পুরুষ মানুষ হলে তা এক লাফেই পার হয়ে যেতে পারে। সন্ধ্যার পর মিসেস সালামত তাই নিজেদের দরজার কাছে আড়ালে দাঁড়িয়ে সুযোগমতো দুই লাফে প্রতিবেশীর বাড়ি চলে যান। এই পাড়ায় সকলে পর্দা-ঘেরা রিকশা ব্যবহার করেন। অবিশ্যি বোরখা পরেন না। বাড়ির মেয়ে স্কুলে যায়। সে-ও পর্দার ওই প্রথা পালন করে। মিসেস সালামত পাশের বাড়ি যেতে আর রিকশা ডাকেন নি। ভেবেছিলেন, এই দরজা ওই দরজা, তার জন্যে আর রিকশা ডাকব কী। তিনি সোজা শটকাট করেছেন। তা নিয়ে মহল্লায় কথা উঠেছে : প্রফেসারের বিবি বেপর্দা আওরত। মুসলমান হয়ে এমন কাণ্ড করে, ইসলামি কানুন মানেন না। শেষমেষ তা মহল্লার সালিশে পৌঁছায়। আখেরি পর্বে পৌঁছেছিলাম আমি। অবস্থার হদিস পেতে আমার আর বিলম্ব ঘটে নি। সালামত স্যার মহল্লার সর্দারের কাছে মাফ চেয়ে নিলেন। তা আমার সচক্ষে দেখা। অবশ্যি আমার বাস গ্রামে। কাজেই পর্দাপ্রথা সম্পর্কে আমার নতুন করে জানার কিছু নেই। সেখানেও মেয়েরা পর্দার ভেতরেই থাকে। আমার মা'র মতো কোটি কোটি মেয়ে বাড়ির চৌহদ্দির ভেতরেই থাকে সারা জীবন। চাষিবাসিদের মেয়েদের পর্দা কিছু শিথিল। কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাষবাসে সাহায্যে মাঠেও হয়ত তাদের যেতে হয়। তাদের গ্রামের শরিফ লোকেরা তা সমীহর চোখে দেখে না। এককথায় যাদের বাড়ির মেয়েরা বেপর্দা তারা কোনো শরিফ মানুষ নয়। সুতরাং এসব ঘটনা আমার কাছে পুরাতন ব্যাপার। বসিরন বাপের উপর খাপ্পা তিনি কেন এমন পাড়ায় বাসা নিলেন। তার কথা ঠিক বৈইকী। শহরে অনেক পাড়া আছে যেখানে পর্দাপ্রথা শিথিল অথবা নামে মাত্র আছে বা নেই। ঢাকা শহরে পুরানা পল্টন, ওয়ারী, নীলক্ষেত প্রভৃতি এলাকায় যারা থাকে, তারা পর্দাপ্রথা তেমন পালন করে না। কিন্তু পুরাতন শহর তো গ্রামের মতো। বসিরন বাপের কাছে আমার সামনেই অনুরোধ শাসানি (যেমন স্কুলে যাবে না) প্রভৃতি উজাড় করে দিল। আমি এই ডুয়েল উপভোগ করছিলাম। একপর্যায়ে বসিরন বললে, "আব্বা, আপনাদের মতো শিক্ষিতলোকেরা ওইসব লোকগুলোকে আস্কারা দেন বলেই ওরা অমন পেয়ে বসে। আপনি মাফ চাইলেন পর্যন্ত।" পিতা অবশ্যি সবই আদরের মার হিসেবে গ্রহণ করেন এবং বলেন, "মা, গোটা সমাজ বদল করা অত সোজা নয় রে, মা। দু-একটা লোক হঠাৎ আস্পর্ধা দেখালে যদি সব বদলে যেত, তাহলে ব্যাপারটা খুব সোজা হয়ে পড়ত। ওদের দোষ কী? শত শত বছর রেওয়াজ চলে এসেছে তা ভালো মন্দ এসব ওরা তলিয়ে দেখে না। ভাবে ওই বুঝি ধর্ম।" বসিরন নিজের বন্দুক কাঁধ থেকে নামায় না। "আপনি তো জানেন অনেক পাড়ায় মেয়েরা বেশ অবাধ চলাফেরা করে। তেমন পাড়া কী করে তৈরি হয়?" "আরে, মা সমুদ্রের মধ্যে তা দ্বীপের মতো। কী বড় ময়দানে যেন একটা ডটবিন্দু। তা দিয়ে গোটা সমাজের বিচার করা যায় না। অবশ্যি ওই ভাবে এগোতে পারলে হয়ত কালে কালে—", তারপর মাঝপথে কথা থামিয়ে সালামত সাহেব বলল, "সব কথা তুই বুঝবি নে। তবে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তারপর মনে রাখিস, 'গা-সওয়া' বলে একটা কথা আছে না। অবস্থায় পড়ে অনেক জিনিস মেনে নিতে হয় বা মানুষ মেনে নেয়। তার মানে এই নয় যে সে ব্যাপারটা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছে। আজকাল মেয়েডাক্তার হচ্ছে— হয়েছে। অনেক পুরুষ তার কাছে আসে চিকিৎসাবাবদ। মেয়েডাক্তার তো পর্দা করে না। সে তো সমাজের বরখেলাপ। তবু তার কাছে লোক আসে। পরে ব্যাপারটা গা-সওয়া আর থাকবে না, ওটাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সবই সময়সাপেক্ষ— টাইম লাগে। যা-এখন ভেতরে যা, মেজাজটা ভালো নয়। আর কচকচি ভালো লাগে না। আমি বরং আলি জাফরের সঙ্গে অন্য আলাপ করি। তবে বাড়ি বদল করব যত শিগগির পারি।" বড় নির্দয়ের মতো স্যার বসিরনকে ভাগিয়ে দিলেন। আমি বেশ আচমকা ঘা খেলাম। ওর ভেতর ভালো লাগার কিছু আছে আমি আগে পেতাম না। আজই প্রথম বেশ লাগছিল। ওর চলা বলা চাউনি আনন্দের দূত হয়ে দেখা দিয়েছিল এই সন্ধ্যায়। গুরুজন প্রতিবন্ধক। আমিও আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করি নি সেদিন। কিন্তু আমাকে নানা প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলছিল। নগীবউদ্দীন সাহেব কলেজ ও হস্টেল পাড়ার সংলগ্ন এলাকায় বাস করেন। সেখানে পর্দার পুরাতন শহরের মতো কড়াকড়ি নেই। মেয়েরা বাজার পর্যন্ত যায় না। কিন্তু পথে ঘাটে ওদের দেখলে কেউ হঠাৎ খোদার খাসবান্দা বনে যাবে এবং ধর্মরক্ষায় আরো মানুষ ডাকাডাকি করবে এমন ঘটনা অকল্পনীয়। নগীব স্যার ইসলাম ধর্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ্যাম্পিয়ন বলা চলে। পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কারণ, পাকিস্তানের উদ্দেশ্য ও ইসলামি রাষ্ট্র বা ইসলামি 'হুকুমত' স্থাপন কিন্তু নগীব স্যার বাড়িতে পর্দা পালন করেন না। মেয়ে তো আর দশ জন ছেলের সঙ্গে বসে থাকে। তার স্ত্রীও অনেক সময় বিকেলে বেড়াতে বেরোন, কিন্তু ছাত্রদের কাছে আসতে তাকে আমি একদিনও দেখি নি। নগীব সাহেব দৈনিক শেভ করেন। তাঁর থুতনির উপর এক-দুদিনের বাসি-দাড়ি দেখার সুযোগ নেই। আর অন্য দিকে সালামত স্যার ইসলাম ধর্ম নিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস দেখান না, পর্দাপ্রথার পক্ষপাতি নন। কিন্তু তিনি আর দশ জনের মতো বা আবেগকে সমীহ করেন। সন্ধ্যায় সেদিন আমি নিজেই সাক্ষী। দুই মহল্লার হেচোরা আলাদা। চিপা গলি ঘন বসতি একদিকে। অন্যদিকে বাড়ি ঘরদোর বেশ ফাঁক ফাঁক ব্যবধানে তৈরি। ফাঁকা জায়গা বেশি। এক এলাকায় ইসলামের অবমাননার জন্যে যেখানে উষ্মা প্রকাশ করা উচিত সেখানে তার প্রকাশ বেশ দেখা যায়। আরেক এলাকায় নিজেদের সুখ সুবিধার পাল্লায় ইমান ওজন হয়। যেহেতু ওদের বিবিদের বাতাস-সেবন স্বাস্থ্য তথা রূপের জন্যে প্রয়োজন। সেখানে পর্দার একরকম সংজ্ঞা, আর সেখানে স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই, স্বাস্থ্য রাখার জন্যে পৃথিবীর চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় সামগ্রী অপ্রতুল কি কমতি সেখানে ইমান মনের অনেক গভীর তক বিস্তৃত। কেন এমন হয়? একই সমাজের মানুষ অথচ এত তফাৎ! জড় সত্তার এবং মানসিক সত্তার উভয় ক্ষেত্রে। সঠিক পথের দিশা কোথায় মিলবে, কে সত্য, কে মিথ্যে' কে বলে দেবে? আমার দুই গুরুজন যেন একই বাঁশ কিন্তু মাঝখানে ফাটা। আর আমি তার মধ্যে পড়ে খাবি খাচ্ছি যন্ত্রণায়। ক্ষতবিক্ষত আমি অমন সব প্রশ্নজাত অস্থিরতায়। আমার সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধু তেমন পাই নি যার সঙ্গে নিভৃতে সব কথা বলতে পারি। অনেকের সঙ্গে সাধারণভাবে আলোচনা করতাম, কিন্তু নিকট কোন হৃদয়ের স্পর্শ পেতাম না। নগীব স্যার পুরাতন মহল্লার কথা তুললে বলতেন, ওরা অশিক্ষিত সংকীর্ণমনা। কারণ থোড়াপড়া টাট্টুঘোড়া-কিসিমের মানুষের কাছ থেকে ধর্মের 'সবক' পায় যারা ইসলাম ধর্মের অ আ ক খ জানে না। তিনি আমাকে ওসব আজেবাজে লোকদের কথা আমলে না আনার জন্যে বারণ করতেন। অথচ নিজের মতের সমর্থনের আশায় তিনি কেন সাধারণ মানুষের দ্বারস্থ হন তাহলে? ওঁর সামনে এমন যুক্তি তুলে ধরার আমি সাহস পেতাম না যদি হটা-বাহার করে দেন সিতারার বিচ্ছেদ আমাকে সহ্য করতে হবে। আমার কাছে দুঃসহনীয় তখন কিছু যদি থেকে থাকে তা ওই বিচ্ছেদ— অন্তত আমার কাছে তা-ই মনে হতো। বসিরনের প্রতি একদিনের দুর্বলতা আমাকে পীড়া দিত। তারপর ওই বাড়ি গিয়েছি। বসিরন বরং সহজে এগিয়ে এসে কথা বলার সুযোগ খুঁজত, কিন্তু আমার উৎসাহ নিভে আসত। সালামত সাহেব দু-তিন মাসের মধ্যে অবিশ্যি বাসা বদল করে কলেজ পাড়ার কাছাকাছি আরো মুক্ত জায়গায় এসেছিলেন। তাঁর কাছে যেতাম কারণ মানুষটাকে আমার বেশ ভালো লাগত। তিনি গলার আওয়াজ উঁচু করেন না। যুক্তির দেয়াল এমন উঁচু করেন যে, অনেক সময় আমার পক্ষে কুলিয়ে ওঠা দায় হতো। আরো হেতু ছিল বৈইকী। আমি পাড়া গাঁ থেকে শহরে গেছি। গাঁয়ের নিরাভরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈনন্দিন জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সালামত স্যারের বৈঠকখানা বড় সাধাসিদা। সাধারণ খানকয়েক চেয়ার। একটা ইজিচেয়ার আছে তা-ও চট দিয়ে ছাওয়া। পাতলা কাঠের ফ্রেম। ক্লান্তি বেশি থাকলে, তিনি নাকি ওইভাবে পড়াশোনা করতে ভালোবাসেন। দেরাজ-হীন একটি টেবিল আছে, একদিকে চেয়ার রাখা পাশে। সেটি হাতলওয়ালা। আকসার এইখানেই সালামত স্যার লেখাপড়া করেন। নগীবউদ্দীন সাহেবের কথা তুলনায় সহজেই আমার চোখে ভেসে উঠত। তাঁর বসবাসের ঠাট দেখে স্পষ্ট ধরা পড়ে তিনি জাঁকজমক বেশ পছন্দ করেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা দামি কাপড় পরে। তিনি সবসময়ে স্যুট পরে কলেজে যান। এমনকি গরমের দিনেও। বাদশাহী নজর তাঁর। ড্রয়িংরুম আধুনিক কায়দায় সজ্জিত। সোফার পাশে টিপয়টি পর্যন্ত বাদ যায় না। পানের সঙ্গে চুন যথা— মজুদ। গুরুজনদের আচরণ সম্পর্কে প্রথমে আমি কোনো প্রশ্ন তুলতাম না। ভাষা নিয়ে অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষার সমস্যা নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা ক্রমশ সরগরম হতে লাগল, আমি চারিদিকে চোখ ফেলতে লাগলাম। অমন আলোড়নের ফলে দুই দল ক্রমশ আপন শিবিরে কাতার বাঁধছিল। তা আমার বিচারবুদ্ধিকে ঘুমিয়ে থাকতে দেবে না। বেশ টের পেলাম। নগীবউদ্দীন সাহেব বেতন পান তো শিক্ষকের অর্থাৎ ডাগর তেমন কিছু নয়। স্বল্প বেতন দিয়ে ফুটানি করা চলে না। পৈতৃক তেমন কোনো সম্পত্তি পান নি তিনি। কানাঘুষা শিক্ষকদের কাছ থেকে ছাত্রদের মধ্যেও চালু হলো। নগীব স্যার দালালি করেন। কারো বদলি, কারো প্রমোশন বা এই জাতীয় কাজের তদবিরে তিনি সিদ্ধহস্ত, সেই বাবদ তিনি ফায়দা ওঠান। সোজাসুজি টাকা নেন না, তবে পুষিয়ে নেওয়ার নাকি তাঁর নিজস্ব 'তরিকা' (পথ) আছে। কারো তদবির করার পূর্বে বা পরে— সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী— তিনি হয়ত পঞ্চাশ টাকা ঋণ করলেন। এই ঋণ আর শোধ দিতে হয় না। কারণ উপকৃতজন অকৃতজ্ঞ-অপবাদ কি সহজে গ্রহণ করতে পারে? ছাত্রদের হাতে রাখা ছাড়া সরকারের জনপ্রিয়তা বজায় রাখা দায়। তার জন্যে স্বার্থভোগীদের মাথাব্যথা কম নয়। তারা ধর্ণা দিত নগীবউদ্দীন সাহেবের কাছে। এসব জনরবের সত্যমিথ্যে যাচায়ের কোনো উৎসাহ আমার ছিল না। তবে মনের কোণে সায় স্বতঃই আসত, লোকটার প্রতি আমার প্রচ্ছন্ন বিরূপতার জন্যে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগত নগীব স্যারের মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণ লোক তাঁর কাছে কল্কি পেত না। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বা ইসলামের তফসির শুধু তিনিই দিতে পারেন। আর যারা আছে, সব মোল্লা। অথচ তিনি রোজা-নামাজের ধার ধারেন না। কিন্তু জুম্মার দিন পাড়ার মসজিদে ঠিক যাবেন। কিছুদিন পরে ওঁর বাড়ি যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিলাম। মাঝে মাঝে গিয়ে পৌঁছতাম যেদিন সিতারার সান্নিধ্য লোভ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত। কিন্তু সেখানেও প্রাচীর তো কম উঁচু নয়। কোনো নিভৃতি পেলে অপর পক্ষের মনের কথা জানা যায়। সে সুযোগ কোথায়? একদিন স্যার ড্রয়িংরুম থেকে অন্দরে গিয়েছিলেন, আমি আমার হাত এগিয়ে দিয়েছিলাম টেবিলের উপর রক্ষিত সিতারার হাতের দিকে যদি ছোঁয়াচ পাওয়া যায়। সাপের দংশন থেকে রেহাই পেতে ফণা এড়িয়ে যাওয়ার অভিনয় সেদিন সিতারা করেছিল। আমার দিকে সে অবশ্যি তাকায় নি। নতমুখী। সুতরাং আঁচ করা গেল না,

তার মনের হদিস। অবশ্যি এসবে অনুমান আর কত দূর যায়? যে চটে সে পটে; বাংলা প্রবাদ আছে কিন্তু আমার কিছু জানা হলো না। নেপথ্য প্রেমিক আমি। সিতারা আমি এলে অন্দরেই বসে থাকত না। একবার অন্তত ড্রয়িংরুম ঘুরে যেত। অন্ধকারেই নাকি প্রেমের আরম্ভ এবং অন্ধকারেই সমাপ্তি পর্ব ঘটে, বইয়ে পড়েছিমাত্র। আমি বুলতে থাকলাম। অবিশ্যি আরো উন্মাদনা ছিল। নতুন কলেজ ও শহরের চাকচিক্যময় হুল্লোড় জীবন ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক বিষয় নিয়ে আন্দোলন— এই জাতীয় প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকে দিন কাটছিল। তাই ব্যক্তিগত কামনার চোটপাট থাকলেও আমাকে তেমন কাবু করতে পারে নি। অন্যদিকে আমি নিজেকে দেখতে শিখছিলাম। কিছু ঘটলেই রাত্রে শুয়ে শুয়ে তার হিসেব নিকেশ আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এক-দেড় বছরের নাগরিক জীবন। অবশ্যি ছুটিতেও গাঁয়ে যাওয়া বন্ধ হয় নি। শহরের খরচ অকারণ বাড়ানো ছাড়াও মা এবং বাবার প্রতি আমার দুরন্ত টান ছিল। এদিক-সেদিক এপাড়া ওপাড়া ঘোরাঘোরি তো ছুটির প্রেরণা কিন্তু মা বাবার সঙ্গে অল্প সময় বসলেও আমার বুক ভরে থাকত। পিতার স্নেহে আপ্লুত জীবন। তিনি তো শহরে থাকেন না। তাঁর মোকাম আমার কাছে তীর্থভূমি। তবে নাগরিক জীবনে আমাকে বদলাতে শুরু করেছে তা বেশ টের পেয়েছিলাম। আমার মুখ-চোরামি কেটে যাচ্ছিল। মুখর হওয়ার আলামৎ (লক্ষণ) আমার ভেতর জানান দিতে শুরু করে। কারো কোনো কথা শুনলে তখনই পাল্টা জবাব দিতে না পারলে আমার নিস্তার থাকে না। অযথা তর্কেও জড়িয়ে পড়তাম চায়ের টেবিলে। আমার বেশভূষায় পরিবর্তন এবার নিজেই দেখতে পেলাম। নাস্তার পয়সা বাঁচানো প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট। গাঁয়ে লুঙ্গিই তো যথেষ্ট ছিল স্কুল যেতে। শহরে পাজামা দিয়েই কাজ চালিয়েছি প্রথমে। এখনো চালাতে হয় কারণ, পাৎলুন দুখানা, হাওয়াই শার্ট মাত্র একখানা। আরেকটা বাড়াতে পারলে কিছু ভদ্র সমাজে ওঠা যায়। তর্কে বসে তোমার প্রতিপক্ষের চেয়ে তোমার লেবাস যদি হেয় হয়, খানিকটা অসুবিধা ভোগ করবে। অবশ্যি দামি কাপড় পরতে হবে, এমন কথা নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মানানসই হলেই চলে যায়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শিখছিলাম, তবু অপূর্ণতার বোধ আমাকে জেরবার করে রাখত। শিক্ষকদের কাছে বিশেষত সালামত স্যারের কাছে গেলে তা বুঝতে পারতাম। তাই জেনেছিলাম, সব কিছু সময়সাপেক্ষ। অধ্যাপক সালামত বলতেন, গাছের ফল রাতারাতি পাকে না। সব চিজের মৌসুম আছে। বীজ ধান রোপণের সময় আছে। সময় বয়ে গেলে তোমাকে পস্তাতে হবে। এবং আবার প্রতীক্ষা করতে হবে সময়ের। কিন্তু আমি বড় অধীর। তা প্রকাশ পেত আমার কথা কাটকাটি খেলার ঝোঁক থেকে। আহ, মনের উপর দিয়ে বোধহয় এই বয়সে এমন ধাক্কা এসে পড়ে। মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ শৈশবে কৈশোরে থাকে না। যৌবন একটা ঋতু বৈইকী। একেক ঋতুর যেমন একেক রকম ফুল ফল, মানুষের জন্যেও তেমনই বরাদ্দ আছে। সহজে এড়িয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য। মানুষের ফল ভোগ করতে হয়। এক ঋতু খামাখা যায় না। পরিণাম সহজে জড়িয়ে থাকে। জীবিকা একটাই সমস্যা মানুষের। তুমি যদি তার জন্যে তৈরি না হও, আখেরে ভুগবে। লেখাপড়া না জানলে এ যুগে চলে না। তা বুঝতাম। তাই হাজার আড্ডা দিই বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য ব্যাপারে সময়ের অপচয় করি এক ফাঁকে লেখাপড়ার কাজ করে রাখতাম। পরীক্ষায় ফেলের কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। বেচারা বাপজান ভয়ানক দুঃখ পাবেন। তাঁর স্নেহের মর্যাদা দিতে আমি যে-কোনো ক্ষেত্রে তৎপর। কোনো একটা উত্তেজনার ভেতর না থাকলে জীবন একঘেয়ে এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে। তামাসার জন্যে যেমন লোভ থাকে যৌবনে, তেমন শুনেছি, আর কখনো হয় না। কলেজজীবনে তামাসা অন্তহীন। যেদিন কিছু থাকে না, সেদিন হস্টেলের কোন বর্ডার-কে নিয়ে কিছু রঙ্গরস করা গেল। এই ক্ষেত্রে মগজের উদ্ভাবনী কৌশলের তারিফ না করে পারা যায় না। একসঙ্গে দশ বিশ জন থাকলেই দেখবে কারো না করো মাথা দিয়ে কিছু গজিয়ে গেছে। একসঙ্গে থাকার এসব লাভ। অবিশ্যি সামাজিক সমস্যা সালামত স্যার বলতেন, যদি মানুষ দেখে শেখে ঠিকমতো তাহলে তা নিয়ে একটা মানুষ সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে এবং অতি আনন্দ সহকারে। কারণ তাহলে উত্তেজনার উৎস আর কোনোদিন শুকিয়ে যাবে না। "এ এমনই অগ্নিগিরি তার অগ্নুৎপাত চিরকাল অনির্বাণ থাকে।" স্যারের বহু কথা আমার কাছে ঐশী-বাণীর মতো হঠাৎ-হঠাৎ প্রতিধ্বনিত হতো। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এই সমস্যা ক্রমশ ঘূর্ণিপাকের মতো মানুষের ভেতর, তা থেকে সংবাদপত্রের ভেতর এবং যে-সমতল থেকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভেতর ঘাই মেরে উঠতে লাগল। নিজের গাঁয়ে গেলাম এক ছুটি উপলক্ষে। পুরাতন শহরে আমার হস্টেল। সুতরাং খোলামেলা চওড়া রাস্তা বা জায়গার অভাব। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব আরো বেশি। গাঁয়ে এলে গাছপালা, দেদার প্রান্তর, খালবিল সব হঠাৎ যে-পরিবর্তনের সম্মুখীন তুমি হও তা-ই যথেষ্ট একজনকে আনন্দ দিতে পারে। তার উপর যদি আমার মতো মা-বাপ কেউ পায় পৃথিবীতে অন্য কী আর প্রয়োজন। প্রকৃতির বেষ্টন, তার সঙ্গে মায়া-মমতা-দরদের ছাউনির ভেতর দৈনন্দিন জীবনযাপন তো স্বর্গবাস। পুরাতন সঙ্গীসাথিদের নিয়ে আমি অবশ্যি বেড়াতে বেরুতাম কদাচিৎ মাঠে মাঠে, বেশিরভাগ ঘুরতাম পাড়ার ভেতর। শহরে গেলে তো সকলের সঙ্গে দেখা হয় না। আর দুএক দিনের জন্যে বাড়ি এলে মওকা মেলে কম জমাট আলাপের। আমাদের গ্রাম বড় হলেও একেক দিকে সকলের সম্পর্ক ছিল বেশ নিকট, তাই অনেক সময় বিকেলে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা হতো না। ওদিকে দুই প্রাণ অপেক্ষার্থী। সন্ধ্যায় আহারের পূর্ব পর্যন্ত শহরের গল্প শোনার জন্যে মা-বাবা বেশ অস্থির থাকতেন। মা একদমই নীরব শ্রোতা। বাবা পাল্টা অনেক জিনিস জেনে নিতে চাইতেন। বাবুর্চির কথা উঠলে তিনি জানতে চাইতেন ছেলেদের এত বায়না সে সহ্য করে কী ভাবে? সব জওয়ান ছেলে তো। ম্যানেজার হয় আপিসে। হস্টেলেও ছেলেদের মধ্যে একজন মেসের ম্যানেজার হয় যার উপর একমাসের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার দেখা শোনার ভার থাকে। ভয়ানক তাজ্জবের ব্যাপার পিতার জন্যে। এমন ব্যবস্থায় ছাত্রদের লেখাপড়া ক্ষতি হয়। বাপের তা মনঃপূত নয়। গাঁয়ে বেড়াতে বেরিয়ে কিন্তু অনেক খবর পাওয়া যায় সাধারণত চাপা থাকে। কারণ, পাড়াপড়শীর হাল হকিকত মুখে মুখে ফেরে। অমুকে কিছু রেশনের চিনি ব্ল্যাক করার জন্যে ভুয়া কার্ড বানিয়েছে। মজকুর ব্যক্তি তো নিজের কথা বলবে না ঘুণাক্ষরেও।

পাড়া-বেড়ানোর ভেতর দিয়ে গাঁয়ের হাওয়া বুঝা সহজ। বাপজান তো সব কথা আমাকে বলেন না। সম্ভবও নয়। বাপ-ব্যাটায় একটা আদবের ব্যাপার আছে। অনেক বিষয় দুই পক্ষ বেমালুম চেপে যাবে। আমি বাপের সব জানতে পাই অন্য পাড়ায় গিয়ে। নিজের অসুবিধার কথা তিনি কখনো বলেন কি না, আমার মনে করা দায়। কলেজে যাওয়ার পর তার এক আনন্দের নিমিত্ত হয়েছিলাম আমি। আমার গল্প তিনি ছুতোনাতা করে তুলবেনই। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে রিপোর্ট স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে পড়ে। তেমন সূত্রেই জানলাম এবার চাষবাস ভালোই হয়েছিল। কিন্তু পাটের মরসুম খুব খারাপ গেছে। একে তো নিজ খরচে কামীন গাবুর খাটিয়ে আবাদ। আজকাল ব্যয় বেশ বেড়ে গেছে। পাট উঠলে ফড়ে দালালরা পেয়ে বসে। অনেকে দাদন নেয়। তারা অল্প দামে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ফড়েরা খোঁজও রাখে। টাকার টানাটানি থাকলে চাষি বাড়ির পাট ধরে রাখতে পারবে না বেশি দিন। তখন দাম খুব পড়ে যায়। গঞ্জে নিজ খরচায় পাট নিয়ে গেলে সেখানে আড়ৎদার গলা কাটে না অবিশ্যি কিন্তু এমন দাম দেয় যে চাষের খরচাও ওঠে না। অথবা, উঠলেও তা না ওঠার সমান। বাপ্‌জান এসব কথা আমার সঙ্গে কোনোভাবে উঠলেই তা চাপা দিয়ে অন্য কথার খেই ধরবেন। অবিশ্যি আমাদের উভয়ের মধ্যে এই লুকোচুরি খেলা নতুন নয়। একবার রাগ করে যে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলাম তা এমন পরিস্থিতি উদ্ভূত। প্রায় ছুটিতে বাড়ি এলে এমন সতর্ক হয়ে উঠতেন যেন তাঁর সুবিধা অসুবিধার ছায়া আমার চোখে না পড়ে। কিন্তু আমি আর স্কুলের পড়ুয়া নই। শহরের আবর্তিত জীবনধারা এবং ঘটনাপ্রবাহ আমাকে বয়সের চেয়ে ঢের বেশি সেয়ানা করে তুলেছিল। পিতার মধ্যেও আমি পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তিনিও মা'র মতো নীরব শ্রোতা হতে চান আমাদের আসরে। দু-এক কথা ছাড়া সায় দেওয়ার তাগিদ কমে আসছিল ক্রমশ। আমারই দুই বোন বড়। অবিবাহিত। আমিই পিতার একমাত্র সন্তান এবং একমাত্র শিরঃপীড়া, আমার ভবিষ্যৎ ভেবে সদা হয়রান। গাঁয়ের ছোটখাট সুখ-দুঃখ সংক্রান্ত ব্যাপারে জানা শোনায় তিনি আগ্রহ দেখান। এমন প্রসঙ্গেই তিনি উত্থাপন করে এসেছেন সব সময়। এবার লক্ষ্য করলাম তিনিও প্রসঙ্গ বদলাতে পারেন। অবিশ্যি সেদিন আমাদের আসরে আরো দুজন মুরুব্বি ছিলেন। দুজনেই এপাড়ার নন, পাশের পাড়ার গ্রাম সুবাদে চাচা খলিল ও রহমান মিয়া। বেশ সম্পন্ন গেরস্থ দুজনেই। পঞ্চাশের বেশি বয়স। বাপের সমবয়সী। বাপজানই জিজ্ঞেস করলেন, "শহরে ভাষা নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে গরমেন্টের যেন গণ্ডগোল। আমাদের বুঝাও তো বা-জান আসলে ব্যাপারটা কী।" আমি প্রস্তুত ছিলাম না। পিতা এমন প্রসঙ্গ তুলবেন, আমার চিন্তার বাইরে। অপর দুজন সায় দিলেন। অর্থাৎ গ্রামেও ঢেউ এসে পৌঁছেছে। খলিল মিয়ার পাড়ায় আবার এক সাপ্তাহিক কাগজ আসে। তিনিও অল্প বেশি ওয়াকিবহাল। পাকিস্তান রাষ্ট্র হয়েছে কয়েক মাস। তার আইন-কানুন এখনো পাকা নয়, পুরাতন ধারায় চলছে। কিন্তু পাকা আইন তো একদিন না একদিন তৈরি করতেই হবে। নচেৎ দেশ চলবে কী দিয়ে? হাল-জামানায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের এক বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষা দরকার। সেই প্রশ্ন নিয়ে ভাষা সমস্যার আমদানি। আমার ইলেম ও আক্কেল অনুযায়ী আমি সবিস্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঁদের বললাম। তিন জনে একমতো এ নিয়ে কোনো মতভেদ হতে পারে না। বাংলা আর উর্দু হলেই তো সব গোলমাল চুকে যায়। খুব সোজা সমাধান। যে-কেউ এমন জবাব দেবে। কিন্তু তা এখনো হচ্ছে না কেন? তারও আমি কাটান দিলাম। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান। সুতরাং যা ইসলামের পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাবে, এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। উর্দু ভাষার মধ্যে আরবি ফারসি শব্দ আছে। তার অনেক সূত্র ইসলামের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। সুতরাং ওই ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। খলিল মিয়া কথাটা মেনে নেন। মুসলমানের জন্যে অমন চিন্তাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমার পিতা তা মনে নিলেন না। তিনি বললেন, "পাকিস্তান চেয়েছে ঠিক। কিন্তু তার জন্য বাংলা ভাষা ছাড়তে হবে কেন?" এই প্রশ্নের হদিস তাঁর বুঝার সাধ্যির বাইরে। তিন বর্ষীয়ান তখন একে অপরের কথা খণ্ডনে তৎপর। খলিল মিয়া যখন বলেন, উর্দু মুসলমানের ভাষা, তখন আমার বা-জান জবাব দিলেন, "আরবিও তো মুসলমানের ভাষা নয়। হযরৎ আসার পূর্বে অর্থাৎ হযরৎ মোহাম্মদ (দ.) আসার পূর্বে মুসলমান কোন দেশে ছিল? কিন্তু ভাষা তো পূর্বে থেকে চালু ছিল?" আমি পিতার এই জবাব শুনে থ'। সালামত স্যার যে বলেন "সাধারণ মানুষ যাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা হয় নি বা আদৌ যে-শিক্ষিত নয়, তারা কিছু বোঝে না, একথা ভুল। জীবনের পাঠশালা অনেক বড়। সেখান থোক অনেক কিছু শিখতে পারে।" আমি ঠিক সেই সময়ে আমার গ্রামের মানুষ পিতার প্রতিমূর্তির পাশে নগীবউদ্দীনের আদল খাড়া করে দেখতে লাগলাম দীপ্তি কোন দিকে বেশি। শিক্ষিত স্যার গুরুজন মানুষ, অথচ তাঁর যুক্তির বহর অমন যা একজন গ্রাম্যজনের কাছেও কল্কি পায় না। কেন, কেন লেখাপড়া শিখে নাকি মানুষ হয়। কিন্তু তা কী সব জায়গায় খাটে? তাহলে— তাহলে— শিক্ষিত জনের মধ্যে নিরক্ষরের সমঝেরও অভাব দেখা যায় কেন? শিক্ষা ব্যাপারটা তাহলে— তাহলে কী? মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা কোথায় মিলবে? মানুষের মন একেক দিকে ধায়। পেছন থেকে কী তাকে ঠেলে নিয়ে যায় বা সম্মুখে কী আকর্ষণ থাকে যে ঐ পথে ধাইতে মন বাধ্য হয়? উদ্ভট সব চিন্তা হয়ত। কিন্তু আমার কাছে তার প্রচণ্ড ধাক্কা বারবার এসে পড়ছিল। নিজের স্বাভাবিকতা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। গ্রামে এলে আমি পুরাতন কৈশোরের সঙ্গীসাথিদের খুঁজে বের করি এবং এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াই। সেবার দুদিন নানা ভাবনায় আমি এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে কারো সঙ্গে পছন্দ হতো না ঘুরে ঘুরে ঘরে এসে বাবার সঙ্গে গল্প করতাম, তাও আমার কাছে বিস্বাদ ঠেকল। অল্প সময় বসেই মাকে বলতাম, "মা, খাবার দেন, ঘুম পাচ্ছে।" বাপ হতাশ হতেন। তাঁর লায়েক ছেলের সঙ্গ থেকে তিনি বঞ্চিত। দ্বিতীয় দিনে আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন সোজা, "বা-জান, তবিয়ৎ খারাপ না তো?" ঠোঁটে হাসি ছিটিয়ে জবাব দিলাম, "না, এমনি। মাঠে অনেক ঘুরছি তো, তাই হাল্লাক।" অথচ সেদিন মাঠের দিকে যাই-ই নাই। পাড়ার এক বাড়িতে ঢুকে তাদের কাহিনী শুনছিলাম। জসিম মৃধারা চার ভাই। দুই ভাই অন্য জেলায় বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে আছে। জমিজমা এককালে এদের বেশ ছিল পিতামহের আমলে। জসিমের বাপের আমলেই বেচারাম ঢোকে। জমি ভাগ হয়ে যায়। বাপের মৃত্যুর পর জসিম যা পেয়েছিল

তা দিয়ে আর সংসার চলে না। কয়েক বিঘা মাত্র সম্বল। ভায়েরা দেশত্যাগের সময় এমন লোক-কে তাদের অংশ বেচে গেছে যে সীমানা নিয়ে শেষে মামলা মোকদ্দমা চলছে। দুমাস তিন-মাস অন্তর দিন পড়ে। এই মামলার খরচ যোগাতে ওরা সর্বস্বান্ত। মাথার উপর দুই বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। তাবুকের উপর জগদ্দল। জসিমের স্ত্রীকে চাচি বলে ডাকি জ্ঞানাবধি নয় যখন থেকে বোল ফুটেছে মুখে। তিনিই সংসারের কাহিনী একে একে বয়ান করছিলেন। দশ বছর আগেও তিনি ছিলেন বেশ প্রাণবন্ত মহিলা, কিছু বেপরোয়া। লম্বা ঘোমটা টেনে বা চাদরে মাথা গা ঢেকে, পর্দার প্রতি যথা-সম্মান দেখিয়ে তিনি প্রতিবেশীদের বিপদের কথা শুনলে চলে যেতেন বিশেষ করে, বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার সময় ধাইয়ের পাশে এই চাচি হয়ে পড়তেন বিশেষ সাহায্যকারী। আবার দেখা গেছে, প্রসব-বেদনা ওঠার পর কেউ ধাই ডাকতে গেছে, তারও বাড়ি গাঁয়ের এক টেরে, এদিকে বাচ্চা হয়-হয়, জসিম চাচি তখন ধাই এবং দক্ষ ধাই। এই জন্যে কোনো বাড়িতে পোয়াতি কেউ থাকলে ধাইয়ের পূর্বে অনেকে জসিম-চাচিকে বায়না দিয়ে রাখত, "বুবু, খবর দিলে আইস্যেন কিন্তু। এই মাইয়া তো আপনারই মাইয়া।" সেই চাচি এখন বুড়িয়ে গেছেন। চল্লিশ বিয়াল্লিশ বয়স। চুল বেশ পেকে গেছে, শরীরও ভেঙে গেছে। সবই দুঃশ্চিন্তায়। তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। তার ফিস্‌ফিস্‌ কণ্ঠস্বরে কানে প্রচণ্ড দাগ রেখে যায়। ছেলেবেলা থেকে চেনা। তখন থেকেই জসিম চাচি আমাকে চাচা বলে ডাকতেন। গলার স্বর যদিও অনেক খাদে নামিয়ে তিনি বলে যান, "চাচা, ঘরের কথা কি হগলরে কওন যায়। তোমার দুই বোন বিয়া দিছিলাম ভালো ঘর দিইখ্যা। অহন কপাল দ্যাহো। বড় জামাইডা ভালো মানুষ। জমি জায়গা ছিল। ভাতের অভাব ছিল না। নদীতে সব শ্যাষ কইরা দিছে। প্রতি বছর জমি ভাঙে। অহন হেরা ভাতের কাঙাল। কষ্টেসিষ্টে দিন চলে। ছোডো মাইয়াডা একদম পোড়া কপাল। জামাইডা আগথন নাকি খারাব। খবর তো পাই নাই। লোকের মুখে শুন্যা বিয়া দিলাম। বিয়ার পর ছ'মাস গেল না, হের সব খসলৎ টের পাইল মাইয়া। এহানে আইলে আমারে চুপিচুপি কইত আর কাইন্দত। তবু বাপের বাড়ি আইলে মনডা ভালো হয়। অহন তারে আনার পারি না। বড় আদরের মাইয়া ছিল। অহন পরানডা পোড়ে কিছু করার পারি না। জামাইডা চোয়াড়। মারধোর করে পেরায়। মান্‌ষের মুখে খবর দিলে কী করতাম চাচা। বুকের আগুন বুকে চাইপ্যা রাখি।" "ওকে আনেন না ক্যান?" "চাচারে, তুমি ঘরের পোলা, তোমারে কওয়ার পারি। তারে খাওয়ামু কী? অহন নিজেদের দিন চলে না। তোমার চাচা আমারে সব কথা কি বলে? ভালো মানুষ। দিন যায়, সংসার চালায়। আমারে তো সব কয় না। অহন মাইয়ারে আইনব। হে মাইয়া তো বড় চালাক। একবার আনছিলাম, আমাকে খুব বকা দিল। "মা আমারে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করছেন, বিয়া দিছেন। আঁর নসিবে যা আছে হইব। আমার তরে আপনেরা কষ্ট করবেন, হে আমি সইতা পারুম না।" বড় শেয়ান মাইয়া। সব বুইঝ্যা ফেলে যে তারে আনলে আমাদের ধারকর্জ করা লাগে। তাই কইলেও ওজর দেয়। এই মাস না ওই মাস। বড় দরদি মাইয়া। মাঝে মাঝে ভাবি ওদের বাড়ি গিয়া কদিন বুকের আগুন নেভাই। কিন্তু হেরা তো সুখে নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর হারামি পোলা জামাই। কয় দিন থাইকলে খরচ হইব, পরে মাইয়ারে খোডা দিবো। চাচারে বাঁইচ্যা আছি, কারণ মরণ আহে না। অহনও মানুষ ডাকে পোয়াতি খালাসের তরে। খাতির করে। তাই মাঝে মাঝে হাওলাত কিছু মেলে। কিন্তু চাচা রে, হাওলাত চাইবার সময় মইরা থাকি। কোনো পোয়াতির যদি মাইয়া হয়, খালাস তো আমিই করি, বহুৎ সময় ধাই আসার আগেই তা হয়। তখন মাইয়া হইলে মনেমনে ভাবি— খামাখা দুনিয়ায় আইল, কপালে কী আছে হে তো জানে না। কিন্তু বাড়ির লোকদের বলি, দ্যাহেন দ্যাহেন একদম রাজকন্যে অইছে। জাফর চাচা, দুনিয়ায় এইভাবে বাঁচা আমাদের দুঃখ কয়জনে আর জানে?" জানে না, আদৌ জানে না। শহরে বিচিত্র রঙ্গমালার মধ্যে এই গ্রাম-রমণীর আদিখ্যেতা কী কোনোদিন পৌঁছায়? সেখানে হয়ত এইসব নাকিকান্না আরো শ্লেষাত্মক ভাষার প্যানপানানি। আমার পিতৃদেব এদের দুঃখ বোঝেন। তাই তিনি পাড়াপ্রতিবেশীদের সাহায্যে আসেন। গ্রামে তাঁর মর্যাদা খুব বেশি। বোধহয় শুধু এই জন্যেই। কিন্তু জসিম-চাচির মতো পিতা আমার কাছে অনেক জিনিস গোপন করে রাখেন। দেড় বছর পূর্বে জমি-বেচা নিয়ে মতভেদ। বাড়ি থেকে পালিয়ে এদের বেশ কষ্ট দিয়েছিলাম। শুনেছি, আর দশ-পনেরো দিন দেরি করলে মা আর বাঁচতেন না। এমন পরিণাম হয়ত আমাকে উন্মাদ করে তুলত। তবে আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে চাষবাসে বাড়ির অবস্থা আর পূর্বের মতো নেই। আমি যদি লেখাপড়া চালিয়ে যাই, পিতা প্রচণ্ড বোঝা বইবেন আমার অগোচরে। তা আমি হতে দেব না। শহরে গিয়ে উপার্জনের একটা চেষ্টা করব। অবসর সময়ে টিউশানি তো চালাতে পারি। কিন্তু আমি মাত্র মেট্রিক পাশ। নিচের ক্লাসের ছেলেমেয়ে পড়িয়ে কটাকা মিলবে? ডিগ্রিহীন লোকের টিউশানি দেবে? তবু চেষ্টার ক্রুটি আমি রাখব না। সেবার গ্রাম থেকে আমার শহরে ফেরার সময় মনের অনেক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ হারিয়ে ফেললাম। আর দশজন ছাত্র যারা পিতার অভিভাবকতায় দিন গুজরান করে, আমি আর তাদের দলে নেই। আমাকে আমার অভিভাবকত্ব নিতে হবে মনের ভেতরে প্রায় এই চিন্তা ঘাই দিয়ে উঠত। অবিশ্যি আমি টিউশনি বা উপার্জনের অন্য কোনো পন্থা ধরব এমন কিছু করি নি। কয়েক মাস জীবন পূর্বধারায় চলল। কলেজ, হস্টেল, ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে চা-খাওয়ায় গুলতানি, রাজনীতি খেলাধূলা সিনেমার শ্রাদ্ধ। আর হপ্তায় একবার অন্তত নগীবউদ্দীন সাহেবের বাড়ি ধর্ণা দান। ১৯৪৮ সনের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল ভাষা নিয়ে বিতর্ক, মার্চ মাসে একটা হরতাল হয়ে গেল। তা আমার জন্যে একটা বিরাট উত্তেজনা। শহরের মধ্যে এত চাঞ্চল্যময় জীবনের গতি সহসা মন্থর হয়ে যায়, আমি তো আগে কখনো দেখি নি। কলেজে স্কুলে ক্লাস নেই। ছেলেরা পিকেটিং-এ বেরিয়েছে বিভিন্ন এলাকায়, সেদিন আমিও আলাওলের ধারেকাছে যাই নি। পাছে কোথাও কোনো কাজ মাথায় চাপিয়ে দেয়। ঘুরে ঘুরে দেখাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। যেন কোনো নতুন তামাসা দেখব— এমনই মনোভাব। হস্টেলে সকাল-সকাল খেয়েদেয়ে টইটই অনেক জায়গায় ঘুরলাম। চেনা-শোনা ছাত্র দেখলে আমি মুখ আরেকদিকে ফিরিয়ে রাখতাম। হঠাৎ এমন উত্তেজনা কোথা থেকে আসে, ভেবে পাই নে। কতগুলি ছেলেমেয়ে বা জনসাধারণ একটা দাবি

AMARBOI.COM

জানাতে চায় সকলকে, দেশের সরকারকে তো বটেই। কিন্তু এমন উত্তেজনা কোথা থেকে আসে, খুঁজে পাওয়া দয়া। আমি অংশ নিচ্ছি না, তবু কেন এমন হয়। কয়েকটা মিছিল পর্যন্ত দেখলাম, সেখানে গগণভেদী শ্লোগান শোনা যায় : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। সালামত স্যার বলেন, "জন-তরঙ্গ।" মানুষ যখন সম্মিলিত কোনো উদ্দেশ্য-সাধনে অগ্রসর হতে থাকে তা ঢেউয়ের মতো এগোয় এবং ক্রমশ উত্তাল হয়। তিনি এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন জন-তরঙ্গ। আমি এই তরঙ্গে সারাদিন কি, সকল মুহূর্ত অবগাহন করতে লাগলাম। এই কয়েক দিনই পূর্ব-পাকিস্তানের কোথাও না কোথাও রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সভা মিছিল এবং পুলিশের সঙ্গে বচসা বা ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছিল। ঢাকা শহরে রেলওয়ে কারখানার গেটে ছাত্রবন্ধুদের পিকেটিং করতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। খবরের কাগজের উপযোগিতা তখন থেকেই আমার কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথম সংবাদপত্র দেখার তাগিদ চাড়া দিয়ে উঠত। হস্টেলে বারোয়ারি একটি ইংরেজি এবং দুটি বাংলা খবরের কাগজ রাখা হত। কিন্তু হকার দিতে বড় দেরি করত। তা ছাড়া খবরের কাগজ আসার পর আবার পড়ার জন্যে হুড়াহুড়ি, প্রতিযোগিতা। হস্টেলে অবস্থাপন্ন দুতিন জন বোর্ডার নিজের পয়সায় কাগজ রাখত। খুব সকালে পাওয়ার জন্যে আমি তাদের কাছে ছুটে যেতাম ঘুম ভাঙার পর। রাষ্ট্রভাষাবিরোধীরা চুপচাপ বসে নেই। ঢাকা শহরেই কয়েক জায়গায় ছাত্রদের উপর গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে, একজায়গায় বইয়ের দোকান লুট করেছে। আর দেখা গেল, ঢাকা শহরে যারা উর্দুভাষী তাদের অধিকাংশই বাংলার বিপক্ষে। কিন্তু আমার তো দুচার জন ছাড়া কোনো অবাঙালির সাথে পরিচয় নেই। তাদের মনোভাব জানার জন্যে বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়লাম। বিরোধিতা মানে মৌখিক প্রতিবাদ নয়, শোনা গেল যে-সব জায়গায় নবাগত অবাঙালি সংখ্যায় বেশি এবং নিজেদের পল্লী তৈরি করে নিয়েছে সেখানে তারা রীতিমতো বাঙালিদের উপর হন্যে, মারমুখো তাড়া করে এসেছে। আবার অনুকরণ-জাত ব্যঙ্গস্বরে চিৎকার পেড়েছে, "বাংলা রাশ্ত্রোভাসা হোবে না, হোবে না।" শুধু ঢাকা নয়, সৈয়দপুরে এমনই কাণ্ড ঘটেছে। মজার কাণ্ড ঘটে যশোরে। সেখানে এক অবাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট-নন্দনী রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে শহীদ হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠেলাঠেলির মুখে তার দাঁত ভেঙে যায়। তার শ্বশুর বা স্বামী তখনো হয় নি, কিন্তু প্রমীলা সেজে খাড়া হয়ে গিয়েছিল উঁচু ক্লাসের সেই তরুণী। সন্ধ্যায় হস্টেলগুলোর ভেতরে তুমুল উত্তেজনা: "পছচিমা (পশ্চিমা) গুলোর মাথা ঠিক আছে নি? উইড়া আইস্যা জুইড়া বসছে, অহন এ দ্যাশে করার চায় কী?" আমি অজানিতে সায় দিয়ে বসি। কিন্তু তখনই মনে হয়, পূর্ব-পশ্চিম মিলে তো পাকিস্তান তৈরি হলো। দান উভয়ের। হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন? পাকিস্তান হবে সব মুসলমানের দেশ। এখন তাগের বহিরাগত মনে করা কি ঠিক? জবাব মিলে গেল, নগীবউদ্দীন সাহেবের কাছে, "আদৌ ঠিক নয়। ভাষার প্রশ্ন তোলাই উচিত নয়। উর্দু চায় ওরা। উর্দুই হোক। বাংলার কথা তুলে এখন রাষ্ট্রের বিপদ ডেকে আনা উচিত নয়। হিন্দুস্থান তো ওৎ পেতে বসে আছে।" আমি দ্বিধায় পড়লে দুই মুরুব্বির কাছেই ছুটে যাই। সালামত স্যার বললেন, "ভাষা মানুষের সহজাত জন্মাধিকার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত শত বছর তার বনিয়াদ। সে শিকড়-উচ্ছেদ অত সহজে করা যেতেই পারে না। তা করলে বরং রাষ্ট্রের বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ বাড়বে। রাষ্ট্র তখনই দুর্বল হয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষতিকর আর কিছু নেই। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো উর্দুভাষীদের মধ্যে বিবেচক মানুষ আছেন। তারা কখনই কেবল উর্দুই রাষ্ট্রভাষা করতে রাজি হবেন না আর একটা ভাষা যখন আছে এবং যা শতকরা ৬৮ জনের মাতৃভাষা। আর খোঁজ নাও কোন ধরনের লোক এসব না বুঝে শুধু বাংলা বা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতি। আবেগের বশবর্তী হয়ে যেমন মানুষ কোনো আন্দোলনে যায়, তেমন স্বার্থের তাগিদেও ধাইতে পারে। কখনো কখনো স্বার্থ এবং আবেগ একত্র হয়। কোনো আন্দোলনে দেখবে কিছু লোক আছে সমর্থক কিন্তু গোঁড়া সমর্থক। আবার অনেকের সমর্থন তেমন গুপ্ত নয়। বর্তমানে যা চলছে তা ঠিক নয়, সত্য। তবে ভবিষ্যতের জন্যে যা চাই তা হলে ভালো হয়, না হলে নাচার, দিন চলে তো যাচ্ছে। ওদের মনোভাব কতকটা এই রকম। এসব নির্ভর করে প্রত্যেক ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা অনুভূতির বনিয়াদের উপর।" সালামত স্যারের কথা কি সব আমি ঠিক বুঝেছিলাম? তবে আমার কৌতূহল জেগেছিল অবাঙালি মনোভাব জানার জন্যে। কলেজে কিছু অবাঙালি ছেলে ভর্তি হয়েছিল। একমাত্র উর্দু ক্লাসের সময় তারা আলাদা হয়ে যেত। নচেৎ প্রায় তো একসাথে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, উর্দুভাষী ছেলেদের কাছ থেকে বাঙালি ছেলেরা আলাদা হয়ে থাকত। ওদের নিজেদের একটা দল ছিল। স্বভাবতই মেশার সুযোগ বা উৎসাহ না পেলে, ওরা কী করবে? তার জন্যে তো দোষ দেওয়া চলে না। আমার তিন চারটি ছেলের সঙ্গে বেশ আলাপ ছিল, একজনের সঙ্গে খাতির— না, খাতিরের চেয়েও একটু অধিক হৃদ্যতামুখী সম্পর্ক। তার চেহারা এবং আচার ব্যবহার আমাকে প্রথমে আকর্ষণ করে। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথার চুল ঝাকড়া, এবং মুখাবয়বে অদ্ভুত কমনীয়তা প্রায় কাহিনী-সুলভ। এই রেজা কাজমী কথা বলত ধীরে ধীরে কিন্তু ঠিক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যেন, কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা অমন-ই। অথচ সে শান্তস্বর, শান্ত মেজাজ হালে-চালে শরিফ। তার জগতে তাড়াহুড়ার কিছু নেই। আমি স্কুলে উর্দু পড়েছিলাম দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে। সেই ইলেমের উপর ত নির্ভর করা চলে না। ভাঙা-ভাঙা কিছু শব্দ ইংরেজিযোগে বলার চেষ্টা পেতাম। আর একথা ঠিক যে অপর দিকে যদি হৃদয়বান দরদি শ্রোতা থাকে তা হলে ভাষা তেমন কোনো বাধা নয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে। রেজা কাজমী বাংলা আদৌ জানে না। তবে আমার কিছুটা উর্দু জ্ঞানের উপর সে নির্ভর করতে পারত। ব্যাকরণের ভুল কি বাচন-ভঙ্গির ত্রুটি, তা ধর্তব্যের ব্যাপার নয়, উন্মুক্ত হৃদয় সেখানে আসল মক্কেল। কয়েক দিন ক্লাসে রেজাকে দেখি নি। হয়ত অসুখ-বিসুখ করে থাকবে। কয়েক মাস পূর্বে তার বাড়ি গিয়েছিলাম তারই অনুরোধে। অবিশ্যি রেজার মুখ-জবানি অনেক কিছু জানা হয়ে গিয়েছিল ওই পরিবারের এবং পরিচয়ও সকলের সঙ্গে। রেজার বাবা জাভেদ কাজমী বর্তমানে সত্তর বছরের বৃদ্ধ। শরীর এখনো শক্ত আছে বলা চলে। তিনি আজীবন কংগ্রেস-সেবী, পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন না, পাকিস্তানে এসেও করেন না। এখনো মুসলিম লীগের নেতাদের কুৎসিত ভাষায় মন্তব্য করেন চায়ের টেবিলে ছেলেদের সামনে। কট্টর জাতীয়তাবাদী। তবু

তিনি কেন পাকিস্তানে এলেন? তার কারণ, বিহারে গড় মুক্তেশ্বরের দাংগা। সেখানে মুসলমান হলেই তুমি দুশ্‌মন, তোমার সারা জীবনের দেশ-সেবার কোনো দাম নেই। রেজার বাবা প্রদেশ কংগ্রেসের কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন, তবু আর কংগ্রেসে আস্থা রাখতে পারেন নি। এই পরিবারের আত্মীয় সাত-আট জন মারা গেছে দাংগায়। একটি এগারো জনের পরিবারে বেঁচে ছিল মাত্র তিন জন। এই অবস্থায় ছেলেদের জিদ, পিতৃস্নেহ, বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষার অচেতন তাগিদ— ইত্যাদির ফলে জাভেদ সাহেব যুগ-যুগান্তরের পিতৃপুরুষদের আবাদভূমি ত্যাগে শেষপর্যন্ত রাজি হন। তাঁর স্ত্রী তো গোড়া থেকেই হন্যে হয়েছিল দেশত্যাগে। এমনকি প্রস্তুতির অপেক্ষায় তিনি রাজি ছিলেন না। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, যখন যাওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন রেজার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করলেন। এই আকস্মিক মৃত্যুর পর পিতা জাভেদ কাজমী সাহেব দেশত্যাগের ইচ্ছা আবার বাতিল করে দেন। কিন্তু বড়ছেলে শাহেদ আহ্‌সানের ভয়ানক পীড়াপীড়ি ও আবেদনে মত বদল করেন। ওদের সংসারে লোক এখন দুই অবিবাহিত বোন সোগ্‌রা ও আম্মারা, দুই ভাই রেজা এবং শাহেদ, শাহেদের স্ত্রী— তাদের এক সন্তান, পাঁচ বছর বয়স এবং স্বয়ং আব্বাজান মোট এই সাত জন। ওঁদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না, নিম্ন মধ্যবিত্ত। বাপ ছোটখাট ব্যবসা করতেন। এককথায় দারিদ্র্য ছিল না ঠিক, তবে প্রাচুর্যও না। পাকিস্তানে আসার সময় বাড়ি জমিজমা বিক্রি করে দিয়েছিল খুব সস্তায়। কারণ, গরজ বিক্রেতার। সেই টাকা দিয়ে তারা ঢাকায় এসে নবাবগঞ্জে একটা দোতলা বাড়ি কিনেছিল, দেশত্যাগী এক পরিবারের কাছে। চার কাঠা জায়গাসহ পুরাতন বাড়ি। ছোট ছোট গোটা পাঁচেক কামরা। নিরাপত্তা যেখানে প্রধান হয়ে পড়ে সেখানে মনের বাছবিচার আর রুচির দিকে ধায় না। বাপ খুঁৎখুঁৎ করতেন। কিন্তু ছেলে ও মেয়েরা খুব খুশি হয়েছিল। পাকিস্তানের জন্য। তাই এমন নিরাপদ জায়গা পাওয়া গেল, নচেৎ কী যে দুর্দশা হতো তাদের। বাপ বলত, এ হারামি বাচ্চা দ্যাখো না ভবিষ্যতে কী হয়। দোতলায় পশ্চিম দিকে বিপত্নীক ভদ্রলোক একা থাকতেন। বড়ছেলে শাহেদ খুব চালু ছেলে। ঢাকায় এসেই সে উর্দুভাষী অফিসারের সঙ্গে জমিয়ে নিয়ে আমদানি ব্যবসার লাইন করে নিয়েছে। প্রথম মাল এনেই সে প্রচুর লাভ করেছে। বাপকে বলেছে, আল্লা যদি মেহেরবান হন, আর দুচার ক্ষেপ ব্যবসা হলে তারা মোহাম্মদপুরে বা আর কোথাও রিফিউজি এলাকা গড়ে উঠবে— কথা হচ্ছে— সেখানে উঠে যেতে পারবে নিজেদের মনমতো বাড়ি তৈরি করে। ভয়ানক আশাবাদী সে। দুই বোনকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে এইট বা ক্লাস নাইনে। তবে শাহেদ বড় নাক উঁচু করে। ঢাকা শহরের লোক বড় রক্ষণশীল (ওর ভাষায় কন্‌জারভেটিভ) এবং বড় কট্টর পর্দাপ্রথা পালন করে। তা হওয়া উচিত নয়। তার বোনেরা রিক্‌শায় স্কুলে যেত প্রথম প্রথম পর্দা টানিয়ে। এখন আর টানায় না। পাড়ার লোকেরা বড় ক্ষুব্ধ। কিন্তু বিহারিদের সঙ্গে তারা ঝগড়া করতে সাহস পায় না। রেজা কাজমী আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এমনকি বোনদের সঙ্গেও। অবিশ্যি ওর বাবাই বেশি কথা বলতেন, নানা কিছু জানতে চাইতেন : এদেশের হাল-চাল জানারও কৌতূহল ছিল তার। কিন্তু সবসময় তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হতেন আমার সামনেই একবার বড় ছেলের সঙ্গে বেশ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল এমন পর্যায়ে যে বাপ চায়ের টেবিল ছেড়ে চলে গেলেন। ছেলে যত আশাবাদী পিতা তত নৈরাশ্যের বিভীষিকাচারী। বাপ সোজা বললেন সবাই তো ব্যবসা করে না বা সবায়ের অফিসার মুরুব্বি নেই। সাধারণ মানুষের কী হবে? আমাদের টাকা ছিল বাড়ি কিনে মাথা-গোঁজার ঠাঁই করে ফেললাম। কিন্তু লাখ লাখ উদ্বাস্তুদের কী হবে? "আব্বা, যো হোনে কা হোগা আপ কিউ এৎনা ঘাবড়াতে হেঁই। ইয়ে আপ্‌কা আদৎ পড় গিয়া।" অর্থাৎ, আপনার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সারাজীবন ছোট ব্যবসার অবসরে রাজনীতি করেছেন জাভেদ কাজমী। অপরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো তার অভ্যেস বৈইকী। পুত্রের কথায় বেশ চটে ওঠেন উনি এবং উঠে চলে যান। আমার সামনেই তা ঘটেছিল। কিন্তু বর্তমান আমার জানার আগ্রহ অন্য বাথানে। অবিশ্যি সেদিনের কলহ আর বেশি দূরে এগোয় নি বা কোনো এক পর্যায়ে ছেলে ক্ষমাপ্রার্থনা-সহ মিটিয়ে নিয়েছে। তা আন্দাজ করা যায়। আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী না হলেও। কারণ, পরে দেখেছি দুজনকে একত্রে চা খেতে এবং বাক্যালাপ করতে। সেদিন আমি তো আর বিনা স্বার্থে রেজা কাজমীর বাড়ি যাই নি। আমি বৃদ্ধজনকে সোজা জিজ্ঞেস করে বসলাম, তিনি কী ভাবছেন ভাষার ব্যাপারে। তিনিও বললেন, দ্বি-জাতি তত্ত্বের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রত্যেকের ভাষা যার যা তা-ই থাকবে। রাষ্ট্রভাষা একটা যদি করা সম্ভব না হয়, দশটা হবে। কিন্তু শাহেদ পিতার উল্টোমত পোষণ করে। রেজা নিরপেক্ষ নয়, সে পিতার দিকে। আমাকে খুশি করার জন্যে সে এমন কথা বলে নি। তার প্রমাণ আমি পরে পেয়েছিলাম। কলেজে উর্দুভাষী বহু ছেলের মাতৃভাষা এবং পাকিস্তানের প্রতি টান এমন উৎকট যে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করে। আমাদের কলেজে অবিশ্যি অপ্রীতিকর কিছু হয় নি। কিন্তু অনেক জায়গায় ঝগড়াঝাঁটি এমনকি মারামারি পর্যন্ত গড়িয়েছে। রেজা সেখানে যুক্তির সাহায্যে সকলের শান্ত হওয়ার পক্ষপাতি। কিন্তু আমার সব উদ্বেগ মিটল না। উর্দুভাষী এই কটা মানুষ তো ওদের সকলের প্রতিনিধি নয়। এরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। এদেশের তুলনায় সুখেই থাকে। কিন্তু আরো তো বহিরাগত মানুষ আছে যারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে এসেছে এবং উর্দু মাতৃভাষা না হলেও উর্দু জানে বা বলে, যেহেতু ছেলেবেলা থেকে শেখা শুরু করে। ঢাকা শহরের প্রাচীন অধিবাসী আছে, তারাও উর্দুর সমর্থক। এক মিছিলের উপর তারা হামলা চালিয়েছিল। বেচারারা কিন্তু অধিকাংশ গরিব। রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলে তাদের কিছু উপকার হবে না। তবু এমন আচরণ কেন? জাভেদ কাজমী বৃদ্ধ মানুষ, জাতীয়তাবাদী বা ন্যাশনালিস্ট ছিলেন, তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত জবাব প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে শুনেছি অনেক জাতীয়তাবাদীই আবার সব ভাষা বাতিল করে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতি। আমার কাছে ব্যাপারটা পারিষ্কার হয় না। তবে সালামত স্যার আমার চোখ অনেকখানি খুলে দিয়েছিলেন। আরো এক ঘটনায় আমি আরো পথ দেখতে পেলাম। নগীবউদ্দীন স্যারের কথার জন্যে তো সেখানে হাজিরা দিই না। নীরব এক বাসনার তাগিদে আমাকে ঠেলে নিয়ে যেত সেই ছিমছাম ড্রয়িংরুমে। এমন দিন খুব কমই গেছে যেদিন সিতারা ড্রয়িং রুমে আসে নি। যেদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে গায়েব থাকত, ওদের চাকরবাকরকেও গর-হাজিরির হদিস জানার সাহস হতো না আমার, পাছে ওরা কেউ কিছু মনে করে। ভৃত্যকুল থেকে সংবাদ মনিবদের কাছেও বিচরণক্ষম। এমন শূন্য দিনে আমি ফিরে আসতাম অশেষ আত্মধিক্কারসহ এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, আমার নীরব অঞ্জলি তো বৃথা। অন্যজন তো কিছু জানবে না কোনোদিন, যদি এইভাবে চলতে থাকে। আর জানলেইবা কী? ওকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার তো কোনো আশাই করা যায় না বর্তমান পর্যায় থেকে। বাউণ্ডেলে অশিক্ষিত উপার্জনহীন এবং আরো ভয়াবহ উপার্জনের জ্ঞানহীন— অন্যদিকের শিক্ষার সিঁড়ি যা তা-কে ঐসব স্বর্গে পৌছে দিতে পারে, তার তো এই প্রথম ধাপ মাত্র। ফল কি কোনোদিন শাখা সহ নিচে ঝুঁকে আসে ক্ষুধার্ত অনুরাগীর ঠোঁটে ধরা দিতে? অবমাননার রোলারের তলায় ফেলে নিজেকে শত ধারায় রগড়াতাম। কিন্তু স্মৃতি মুছে যেত নিমেষেই। পরদিনই হয়ত আবার দেখা যেত আমি হেঁটে চলেছি। গন্তব্য, আন্দাজ করার জন্যে কাউকে খুব বেশি তকলিফ করতে হবে না। আমার গন্তব্য অধ্যাপক নগীবউদ্দীনের কোয়ার্টার। সিতারাকে আমার একবার দেখা দরকার। যে সমস্যার কোনো কুল-কিনারা নেই, কি নিকট কি দূর-ভবিষ্যতে, হতাশার পোঁচ যেখানে অহরহ গভীর হয়, সেখানেও কেন মানুষ অনর্থক মাথা কোটে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, এসব থেকে বেশ রেহাই পাওয়া যায়, যদি অন্য কোনো উত্তেজনার মধ্যে ডুবে যেতে পারো। ১৯৪৮, হ্যাঁ মার্চ মাস, কদিন তুমুল উত্তেজনা গেল। তখন বেশ দিন কেটে যায় কিন্তু তা কেটে গেলেই আবার নিজের সুখদুঃখ বড় হয়ে ওঠে। তখন আবার এমন ব্যক্তিগত ব্যাপার তোমাকে পীড়িত করে। কিন্তু রোজ-রোজ কি জীবনে উত্তেজনা থাকতে পারে? এমন কিছু কি আছে যা আমাকে সারাজীবন অমন নেশার মধ্যে ডুবিয়ে রাখবে? যারা সারাজীবন একটা আদর্শ নিয়ে থাকে, তারা কি এমন কিছু পায় যে, অন্য কিছু আর তাদের দরকার করে না? এসব ভাবনা আমার ভেতর চাড়া দিয়ে উঠত। তেমন কিছু পেলে ওই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। ছুটির সময় তখন এক দুদিন দেরি করে বাড়ি যেতাম। আগে তো ছুটির তারিখের দিকে চেয়ে হন্যে মা বাবার মাঝখানে গিয়ে পৌছানোর জন্যে। এমন সব মানসিক ফেরে বড় জেরবার হতে হয়। অথচ ছুটিতে বাড়ি না গিয়ে উপায় থাকে না প্রথমত পকেটের জন্যে। কিছু পয়সা বাঁচে। বাবার উপর চাপ দিয়ে আদৌ সোয়াস্তি পেতাম না। তবু দুচার দিন এদিক-ওদিক করতাম। এই দোটানায় মাঝে মাঝে অস্থির, আমার বাঁচার উপর ধিক্কার এসে যেত। অবিশ্যি তা শুয়ে-শুয়ে আকাশ-পাতাল বিচরণের সময়। খাড়া অবস্থায় আমি সচল মানুষ যার কাছে পৃথিবীর সব, যেখানে বাঁচার মধ্যেই স্বর্গ-সুখ লুকিয়ে আছে। সিতারা কি বসিরন এমন সব তাজা তরুণীদের চিন্তায় আচ্ছন্ন হলে লেখাপড়ার কত ব্যাঘাত। তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হতো। লেখাপড়া অবহেলা করতে পারতাম না। কিন্তু অভ্যন্তরীণ খোঁচায় জেরবার। আলাওলের মতো ছেলেরা আমার হিংসার পাত্র হয়ে উঠল। ওরা বেশ আছে। ছাত্ররাজনীতি করে এবং তা নিয়ে উত্তেজনার ভেতর বসবাস চব্বিশ ঘণ্টা। কিন্তু আমি তেমন তাগিদ পাই না কেন? যে-টুকু তাগিদ পাই তা তেমন প্রবল নয়। কিন্তু ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো হলে আমার লেখা পড়ায় বেশ ব্যাঘাত ঘটবে। হয়ত ফেল করে যাব। তাহলে তো মরার দশা। বাপ-মার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। খাবি খাচ্ছিলাম। শহর অহর্নিশ তরঙ্গিত মুহূর্তে। মাঝে মাঝে আমি শুধু নিঃশ্বাসের জন্যে অস্থির থাকতাম। নাগরিক ঝলমল চাকচিক্যের প্রতি আমার সব আকর্ষণ নিভে যেত। আমি সেই বামন যে চাঁদ হাতে পাওয়ার প্রবল বাসনা বুকে চেপে আকাশের দিকে বারবার তাকায় এবং মুঠি বন্ধ সে করে খোলার পর। কিন্তু করতালু শুধু খালিই থেকে যায়। তখন অজানিতে চোখ আসমান ছেড়ে মুঠির ভেতরে ঢোকে। এই জেরবার ক্লিষ্ট দিন। এক সন্ধ্যায় আমি সেখানে গিয়েছিলাম। নগীব স্যার অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ বেশি উৎফুল্ল, আমাকে দেখেই সম্বোধন করলেন, "এসো এসো।" কণ্ঠ আন্তরিকতায় ছয়লাব। সিতারা তখনো বাইরে আসে নি। যদি বাইরে কোথাও না গিয়ে থাকে কোনো আত্মীয় বাড়ি কি অন্য কোনো সামাজিকতা রক্ষায় তা হলে সে একবার আসবেই আমার গলার আওয়াজে। এই ক্ষীণ সূত্র-ধারাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নচেৎ নিকট অন্ধকারে আর স্বর্ণধূলি আহরণের যৌক্তিকতা কোথায়? ড্রয়িংরুমে আর কেউ ছিল না। স্যারের হাতে একটা হ্যান্ডবিল জাতীয় কাগজ। তা পড়ছিলেন, আমাকে দেখেই বোধহয় উল্টে চাপা দিয়ে রাখলেন। সেদিকে ছাপা কিছু নেই। আতিথেয়তায় নগীব স্যারের জুড়ি নেই। সকলকে চা খাওয়ান অন্তত একখণ্ড বিস্কুট সহযোগে। কোনোদিন তার চেয়েও রসনা-তৃপ্তিকর আর কিছু। আমার সঙ্গে দু কথা বলার পর তিনি হাঁক দিলে, "ও রে চা দিয়ে যা এককাপ।" হায়দারী হাঁকে অনেক দূর যায় অন্দর পর্যন্ত তো বটেই। একটু পরে কোনো ভৃত্য এল না, এল আমার সবচেয়ে প্রতীক্ষিত নয়ন-লোভা, যার এক হাতে চায়ের কাপ অন্য হাতে তস্তরিতে একজোড়া সন্দেশ। নিশ্চয় কোনো সুসংবাদ বা ঐ জাতীয় কিছুর অভিঘাতে এই পরিবার বেসামাল আনন্দে শরিক। সিতারা যথারীতি টেবিলে দুই তস্তরি রেখে এক চেয়ারে বসে পড়ল। সোজা তার দিকে তাকাতে সাহস পাই নে। আড়চোখ সহায়। সিতারা সালোয়ার কামিজ আর ওড়নায় দেহ-বল্লরী ঢেকে এসেছে আজ। আরো স্মার্ট এবং আকর্ষণক্ষম শোভাময়ী এক মূর্তি। অন্যান্য দিনের মতোই সে চুপচাপ বসে থাকে। কথা বলে না। একমাত্র প্রশ্নের হ্যাঁ-না জবাব ব্যতিক্রম। আজও উন্নত গ্রীবা, নতুবা পোশাকে সচেতন লজ্জার শিকার সিতারা নীরব। মুখ খোলা রেখেছেন শুধু নগীবউদ্দীন স্যার। কয়েক কথা বলার পর তিনি আরেক কাপ চায়ের তৃষ্ণা অনুভব করলেন। তারপর কন্যার দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র সে উঠে গেল। বিরাট শূন্যতার গহ্বর থেকে আমি শুনতে পেলাম, "জানো জাফর, আজ আমি একটি ঝক্কি থেকে কিছু মুক্ত। সিতারা পশ্চিম পাকিস্তানে একটা বৃত্তি পেয়েছে। ও লেখাপড়া সেখানেই করবে। মানুষের দুই চোখের মতো পাকিস্তান দুই অংশ যদিও মাঝখানে চৌদ্দশ মাইল ব্যবধান, বিজ্ঞানের যুগে আসল নৈকট্য হচ্ছে সম্পর্ক। দুই অংশে সম্পর্ক ঠিক থাকলে স্থানের দূরত্বে কিছু আসে যায় না। আমার মতে, এইভাবে এক দিকের ছেলেমেয়ে অন্য দিকে লেখাপড়া শিখলে কালে কালে আমরা সত্যি পাকিস্তানি হয়ে যাব। স্বপ্ন দেখেছিলাম পাকিস্তানের। তা বাস্তব হলো। কিন্তু এখনো স্বপ্নের পরবর্তী অবস্থা অর্থাৎ আবছা অবস্থা। কালে কালে

সব রঙ হবে গাঢ় বিস্তৃত। কদিন পরেই সিতারা লাহোর চলে যাবে।" অধ্যাপক নগীব আরো কী কী বলেছিলেন, সেদিন সব আমার কানে ঢোকে নি। সিতারা কয়েকদিন পরে লাহোর চলে যাবে। ওই কটি শব্দ শুধু কর্ণপটে বাজনা বাজিয়ে চলে গেল এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তের পানে এবং আমি বধির হয়ে গেলাম না শুধু, বধির হয়ে রইলাম সেই গোটা সন্ধ্যা। আমার দুই চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে গেলে আমি তা সানন্দে বরণ করতাম। কারণ, দেখার জন্যে যে অদম্য আকুলতা যন্ত্রণার কশাঘাতে পরিণত হয়, তার কোনো ভয় আর আমার থাকত না। চুপ করে রইলাম। আমার মুখে কোনো ছাপ নেই ভেতরের দহনের। সিতারা ফিরে এসেছিল চায়ের কাপ নিয়ে। চাকরবাকরকে দিয়েও পাঠাতে পারত। এই দয়াটুকু তখন আমাকে উজ্জীবিত রেখেছিল। নগীব স্যার অন্য দিকে প্রগলভ। নানা কথা বললেন, অতীত জীবনের। সাবেককালে ছাত্ররা কেমন ছিল, তিনি কেমন ছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু কী শুনছিলাম আমি বলতে পারব না। মাঝে মাঝে সায় দিচ্ছিলাম তার কথার উপর। তা শুধু অধ্যাপককে তন্ময় রেখে সিতারার মুখ-পানে তাকানোর ছলনা। হঠাৎ চুমু খাওয়ার তীব্র ইচ্ছা আমাকে পেষণ করছিল। কিন্তু সুযোগ কোথায়? উপন্যাসে বিদায়-চুম্বনের দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু সেখানে তো দুই পক্ষ থাকে। এখানে আমি একা। আরেক জনের মনে কিছু থাকলেও অপ্রকাশিত। একদিন আমার হাতে সে সাপ দেখেছিল অতীতে, সেই ছবিটা আবার চকিতে খেলে গেল। একরকম তিক্ততায় ভরে উঠল সারা দেহ। খামকা মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন। পৌরুষের অভাবে এসব ঘটে। অধ্যাপক একবার উঠে অন্দরে গেলেন, তার পেছন পেছন সিতারা। আমার অস্তিত্ব তার কাছে ছিল কি না বোঝা গেল না। শূন্য আসর। এই ফাঁকে আমি উল্টানো প্রচার-পত্রটির হেডিং দেখে রেখে দিলাম, যথারীতি চাপা দিয়ে, খুব দ্রুত গতি, পাছে ধরা পড়ে যাই। হঠাৎ পদধ্বনি শোনা যায়। চেয়ে দেখলাম, পিতা নয়, দুহিতা ফিরে এসেছে। সে আর বসল না, আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বললে, "দুদিন পরে চলে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে, আশা রাখি।" আমি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কোনো জবাব আসছিল না মুখে। কিছু বলব তার পূর্বেই আবার পদধ্বনি শোনা গেল। সিতারা চকিত ত্রস্ত অন্দর অভিমুখে, আমি বসে পড়লাম সমস্ত উত্তেজনায় পানি ঢালতে যেন আমার মুখে কোনো রকম ছাপ কোথাও এতটুকু না থাকে। নগীব স্যারের সঙ্গে মামুলি কিছু কথায় যোগ দিলাম। আজ ভাষা, ইসলাম, পাকিস্তান, তমদ্দুন বা এই ধরনের কথা উঠল না। সাধারণত সন্ধ্যায় অনেক লোক জময়েৎ হয়, তাও আজ নেই। আমি তখন নিজেকে একা পেতে চাই। কিন্তু নগীব স্যার আরো আধঘণ্টা দেরি করিয়ে দিলেন। তার মুখেও শোনা গেল আবার "মেয়েটাকে পাঠাতে হাংগামা আছে। টিকেট, কাপড়-চোপড়। দরজিকে মোটে দুদিন আগে কাপড় দেওয়া, এইসব ঝামেলা। দুদিন পরে তো চলেই যাবে। এই দুদিন আর এসো না সন্ধ্যায়। আর চেনাশোনাদের বলে দিও।" একা ফেরার সময় বুকের আলোড়নের মুখে পথ-হারা। পা ফেলেছিলাম কীভাবে আমার অজ্ঞাত। আমার সমস্ত অনুমান মিথ্যে। অঙ্গভঙ্গি ভাষা হতে পারে। তেমন ভাষাও তো কখনো দেখিনি গত দেড় বছরে। "আবার দেখা হবে, আশা রাখি।" ঐশীবাণীর মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিধ্বনিত হয় আমার চতুর্দিক ঘিরে। আশা রাখা কেন? আশা কি ছিল পূর্বে? পাড়াগাঁ থেকে নতুন আগত আমার বেশভূষায় আকর্ষণীর কিছু ছিল না। স্বাস্থ্য হয়ত ভালো। পেশল তাগদের চিহ্ন পরিস্ফুট, তা আয়নার সামনে দেখা। কিন্তু কী আছে আমার আবার সাক্ষাতের লোভ যা উদ্রেক করতে পারে? হস্টেলে ফেরার সময় সংগীতময় অন্ধকারের লোভে এক গাছের ছায়ায় দাঁড়ালাম। কিন্তু স্থির থাকেত পারলাম না। অনেক মানুষের দয়া থাকে প্রাণে বেশি। আমি কী সে-ই দয়ার পাত্র হয়ে উঠেছিলাম? কীভাবে হস্টেলে ফিরে এসেছিলাম খোদাকে মালুম। আদৌ ক্ষিধা ছিল না। শুয়ে পড়েছিলাম রাত্রে কিছু না খেয়েই। ঘুমও ধরেছিল। আশ্চর্য একটানা ঘুম। ভোরে উঠলাম। হঠাৎ মনে হয়, এই পৃথিবী আমার চেনা নয়। আমি এখানে যেন স্বপ্ন দেখছি এখনো। জেগে আছি যেমন সত্য, স্বপ্নে বিচরণও তেমন সত্য। একসঙ্গে দুই আলাদা উপাদান মিশে গেছে আমার মধ্যে। আমার কিছু প্রয়োজন নেই এই পৃথিবীতে। "আবার দেখা হবে।" কার মুখ থেকে এ কথা বেরিয়েছিল, কে সে? ভবিষ্যৎ হাঁক দিয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে। কিন্তু বর্তমানে কেন? ব্যাকরণ মিথ্যে হয়ে যায় চক্র-ফেরে। আমার পাশের রুম-মেট পড়ুয়া ছেলে, কিন্তু আমার হাবভাবে বোধহয় অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিল। সে বললে, "আপনাকে রাত্রে খেতে দেখলাম না। কখন এসেছেন তা-ও জানি নে। বাড়ির খবর, আপনার শরীর ভালো তো?" পৃথিবীতে যেন এইমাত্র আমি ফেরৎ এলাম। রুম-মেটের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা হাই তুলে জবাব দিয়েছিলাম, "স্বপ্ন দেখেছি, বিকট স্বপ্ন।" আমার মিথ্যে বলা পরে সত্যি প্রকৃত ঘটনা হয়ে দেখা দিত। সত্যি সিতারাকে স্বপ্নে দেখতাম। কখনো বিরাট অজগর সর্পিনী কখনো বিকটাকার প্রেতিনী। আমার রেহাই ছিল না ঘুমের ঘোরেও। কিন্তু দিন ক্রমশ আমাকে সংযত করে তুলছিল। ভাষা বা অন্য যে-কোনো সামাজিক তর্কে জড়িয়ে পড়তে আমার বেশ ভালো লাগত। কিন্তু আমার এমন বেপরোয়া স্বাধীনতার দিন যেন শেষ হয়ে আসছে। গাঁয়ে গেলে আঁচ পেতাম। কত সঙ্গীসাথি ছিল গ্রামে। সকলের নসিবে কলেজের দরজা পর্যন্ত যাওয়া লেখা ছিল না। জীবিকার তাড়নায় নানা দিকে ভেসে যেতে হয়েছে অনেক-কে। কেউ ভিন জেলায় গিয়ে প্রাইমারি স্কুল খুলেছে নিজের চেষ্টায়। একজন তো মসজিদের ইমাম। কিছুই জানত না সে শুধু আজান দেওয়া ছাড়া। আমার মতো ম্যাট্রিক পাশও নয়। কিন্তু নাচার। সংসারে বাপ-মার গলগ্রহ হয়ে উচ্চাশিক্ষার সুযোগ ছিল না তার। আমার খুব নিকট-সঙ্গী ছিল পাটোয়ারী পাড়ার খালেক পাটোয়ারী। সে গাঁয়েই থেকে গেছে। কোথাও যায় নি। নিজেদের জমি ছিল, তার কিছু বর্গা দেয়, কিছু নিজেই চাষ করে। দরকার পড়লে বীজ ফেলা, রোয়া প্রভৃতি কাজে নিজেই লেগে যায়। কোনো উচ্চাশা তার চোখের সামনে নেই। কিন্তু সে খুব দুঃখ পায় তা মনে হয় না। প্রথমে আমাকে এড়িয়ে চলত খালেক। কিন্তু ইদানীং বাড়ি গেলে সে এসে খোঁজ-খবর নেয় এবং বেশ কিছু সময় কাটিয়ে যায়, অন্য জরুরি কর্তব্য মাথার উপর না থাকলে। গতবার শহরে আসার সময় সে আমার সঙ্গে সঙ্গে নদীর কিনারা পর্যন্ত এল আমাকে নৌকায় তুলে দিতে। তারপর গঞ্জ ধরে বাস ধরে রেল-স্টেশনে। যাতায়াতের ফের কম নয়। খালেক ব্যক্তিগত অনেক খবর

বলল। তার পিতা কিছু কষ্ট করলে হয়ত তার উচ্চশিক্ষা হতে পারত। কিন্তু তিনি খামখা অনিশ্চিত ঝুঁকি নিতে রাজি নন। আগে তিনি দেখেছেন লেখাপড়া শিখে অনেকে বেকার থাকে। তাই খালেকের বাপ খুব হুঁশিয়ার। কিন্তু ছেলে আমাকে বললে, পুরাতন দিন কি চিরকাল থাকবে? ব্রিটিশ আমল, তার উপর হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল। এখন তা আর নেই, থাকবে না। পাকিস্তান হয়েছে তো মুসলমানদের সুখ-সুবিধার তরক্কির (উন্নতি) জন্যে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা না থাকলে তো যে-কলুর বলদ সে-ই কলুর বলদ হয়ে ঘানি টেনে জীবন যাবে। খালেকের এই কথা আমার বহুবার মনে হয়েছে। খালেক ভাবে, যে-যেখানে জন্মেছে, সেখানে তার হিল্লে হলে তো এত দুঃখ থাকত না দুনিয়ায়। খালেকের দুঃখ আমার মতো সঙ্গী হারিয়েছে সে। গাঁয়ের উপর তার মায়া প্রচণ্ড। আমি কেন গাঁ ছাড়লাম, কিসের আশায়? আশা একটা আছে নিশ্চয়। নচেৎ বাপ-মা ছেড়ে বিদ্যা-অর্জনে যাওয়া কেন? শহরের চাঞ্চল্যমুখর ঘূর্ণির মধ্যে ওইসব প্রশ্ন আমাকে ঘায়েল করে ছাড়ত। সিতারা চলে যাওয়ার সেই মোহ-আচ্ছন্নতা আমাকে বেশি দিন ঘিরে রাখতে পারল না। কারণ, নানা দিকে আকস্মিক টান। বসিরন আমাকে কখনো প্রচণ্ডভাবে টানে নি। নগীব স্যারের ড্রয়িংরুমের আর আকর্ষণ কোথায়? তা ছাড়া, অধ্যাপক-কে আমি চিনে নিয়েছি সেদিন যে হ্যান্ডবিল তিনি চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, তা বাজারেই ছাড়া হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে ভাষা সম্পর্কিত বচসা যখন তুঙ্গে। কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অধ্যাপক সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছিলেন, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বেশ চড়া ভাষায়। ওরা নাকি সকলে বিদেশী রাষ্ট্রের চর অথবা দালাল। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন নগীবউদ্দীন স্যার। আরো আশ্চর্য, সালামত আলি সাহেবও অন্তর্ভুক্ত। আমার দিশাহারা হওয়ার উপক্রম। সালামত স্যার যিনি নগীবউদ্দীনের বিভাগীয় সহকর্মী হলেও তার বাড়ি কোনোদিন আর যান নি। এমনকি বাক্যলাপ পর্যন্ত বন্ধ। কিন্তু এমন সহ-অবস্থান কেন? এই দ্বন্দ্বের ফয়সালা তো সহজ নয়। আমি একদিন ওঁকে নিভৃতে পেয়ে সোজা জিজ্ঞেস করেছিলাম, রহস্য কোথায়। "সংসারে ঢুকে দেখো, জাফর, কত প্যাঁচ। এখন চাকরি ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার আরো পোষ্যি আছে, গাঁয়ে বুড়ো বাপ-মা এবং এক বিধবা বোন দুটো বাচ্চা নিয়ে। এদের আমি কোথায় ফেলে দেব? ওদের কাছে না বলা অর্থ জীবিকা থেকেও 'না'। অনেক ভেবেচিন্তেই বিবেকের মুখে আমি কালি দিয়েছি। লেখাপড়া শিখলেই মেরুদণ্ড হয় না বা মানুষ হওয়া যায় না।" স্যারের এই আদিখ্যেতার পর নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। "তাহলে কে পথ দেখাবে আমাদের? কলেজের নিজস্ব আরামদায়ক কোয়ার্টার, কিছু আরামে থাকা-খাওয়া-ঘুমের ব্যবস্থা যদি শিক্ষিত জনের কাম্য হয়ে ওঠে, তাহলে তো শতবার মূর্খ হয়ে থাকা শ্রেয়।" মন এইভাবে ফুঁসে উঠলেও, সেদিন চুপ করেছিলাম। আমার সামনেও হয়ত ভবিষ্যতে এমন সব উভয়সংকট প্রতীক্ষা করছে। আর্থিক নিরাপত্তা মানুষের মেরুদণ্ড হতে পারে। সব ক্ষেত্রে তা হয় না। বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক। কিন্তু সালামত স্যারের ম্রিয়মাণ কণ্ঠস্বর সেদিন আমাকে কম দুঃখিত করে নি। সৎ মানুষ হওয়া পৃথিবীতে বড় কঠিন। যারা সোজা দুচারটে উপদেশ খয়রাৎ করে বগল বাজায় নিজেদের আক্কেলের, আত্ম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিমার, তারা আসলে ভণ্ড অথবা আহম্মক। ক্ষমার্হ কণ্ঠস্বর সালামত সাহেবের। "জাফর, আমাকে তুমি কী ভাববে আমি জানি নে। কিন্তু শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা আমার অন্তত নেই।" একজন শিক্ষক ছাত্রের সম্মুখে নিজেকে এমনভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছেন আমি নিজেই অসোয়াস্তির মধ্যে পড়েছিলাম। "আমিও পাপী, অবিশ্যি, জ্ঞানপাপী। কিন্তু আমাকে নগীব মনে করো না। সে ইহকাল গুছিয়ে নিচ্ছে। সেই জন্যে ওদের মুখে আখেরের কথা, আখেরাতের (প্রলয় দিন) কথা এত বেশি। নিজের ছেলেমেয়েদের কেমন ভাবে সুখ-সুবিধা জুটিয়ে দিতে হয়, তা-ও সে ভালো জানে। একসঙ্গে অথচ বিবৃতিতে সই করেছি, করতে হলো। জানোয়ারের সঙ্গে বসবাস করলে অপরে তোমাকে জানোয়ার ছাড়া আর কিছু ঠাউরাবে না।" এসব কথা শুনে আমার একটা মঙ্গল হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই অন্তত দিনের আশপাশ আরো ভালোরূপে দেখতে শিখলাম। আমার নিজের খামখেয়ালিপনা আমাকে আর অত কাবু করতে পারত না। সিতারার স্মৃতির দহন অনেক শীতল হয়ে এল। স্বপ্নালু উন্মনা একরকমের নেশার বিলাসিতা আগে পেয়ে বসত আর সহজে ছাড়তেই চাইত না। তেমন বহুক্ষণ স্থায়ী নিষ্ক্রিয়তা থেকে রেহাই পেতাম। বসনময় যবনিকার আড়ালে সিতারার অঙ্গরাজীর কাল্পনিক দৃশ্য আঁকা সহজ হয়ে উঠত। টগবগ যৌবনের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু মানসিক চাপ চতুর্দিক থেকে এমনভাবে আমাকে ঘিরে ধরল যে হঠাৎ বুড়িয়ে গেলাম। জওয়ানেরা অত হিসেব করে না কোনো কাজে। বৃদ্ধরা হিসেবী। আমাকে হিসেবের খাদে পড়তে হলো। ছাত্রজীবনে বিরাট ধাক্কা। একমাস টাকা এল না বাড়ি থেকে। চেনাশোনা সহপাঠী বা ছাত্রসঙ্গীদের কাছে হাত পাততে হলো নিজের মাথা জলাঞ্জলি দিয়ে। বাড়ি থেকে টাকা এলে শোধ করে দেব এই ভরসা। তখন কাটা মাথা আবার জোড়া লাগবে। মাসের মাঝামাঝি বাড়ি থেকে টাকা এল ঠিকই। কিন্তু বরাদ্দের অর্ধেক। দেনা-শোধ করে খাব কী অর্ধেক মাস? তাই লজ্জা আর মুছতে পারলাম না। কোনোরকমে মাস গেল। নগরজীবন এবং ছাত্রজীবনের তরঙ্গিত অস্থিরতার মধ্যে আমি যেন হঠাৎ স্থবির কোনো পদার্থ নির্বিকার অস্তিত্ব যাপন করছি। এখানে আমি বেমানান, বেঢপ। শুধু লেখাপড়ার ব্যাঘাত নয়, জীবনের স্বাদ ক্রমশ আমার কাছে অন্তর্হিত এবং আমি নিজের মধ্যে ক্রমশ গুটিয়ে যেতে লাগলাম সেই সময়। কিন্তু এইভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না। জীবনের এই মাত্র প্রারম্ভ। এখনই যদি এমনভাবে মুষড়ে যাই, বাকি জীবন কী করব। বাড়ি থেকে পরের মাসের প্রথম হপ্তায় চিঠি এল, বাপ বেশ অসুস্থ, আমার একবার বাড়ি আসা দরকার। নিজের হাতে লিখেছেন চিঠি। অবিশ্যি দুবার নিষেধাজ্ঞা আছে তার মধ্যে। আমার লেখাপড়ার ক্ষতি হলে যেন না যাই। শরীরের খবর পরে চিঠি দিয়ে বাপ জানাবেন। কিন্তু আমার উদ্বেগ কিছুতেই থামল না। বুড়ো মানুষ। মাত্র পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। গাঁয়ে বুড়ো ধরা হয়। কিন্তু শহরে নাকি কোনো বয়সই নয় পঞ্চাশ। শরীরের জন্য আহার লাগে। আহারের যে রকম-ফের আছে, তা আমিও আগে জানতাম না। আর সেই রকম ফেরের দৌলতে গাঁয়ে বুড়ো হতে সত্তর বছর পেরিয়ে যায়। আর কেউ-কেউ চল্লিশেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়। বাপজান প্রায় বলেন "বল বুদ্ধি ভরসা, চল্লিশ পেরোলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফর্সা।" অর্থাৎ চল্লিশই আয়ুর মেয়াদ ধরা হয়। বাড়ি আমি যাবই, বাপ যা খুশি লিখুন। কিন্তু আমার কাছে রাস্তা-খরচ পর্যন্ত ছিল না। পিতার চিঠিই করুণা-উদ্রেকের নিমিত্ত হয়ে উঠল। ধার পাওয়া তো দায়। যারা সঙ্গীদের জন্যে চায়ে খরচ করতে সমর্থ, ভবিষ্যতে তারা কর্জও পায়। কিন্তু আমি তো নির্বিত্ত। সুতরাং হাত কী দিয়ে দরাজ করব? লজ্জায় মাথা কাটা যায়, তবু হাত পাতা ছাড়া উপায় ছিল না। কোনো রকমে রাস্তাখরচ যোগাড়। কয়েক ঘণ্টা পথে যায়। ইতোমধ্যে কিছু নাস্তা খেতে হয়। ওই বাড়তি খরচটুকু করার সুযোগ পর্যন্ত ছিল না আমার। বাড়ি পৌঁছলাম। স্বভাবতই বাপ-মা শীর্ণমুখ দেখে আগেই এমন উৎকণ্ঠা প্রকাশ শুরু করলেন যে তাদের কুশল জানার সুযোগ পেতে আমার দেরি হয়। বাপের জ্বর হয়েছিল খুব। তিনি ঘাবড়ে যান। নিজেকে অতি বুড়োর দলে ধরেন। অসুখ মানেই হঠাৎ কিছু ঘটে যাওয়া। কিন্তু সন্তানের মুখ না দেখে মরার কথা তিনি ভাবতে অক্ষম। তাই চিঠি লিখেছিলেন এবং লেখার পর আবার অনুতপ্ত হয়েছেন, লেখাপড়া শিখতে বিদেশে গেছে ছেলে। তাকে এইভাবে বিব্রত করা ঠিক নয়। আমাকে টাকা পাঠাতে না পারার কৈফিয়ৎ দিলেন। একবারই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অপরাধীর মনে যদি অপরাধ বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায়, তা বারবার ফিরে আসতে বাধ্য। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েই পিতা ওই প্রসঙ্গ কতবার না উত্থাপন করতেন। গ্রামে কোনো ডাক্তার নেই। তিন মাইল দূরে থাকে এক চিকিৎসক যিনি 'পাশ-করা ডাক্তার' নামে খ্যাত। কারো অসুখ-বিসুখে তাকে খবর দেওয়াই তো দায় হয়ে পড়ে। কজনের আর বাড়তি লোক রাখার মতো ক্ষমতা আছে আর কজনই বা পয়সা খরচ করে লোক পাঠাতে পারে? ধরা গেল, ব্যয়-সক্ষম এক পরিবার। কিন্তু লোক অনেক ক্ষেত্রে সময়মতো মেলে না। এমন সব অসুবিধার মধ্যেই তো দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করে। এই প্রবাহ চলছে যুগের পর যুগ। কিছু করা সম্ভব নয় এমন অসুবিধার প্রতিকারে? এসব আমাকে ভাবিয়ে তুলত। যখন গ্রামে ছিলাম বাপ-মার নিকটে তখন অনেক কিছু জানতাম না। শহরের স্বল্প জীবন কিন্তু আমার ভেতর যতই অস্থিরতার উৎস হোক, আশার উৎসও তার চেয়ে কম হয় নি। অনড় গ্রামগুলো কবে নড়বে? খালেক পাটোয়ারীর সঙ্গে যোগাযোগ ইদানীং ঘন হয়। সে-ও গ্রাম জীবনে আরো কিছু খোঁজে। অবিশ্যি চাষবাসে সে বেশ মন বসিয়ে ফেলেছিল। আমার ওকে হিংসা হতো। আমি ওইভাবে মানিয়ে নিতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। চার-পাঁচ দিন গাঁয়ে থাকলেই আমি তখন হাঁপিয়ে উঠতাম। মা-বাপের নৈকট্যে আর তেমন মাদকতাময় কিছু থাকত না। বাপ সেরে উঠছিলেন। আমার গতমাসের টাকা কি আরো এই মাসের টাকা এবং দশ-পনর টাকা আরো বাড়তি তিনি যোগাড় করে দিলেন। কী ভাবে যোগাড় করলেন? তখন আমি মিষ্টি ধমক খেলাম। "বা-জান, এই গেরামে ছেলেবেলা থেকে আছি। অপরের দায়ে-দফায় যেমন আমি যাই আমার দায়ে-দফায় তেমন অপরে আসে। এসবের ভেতর তুমি সান্ধায়ো না। যদ্দিন বাঁইচ্যা আছি, কিছু চিন্তা করো না। খোদার যা ইরাদা তা-ই হইবো। তুমি মন দিয়া লেখাপড়া কইরবা, কোনো চিন্তা রাখবা না।" পিতার কৌশলের কাছে আমি হেরে গেলাম। তিনিও নিশ্চয় আমার মতো কারো কাছ থেকে কর্জ করেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তা সংসারে থাকতে গেলে করতে হয় এবং তা অস্বাভাবিক কিছু নয়, এই দিলাশা দিয়ে তিনি আমার ক্ষোভের পাল থেকে বাতাস কেড়ে নিলেন। খালেকের সঙ্গে অনেক সুখ-দুঃখের কথা হয়। মুরুব্বিরা কী করে সংসার চালায়, তা সে আজও জানে না। একটা পরম নিশ্চিন্তের ভেতর তার বাস, খালেকের কথায় তা স্পষ্ট হয়ে এল। আমি পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে পিতার সুনামই শুনলাম। অবস্থা ভালো থাকলে অপরকে সাহায্য করা যায়। খাদে যখন নিজেই পড়ে গেছ তখন নিজের ওঠার পূর্বে তো আর কাউকে তোলার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বাপজান এক আজব মানুষ। আরো কয়েকদিন গাঁয়ে রয়ে গেলাম। তখন আমি মানুষ চেনার জন্যে অস্থির। আমার জানা দরকার, যুগ যুগ মানুষ কীভাবে অসুবিধার হাজার জগদ্দল বুকে ঠেলে ঠেলে বাঁচে। কেন এমন ঘটে? এমন সব প্রশ্নের মুখে জেরবার আমি হাঁটতাম গাঁয়ের পথে পথে কখনো একা, এবং বেশিরভাগ খালেক পাটোয়ারীর সঙ্গে।

এখানে থেকে প্রশ্নের জবাব মিলবে না, শহরে গিয়ে জানতে হবে। অনেক কিছু জানার আছে— যেমন সালামত স্যার জানেন। এই সময় গাঁয়ের গাছ-পালা নদী-নালা পশু-পাখি সকাল-সন্ধ্যা তুমুল দুপুরের ভেতরে চোখ এবং মন বড় শান্তিময় প্রলেপ খুঁজে পেত। একা থাকলে তো বিশাল মাঠের উপর দিয়ে বেবহা দৃষ্টি ছেড়ে দিতাম। তখন বিশেষ কিছু যে দেখতাম, তা না। তবে আয়নার সমতলের মতো আমার মন। তার উপর চলমান নানা ছায়া, নানা রঙ। অনেক সময় একজায়গায় বসে পড়তাম। কোনো ঝোপের আড়ালে যেখানে তোমাকে কেউ দেখে না, কিন্তু তুমি দেখতে পাও দূরের মাঠঘাট আর মানুষকে দৃষ্টি-বিন্দুর ভেতর অবস্থান অনুযায়ী ক্রমশ বিলীয়মান অথবা অনুপাত-মাফিক দৃশ্যমান। সব-কিছুর পেছনে নানা জিজ্ঞাসা নানা-রঙের সুতোয় জবাবগুলো বেঁধে দে দোল উড়িয়ে দিচ্ছে, সেখানে জটিলতা শুধু জড়াজড়ির নয়, বরং প্রচণ্ড গতির। যার ফলে, তুমি অনড়তায় স্তব্ধতায় বুঁদ। অনেক দূর থেকে চেতনার বুদ্বুদ ভেসে আসে, কী যেন শব্দ তোলে— হয়ত তা কোনো অর্থময় ভাষা; কিন্তু তোমার বোধগম্যের বাইরে। গ্রামের সীমানায় মন টিকত না। মনে হয়, আর কোথাও যাই। কিন্তু গন্তব্য বারবার একই শহর এবং ঢাকা শহরের আদলে ভেসে উঠত। খালেক পাটোয়ারীকে বললাম, "গাঁয়ে আমিও ফিরে আসতে চাই। অন্তত তোমাদের কাছে পাব। বুড়ো বাপ-মার সেবা করার সুযোগ মিলবে।" সে বেশ বাধা দিলে, "ও কাজ করো না, খবরদার। এই তো আমি আছি। কিন্তু ঠিক যাকে মন-টেকা বলে, তা কিন্তু ঠিক আমার নেই। তবু আছি; এখানে থাকলে কেউ মানুষ হয় না।" পাটোয়ারীর জবাবে আমার পাল্টা প্রশ্ন করার ইচ্ছে হয়েছিল, মানুষ বলতে সে কী বোঝে। কিন্তু তা আর করলাম না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমার মানসিক অবস্থা যা-ই হোক, বাপজানের কাছে এমন প্রস্তাব দিলে তাঁর নিঃশ্বাস হয়ত হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেকে নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন, যখন দেখি বেশ কষ্ট সহ্য করেও তিনি আমার উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার অমন পক্ষপাতি। শহরে ফিরে যাই। তারপর যা-হয় করা যাবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত। গ্রামের কত মানুষ বড় শহর দেখে নি। তাদের অসোয়াস্তি বোধহয় কম। এমন প্রশ্নও আমাকে

ঘায়েল করত। হয়ত শহরে আসাই আমার উচিত হয় নি। কিন্তু তা-ই কী? মুনশী পাড়ার বড় মিয়া কবির উদ্দীন তো প্রায় শহরে যান। ছেলেরা সেখানে বড় বড় চাকরি করে। তারা গাঁয়ে আসে বছরের দু বছরে এক আধ দিনের জন্যে। কই বড়ো মিয়া তো শহরে থাকেন না। লোকমুখে শোনা, তিনি বৈঠকখানা গুলজার করে সকাল-সন্ধ্যায় যখন বসেন, তখন গল্পচ্ছলে বলেন, "শহরে আমি থাকতে পারব না। চাপা চতুর্দিক, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আমার এই খোলামেলা গাঁ-ই ভালো।" তার মনের এই স্থিতি কোথা থেকে এল? অবিশ্যি বড় মিয়া এখানে একজন সত্যি মাতব্বর। লেখাপড়া গাঁয়েই, ম্যাট্রিকও যায় নি। কিন্তু বাপ-মার প্রচুর জমিজায়গা ছিল, হম্বিতম্বি করে থাকতে পারে। আগেও তা করত। এই জন্যে কি গ্রাম তার কাছে প্রিয়? আর খাওয়া পরার অভাব নেই। অথচ ছেলেদের তিনি গাঁয়ে রাখতে পারলেন না। কোথা দিয়ে কী ঘটে, তা বুঝার জন্যে অনেক চিন্তা ভাবনা প্রয়োজন। শহরে ফিরে এলাম। কিন্তু আমার ভেতরে এক অসোয়াস্তি আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সিতারা বিদায় নিয়েছে। কোনো পোড়ানির ছ্যাঁকা অন্তত আমাকে পীড়িত করে না। স্মৃতি অবসর বিনোদনের আয়োজন হিসেবে তোফা চিজ, তার বেশি কিছু না। কিন্তু তরুণী কেউ চোখে পড়লে তার প্রতি ঘৃণা উদয় হতো এবং মুখ দিয়ে খিস্তি এসে যেত। সালামত স্যারের বাসায় যাওয়া তাই একদম কমিয়ে ফেলেছিলাম। বসিরনকে দেখলে আমার হিংসা ছাড়া আর কিছু জাগত না মনে। মন এমনই জংগলে পরিণত। অথচ বিরাট সংকটের মুখোমুখি আমি। শেষ সিদ্ধান্ত নিলাম, কলেজের বেপরোয়া জীবন আমার জন্যে নয়। হাত-পা চালু অথচ বাপমার গলগ্রহ হওয়া অর্থহীন। অন্তত আমার পৌরুষে বেধেছিল। লেখাপড়া ছেড়ে উপার্জনে মন দেব। কিন্তু এই প্রস্তাব পিতার কাছে দেওয়া মানে তাঁর অকাল মৃত্যু ডেকে আনা। তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রোজগার করব পিতার অগোচরে, এমন একটা পন্থা তো গ্রহণ সম্ভব। কিন্তু পিতা যদি মাস-মাস টাকা পাঠান, আর আমি তা জমিয়ে রাখি, যেহেতু আমার উপার্জন আছে, তাহলে বাপের বোঝা আর লাঘব হয় কী করে? অথচ সেই জন্যেই তো এত ফন্দি। অবিশ্যি ফন্দি একটা মনেমনে এঁটে রাখলাম। বাপ টাকা পাঠালে মনিঅর্ডার নেব ঠিকই। কিন্তু সেই পরিমাণ অর্থ কোনো বাহানা করে আবার আমি পাঠিয়ে দেব। এইভাবে চলতে পারে। গাঁয়ের লোক শহরে আছে বেশ কিছু। কিন্তু তারা এত দূরে দূরে থাকে যে পথেঘাটে কদাচিৎ দেখা হয়ে যায়। সুতরাং সেদিক থেকে তেমন ভয় নেই ফন্দি ধরা পড়ার। কিন্তু সমস্যা কী চাকরি পাওয়া যাবে, কোথায় পাওয়া যাবে? এমন সংকট-আবর্তের মুখে দিশাহারা হওয়ার উপক্রম। কদিন ক্লাস বাদ দিলাম। জীবনের এই প্রত্যুষে এমন ঘন অন্ধকার। মাঝে মাঝে মন এমন বিগড়ে যেত যে একটা কিছু ঘোর অপরাধ করে জেলে চলে গেলে মন্দ হয় না, এমনও ভাবতাম। কিন্তু যাদের দুশ্চিন্তা লাঘবে এত পাঁয়তারা, তাদের যন্ত্রণা কি হালকা হবে অমন বেয়াড়া কর্মে? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কয়েক জায়গায় দরখাস্ত করলাম। রুম-মেটদের কাউকে কিছু বলি নি। আমার কাছেও অবাক লাগত প্রায় দুবছর শহরে এলাম, এখানে তেমন কোনো সহপাঠী পেলাম না কেন খালেক পাটোয়ারীর মতো? এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্রেফ মনের উপর নির্ভর করতে হয়? জবরদস্তি অচল। সামাজিক নানা সমস্যার ভেতর ডুবে যেতে চাই। সেই সংকল্প যখন ভেতরে চাড়া দিয়ে উঠছিল তখনই এমন ঝামেলায় পড়লাম। সিতারার ঘটনা আমাকে ব্যঙ্গ হেনে যেতে লাগল ক্রমে ক্রমে। নিজের দুর্বলতা ঢাকার অছিলা হয়ত আমাকে নারীবিদ্বেষী করে তুলছিল। এত ঝটপট মানসিক এইসব আওড়-পরিবর্তন যে আমি তাড়াতাড়ি যেন বুড়িয়ে যাচ্ছি মনে হতো। অথচ তর্ক করতে আমি এখনো লড়ুয়ে মোরগ। ভেতরে এত ঝড় তবু আমার ছাত্রজীবনের দৈনন্দিনতায় কিন্তু কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। সরকারি চাকরির ঝামেলা দেখলাম মেলা। চরিত্র বিষয়ক সার্টিফিকেট দাও তার উপর পুলিশ রিপোর্ট। এত কাঠখড়ের ব্যাপার। সালামত স্যারের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট অবিশ্যি রেখেছিলাম। অনেক চেষ্টার পর প্রাইভেট ফার্মে একটা চাকরি পেয়ে গেলাম নিজের সুপারিশে। বিজ্ঞাপন-প্রার্থীকে স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত দেওয়ার নির্দেশ ছিল। কেরানির কাজ। যদিও আনাড়ি। তবু আমার কাজকর্ম শিখে নিতে বেশি বেগ পেতে হয় নি। ছোট ফার্ম। পাঁচ-ছজন কর্মচারী। ওদের আমদানির ব্যবসা ছিল সামান্য। বেশিরভাগ দেশের মধ্যেই মাল কেনা-বেচা আসল কাজ। আমাকে সবসময় আপিসে বসে থাকতে হতো না। ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার জন্যে ওদের পুরাতন এক কেরানি ছিল। আমদানি লাইসেন্সের কাজ-কর্মে মালিক হাবীব সাহেব নিজে চাটগাঁ যেতেন। তারপর ঢাকায় এসে ব্যাংক-মারফৎ মাল আমদানির ঝামেলা পোহানো। ব্যাংকের কাজ ক্লিয়ারিং এজেন্টের কাছে যাওয়া, যারা চাটগাঁর কাস্টমস্ থেকে মাল ছাড়িয়ে ঢাকা পাঠাত রেল-মারফৎ, তাদের আপিসে যোগাযোগ বা তৎসম্বন্ধীয় ঝামেলা পোহানোর ভার ছিল প্রায় আমার উপর। তদুপরি ছিল চিঠি লেখা বা জবাব দান। মালিক নিজেই একাউন্টেন্ট। আমার দুঃখ ছিল ভেতরে অনেক। কিন্তু আশ্চর্য, আমি মানিয়ে চলতে চেষ্টা করলাম নতুন এই অধ্যায়ের সঙ্গে। পেছনে পড়ে আছে এক রঙিন জগৎ। পৌনে দুবছরের কলেজ জীবন। ধিক্কার দিয়ে বসতাম নিজেকে। সমাজে কে কোথায় জন্মেছে, তা-ই তার অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। কাউকে জীবন হাত ধরে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়, কারো জন্যে পথই হয় দুর্গম। কিন্তু ধৈর্য্যের পরীক্ষায় আমি বোধহয় সহজে ফেল করতাম না। কেরানি-জীবন আমার কাছে তিক্ত মনে হতো কোনো দুর্বল মুহূর্তে। কিন্তু কাজ আমি ঠিক করতাম। আপিস আমার কাজে খুব খুশি ছিল। আর মাস মাস মাইনা— মোটে ষাট টাকা— তো কম কথা নয়। নিজের খরচ তিরিশ চল্লিশে বেশ কুলিয়ে যেত। কুড়ি টাকা বাঁচাতে পারতাম। বাপজানের টাকা খরচ করতে হতো না। এই আনন্দ আমাকে কাজের প্রেরণা যুগিয়েছিল পরিমাপহীন। অবিশ্যি সমস্যা কম পোহাতে হয় নি। প্রথম এক মাস হস্টেলে থেকে চাকরি করতাম। কিন্তু সেখানে তো বেশি দিন থাকা অসম্ভব। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। নিজের গরজে বাসা খুঁজে বেড়ালাম। শেষে নারিন্দা এলাকায় একটা মেসে সিট পেয়ে গেলাম। দশ টাকা সিটের ভাড়া। এক ভদ্রলোক ম্যানেজার রূপে এই মেস চালিয়ে যেতেন। অবিশ্যি তিনিও চাকুরে। আমাদের সঙ্গে ছিল চকবাজারের এক দোকানদার কেরামত আলি। সে-ও ছিল আমার মতো ম্যাট্রিক পাশ। অন্য কোনো চাকরি করতে পারত।

কিন্তু অমন জায়গায় কেন পড়ে আছে, আমার জানার কৌতূহল ছিল, কিন্তু কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কে জানে কেঁচো খুঁড়তে যদি সাপ বেরিয়ে যায়। বাপের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলছে। তা ওদের জানার বাইরে। ঠিকানা বদলেছি, তা বাড়িতে জানালাম তিন-চার মাস পরে, তার আগে হস্টেলে গিয়ে চিঠির খোঁজ নিতাম। বাপকে জানিয়েছিলাম, হস্টেলে খরচ আর গণ্ডগোল দুই-ই বেশি। তাই অমন সিদ্ধান্ত। মেসে আমার কেনা ছোট টেবিলের উপর বই সাজানো থাকত। পিতার কথা বলা যায় না, যদি কোনোদিন এসে পড়েন। হস্টেলের চেয়ে খরচ কম তাই বাজানকে মাসে দশ টাকা কম পাঠাতে বলতাম। পরে লিখলাম, টিউশানিতে বেশ টাকা পাওয়া যায়। এখন আর টাকা পাঠাবেন না। দরকার হলে লিখে পাঠাব। কিন্তু আমার তা আর দরকারই হতো না। পুরাতন দিনের হাতছানি মাঝে মাঝে বিহ্বল করে তুলত।

শেষে এই কলম-পেষা জীবন। ভেতর ভেতর অস্থির হয়ে পড়তাম। ছুটির দিনে কোনো কোনো দিন সালামত স্যারের কাছে যেতাম। তিনি কেন কলেজে আর আমাকে দেখেন না? শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে কোনোরকমে দায় উদ্ধার। কিন্তু মন আর সেখানে বসত না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়তাম। বসিরন আমার কাছে অবান্তর। বাঁচার লড়াই এবং তা আপাতত একজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা কেন্দ্রিক মাত্র। বাপ মাঝে মাঝে পোস্টকার্ড লিখতেন হাজার দোওয়া বোঝাই। আমি যে তাঁদের বোঝা কাঁধে নিতে আরম্ভ করেছি, এই জন্যে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। 'আল্লা তোমার হায়াৎ দরাজ করুন।' তা যেন এখনই বুঝা যায়। কারণ, আমার শরীর খারাপ হয় কম। সামান্য সর্দি-কাশির বেশি কিছু না। আর আমার খুব ভয় ছিল, যদি কখনো কোনো বড় অসুখ ধরে এবং পিতা এসে পড়েন, তখন আমার সব ফন্দি ফাঁস হয়ে যাবে। মেসে কোনো ছাত্র থাকে না। দোকানদার পর্যন্ত আছে। অবিশ্যি সে মেসের বাসিন্দা বলা দায়। বেচারা সকাল সাতটায় যায় আর ফিরতে ফিরতে রাত দশটা সাড়ে দশটা। দোকান বন্ধ করতে এত দেরি লাগে, ওদের মালিক খুচরা রুটি-বিস্কুট-মনিহারি জিনিসও বেচে। তাই দেরি হয়ে যায়। নানারকম উপার্জনের ফন্দি করেন। অবিশ্যি সব সাহেব। আমাদের হাবীব সাহেবও তা-ই। পয়সা যেদিক থেকে আসে সেদিকেই তার হাত এগিয়ে যায়। অস্বাভাবিক কিছু নয় ব্যবসাদারের পক্ষে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বেচারা কর্মচারীদের হাড় গলে যাওয়ার উপক্রম। বারো-তেরো ঘণ্টা ডিউটি। অবিশ্যি দুপুরের আহারের পয়সা দেয় কেরামত আলিকে ফার্ম থেকে এবং বিকেলের নাস্তা। সে-টুকুই মুনাফা। কিন্তু দোকানদার কেরামত আলির কাছ থেকে অভিযোগ শুনতাম না তেমন। দশটা পাঁচটা আপিস করতে, আমি হাঁপিয়ে উঠি। অথচ দোকানদার নির্বিকার। শুনেছি আইন আছে। অনেক আগেই ব্রিটিশ আমলের পাশ করানো আট ঘণ্টা দৈনিক ডিউটি এবং হপ্তায় দেড় দিন ছুটি পাবে দোকানে যারা চাকুরি করে। কেরামত আলি কি জানে না? সে বললে, "সবই জানি। কিন্তু কী করব ভাই। জবাব দিলে চাকরি কোথায় পাচ্ছি?" আমার ধারণা ভুল যে, কেরামত আলির অভিযোগ নেই। ভেতরে ভেতরে সে-ও ফুঁসছে। আমার মতো বহুজনেই হয়ত কোনো পরিস্থিতিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেনে নেয় বাধ্য হয়ে। আপিসের ছুটি শেষে আমি প্রতিদিন মেসে ফিরতাম না। সকালে কাগজে নোটিশ দেখতাম, কোথায় কোন সভা আছে। তেমন বিশেষ কিছু চোখে পড়লে আপিস থেকেই সেদিকে ফিরে পত্রিকার পাতা উল্টাতাম স্রেফ সময় কাটানোর জন্যে। কোনো কোনো দিন নাগরিক জীবনের গোড়ার হাতছানি চোখের উপর দিয়ে খেলে যেত। পূর্বে ছাত্র ছিলাম। অন্য ছাত্রের বাড়ি যাওয়া সহজ ছিল। এখন কোথায় যাব? খাতির তো খুব বেশি জনের সঙ্গে হয় নি। চেনাশোনার ছুতা ধরে কারো বাড়ি যাওয়া বেমানান। রেজা কাজমীর কথা মাঝে মাঝে স্মরণ হতো। কিন্তু এখন সেখানে যাওয়ার কোনো কৌতূহল আর কোথা থেকে আসবে? তার দুই বোন আম্মারা এবং সোগ্‌রা কলেজে পড়ে। ভাষা বিরাট ব্যবধান। আর আমার ইংরেজি তেমন সড়গড় নয় যে কথাবার্তা খুব স্বচ্ছন্দে চলবে। নচেৎ দুই স্বাস্থ্যবতী তরুণীর প্রতি এক যুবকের আকর্ষণ থাকতে পারত। কিন্তু আমি তেমনভাবে আর পিপাসার্ত নই। এক দরিদ্র কেরানির পক্ষে সমাজের উঁচু শাখা-প্রশাখায় হাত বাড়ানো তো সহজ নয়। মাত্র দুবছরের ভেতর আমার উপর হুড়মুড় এত ধাক্কা? আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার ভবিষ্যৎ কী? বাসনা কামনার দলগুলো শুকোতে শুরু করেছে। পার্থিব সব সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমার ভেতর ছিল। এখন এমন ম্রিয়মাণ, নিজেকে এত নিস্তেজ লাগে কেন? কত দিন আপিস থেকে ফিরে এসে হাত-মুখ না ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি, আমার আকাশ-পাতাল বিচরণ শুরু হয়। একটা বয় আছে, অবিশ্যি সে আমাদের বাবুর্চিও বটে, চা খাওয়ার তাড়া দিলে জবাব পর্যন্ত আর মুখ থেকে বেরোয় না। হতাশার বহু ছায়া ঘিরে ধরে। বিছানা ছেড়ে উঠতে বেশ কসরত লাগে। এক সময় চা খেয়ে চাংগা হয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। একা-একা ঘোরা আমার অভ্যেস গাঁয়েও ছিল। সেখানে নিজেকে একা মনে হতো না। কিন্তু শহরে তেমন মানসিক বল গায়েব হয়ে যায়। কেন? জবাব দেওয়ার লোক কেউ নেই। শিক্ষার আসর থেকে ছিটকে পড়ে কি ভালো করলাম? বাপের উপর দরদ দেখানোর খেয়াল যুক্তিযুক্ত হবে না হয়ত শেষপর্যন্ত। একদিন বাপ সব জেনে ফেলবেন। জেনে ফেলার পর তাঁর দুঃখ যেন বেশি না হয়। তেমন ব্যবস্থা কী ভাবে হতে পারে? আমি যদি অনেক রোজগার করি, তাহলে নিজের দুঃখে হয়ত তিনি তেমন পীড়িত হবেন না। প্রাইভেট ফার্ম। সরকারি আপিসের মতো নয় যে ছুটি বেশি অথবা ছুতোনাতায় কাজে ফাঁকি দেওয়া চলে। বাড়ি গিয়ে দু'চার দিন না থাকলে পোষায় না। তেমন ছুটি কোথায়? শনিবার-রোববার দেড়দিনের সঙ্গে এক-আধ দিন যোগ করা দরকার। সবই নির্ভর করে মালিকের মর্জির উপর। আরো দুদিন যোগ করে এক শনিবারে বাড়ি গেলাম। বাপের দুমাসের টাকা হাতে ছিল, আরো আমার নিজের বেতন। বেশ কিছু জিনিস কিনলাম বাড়ির জন্যে। এমনকি চিনিও তো গাঁয়ে অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য চিজ হয়ে ওঠে। তাই আড়াই সের চিনি পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিল। বাপের জন্যে লুংগি, গামছা, মার শাড়ি ব্লাউজ এবং আরো টুকিটাকি ছাড়া কমলালেবু নিলাম আধ ডজন। কমলা তো স্বর্গীয় ফল পাড়াগাঁয়ে, মানুষ সহজে চোখে দেখে না। বাপ খুব খুশি হলেন একসঙ্গে এত জিনিস পেয়ে। বারবার আমার সামনেই হাত তুলে দোয়া মাঙলেন

আল্লার দরগায়। তাঁর টাকা তো শুধু ফেরত আনি নি, তার সঙ্গে আমার বেতনের কিছু অংশও যোগ আছে। বাপজানের উৎফুল্ল মুখখানা দেখার মতো। নিজের লুংগি নিয়ে মা-কে ডেকে শুধান, "দ্যাখো তো জাফরের মা রঙ তোমার পছন্দ নাকি?" তাঁর আনন্দ যে সীমা পার হয়ে গেছে, তা বালকের মতো প্রগলভ উচ্ছ্বাসে জানিয়ে দিলেন পিতা। আমি নগরবাসী অল্পদিনের হলেও। সেখানের চাকচিক্যের স্বাদ আমি পেয়েছি বৈইকী? কিন্তু পিতা কত অল্পে পরিতৃপ্ত। ওঁরা যার কথা বলে সেই আল্লার নেওয়ামৎ (দান) কত রকম এবং কত সংখ্যায়, তা যদি জানতেন। মধ্যবিত্ত কলেজের মাস্টরগুলোর অনেকের— নগীব সাহেবের— ঠাটবাট দেখলে তো বাপ ভিরমি খাবেন। আরো উঁচু কেতায় ঝলমলানি আরো ঢের বেশি। বাপ উচ্চাশা করেন নিজের জন্যে নয়। কিন্তু পুত্রের দৌড় কত দূর হতে পারে, তাঁর অবগতির বাইরে। কৃতার্থ বোধ করতে লাগলাম যে, আমি বাপের কিছু সুখের প্রাণে হাওয়া বইয়ে দিতে সমর্থ। কিন্তু জীবন তো সামনে পড়ে আছে। কেরানির চাকরি পাকা কিছু নয়। যে-কোনো দিন চলে যেতে পারে মনিবের মর্জি অনুসারে। অর্থাৎ, তুমি ওখানে টিকে থাকতে পারো শুধু একজনের মন যুগিয়ে। আমার তেমন হীনমন্যতা তখনো স্বীকার করতে হয় নি। কিন্তু নেপথ্যে একটা খাঁড়া ঝুলছে আমার উপর, তা আমার জানা। এই অসোয়াস্তি একেক সময় অনুভব করতাম বৈইকী? কিন্তু হাবীব সাহেব তেমন মনিবগিরি ফলান না কোনোদিন। পুরাতন কর্মচারীদের তার সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে। কেউ চাচা বলে, কেউ ভাই। আমি তেমন কিছু এখনো পাতাই নি। কারণ, কোথায় যেন ভেতরে বাধা। সম্পর্ক পাতানো তোষামুদির এক রকম-ফের নয় তো? এই মেসে অবিশ্যি বয়োজ্যেষ্ঠদের আমি মিয়াভাই বলে ডাকি, সে-কথা আলাদা। গ্রাম-জীবনের সুবাদে গড়ে ওঠে পাশাপাশি বসবাসের ফলে আত্মীয়তার সূত্র। পেশার সূত্র এখনো সুবাদের উৎস হতে পারে, কিন্তু তার ভেতর কী সত্যিকার আত্মীয়তা থাকে? অবিশ্যি এই মেসে আমি এক মহা-অসুবিধায় পড়েছিলাম। বয়সে ছোট। তা কোনো অসুবিধার হেতু হতে পারে না। এখানে দেখলাম সকলেই বড় আত্মকেন্দ্রিক, সামাজিক সমস্যা নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। দু-একবার কথা তুলে দেখেছি, অপর দিকে উৎসাহ তো নেই-ই বরং বিরক্তির স্বরে বলে বসবে, "ওসব নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, ঘামাক গিয়ে। আপনার আমার কী? আমরা চুনোপুটি"। হস্টেল ও কলেজজীবনের স্বাদ তাই বারবার ঘুরেফিরে আসত। তখন বড় ক্লান্তি পেয়ে বসত। তা ছাড়া সালামত স্যারের সান্নিধ্য হারিয়ে ফেললাম। তাঁর কথা শুনে বেশ উত্তেজনা অনুভব করা যেত ভেতরে ভেতরে। একসময় গ্রাম থেকে এসে আমি নিজেই বেশ বুঝতে পারতাম। তা আর এগলো কই? এখনো খবরের কাগজে ছাত্রনেতা আলাওলের নাম দেখলে আমি সাগ্রহে তার কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট পড়ি এবং সেই অনুপাতে নিজেই মিইয়ে যাই। মাঝে মাঝে যে সভা সমিতিতে যাই, তখন দর্শক এবং বক্তাদের নৈকট্য আমাকে অনুপ্রেরণা দেয় নানা স্বপ্ন রচনায়। কিন্তু আস্তানায় ফিরে আমি ফুটো বেলুন। মেসের শ্বাসরোধী আবহাওয়া। খালেক পাটোয়ারীর কথা বাদ দিলাম, এখানে মোটামুটি কোনো একটা বিষয় আলোচনা করে শান্তি পাব তারও যো নেই। এখানে কথা মানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজার-দর, অমুক জায়গায় অমুক ঘটনা— নর-নারী হত্যা, জুয়াচুরি বা এই ধরনের অস্বাভাবিক কিছু। একদম গুম বসে থাকা কষ্টকর। পত্রিকা পড়ে আর কতক্ষণ সময় কাটে? কিন্তু জেনেছিলাম, শহরে বাসা পাওয়া যায়, মেসে একটা সিট পাওয়া সবচেয়ে কঠিন। তাই অন্যত্র যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। পিতার স্বপ্ন পূরণে শহরে আসা। তিনি ওয়াকিবহাল নন কত ধানে কত চাল। মেসের ম্যানেজার সাহেব কাজী আলম চল্লিশের ঊর্ধ্বে বয়স। সরকারি চাকরি করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে, ফ্যামিলি এনে শহরে রাখতে পারেন না। ছুটিতে ছুটিতে বাড়ি যান। মেস করে তার কিছু লাভ বৈইকী? তার নিজের সিট ভাড়া নিশ্চয় লাগে না। তার উপর বাবুর্চি তাকে খুশি রাখে। কাজী সাহেবের একটি গুণ ছিল। সত্যি পিতৃ-সুলভ আন্তরিকতায় তিনি বয়োকনিষ্ঠ ভাড়াটেদের দেখতেন। সেদিক থেকে বড় নির্বিবাদ আবহাওয়া। খাওয়া-দাওয়া খারাপ হতো না। ম্যানেজার নিজেই ভোজনবিলাসী। একদিন নিজেই আত্ম-পরিচয় দিয়ে ওদের দুজনের মজলিসে সেঁধিয়ে পড়েছিলাম। কাজী আলম অবিশ্যি বিরক্ত হন নি। তা তার পরবর্তী আচরণে বুঝতে পারতাম। সাংবাদিকরা আরেক সমাজ-জগতের বাসিন্দা। ওরা অনেক খোঁজ-খবর রাখেন। তাই যেচে আলাপ। মেসজীবনের একঘেয়েমি অন্তত কেটে যাবে। অবিশ্যি আমি শ্রোতা। ওরা কথা বলেন, আমি শুনি। কোনো মন্তব্য আমার মনে গুঁজরে উঠলেও বাইরে তার প্রকাশ নেই। মাসে খুব জোর এই সাংবাদিক সেলিম সাহেবের সঙ্গে দুবার, কোনো কোনো সময় তিন বার দেখা হতো। তিনি এলে স্বভাবতই দেশের হালফিল রাজনীতি, বিভিন্ন পার্টি, সমস্যা ইত্যাদির কথা উঠত। একটা রিপোর্ট মোটামুটি পাওয়া যেত। কিন্তু আমি সহজে বুঝে ফেলেছিলাম সেলিম সাহেব এবং নসীরুদ্দীন সারের কথা একদম হুবহু মিলে যায়, যদিও দুজনের পেশা এক কিন্তু মতামত আলাদা। তদানীন্তন সরকারি মতামতের প্রতিনিধি বলা যায় এই সাংবাদিককে। তিনি চাকরি করেন এক জনপ্রিয় সংবাদপত্রে। তারা সরকারের সমর্থক। কিন্তু ভদ্রলোকের নিজস্ব মতামত আছে কি না তা জানতে পারলাম না। বয়সে ছোট, সমাজের ধাপ অনুযায়ী অনেক নিচে জায়গা আমার। বেশি কথা জিজ্ঞেস করার সাহস ছিল না। অধ্যাপকের মধ্যে যেমন দুরকম মানুষ দেখেছি একই পেশার ভেতরে, তেমনই ব্যাপার সংবাদপত্রের জগতে নিশ্চয় অবস্থিত। কারণ সরকারি মতামতের বিরোধী কাগজও আছে। সেখানে ভিন্ন মতাবলম্বী সাংবাদিক থাকার কথা। অধ্যাপকের ক্ষেত্রে আমি এখন সন্দেহ-মুক্ত। কারণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা। সাংবাদিকের ব্যাপারে সংশয় রয়ে গেল। কারণ, আর কোনো সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় নেই। কাজী আলমের সঙ্গে সেলিম সাহেবের পরিচয় অবিভক্ত বাংলার রাজনীতির কলকাতা শহরে। দেশ বিভাগের পর দুই জনে ঢাকায়। অবিশ্যি কাজী আলমের রাজনীতির প্রতি তেমন উৎসাহ নেই। তবে আড্ডায় কেউ কথা তুললে সাধারণ জ্ঞানে যা মনে আসে তা বলে যায়। কিন্তু তখন ভাবখানা একদম বিশেষজ্ঞের। সেলিম সাহেব এলে ছুটির দিনে সকালের দিকে এসে দুপুর পর্যন্ত মজলিস জমিয়ে রাখতেন। আমার কিন্তু ক্লান্তি সহজে যেত না। বসে থাকতাম মজিলসে, ভেতরে একঘেমেয়ি-জাত বিরক্তির ভারে ন্যুব্জ। কোথাও স্বস্তি নেই। নিজের মনের সঙ্গে

AMARBOI.COM

লড়াই। যখন শেখার সময় তখন জীবিকার জোয়াল কাঁধে তুলে নিলাম। হালফিল, বর্তমান, অতীত, আমার কলেজের জীবন, সহজে মন থেকে মুছে যেতে পারে না। অতীত অতীত হতেও দেরি লাগে। সেদিন উপলব্ধি করলাম। কয়েক মাসের মেসজীবনে স্বস্তি একটা ছিল বৈইকী। খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম মেলে এবং হুকুম চালানোরও সুযোগ পাওয়া যায় বয়ের উপর দিয়ে, যা যে-কোনো ব্যক্তির কাছে প্রভুত্ব পদের স্বাদরূপে গণ্য, আত্মপ্রত্যয়ের ঊর্ধ্বগামী সোপান বিশেষ। সোজা গ্রাম থেকে এসে এমন অবস্থান আমাকেও গর্বিত করে তুলতে পারত। কিন্তু আমি তা হতে দিই নি। বুঝেছিলাম, দশ জনের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সুখ নেই। সিতারা-ঘটিত দহন-কালে তা আমার বেশ জানা হয়ে গেছে। সালামত স্যারের একটি কথা আমাকে বড় সাশ্রয় দিত : "জন তরঙ্গে ভেসে যাওয়ার মধ্যে অনন্ত সুখ বিরাজ করে। বিরাট কিছু গড়ে তোলার স্বপ্ন তখন চোখে থাকে। সেই ঐশ্বর্য্যের ঝলক মানুষকে আর সংকীর্ণ হতে দেয় না।" কিন্তু আমি এখন কোথায়? এগিয়ে কোনো দিকে যাওয়ার পথ দেখি না। উপার্জনের ভিত দরকার হয় শুধু বাঁচার জন্যে, অস্তিত্ব জীইয়ে রাখার জন্যে। সেখান থেকে আর কোনো দিক বেছে নিতে হয়, কিংবা যেখানেই যাও, ওই ভিত পেছনে থাকেই। হয়ত কাছে কাছে বা সামান্য দূরে। তেমন ভিত ছাড়া কিছুই এগোয় না। আমার ভবিষ্যৎ কী আদল নেবে? একবছর পূর্বে আমি ছাত্রদের ছোটখাট সভায় বক্তৃতা দিতাম। সামাজিক প্রশ্ন জড়িয়ে পড়তে উৎসাহ পেতাম ভেতর থেকে প্রচণ্ড। এখন আমি কচ্ছপের মতো খোলে গুটিয়ে। আর আমার তো কিছু জানা হয় নি। কলেজ ছাড়লাম। নাইট কলেজে ভর্তি হয়ে দেখব কিছু দিন? নিজের চেষ্টায় তো কিছু শিখতে পারি, অক্ষর পরিচয় যখন হয়ে গেছে। স্কুল তো শেষ করেছিলাম। এমন সব প্রশ্ন আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলত। অবিশ্যি আপিসের কাজের সময় এমন আবেগের ধাক্কা একেকবার আসত ঠিক, কিন্তু আমার কাছে আমল পেত না। শাখা-প্রশাখা বেড়ে ওঠার কালে যদি বৃক্ষ ঝড়ের মুখে পড়ে প্রচণ্ড আন্দোলিত হয় এবং ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হতাশা এলেও আমি তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা পেতাম। পুরাতন হস্টেলে গিয়ে সাবেক সহপাঠীদের খোঁজ নিতে ইচ্ছে করত। তাদের বলে এসেছিলাম, অন্য কলেজে যাচ্ছি। তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে নানা আটঘাট বাঁধা মিথ্যা কথনের ঝুঁকি তো আছেই। সুতরাং বাদ দাও। পিতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলার সমান্তরাল আমার নিজের সঙ্গে লুকোচুরি কম করতে হয় নি। ইচড়েপাকা কথাটা কটুভাষণের পর্যায়ভুক্ত। অথচ সজ্ঞানে তুমি নিজেই তেমন দুর্গন্ধের শিকার হতে পারো। পচা মড়ার পাশ দিয়ে যেতে লোক নাক বন্ধ রাখে। কিন্তু চোখের কৌতূহল বাদ সাধে না। আমি আমার নিজকে তেমনভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক কিছু জানার ব্যগ্রতা মানুষের থাকতে পারে। কিন্তু যখন পরিবেশ তাকে সাহায্য করে না, তখন শুধু নিজের সাধারণজ্ঞানই নির্ভর। ছাত্রজীবনে যে সহপাঠীদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তাম, তখন কি জানা শেষ হয়ে গিয়েছিল? কিন্তু তর্ক করতে ছাড়তাম না। এখন আর সুযোগ নেই। মেস আর আপিস তো বিদ্যালয়ের এলাকা নয়। মুষড়ানো মন নিয়ে বহু সকাল এবং সন্ধ্যা হয়রান হতে হতো। জীবিকার কাজে থাকলে বরং নিরূপদ্রব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকা যায়। আর ওই পরিস্থিতির মুখে আমার চাকরি ছাড়ার যো ছিল না। পিতাকে কী কৈফিয়ৎ দেব? ভবিষ্যৎ যা হওয়ার তা হবে। এখন পা রাখার জমিন তো দরকার। তার উপর দাঁড়িয়ে উঁচু দেওয়ালের ওদিকে কী আছে দেখার জন্যে গলা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। পিতার অনুমতি নিয়ে চাকরি যোগাড় যদি করতাম, তা হলে অনেক পুরাতন সম্পর্ক হয়ত বজায় রেখে চলা যেত। সালামত স্যারের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা তো কোনক্রমে কমে না। কিন্তু এখন কোন মুখে সেখানে দাঁড়াব? মানসিক গুমোট অনেক সময় দুতিন দিন বুকে চেপে বসে থাকত। তখন হাপ ছাড়তে গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছতাম। কিন্তু সেখানেও রেহাই ছিল না। কৈশোরের পল্লী উধাও হয়ে গেছে আমার কাছ থেকে। জসিম চাচি আর একজন নয়। বছরের পর বছর যায়। গাঁয়ের দুঃখ বাড়ে। খলিল চাচার মতো বুড়ো মানুষ তো প্রকাশ্যে বলেন, "জাফর মিয়া, বড় আশা নিয়া পাকিস্তান চাইছিলাম। জিন্না সাবের কথামতো চলছি। অহন তো দেহি ব্রিটিশ আমলই বরং ভালা ছিল।" এই অভিযোগের জবাব দিতাম বৈইকী? সব গোড়ার ব্যাপার এবং নতুন গড়ার ব্যাপার, তাই এমন তকলিফ হচ্ছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কি খলিল বা রহমান চাচা কেউ তা মানতে রাজি ছিলেন না। আরো উল্টা চাপ দিতেন, "মিয়া, প্যাড জ্বালাইয়া জ্বালাইয়া কি বছরের পর বছর চালাইতে পারে মানুষ? একহপ্তা পারে না। না তা সম্ভব?" গ্রামজীবনে স্বভাবত ঢেউ কম। তার উপর দিনের পর দিন অন্ন-সমস্যা। মানুষের চাহিদা পেটের বাইরে যেতে পারে না। পৃথিবী যে বড় জায়গা এবং মানুষ সত্যি অনেক বড়, তা সকলের অবগতির বাইরে থেকে যায়। ফলে, সংকীর্ণ দলাদলি, লাঠালাঠি, মামলা-মোকদ্দমা গ্রামজীবনে এত বেশি। পেটে দহন থাকলে মানুষের সহন-ক্ষমতা হ্রাস পায়। পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি, হিংসা-রিষ খামখা বাড়ছে না। তা আমি যুক্তিপ্রমাণ দিতে না পারলেও বিশ্বাস করতে শুধু করেছিলাম। মানুষের জীবনযাপনের ধারার মধ্যেও ভালো-মন্দের বীজ থাকতে পারে। তা না হলে দস্যু-কে এবং দাস-কে একই শাস্তি দিত দেশের আইন। কিন্তু দাস-কে যত হীন চোখে দেখা হয়, দস্যু-কে তো তা হয় না। কোথাও কোথাও দস্যু সাহসের জন্যে বরং প্রশংসা পেয়ে থাকে। আমি জানার কৌতূহলী। জীবনে অনেক কিছু জানা উচিত। অন্যথায় কিসে কী হয় বুঝে ওঠা দায়। বিভ্রান্তির মধ্যে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝাপসা ঠেকে। তার ফল কখনো ভালো হয় না। কিন্তু গাঁয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা কোথায়? একটা প্রাইমারি স্কুল হয়ত থাকে। তারও শত দুর্দশা। শিক্ষকেরা প্রায় মেরুদণ্ডহীন। এত স্বল্প বেতন যে হয়ত কোনো ধনী গ্রামবাসীর দহলিজে থাকতে হয়, আহারের বন্দোবস্তসহ। দিনের পর দিন এইভাবে বসবাস। সদা পরমুখাপেক্ষী। নিজস্ব স্বাধীনতা অল্প। সে জায়গায় মেরুদণ্ড আর কোথা থেকে গজাবে? বহু শিক্ষকের অকারণ বিনয়-নম্র আচরণ দাসত্বের একধরনের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। শেষপর্যন্ত ধনীর বাড়ির কুকুরের দশা হয়ে দাঁড়ায় একজন শিক্ষকের। তেমন মানুষ কী শিক্ষা দেবে? কী ভাবে ছেলেদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে? গাঁয়ে মসজিদের ইমাম সাহেব আর্থিক নিরাপত্তা না থাকার ফলে, ঠিক এইভাবে ব্যক্তিত্ব খুইয়ে বসেন। তখন সমাজ-বিরোধী যাদের কাছে ধন-সম্পদ থাকে তাদের স্বার্থেই কাজ করে যান ইমান জলাঞ্জলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে। এ-সবের প্রতিকার কোন্ পথে আসবে? গুণীজনদের ভাবনা মাটি স্পর্শ করে না। তাই সামাজিক নানা দাওয়াইয়ের কথা শোনা যায়, কিন্তু আখেরে সবই বাগাড়ম্বর। গ্রামে গিয়ে শান্তি পেতাম। তা-ও আর রইল না। মনের গতি এত দ্রুত এদিক-ওদিক হয়ে যায় কেন? কিছুদিন পূর্বেও গাঁয়ের গাছ-পালা, পশু-পাখি, পতঙ্গ-খচিত জীবনধারার মধ্যে হাজার অসংগতি থাকলেও সব ছাপিয়ে বুকের ভেতর একধরনের ধ্বনি খুঁজে পেতাম, যার সাহায্যে সামনে অনেক আশার আহ্বান শোনা যেত। এখন সেই ধ্বনিটুকু কে, কিসে যেন হটিয়ে দিয়েছে। যষ্ঠি খোয়ানো অন্ধের মতো তোমার দশা। তবু ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়ে পৌঁছতাম। অনেক দরদ তো তোমার অপেক্ষার্থী। মা-বাপ আছেন না বললেও চলে। খালেক পাটোয়ারীর মতো বাল্যসঙ্গী তো শহরে মিলবে না। তা ছাড়া, বাপজান ঝগড়াঝাঁটি থেকে গা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে প্রৌঢ়কালে এসে ঠেকেছেন। তাই পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট তাঁর একটা সম্মান আছে। এমন সম্মানিত ব্যক্তির সন্তান আমি। তাই আমার উপর স্নেহ মমতা বর্ষণের জন্যে অনেক প্রাণ অন্তত গ্রামে পাওয়া যেত। কিন্তু সাময়িক উপশমের ঔষধি এমন সম্পর্ক। সারাজীবন ওদের সঙ্গে থেকে যেতে পারলে হয়ত আমার আর কোনো যন্ত্রণা থাকত না। কিন্তু সে-পথ বন্ধ। শহরের আকর্ষণ অন্তর্গহনে আছে বৈইকী। নচেৎ এখানে এত চেনা-জানা হৃদয়ের আসরে আমার স্থায়ী ঠাঁই হয় না কেন? আমার বাস তো অচেনা মানুষের মধ্যে। কাজী আলমকে কতটুকু জানি। কতটুকু জানা সালামত্ স্যার— যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সহজে উদ্রেকে বাঁধা? প্রায় সবই তো এমনই। খাতির আছে রেজা কাজমীর সঙ্গে, আলাওলের সঙ্গে তার বেশি তো কিছু না। নেহায়েৎ মৌখিক খাতির। ফার্মের মালিককে চাচা-মামা-মিয়া ভাই ইত্যাদি সম্বোধনে সহকর্মীরা ডাকে। আমি তা পারলাম না। তার অর্থ ব্যক্তিটি অচেনা। সম্পর্কে কেবল মাসের শেষে কিছু অর্থ আদান-প্রদানের। কোনো মুখ মেলে না, যার নিঃশ্বাসের ছায়াতলে তুমি সহজে ঘুমিয়ে পড়তে পারো নিশ্চিত সুখ-স্বপ্নে। সিতারা এমন মুখ হতে পারত। ফলের জন্যে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা নাড়া দিতে অথবা সেখানে আরোহণ করতে হয়। আজ নিকটে কোনো বৃক্ষ নেই। বসিরন দূরারোহ বৃক্ষের মতো এবং বহু দূরত্বে অবস্থানকারী। নিজের ভিতরে রিক্ত-আশ্রয় কেউ হতে চায় না। তেমন পর্যায়ে বাঁচার সব আনন্দ কেড়ে নেয়। মা-বাপ বা শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু দুঃখ দিনের সমব্যথী হতে পারে, কিন্তু তা বুক পূর্ণ করতে অক্ষম। নরের পক্ষে নারীর প্রতি আকর্ষণ তাই শুধু জৈবিক নয়। নিঃসঙ্গ জীবন আমার কাছে অসহ্য ঠেকত মাঝে মাঝে। অথচ আছি তো নানা লোকের মধ্যে জীবিকা-প্রসূত নানা কাজে। মেসেও লোক কম নেই। আরো সাত আট জন। ওদের অনেকে ছুটির দিন দল বেঁধে তাস খেলে। অনেক অতিথি আসে ওই দিনে। কাজী আলম খাবারের ধরন সেদিন একটু জেল্লাদার করে তোলেন। রান্নাবান্নায় কেউ-কেউ যোগ দেয়। ফলে বেশ গুঞ্জনময় মেসের পরিবেশ। কিন্তু আমাকে কিছুই টানে না। একদম যে চুপচাপ বসে থাকি তা-ও নয়। আড্ডার ভেতর বসে আছি। কথাবার্তায় মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ে বসি। কিন্তু তা দৈবাৎ। আমার বয়স অনেক কম, মেসে তাই অনেকেই মুরুব্বিসুলভ দূরত্ব বজায় রাখেন। তা আমার জন্যে মঙ্গল। কেউ আমার কাছ থেকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক কথা শুনতে চায় না। শ্রোতারূপেই আমার কদর বেশি। তা আমার পক্ষে ভালোই হয়েছিল। নচেৎ এখানে থাকা যেত না। আর থাকলে মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ত। এইভাবে দিনের পর দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। মনের অস্থিরতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পিছিয়ে পড়তাম। গ্রামে গেলে বাইরে বাইরে কাটত বেশি। বাপ-মার কাছে বসে শহরের গল্প বা অন্য কোনো কথাবার্তার মধ্যে যে শীতল প্রলেপ পাওয়া যেত বুকের উপর, তা-ও যেন ক্রমশ আর পূর্বের মতো মেলে না। পাড়ার আরো মানুষ এসে জুটত, অধিকাংশ সময় রহমান ও খলিল চাচা, সকলের প্রত্যাশা আমি লেখাপড়া শিখছি, সুতরাং সব কিছু নিয়ে কথা বলার অধিকার মজলিসে আমারই বেশি, আর কারো নয়। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গ এড়াতে বহু সন্ধ্যায় অন্য পাড়ায় গিয়ে কাটিয়ে দিতাম, যেখানে আরো জোয়ান ছেলেপুলে আছে এবং সকলেই আড্ডায় ঝলমলিয়ে ওঠার জন্যে উদগ্রীব। বাড়ি ফিরলে পিতা আফসোস করতেন, "তোমার পাড়ার চাচারা আইছিল তোমার কথা শোনার চায় সবাই। অপেক্ষা কইরা কইরা হতাশ। এইমাত্র গেল হগ্‌গলে।" আমি লজ্জা পেতাম নিজের অজানিতেই। বাপ-কে খুশি করার জন্য বলতাম "আপনেরা মুরুব্বি। জীবনে কত কী দ্যাখছেন। আমি তো সেদিনকার পোলা। আমার কথা শোনার এমন কী আছে?" পিতা নিরস্ত হতেন না। অগত্যা পরদিন বা আরো কয়েক দিন আসরে থাকতে হতো। অবিশ্যি আমি। এমন প্রশ্ন করতাম যেন প্রায় সর্বক্ষণ শ্রোতা হিসেবে আমি সময় কাটিয়ে দিতে পারি। জীবনযাপনের ধারা স্বাধীন হওয়ার পূর্বে কী রকম ছিল, জিনিসপত্রের দাম কী ছিল— এমন সব অতীত-সম্বলিত প্রশ্ন আমিও খুঁড়ে খুঁড়ে বের করতাম। খলিল চাচা এসব জবাব দিতে খুব আনন্দ পেতেন। দোহার হিসেবে ছিলেন রহমান চাচা, পিতা এবং আরো উপস্থিত জন কেউ-কেউ। আসর রঙ-ছুট হতো না আদৌ। আমারও ভালো লাগত এইসব কথা শুনতে। কারণ এইসব প্রৌঢ় জনেরা জীবনের কাছে কী চেয়েছেন, কী পেয়েছেন এবং তা নিয়ে ওঁদের বর্তমান মানসিক অবস্থা কী— এসব হদিস তো জানা যেত। এক কালে এঁরা আমাদের মতো জওয়ান ছিলেন, তা তো আর নতুন কথা নয়। সবচেয়ে আমাকে অবাক করে দিত, জিনিসপত্রের দাম। মহাযুদ্ধ চলার সময় আমার বয়স নয়-দশ। যুদ্ধের কথা আমার আবছা মনে আছে। গাঁয়ে ব্রিটিশ জার্মানি রাশিয়া এসব শব্দ শুনতাম মাত্র। দেশময় দুর্ভিক্ষে ষাট লক্ষ লোক মারা যায়। কিন্তু আমাদের এলাকায় তেমন কিছু হয় নি! মাস খানেক লোকের কষ্ট হয়। চালের দাম খুব বেড়ে গিয়েছিল, তবে পাওয়া যেত। গ্রামে খুব গরিব ছিল বিশ-তিরিশ জন তাদের খিচুড়ি রান্না করে খাওয়ানো হতো। চাঁদা তুলেই এই ব্যবস্থার আয়োজন। সরকার চাল-ডাল দিত। তাতে সব কুলাত না। তার বছর তিন বা সাড়ে তিন পরে পাকিস্তান হলো। দুর্ভিক্ষের কাহিনী শুনেছি। শহরে রাস্তায় রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকত। গাঁয়ে চাল ছিল না। শহরে ভিক্ষে করতে দলে দলে দলে লোক ছুটত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যদের জন্যে সরকার চাল কিনে কিনে গুদামে মজুদ করত। তার ফলেই দুর্ভিক্ষ। এসব শোনা কথার মত। ওই বয়সে এসব কিছু তেমন দাগ ফেলতে পারত না! আজ আবছা অস্পষ্ট ফিসফিস শব্দের মতো সেদিনের শোনা কাহিনী। এই সময় আর একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার আমাদের উত্তেজিত করত। তা সাম্প্রদায়িক দাংগা। শিকার হিন্দু এবং মুসলমান। মুসলিম লীগের ছাত্র আমরা স্বভাবতই পক্ষপাত মুসলমানের দিকে। কিন্তু তা নিয়ে আমাদের এলাকায় হিন্দু-মুসলমানের কোনো সংঘর্ষ লাগে নি কোথাও। তখন খবরের কাগজ পড়তাম কালেভদ্রে। তবে দাংগার খবর গঞ্জে হাটে আলোচিত হতো। কিন্তু প্রত্যক্ষ দাংগা আমরা কখনো দেখি নি বা অংশ নিই নি। সুতরাং মনেমনে বিদ্বেষ পোষণ করলেও তার রক্তাক্ত ভাষ্যের কথা ভাবা দায় ছিল। কিন্তু উনিশ শ পঞ্চাশ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির তিন বছরের মধ্যে আমি দাংগা দেখলাম। সালামত স্যার বলতেন, "ধর্মের নামে দ্যাখো মানুষের মধ্যযুগীয় কাল্‌চে রিপুর ভিতর কেমনভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দিচ্ছে জানোয়ারের দল।" প্রথম ধাক্কা খেলাম আমি সেইসব লুটতরাজ নরহত্যা ধর্ষণ আগুন লাগানোর নারকীয় কার্যকলাপ দেখে। এক দেশের নিরপরাধ বালক বৃদ্ধ বণিতা নরনারী শিশুকে হত্যা করছে যেহেতু অন্য এক দেশে এক সম্প্রদায় অন্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের উপর অমনই অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। কোথায় এর প্রতিকার? নিরপরাধ কেন বধ্যভূমির প্রাঙ্গন রক্তে ধুয়ে দেবে? স্কন্ধ কাটা প্রেত যেন ধর্মাবলম্বীদের মূর্তি পরিগ্রহ করে তার হত্যার অস্ত্রশস্ত্র অকুণ্ঠভাবে মানুষের উপর চালিয়ে যাচ্ছে। দুই দিকে দুই ধরনের প্রেত। এই ভূখণ্ড স্বাধীন হয়ে গেলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ চিরতরে লোপ পেয়ে যাবে, পূর্বে তা প্রতিদিন প্রচার করা হতো। স্বাধীনতার তিন বছর পর এমন ঘটনা কেন? এমন জাহান্নামের ভেতর একদম নিষ্ক্রিয় থাকা অন্যায়। তাই ছুটে গিয়েছিলাম প্রতিবেশীর সাহায্যে। আমাদের মেসের আশেপাশে তেমন মজলুম হওয়ার কেউ ছিল না। কিন্তু সামান্য দূরেই তো এক পল্লী আছে, যার উপরে গুণ্ডাদের হামলা স্বাভাবিক। ধর্মের অছিলা তাদের স্বাধীনতার জন্যেই যেন তৈরি হয়। উত্তেজিত মহল্লা। আমি চুপ থাকতে পারি নি। ছুটে গিয়েছিলাম প্রতিবেশী না হলেও মজলুম এক পল্লীর দিকে, যার ভেতর নানা দিকে তখন আগুন জ্বলছে। আর্তের ক্রন্দন কানে আসে। কোথাও ঢংঢাং ধাতব শব্দের কর্কশ ক্রেঙ্কার। লোহার সিন্দুক ভাঙছে ধর্মের আহ্বান দীপ্ত বেকার গুণ্ডাবাহিনী। দিশাহারা ছুটে গিয়েছিলাম অকুস্থল লক্ষ্য করে। কিন্তু গলির মোড়ে গিয়ে আর এগোতে পারলাম না। নরকের বরকন্দাজরা বাধা দিলে, 'যাবেন কোথা সাহেব?' 'দেখতে পাওনা, আগুন লেগেছে পাড়ায়?' 'হ দেখছি তো। আপনে কী করার চান?' 'আগুন নেভাতে যাওয়ার চাই।' 'আপনে বুঝি দমকলের সাহেব?' 'না। মানুষ না আমরা? আগুন লাগছে আর চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখব?' 'বাড়ি যান। খামখা এ-সবের ভেতর আইবেন না।' আমার জিদ চড়ে গিয়েছিল। দরকার হলে মারপিট করব, ভেতর উত্তেজনা এমনই। তর্ক-যুদ্ধ আর বন্ধ হলো না। মুখ থেকে কাইজ্যা এবার হাতে যাওয়ার উপক্রম, হঠাৎ আরো তিন চার জন চোয়াড় প্রকৃতির জোয়ান ছেলে তর্কের রেশ ধরে জবাব না দিয়ে আমাকে জাপটে ধরে একজন বললে, 'এটা মুসলমান কি না দ্যাখার দরকার।' বাকি বেইজ্জৎ আমি সারা জীবনে ভুলব না। মুসলমানের মঙ্গলসাধনের সেই বীরনায়কেরা আমাকে গলির এক দিকে নিয়ে গিয়ে কিছুটা বিবস্ত্র করে ছেড়ে দিতে দিতে বললে, "মুসলমান ঠিগই। তবে মাথা খারাব। দে হালারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য দিকে পাচার কইরা।" গলির ভেতর আরো এ-গলি সে-গলি করে তারা আমাকে হাঁকিয়ে দিলে অকুস্থল থেকে। পেছনে ফিরে তাকাই। আগুনের শিখা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। কিন্তু শুধু সেই দিকে নয়, নানা দিকে। কোনো প্রতিকার নেই কী এই অন্যায়, অবিচারের ধর্মের আদলের এই জঘন্য বিকৃতির। নিজের কাছে জবাব পাই নি। অনেক দিন পরে সালামত স্যারের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। তাঁর কাছে মিথ্যে বলতে পারি নি। আমার ছাত্রজীবনের সমাপ্তির কথা শুনে তিনিও আফসোস করলেন। কোনো নাইট কলেজে ভর্তি হওয়ার উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন ব্যক্তিগত কথা তুলে আমি অনুতপ্ত। নেপথ্যে যে-প্রশ্ন আমাকে কুরে খাচ্ছিল তার বিশদ কোন আলোচনা হলো না। পাছে অধ্যাপক বিরক্ত হন, তাই সব কথা ঘুটিয়ে জিজ্ঞেস করার সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম। তিনি যা বললেন তার সব বুঝে ওঠা দায় ছিল আমার পক্ষে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার কাছে ক্রমশ পরিষ্কার : জীবন-ধারা অবিশ্যি জটিল এবং তার উপরে যে-বুদ্বুদ ওঠে তা কিন্তু প্রকৃত ঘটনা নয়। অনেক ভেতরে থাকে এইসব বুদ্বুদের উৎপত্তি-স্থল। জ্ঞানী-গুণীজনের চোখে তা ধরা পড়ে। আর কিছু আঁচ পায় সংশ্লিষ্টজনের সামান্য অংশ, যা পরে বিস্তৃতি লাভ করে। অধ্যাপক সালামতের সংস্পর্শ আমার এই উপকার হয়েছিল। তাই চট করে আমি কোন সিদ্ধান্তে যেতাম না। দাংগার পটভূমি তাঁকেও খুব ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল। নিজের মনেই উত্তেজিত স্বরে বলে উঠেছিলেন, "মধ্যযুগীয় রিপুর লালন-পালন করলে, তা এই যুগে বর্ণ-বিদ্বেষ হয়ে দেখা দেয়। তখন মানুষ নিজের পরিচয় ভুলে যায় এবং কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়। নিজস্ব স্বার্থের বাইরে আর কোনো মানুষ থাকতে পারে তা তাদের পক্ষে ভাবা কঠিন হয়ে পড়ে। বিচিত্র পৃথিবীতে বৈচিত্র্য থাকতে পারে এবং তা মেনে নিয়েই বাঁচা যুক্তিযুক্ত, এমন ধারণা তাদের চিন্তায় আর জায়গা পায় না।" এই জাতীয় উচ্চারণ আমি শুনেছিলাম। সব বুঝে উঠতে পারি নি। তবে অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপের পর মেসে ফেরৎ আসার সময় দুবছর কি কিছু বেশি আগেকার এক ঘটনা আমার কাছে আবার ভেসে উঠেছিল : সেই ট্রেনের দৃশ্য। প্রথম শ্রেণীর টিকেটধারী বাঙালি যারা ছিল তাদের সমর্থন কিন্তু দেখা গিয়েছিল অবাঙালি আরেক ফাস্ট ক্লাসের টিকিটধারীর সঙ্গে। অথচ বাইরে তারা আলাদা : বাঙালি-অবাঙালি। কিন্তু ভেতরে তাদের অন্য মিল রয়েছে। আমরা টিকেটহীন অপরাধী, তারা অধিকারী, গোটা কামরার, সিটের তো বটেই। মাথার ভিতর নানা চিন্তার ঘুরপাক। মানসিক ক্লান্তি আমাকে ক্রমশ অথর্ব করে তুলেছিল। একদিন রাত্রে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। দোজখ থেকে ফিরে এলেও তার ছবি তো সহজে চোখ থেকে মুছে যায় না। শহর কয়েকদিন পর স্বাভাবিক হয়ে এল। কিন্তু বহু ঘরের ভেতর মানসিক অস্বাভাবিকতা বেড়ে গিয়েছিল, তা নিজের ঘরে বসেই জোর দিয়ে বলা যায়। দাংগার সময় উপদ্রুত অঞ্চল থেকে বহু নাগরিককে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে রাখা হয়। সাময়িক এই আশ্রয় "রিফিউজি ক্যাম্প" নামে খ্যাত। ইংরেজ আমলের ব্যাপার। ইংরেজ গেছে। কিন্তু শব্দ দুটো আছে। শহর স্বাভাবিক হলে রিফিউজিরা যে-যার ঘরে ফিরে যায়। যাদের ঘর ছিল, আর নেই, আগুন বা অন্য কিছুর মুখে বেদখল। তারাও নতুন আশ্রয়ের

খোঁজে বেরিয়ে পড়ে বা কোনো ব্যবস্থা করে। কিন্তু আতঙ্ক কি সহজে যায়? পুরাতন শান্তির নীড় আর গৃহ নয়। অস্বাভাবিকতার উঁকি ফলে স্বাভাবিক। তা বেশ বুঝা গেল ট্রেনে বাসে এয়ারপোর্টে ভিড় দেখে। যাদের সামর্থ্য আছে, তারা দেশের বাইরে যাচ্ছে। অনেকে হয়ত ফিরবে অথবা ফিরবে না। দেশ ত্যাগের মতো নির্মম বাক্য কেইবা উচ্চারণ করতে চায়? ঠাঁই-নাড়া হলে মানসিক অনেক ভার হাল্কা হয়ে যায়। এই দেশের বড় প্রাচীন দাওয়াই। কারো বাড়িতে শোক হলে তা অন্য স্থানে যেত। এখানে স্থান অর্থ কোনো আত্মীয়বাড়ি। এমন ঠাঁই বদলালে শোকের যন্ত্রণা অনেক কমে যায়। কিন্তু সেই প্রাচীন প্রবাদ এই যুগে বুঝি অচল হয়ে গেল। উপদ্রুত এক জায়গা থেকে মানুষ আরেক জায়গায় যায় অন্য কোনো উপদ্রুবের সঙ্গে সাক্ষাতে। আপিস থেকে ছুটি নিলাম তিন চার দিনের জন্যে। দাংগার পক্ষকাল পরে। ঠাঁই-নাড়া হব জন্মভূমি গ্রামে। গাছপালা প্রান্তরবেষ্টিত চির-সবুজ বাংলার জনপদে অন্তত শহরের ক্লেদ নেই। সেখানকার ক্লেদ অন্য রকম। শহরের মতো এত দুর্গন্ধ নোংরামি কি বর্বরতাকীর্ণ নয়, যেখানে হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ পাশবতার সম্মুখে নীরব স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সেই ঝড় যখন পাড়া-প্রতিবেশীর উপর দিয়ে বয়ে যায়। আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই যেন সেদিন বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মফস্বল সব এলাকায় যোগাযোগ সুবিধাজনক নয়। আমাদের গ্রাম তো দুর্গম সেদিক থেকে। ট্রেনে কয়েক মাইল। তারপর খেয়াপার হও। পাকড়াও বাস। সর্বত্র জায়গায় দৌড়ের প্রতিযোগিতা আছে। কারণ সিটের প্রশ্ন। এই ছ'মাইল বাসে ঠেসাঠেসি, কখনো পর্ব-উপলক্ষে স্রেফ গুড়ের নাদা— মেঝের উপর উবু-বসা। অকুস্থলে পৌঁছলে তারপর আবার পায়ের কসরৎ একমাইল, অর্থাৎ হাঁটা। কুড়ি মাইল বাসরুট এই অঞ্চলে। কিন্তু বাসের সংখ্যা পাঁচ ছ'খানার বেশি নয়। তার মধ্যে কিছু জিনিস ছিল, ছোট একটা সুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ। চার-পাঁচ সের জিনিস বওয়া কষ্টকর নয় আমার কাছে। গ্রামে মানুষ, এখনো পুরাতন অভ্যেস ইচ্ছেমতো আবার খাড়া হয়ে যায়। সঙ্গী দুজন লোকও পাওয়া গেল। তারা আমাদের নিকটস্থ অন্য গ্রামের লোক। সঙ্গী থাকলে রাস্তা অর্ধেক হয়ে যায়। আমার প্রস্তাবে তারা রাজি হয়ে গেল। এই রুটে বাসও বেশি দিন হয় নি। পূর্বে শুধু প্রমোদে মেতে আমরা এইসব এলাকা চষে বেড়াতাম। বেলা তখন এগারোটা। বাড়ি পৌঁছতে খুব জোর দুটো-আড়াইটা হবে। তিন জনে রওয়ানা দিলাম। মাইল তিন যাওয়ার পর আমরা এক গাঁয়ের ভেতর পড়লাম। চওড়া রাস্তা এখানে। দুদিকে বাঁশবন, বসতবাটি এবং ভিটাসংলগ্ন নানা গাছের ভিড়। কোথাও ঝোপ আছে বেত এবং অন্যান্য বুনো লতার। দিনের বেলা। তবে বেশ ঠাণ্ডা সড়কটা গাছপালা দুই দিকে থাকার জন্যে। কিন্তু লোক নেই কেন? তা ছাড়া শহর থেকে এই সড়ক ধরে লোক এলে প্রায় এক জিজ্ঞাসা তোমার কানে পড়বে, "শহরের খবর কী? শুনলাম গোলমাল।" আজ সব বিরাণ ঠেকে। ভুতুড়ে আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে যেন তুমি হাঁটছ। আমার সঙ্গী একজন হঠাৎ চৈতন্যোদয় রূপে দেখা দিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, "বোধহয়, এখান থেকে দাংগার পর লোক দেশত্যাগ করেছে বা রিফিউজি ক্যাম্প থেকে এখনো ফেরে নি।" "দাংগা, এখানে দাংগা," আমি আঁৎকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলাম। খবরের কাগজে এসব খবর তো কোনোদিন দেখি নি। যেখানে চলেছি— তা আমার আরামের হাওয়াখানা— সব পোড়ে নি যন্ত্রণা সেখানে গেলে জুড়িয়ে যায়। কিন্তু একী শুনছি? সঙ্গী আমাকে আরো অবাক করে দিলে যখন আবার মুখ খুললে, "এদিকে গ্রামেও দাংগা ছড়িয়ে পড়েছিল, আমরা তো কবে শুনছি। লোকের যাতায়াত দাংগার সময়ও বন্ধ হয়ে যায় নি। এই গ্রামের নীরবতা আমার পায়ে পায়ে জড়তা হয়ে ধেয়ে আসে। কোথাও যাচ্ছি তাহলে? গাঁয়ে কী দেখব? সঙ্গীদের প্রস্তাব দিলাম চলুন একটা শূন্য ভিটা অন্তত দেখে যাই।" তাই মাঝপথে আমরা একবার বাম দিকে মোড় নিলাম। এখানে নিচে বড় খাদ। গেরস্থ মাটি তুলে ভিটা বানিয়েছে অথবা অন্য কাজে লাগিয়েছে। তাই উপরে বেশ মজবুত সাঁকো, ভিটা এবং রাস্তার সংগে সংযোগের বাহন। ভিটার কিনারায় কয়েকটা বাঁশগাছ থাকার ফলে উঠান ছায়াময়। আমরা হেঁটেছি অনেকখানি। একটু বিশ্রাম নিলে ভালো হয়। সাঁকো পেরোলেই বাম দিকে একটি টিনের ঘর। দেওয়ালে সাইনবোর্ড ঝুলছে। এখানে এক ডাক্তার ছিলেন, নাম ডিগ্রি সাইনবোর্ডে লেখা। নির্জন চতুর্দিকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াই ডাক্তারের ডিসপেনসারির সামনে। দরজা খোলা রয়েছে। ভেতরে ঢুকলাম আমরা তিন জনে দুটি আলমারির পাশাপাশি। এখনো শিশি বোঝাই রয়েছে। একপাশে একটি তক্তপোষ কামরার ভেতর। হয়ত বিশ্রাম-স্থল ডাক্তারের বা কেউ রাত্রে এখানে ঘুমোত। বৈঠকখানা এবং ডিসপেনসারি একই জায়গায়। কেমন গুমোট লাগলে এই কামরার নির্জনতা। আমরা পেছনে অন্দরের দিকে গেলাম। সেদিকে আঙিনায় এক কোনায় পায়রার খোপ। কাছে গিয়ে দেখলাম, তখনো দুটি পায়রা বসে আছে পাশাপাশি কুঠরির ভেতর। আমাদের দেখে সন্ত্রস্ত। কিন্তু উড়াল দিল না। কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। এমন শান্তিময় নির্জনতা প্রাণীদের জন্যে। একটি শাদা অপরটি কালো রঙ পায়রার। সালামত স্যার বলতেন পৃথিবীতে শুভ-অশুভ কল্যাণ-অকল্যাণ অনেক সময় সহঅবস্থান করে। তাঁর কথা আমি ঠিক বুঝি নে। কিন্তু আজ শাদা-কালো দুটি প্রাণী দেখে অধ্যাপকের কথা আমার মনে হলো। শূন্য আঙিনা। একটি পুরাতন বড় কাঠ মল্লিকার গাছ ফুলে ছাওয়া। তলায়ও কিছু ঝরে পড়েছিল ফুল। বাড়িটা টিনের। গ্রামাঞ্চলে সংগতির সূচক। আর ঘরে ঢুকে দেখার ইচ্ছে কারো ছিল না। এমন প্রেতায়িত আবহাওয়া। আমার সঙ্গী বললে, "পাশ করা ডাক্তার পাঁচ ছ'মাইলের মধ্যে আর নেই। এই ভদ্রলোক ছিলেন। এখন অসুখ-বিসুখে কাকে ডাকবে সেদিকে খেয়াল থাকলে কী হতভাগারা এই কাজ করে?" উন্মাদ ও ক্রুদ্ধ মানুষ ফলাফলের তোয়াক্কা রাখে না। সঙ্গীর কাছ থেকে আরো জানা গেল, বোধহয়, ওদের বোধোদয় হয়েছে পরে। ডাক্তারের বাড়ি বলে এখনো জানালা-দরজা টিন খুলে নিয়ে যায় নি। তার প্রমাণ পেলাম আবার সড়ক ধরে এগোনোর সময়। অনেক ভিটার উপর এক মাটির দেওয়াল ছাড়া ঘরের অন্য কোনো নিশানা নেই। সব লুটপাট হয়ে গেছে। দরিদ্র মানুষে দেশ বোঝাই। শিক্ষা এবং বিত্ত প্রায় সমার্থবাচক। গরিবদের কাছে শিক্ষাও তো যায় না। বিত্তবানদের রকম-সকম দেখে গরিবরা শেখে। লুটপাট আর নতুন করে শিখতে হয় না ওদেশে। যেমন ইমান তেমন মুসল্লি। সমাজে যারা নেতৃত্ব দেয়, তারাই তো আদর্শ হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরিবদের গালাগাল দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমার সঙ্গী মানুষটির কথাবার্তা শুনে মনে হয় সালামত স্যার আমার পাশাপাশি হাঁটছেন। কিন্তু নগীবউদ্দীন সাহেব অমন হলেন কেন? এক এলাকার লোক এক পেশা এবং এক জায়গায় পেশা দুজনের। তা থেকেই কি কল্যাণ-অকল্যাণের সব অবস্থানের অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন অধ্যাপক সালামত? কোনো কোনো রোগের সঙ্গে থাকে খিঁচুনি। সমাজের মাঝে মাঝে খিঁচুনি ধরে। দাংগার হাওয়া খুব বেশি দিন থাকে না। রক্তপিপাসাও বোধহয় মিটে যায়। স্বল্প সময়ের পরিমাপেই তা ঘটে। কিন্তু যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী খিঁচুনি ফিরে ফিরে আসে কেন? তার কুলকিনারা আমার চোখের সামনে ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন সেই সময় বারবার ঝিলিক দিয়ে উঠত। তাই তো বুঝেছিলাম জানা এবং অনেক জানার ভেতর দিয়েই ইতিহাসের ব্যাধির স্বরূপ হয়ত ধরা পড়ে। কিন্তু কয়েক হাজার বছরেও প্রতিকার কেন খুঁজে পায় নি? মফস্বলের সড়ক। গ্রামের পার গ্রাম পর হয়ে চলেছি। কত রকমের দৃশ্য মানুষের কাজকর্মের। প্রকৃতির সাজানো বাগানের কথা ভুলে যাওয়া চলে না। কিন্তু দুই চোখ বিশ্রাম খুঁজে খুঁজে হয়রান। সহযাত্রীটির কথায় বার্তায় শান্তির প্রলেপ ছিল যেন। তাই পথের ক্লান্তি ভুলেছিলাম। আর একটি সঙ্গী বড় স্বল্পভাষী। একজায়গায় গাছতলায় বিশ্রাম নিতে বসেছিলাম মিনিট পনেরো। সে পুঁটলি থেকে মিষ্টি বের করে আমাদের খাওয়াল। তখন 'আসুন' ছাড়া আর অন্য শব্দ যোগ করেন নি। শান্ত, আজব মানুষ। আল্লাকে ধন্যবাদ, অন্য ধাঁচের লোক হলে হয়ত পথে তক্কাতক্কি বেধে যেত এবং হাঁটার ক্লান্তির চোটে মেজাজ বিগড়ে বসত। কিন্তু তা না হলেও, সোয়াস্তি ছিল না। বাড়ি পৌঁছালে হয়ত কিছু শান্তি পাব। কিন্তু কোথায় শান্তি? বাপজান বয়ান দিলেন, শহরের ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে এই এলাকায় এসে পড়েছিল। তাদের গাঁয়ে একদল ছোকরা ক্ষেপে ওঠে। বেশিরভাগ চাষিবাষির পোলা। তাদের বুঝাতে, ব্যাপার আর বেশি এগোয় নি। পাশের গ্রামে শিক্ষিত মুসলমান আছে। চাকরিবাকরি করে খায়, তাও খুব বড় কিছু না, সেখানে শরিফদের আস্কারায় গাঁয়ের চোর বদমাশ কিছু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, কিছু লুটপাটও হয়েছে। বাপ্‌জান নিজের চোখে দেখেন নি। শুনেছেন। তাঁর কাছে সবচেয়ে অবাক ব্যাপার শিক্ষিত লোকেরা কীভাবে পাড়াপড়শীর উপর অমন জুলুমে সায় দিতে পারে? ইলেমের কী এই তাসির (ফল)? লেখাপড়া মানুষের কাছে মানুষ যায় সৎ উপদেশের জন্য কিন্তু কী হচ্ছে এসব? আখেরি জামানার কাহিনী তিনি শুনেছেন মুরুব্বিদের মুখে। তখন মানুষের আকার থাকবে ঠিক, কিন্তু মানুষ আর থাকবে না, জানোয়ারের মতো তার হালচাল হবে। এসব কি তার আলামত (চিহ্ন) নয়? পিতা আমাকে জিজ্ঞেস করেন। আমি মাথা নিচু করে থাকি, জবাব দিতে অক্ষম। আমি আর নিরক্ষর নই। লেখাপড়ায় আমার দৌড় যদ্দূর হোক, আমি শিক্ষিত— এই গর্ব আছে মনের ভেতর। কী জবাব দেব? কিন্তু আমার কাছে অবাক লাগে, কোন গুণ থাকলে মানুষ মানুষ পদবাচ্য হয়, সেই বিশ্বাস কীভাবে বাপজান পেয়েছিলেন, যার জন্যে এই প্রৌঢ়কালেও প্রতিবেশী সম্পর্কে কয়েকটা সহজ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। সালামত স্যার যেখানে পৌঁছেছেন নানা বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে, সেখানে গাঁয়ের অল্পশিক্ষিত মানুষ কী করে পৌঁছায়? এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রহেলিকার জবাব আমার সামনে সহজে খাড়া হয় না। নিজ গ্রামের অনেক ঘটনা শুনলাম। পরদিন খালেক পাটোয়ারীকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে কিছু নিজের চোখেও দেখলাম। গাছপালা ঘরদোর সব ঠিক আছে। প্রকৃতির বেষ্টন বাংলাদেশের সব দারিদ্র্য ঢেকে রাখে। এই ঐশ্বর্যের পিছনেই বাস করে মানুষ, যারা ঐশ্বর্যবান নন! দারিদ্র্য এবং তজ্জাত অভিশাপও ঢাকা পড়ে থাকে কেবল গাছপালার সবুজের তলায়। বাঁচার লড়াই থেকে লোভের উৎপত্তি শতকরা আশি ভাগ। বাকি বিশ ভাগ মানুষের স্বভাবের উপর ছেড়ে দেয়া যায়। তা-ও অমন চুলচেরা হিসাবে না। আমাদের গ্রামে শূন্যভিটা নেই। কিন্তু মানুষ কমে গেছে। আতঙ্ক যখন ছড়ায় তখন দিগ্বিদিকজ্ঞান বজায় রাখা কঠিন। পাটোয়ারী বললে, "অনেক-কে বুঝিয়েছি খামখা হিড়িকে পড়ে পূর্বপুরুষের বাস্তু ছাড়বেন না। কিন্তু কে শোনে? দিনে শুনলেও রাতের আঁধারে তারাই গাঁ ছেড়ে চলে যায়।" কোথা থেকে আসে এই স্রোত কোটাল বন্যার মতো? জন্মভূমি গ্রাম। কবিদের মোহন শব্দ আলপনায় অঙ্কিত তার তরুলতা মাঠঘাট প্রান্তর নদী আমাদের কাছে ধরা দেয় ছেলেবেলা থেকে। হঠাৎ তিক্ততায় ভরে ওঠে দেহ। সব জ্বালার আশ্রয় এখন জ্বালার উৎস। বাপ-মা ভাইবোন কারো সান্নিধ্য আর বুকে শান্তি ফিরে দিতে পারে না। শহরে জীবিকার মধ্যে তবু কিছু ভুলে থাকা যায়। আর আছে নগরজীবনের অহরহ বিক্ষুব্ধ বুদ্বুদ। সাবানের ফেনা নিয়ে খেলার মতো তার ভেতরও মানুষ কিছু সময় কাটানোর সুযোগ পায়। গ্রাম সেখানে প্রতিযোগিতায় পরাজিত। নিজের মনের কাছে আমাকেও হার মানতে হলো। ছুটি পর্যন্ত কোনোরকমে কদিন গাঁয়ে থাকা। তারপর ফিরে এলাম নিজের জায়গায়। ছক বাঁধা হয়ে যায় জীবন। সেই ছকের বিস্তৃতি নিয়েই যত মাথাব্যথা। একঘেয়েমি কাটাতে মানুষ তৎপর হয় যখন তেমন সুযোগ থাকে না, একটা না একটা কিছু উদ্ভাবনী মাথায় এসে যায় বৈইকী? গাঁয়ে যে কৈশোরকালে বনভোজনের আয়োজন করতাম তা একঘেয়েমি চুরমার করার পন্থা ছাড়া আর কী? দাংগার পর শহর আবার পুরাতন ছন্দে ফিরে এসেছে। খিঁচুনি ব্যারাম সবসময় থাকে না। আমার জন্যে আরো একটা অসোয়াস্তি রয়ে গেল। এই এলাকায় সামান্য ব্যবধানে ছোট ছোট তিনটে পাবলিক লাইব্রেরি ছিল। আমি প্রায় বই আনতাম। দৈনন্দিনতার একঘেয়েমি থেকে রেহাই পেতে বইয়ের চেয়ে বড় মোক্ষম প্রতিষেধক আর এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি পৃথিবীতে। এখানে সহজে তৃপ্তিজাত অবসাদ আসতে পারে না। বইয়ের জগত তো অনন্ত। তার ধরন-ধারণ এবং বৈচিত্র্য অন্তহীন। দাংগার পর এলাকার এই ছোট লাইব্রেরি এবং রিডিংরুমগুলো বন্ধ হয়ে গেল। পরিচালনার ভার যাদের হাতে ছিল, তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে দেখলাম, বইশূন্য ঘরগুলো বেদখল। দোকান-পাট বসে গেছে। নিজের দিকে তাকিয়ে আমার করুণার অন্ত থাকে না। জীবিকার এই শিকল-ছেঁড়া আমার জন্যে একান্ত জরুরি। কিন্তু কোনো সহজ পথও চোখে পড়ে না। যুগে যুগে পিঁজরার পাখির সঙ্গে মানুষের আত্মার তুলনা এত যুক্তিযুক্ত, তা আমি বেশ অনুভব করছিলাম। আমার সুমতির জন্যে বাপজানের অশেষ আনন্দ। মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন অজস্র দোয়া ভরে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা যেন আমার আর পূর্বের মতো নয়। তাঁকে খুশি করতে গিয়েই

তো আমার বর্তমান জীবন। শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ নিজ হাতে নষ্ট করলাম। মানসিক এমন বিপর্যয়ে নাজেহাল। কিন্তু আমার দৈনন্দিন স্রোত তেমন অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তাস খেলাও আমি ইতিমধ্যে শিখে নিয়েছিলাম। মেসের জীবনে ভেসে থাকার এক উপায়। কিন্তু নিজেই লক্ষ্য করলাম, মন সেখানে সহজে বসে না। তাসের আসরে শরিফের ভুলচুক নিয়ে বা আমার কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে ঝগড়াঝাঁটির জন্যে যেন প্রস্তুত হয়েই থাকতাম, কিন্তু থামিয়ে নিতাম নিজেকে। আর এখানে বয়সে সবাই বড়, সেদিকও ভাবতে হয়, শেষে খেলা ছেড়েই দিলাম। অনেক সময় পার্টনারের অভাবে আমার ডাক পড়ত, আমি ছুতোনির্ভর সহজে ওই ফাঁদে পা দিতাম না। একাকীত্বের বোঝা আরো ভারী হতো। যৌবনের এই জোয়ার মুখে বাপ-মা ছেলেমেয়ের বিয়ের উদ্যোগী হয়। আমার পিতার উপর চাপ পড়ত কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত বাপজানের প্রতিনিধির। এসব আমার কানে আসত গাঁয়ে গেলে। পিতা লেখাপড়া শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করেছেন। সেদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। অবিশ্যি আমার সম্মতি চাইলে আমিও না বলতাম। গ্রামজীবনের ছকে আমি বাঁধা নই। পরিবার পোষণ পিতার দায়িত্ব নয়, এটুকু তো বেশ বুঝেছিলাম। সংসার রচনা? আমার সাহসই হতো না। ছিটকে পড়লাম সহপাঠীদের কাছ থেকে গ্রাম থেকে। আধা-গ্রামীণ আধা-নাগরিক আমার মানস জগতের সংবাদ কে-ইবা দরদের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে? একাএকা যান্ত্রিক দৈনন্দিনতার ভেতর ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। অনেক সময় সংবাদপত্রের নোটিশ দেখে ঠিক করলাম, বিকালে পল্টনের মাঠের মিটিং-এ যাব, কিন্তু বিকালে বাসায় ফিরে আর উদ্যম ফিরে পেতাম না। আর মনে হত কী হবে গিয়ে? সদ্য প্রতিকার যদি না হয়, তাহলে এমন সব বাগাড়ম্বর শুনে লাভ কী? নিস্তেজ ম্রিয়মাণতা চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরত। অথচ আমি তো এমন নই, এমন ছিলাম না। ট্রেনের সেই পুরাতন দৃশ্য চকিতে দৃষ্টির সমতল পার হয়। অবাঙালি ব্যবসাদারের সামনে খাড়া। তর্জনীর উদ্ধত ভংগিমায় লেখা : কৈফিয়ত দাও। এখন আমি লেজ গুটানো পলাতক শৃগাল, পিছনে অনেক ডালকুত্তা। আত্মধিক্কার আমাকে খেদিয়ে নিয়ে চলেছে অন্ধকার পাতালের দিকে। একেক সময় সাহসে বুক বাঁধা, পর মুহূর্তে বিদীর্ণ ডাক— আর শব্দ বেরোয় না বুকে। এইভাবে পালাক্রমে জেরবার, একদিন আপিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে গেলাম। আনমনা বিকেল অপচয় উদ্দেশ্য। হঠাৎ কানে গেল, "ভাইসব!" আর উৎকর্ণ হওয়া লাগে না। মিটিং চলেছে। কোনদিকে। মাইক খনখন করে উঠল। দ্রুত এগিয়ে গেলাম। সময়টা ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের পয়লা হপ্তা! "ভাইসব... চার বছরের মধ্যে আবার বিশ্বাসঘাতকরা পুরাতন অঙ্গীকার ভুলে গেছে। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলার কোনো জায়গা নেই। পুরাতন কথা আবার আপনারা স্মরণ করুন। ১৯৪৮ সনে এই প্রশ্ন উঠেছিল। তখন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মনোভাব দেখে পাকিস্তান সরকারের প্রধিনিধিরা এখানে মেনে নিয়েছিল, উর্দুর মতো বাংলা ভাষার মর্যাদা সমান। মাতৃভাষার উপরে আঘাত হানার ইচ্ছা কারো নেই। কিন্তু চার বছর যেতে না যেতে কুকুরের লেজ আবার বাঁকা হয়ে গেছে। বেচারা কুকুর লেজের উপর হাত থাকে না। কুত্তাকে মাফ করা যায়। মানুষ সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সিদ্ধান্ত তেমনভাবে নেওয়া চলে কি? (শ্রোতাগণ : না, না) চলে না। কিন্তু মানুষ যখন কুত্তা হয়ে যায় তখন লেজের মতো তাদের কথাও বেঁকে যায়। কথায় বলে : যার বাতের ঠিক নেই, তার বাপের ঠিক নেই। বাত মানে রোগ মনে করবেন না। বাত মানে কথা। কিন্তু ওদের লেজ আমরা সিধা করে ছাড়ব...।" বক্তার দরাজ গলা, বাচনভঙ্গি এবং সহজ ভাষার যুক্তির আতশবাজি শোনার মতো। আমি আগে মাইকে ঘোষণা শুনি নি। তাই জানা গেল না, বক্তার কী নাম। ভিড়ের ভেতর আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। বহুদিন পর স্বল্প কলেজজীবনের স্বাদ হঠাৎ ফিরে এসেছে। তিন বছরে হয়ত আমিও এমন বক্তৃতা দিতে পারতাম। কল্পনায় তখন একাধারে আমি বক্তা এবং শ্রোতা। স্বগতোক্তির মতো শুনলাম : "ভাষা মানে বাঁচার প্রথম অপরিহার্য উপাদান দেহের বাইরে। আপনার পিয়াস লেগেছে যদি বলতে না পারেন, তাহলে কি পানি এনে দেবে আপনাকে? অপর মানুষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কী দিয়ে হবে? ইতিহাসে শোষকেরা তাই প্রথমে ভাষার ব্যাপারে নাক গলায়। ইংরেজ রাষ্ট্রভাষা ফার্সি বাতিল করে ইংরেজি চাপিয়ে দিলে। শোষক এবং শোষিতে ফারাক আরো প্রকট হলো। বিজয়ী নর্মগ্যানরা ইংলন্ডে ফরাসি রাষ্ট্রভাষা করেছিল ইংরেজদের দাবিয়ে রাখতে। পাকিস্তানের বর্তমান নেতারা সেই চিরাচরিত পুরাতন ফন্দিফিকিরই বেছে নিয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানকে ওরা কলোনি— উপনিবেশ— বানাতে চায়। তাই এই ষড়যন্ত্র। অবিশ্যি বাংলা ভাষাভাষী কিছু লোক পাবেন, যারা পাকিস্তানি প্রভুদের গলায় গলা মিলিয়ে চলে। এদের চিনে রাখুন। আমরা যারা বাংলায় কথা বলি, তারা যুগ যুগ পরপদানত— এককথায় গোলাম। বখতিয়ার খিলজী এই মাটির সন্তান নয়। তেমনই পাঠান শাসকেরা। ইংরেজ তো নয়ই। শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা গোলাম। গোলামের খসলৎ সহজে যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দীর জমাট হীনমন্যতার শিকার কিছু বাঙলাভাষী নেতা। গোলামের প্রথম কাজ কোনোরকমে বেঁচে থাকার চিন্তা। আপনি বাঁচি তো বাপের নাম। তারা এই মন্ত্র প্রতিদিন জপ করে। তাই সহজে টোপ গিলে সবে। এইসব পূর্ব-পাকিস্তানি রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের পরিবারের আখের গুছাচ্ছেন। দেশের মানুষ অপেক্ষা নিজের পকেট পুঁটলি ওদের কাছে ঢের বেশি মূল্যবান...।" আমি এই সব যুক্তির কথা জানতাম, পূর্বেই শোনা। কিন্তু সেদিন বক্তার কণ্ঠস্বর যেন কথার প্রত্যক্ষ রূপ হয়ে আমার কাছে ধরা দিল। নওজোয়ানকে দেখা যায় না। গলার স্বর শুধু ভেসে আসে। আন্দাজ করা যায় গলির ভেতর কোথাও এমন আয়োজন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। তন্ময় আমি। হঠাৎ আলাওলের কথা আমার মনে পড়ল। বক্তা কি আলাওল? জানার তাগিদ আমাকে চেপে ধরল। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব? আমার পাশে আরো কিছু পথচারী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একজনকে দেখে মনে হলো স্কুল কলেজের ছাত্র। তার হাতে খান দুই বইও রয়েছে। সামান্য সংকোচ লাগছিল। তা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করে বসলাম, "বক্তৃতা দিচ্ছে কী ছাত্রনেতা আলাওল?" আমার প্রশ্নে সচকিত পথচারী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "কবেকার খবর বলছেন? চার বছর আগেকার আলাওল। সে তো আর ছাত্র নয় এখন। তা-কে সরকার বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে কবে। দালাল— তার মুখ বন্ধ করতে জানে গরমেন্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি কি ছাত্র?" "না।" "তাই জানেন না। নদীতে এমন কত মড়া আসে আর ভেসে যায়।" আমি রীতিমতো নিজের ভেতর গুটিয়ে যাই। আলাওল দালাল। যুবক পথচারী আমাকে আরো দশ বাঁও জলে ঠেলে দিলে, "মনে রাখবেন, রাজনীতিও রোজগারের ফন্দি হতে পারে। তার জন্যে অ্যাপ্রেন্টিস কাল আছে। বহু রাজনীতিবিদ তো দেশ উদ্ধারে আসে না, আসে গোষ্ঠী উদ্ধারে। কী বলতে পারেন পুষ্টি উদ্ধারে। এদেশে তো সকলের কপালে পুষ্টিকর আহার জোটে না। রাজনীতি দিয়ে তা যোগাড় করতে আসে।" পথচারীর কথা শুনে আমি অবাক হই না। ভারী আনন্দ লাগে তার বলার রকমসকম দেখে। ওর সঙ্গে আরো যেচে আলাপ করার ইচ্ছে আমার চেগে ওঠে। তখন মাইকে ঘড়ঘড় শব্দ শুরু হয় এবং কী একটা দূরাগত গণ্ডগোলে ক্ষীণ শব্দ মাঝে মাঝে ঝিলিক খায় কানে। সঙ্গী পথচারী তখন আমার দিকে আর তাকায় না, সোজা সামনে পথ দেখে। পেছন থেকে তা-কে ডাক দেওয়ার বাসনা কোনোরকমে চাপা দিয়ে রাখি। ওকে ভদ্র-অভদ্র এমন কিছু মনে হয় না। ওদিকে মাইক নীরব। আমার মিটিং-এর উৎস সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। কিন্তু আমি তা আমল দিই না। হঠাৎ দেখা পার্শ্বস্থ যুবকের কথাগুলো আমাকে বেশ বুঁদ রাখে। রাজনীতিও ভালোমন্দ আছে। তা যাচাই করে নিতে হয়। কিন্তু তার কষ্টিপাথর কোথায়? একদা আমার দুই শিক্ষক আমাকে ধাঁধায় ফেলেছিল। আবার নতুনভাবে প্রশ্ন-বিহ্বল মন। কিন্তু ওই বিকেল সন্ধ্যা গোধূলী আমাকে বেশ উত্তেজনার আস্বাদ দিয়ে গেল। মনমরা নির্জীব হতাশা যা দৈনন্দিন প্রহরের উপজীব্য হয়ে ছিল, তা যেন সরে যেতে লাগল। পরদিন সকালে খবরের কাগজ দেখে আমি জানতে পারলাম ভাষার প্রশ্ন আবার দেখা দিয়েছে এবং শুধু দেখা দেওয়া না, চার বছর পরে সমস্যার রেশ সুদূর গ্রাম গ্রামাঞ্চলে পৌঁছেছে। শহর দেশের হৃদপিণ্ড এই যুগে নিশ্চয়। কিন্তু তার শিরা উপশিরা তো জনপদের ভেতর প্রবাহিত। নগর শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্দ্র হয়ে পড়ে। তাই ধমনীর ভেতর রক্ত প্রবাহের ধ্বনি প্রথমেই শোনা যায়। ধীরে ধীরে তার তরঙ্গ গ্রমাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছায়। খবরের কাগজে অনেক সময় স্রেফ আলস্যের জন্য আর চোখ বুলাতাম না। কিন্তু ওই সময় খুব সকালে কাগজ দেখার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে উঠতাম। কথা বলতে না পারলে ব্যক্তিত্ব খর্ব হতে থাকে। আপনার ভেতরে তখন গুমোট জমে। ভেতরটা ক্রমশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। সহজে মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠার আর আপনার যো থাকে না। দরকাঁচা ফল দেখেছেন। দুমড়ানো তুপড়ানো। আপনার ব্যক্তিত্ব তেমনই হয়ে দাঁড়ায়। আপনি স্নায়ুরোগী হয়ে পড়বেন। বাঁচার কোনো আনন্দ পাবেন না। ক্রমশ আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে উঠবে আপনার মন। এই সঙ্গে মনে রাখবেন জীবিকার অদৃশ্য শিকলে সকল মানুষ বাঁধা। অনেক সময় শুধু বেকার হওয়ার ভয়ে মানুষ বিবেককে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়। অন্যায়কে মেনে নেয় বা অত্যাচার সয়ে যায়। বক্তৃতার ওজস্বিনী গলার সেই ভাষণ আমার কানে টোপইর লেগে থাকে। সংবাদপত্র নানা জায়গার সভা-সমিতির রিপোর্ট বিবৃতি ছাপে। আমি তা গোগ্রাসে গিলে যাই। ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে এক বিবৃতি দেখে আমি থ। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের শিক্ষাবিদেরা এক বিবৃতি দিয়েছেন চার বছর আগেকার মীমাংসিত সমস্যাকে আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পুনরায় জীইয়ে তোলার জন্যে। ওই বক্তব্যের ভাষা বড় চড়া এবং প্রতিবাদ প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করে তুলতে যথেষ্ট। আমার বিস্ময় বিবৃতিদাতাদের মধ্যে সালামত স্যারের নাম দেখে। স্পষ্ট ধরা যায়, তিনি মত বদলান নি, এবার স্বরূপে বেরিয়ে এসেছেন। পূর্বে তিনি স্বাক্ষর দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার বিপক্ষে, কিন্তু তাঁর মত তো তা ছিল না। তখনও তিনি মনেমনে বাংলা ভাষার সমর্থক কিন্তু আত্মগোপন করে বিপরীত মুখোশ পরেছিলেন। এবার সেই মুখোশ খুলে ফেললেন। কেন? এবার কি তিনি পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর চিন্তান্বিত নন। ওই বিবৃতি কদিন আমাকে বেশ অসোয়াস্তির মধ্যে ফেলে রাখলে। দুই শিক্ষক যেন আমার জীবনে কাল হয়ে দেখা দিয়েছিল। যখন বেশি চিন্তা ভাবনা করতাম না, তখন বেশ ছিলাম। কলেজজীবনে আমার উপকার আর কতটুকু। আমার আরো কৌতূহল নগীব স্যার এখন কী করছেন? বাতাস এখন তাদের বিপক্ষে? চার বছরে পাশা উল্টোতে শুরু করেছে। কোন মুখে আর তাঁর কাছে যাব? অবশ্যি সালামত স্যার জানেন আমার ছাত্রজীবনের ইতিকথা। তার কাছে স্বছন্দে যাওয়া যায়। আর তিনিই তো আমার প্রধান নিশানা। একা ছিলেন না ড্রয়িংরুমে। আমাকে দেখে বেশ খুশি হয়েছেন তা তাঁর "এসো, এসো" সম্বোধনেই লেপ্টে ছিল। স্যারের মুখোমুখি চেয়ারে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক বয়সে উনিশ-বিশ স্যারের কাছাকাছি। ভদ্রলোকের শ্যাম চেহারা, বাবরি চুল-শোভিত মস্তক, থুৎনির উপর কয়েক গাছি দাড়ি। মনে হবে, যেন অন্য কারো দাড়ি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে ওখানে গুঁজে দিয়েছেন। ওঁর চোখ দুটো কিন্তু আশ্চর্য দীপ্তিময়। পরিচয় করিয়ে দিলেন অধ্যাপক সালামত; তিনি একজন কবি। আমার বড় অসোয়াস্তি লাগছিল। এলাম স্যারের সঙ্গে পুরাতন রেস্তোর কথা বলব এবং অন্য উদ্দেশ্য আছে। তৃতীয় ব্যক্তি তো ব্যাঘাত। কিন্তু আপদ বেশিক্ষণ সইতে হোল না। ভদ্রলোক মিনিট দশ পরে উঠে গেলেন। অতিথি হিসেবে তিনি পূর্বেই আপ্যায়িত। তা বুঝতে পারলাম স্যার যখন বললেন, "একটু আগে আমরা চা খেয়েছি। এবার তোমাকে খেতে হবে।" আমি আপত্তি জানালাম না। আমাকে কেঁচো খুঁড়ে এগোতে হয় নি বেশিদূর। অধ্যাপক স্যার নিজেই সাপ বের করলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। গ্রামঞ্চলে ভাষা নিয়ে মানুষ কিছু ভাবছে কি না। আমার সমর্থক জবাবের সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করলেন, "তিন চারদিন পূর্বে আমরা শিক্ষকরা একটা কড়া বিবৃতি দিয়েছিলাম, তুমি দেখেছো?" "দেখেছি, স্যার।" "তোমার জবাব ঠিক হলো না। তোমার তো পাল্টা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, আমার মতিগতি কী করে ফিরল?" আমি ভেতরে ভেতরে অসীম কৌতূহল নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। "আমার মতি সম্পর্কে তুমি জানতে। আর গতি সম্পর্কেও। চার বছর পূর্বে ছাত্র হলেও তোমার কাছে দুর্বল মুহূর্তে স্বীকার করে ফেলেছিলাম, আমার পরিবারের জন্যেই আমি বিবেকের সঙ্গী নই। শুনে রাখো, পরিবারের চিন্তা আমার আজও আছে। চিন্তা নয়, দুর্ভাবনা। তবে আজ আমার ভয় খুব বেশি নয় যে কাবু হয়ে পড়ব যা আছে তা সাহসেই বলতে পারো। তুমি চুপচাপ কেন? সঙ্গে সঙ্গে তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল আমার সাহস কোত্থেকে এল— " সাহস— সাহস— সাহস তিন অক্ষরের শব্দটা উচ্চারণ

করতে করতে অধ্যাপক স্যার উত্তেজিত, ড্রয়িংরুমে পায়চারীর মধ্যে বলতে লাগলেন, কখনো তর্জনী আমার দিকে বাড়িয়ে, কখনো উর্ধ্ব নেত্র যেন নিশিগ্রস্ত। "শোন আলী জাফর, আমার সাহস যুগিয়েছে কারা জানো? দেশের মানুষ। ওরা আর নিঃসাড় নয়। ওরা এগিয়ে এসেছে তাই আমি লা-পরোয়া। আমার উপর চোটপাট এলে তারা ঢাল হয়ে দাঁড়াবে— দেশের লাখ লাখ মানুষ। তুমি কি মনে করো, যার মূল্যবোধ, দেশের ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, ভাবে তারা মূল্যবোধকে রক্ষা করে? আদৌ না। বহু বুদ্ধিজীবী আছে দেশে। ওরা কি মূল্যবোধ, শ্রেয়বোধকে রক্ষা করে? ওদের অনেকে আছে যারা ব্যক্তিগত সুখের জন্যে ওসব জলাঞ্জলি দেয়। মনে রেখো, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়েসের জন্যে যখন কেউ প্রতিভাকে কাজে লাগায়, তখন প্রতিভা পরিণত হয় পাছায়। ওরা বুদ্ধিজীবী নয়, ওরা পায়ুদাস, পায়ুজীবী। ভালো আহার পেলে পায়খানা বেশ সহজ সরল এবং আরামদায়ক হয়। তা ওরা বেশ জানে। ওদের কার্যকলাপ তা সামনে রেখেই এগোয়। দেশের সমস্ত জড় এবং মানসিক সম্পদ রক্ষা করে দেশের সাধারণ মানুষ। ওরা না এগিয়ে এলে কিছুই রক্ষা হয় না, কেউ রক্ষা করতে পারে না।" অধ্যাপক সালামতের এমন কণ্ঠ আমি ক্লাসেও শুনি নি কোনোদিন। রেশ কাটে না, আপন স্বগতোক্তির স্রোতে তিনি ভেসে চলেন "কেউ রক্ষা করতে পারে না দেশের মানসিক সম্পদ। ভাষাকে কে রক্ষা করে, কবি সাহিত্যিক নাট্যকার ইত্যাদি ইত্যাদির পাল? ছুহ্... ছুহ্...। ওই যে আমার সঙ্গে বসেছিল কবি। মূর্খ দালাল। ও এক আজব চিড়িয়া। ও ইমানদার লোক। কিন্তু জগতের কলকব্জা সম্পর্কে কিছু ওয়াকিবহাল নয়। ও কী মনে করে জানো? পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে হবে যে-কোনো মূল্যে। কারণ, পাকিস্তান টিকে গেলে তবে ইসলাম টিকে থাকবে। মূর্খ, মূর্খ...। পাকিস্তান, একটা রাষ্ট্র, ইসলাম একটা ধর্ম। ওই মূর্খ কবি এই ফারাকটুকু বুঝল না। রাষ্ট্র এবং ধর্মের ফারাক নাদান কবি বোঝে না। অথচ ভালো কবিতা লেখে সহজাত ক্ষমতা আছে ওর। তা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু তা নিয়ে ও 'কদ্দূর যাবে? ওর শৈল্পিক ক্ষমতা হ্রাস পেতে বাধ্য। একরোখা মনের পরিণতি এমনই হয়, সেখানে বৈচিত্র্যের শোভা প্রবেশ করে না। তকে কবিটা একটা ট্র্যাজিক কেস। ও বেইমান নয় নগীবউদ্দীনের মতো। নগীব পরকালের মন্ত্র আওড়ায়, কিন্তু তার দুই চোখ ইহকালের বুচকীর দিকে। আর এই আহাম্মক কবি নিজের মোহ-মরীচিকায় এমন আবিষ্ট যে পেছনে কামান দাগলেও টের পায় না। নিজের ইমানও তোমাকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যেতে পারে— অনেকের পক্ষে তা বোধগম্য নয়। ইমানও যাচাই করা দরকার। তার কষ্টি-পাথর দেশের মানুষ। যদি তাদের কল্যাণ আনে তোমার ইমান, তাহলে তা সাচ্চা। আর যদি ঝুট হয়, দেশের মানুষের দুর্দশা তোমাকে বলে দেবে ইমানের মধ্যে খাদ আছে। আমাদের ওই মূর্খ কবি চোখ বুজে ইমান ইমান রবে চিৎকার করে, দেশের মানুষ আর কী ভাবে দেখবে? ওটা একটা মনস্তাত্ত্বিক রোগী। ওর সঙ্গে আমি আর তর্ক করি নে। আসে বাড়িতে অতিথির মতো। ওর সমাদর আমার কাছে কবি হিসেবে। নচেৎ ও তো সমাজ-বিরোধী প্রাণী, ক্রিচার। নিজে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখে, তবু বলবে, পাকিস্তানের মাত্র পত্তন-কাল, এই সময় ওসব সমস্যা উত্থাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যায়। কিন্তু ওই কবি নগীবউদ্দীন নয়।" প্রায় ক্লাসের বক্তৃতা পরিবেশন করে বসেছিলেন আমার কাছে অধ্যাপক সালামত। আমি সাহস পেলাম তার ভাবভঙ্গি দেখে এবং সোজা নগীব স্যারের বর্তমান হালচালের খবর জিজ্ঞেস করলাম "নগীব, এখন ময়দানে নেই। দেখেছে আর হালে পানি পাচ্ছে না। তাই চুপ করে আছে। তবে পুরাতন চাল সে ছাড়তে পারে না। এখন যারা দেশে উর্দু বা আরবি অক্ষরে বাংলা চালু করার পরামর্শ দিচ্ছে ও তাদের দলে ভিড়েছে। উর্দুর সপক্ষে কিছু বলে না, কিন্তু বাংলা ভাষার বিরোধিতায় নতুন ফন্দি এটেছে। আমি আর ওর খবর রাখি নে। তুমি কিছু জানো না কি?" ওই পথে আর এগোনো নিষ্প্রয়োজন। তবু স্যার যোগ করলেন, "অবস্থা অনুযায়ী কী করে কৌশল বদলাতে হয় তা শুধু সেনাপতি জানে না, সামাজিক যুদ্ধেও একই ব্যাপার ঘটে। নগীবউদ্দীনের ওসব শেখাতে হয় না। তবে ভালো গুছিয়ে নিচ্ছে। একটা ছেলেও মার্কিন দেশে গেল লেখাপড়া শিখতে বিনা খরচে।" স্যার তারপর অন্যান্য কথা পাড়লেন। সেদিন সন্ধ্যাটা আমার খুব উত্তেজনায় গেল। মেসেও দেখি, বাংলা ভাষা নিয়ে কথা বলাবলি শুরু হয়েছে। কাজী আলম রীতিমতো উত্তেজিত।" পচ্ছিমারা পাইছে কী?" অর্থাৎ পশ্চিমারা কী পেয়েছে? সেলসম্যান কেরামত আলি যে কোনো সাতেপাঁচে থাকে না, সে-ও নীরব শ্রোতা নয়। পাকিস্তান চেয়েছিল সে। তার মানে এ নয় সে বাংলা ভাষা বিলোপ অথবা মর্যদায় কোনো ভাষার চেয়ে খাটো হয়ে যাবে। আমার মনে পড়ল গ্রামের খলিল চাচার কথা। তিনিও এমন মত পোষণ করেন। আশ্চর্য ব্যাপার বৈইকী। শিক্ষিত এবং গেঁয়ো অর্ধ-শিক্ষিত মানুষ এখানে এক কাতারে। অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন মেস সরগরম রইল। চার বছর পূর্বের কৌতূহল আবার আমার ভেতরে ঝিলিক দিতে থাকে। কী হচ্ছে অন্য পাড়ায় অন্য শিবিরে? বাংলা ভাষাবিরোধী বাঙালি এবং অবাঙালিদের মতিগতি কোন দিকে? রেজা কাজেমীর নবাবগঞ্জের বাড়ি যাওয়ার তাগিদ স্বাভাবিক। কিন্তু কোন মুখে যাব? আমি আর ছাত্র নই এবং রেজার সঙ্গে যোগাযোগ তথৈবচ। তবু একদা সহপাঠীদের উপর তেমন যেন একটা অধিকার থাকে। আপিসের কাজে আর কেমন মন বসে না। জীবিকা দায়সারা কিছু হতে পারে তা সেদিন বেশ টের পেলাম। ছুটি হওয়ার কিছু আগেই উড়ুউড়ু মন। একসময় বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম। কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিল শাহেদ কাজেমী— রেজার বড়ভাই। আমি অসোয়াস্তিকর ম্রিয়মাণতায় তার মুখের দিকে চেয়ে স্লামালেক দেওয়ার পর উচ্চারণ করলাম অস্পষ্ট ঘষা-গলায়, "রেজা!" "রেজা নেহি হ্যায়", শাহেদ জবাব দিলে। কিন্তু অন্য ব্যাখ্যা দেয়ার পূর্বে আমাকে সাদর কণ্ঠে ডাক দিলে, "আন্দরে আইয়ে না।" রেজা নেই, আমি কার কাছে যাব? শাহেদ কাজেমীর পরবর্তী বিবরণে আমি থ' হয়ে গেলাম। রেজা গতবছর করাচি চলে গেছে। সে শুধু একা নয়। তার পিতা, আম্মারা, সোগরা সকলেই এখন সেখানে। সে শুধু তার ফ্যামিলি নিয়ে আছে মাশরেকি পাকিস্তানে। আমার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে শাহেদ আরো বিস্তারিত হলো এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তার মুখে শোনা গেল, জাভেদ কাজেমী অর্থাৎ পিতৃদেব আর পূর্ব-পাকিস্তানে থাকতে রাজি নন। এখানে ভাষা নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছে। এসব বাইরের আলামত (লক্ষণ)। তার

মতে ভেতরেও বিরোধ শুরু হয়েছে। এখন লক্ষণ ভালো নয়। তার চেয়ে করাচি যাওয়া ভালো। সিন্ধি শহর করাচি। শরিফ লোকেরা সেখানে উর্দু বলে। বিরোধ নিশ্চয় বেশি হতে পারে না। শাহেদ পিতৃদেবের জাতীয়তাবাদের উপর একচোট নিলে, আরো চোটপাট চালালে তার বাতিকের জন্যে ফ্যামিলির মধ্যে এমন বিবাদ ভালো নয়। শেষে বুড়ো কাজেমী জিতে গেছেন। অবিশ্যি শাহেদ ব্যবসায় বেশ ভালো করেছে। আল্লা মুখ তুলে চেয়েছেন তার দিকে। সে এখানে থাকার পক্ষপাতি ছিল। শুধু বুড়ো বাবার বাতিকের জন্যে মজবুর। তার বাবা একটা কথা নাকি বারবার বলতেন, "এই দেশে এসেছিলাম, তখন রিক্সাওয়ালারা দাম যা দিই তা নিত আরো বলত আপনারা পাকিস্তান গড়তে এসেছেন আপনাদের লগে কী দরাদরি।" তারা এখন 'পশ্চিমা' বলে ঘেন্না প্রকাশ করে। এসব তোমাদের বুঝা উচিত। এখানে শেষপর্যন্ত কী হয় আল্লা জানেন। সন্দেহপ্রবণ পিতার উপর বড় খাপ্পা শাহেদ কাজেমী। এখন দুদিকে দুই সংসার টানা তার পক্ষে কষ্টকর হবে না— আল্লার দোয়ায়। কিন্তু ব্যাপারটা শোভন হলো না। বহিরাগত কোনো মুসলমানকে এখানকার লোক বিশ্বাস করবে না। শাহেদের কাছ থেকে ভাষা-সংক্রান্ত আর কিছু জানার দরকার আছে কি? কিন্তু তার অতিথি আপ্যায়নের ধারা আজ বড় আন্তরিক মনে হলো। বারবার গোস্বা ঝাড়লেন সে বৃদ্ধ পিতার উপর। নচেৎ মহাম্মদপুরে তার নামে একবিঘা জমি 'অ্যাল্‌ট' হলেও সে তা ফিরিয়ে দিলে। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুসমাজের উপর তার রাগ আরো বেশি। ভাষা নিয়ে বর্তমানে যে গণ্ডগোল, তা ওদের ষড়যন্ত্র আর তার সঙ্গে আছে ভারতীয়দের যোগসাজশ। আমি চুপচাপ তা মেনে নিলাম না। সালামত স্যারের বাণ নিক্ষেপ করলাম। "শাহেদ সাহেব, ভাষা তো কোনো ধর্মের হয় না। তা স্থানীয় ব্যাপার। ভূগোল এবং ইতিহাস ভাষা তৈরি করে। গুজরাটের মুসলমান গুজরাটি বলে। সেখান হিন্দুর বুলিও ওই এক ভাষা। সেখানকার হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন তোলা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। এসব ধোকা সৃষ্টি করে ফেরেব্বাজেরা— যারা দেশের মানুষকে শোষণ করতে সর্বদা ফন্দি খোঁজে।" শাহেদ শেষে যুক্তির ধার ধারে না আর। সে রীতিমতো চটে উঠল, তা তার গলার আওয়াজে বুঝা গেল, আচরণে নয়। ফেরার পথে ওর ফন্দি আমার কাছে ধরা পড়ল। ও এদেশে আছে ব্যবসার জন্যে। মহাম্মদপুরে জমি নিয়েছিল নিশ্চিয় বাড়ি করার জন্যে। পরে পিতার জন্যে মত বদলেছে। তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, কাজেমী সাহেব ভালো কামাচ্ছেন এবং এমন কামিয়েছেন যে, বাড়ি তোলার স্বপ্নও দেখেন। সালামত স্যারের একটি কথা তাঁর অনেক কথার মতো, বহুবার মনে পড়ত "ব্যবসায় মুনাফার হার থেকে বুঝতে পারবে মানুষ কী হারে শোষিত হচ্ছে। কারা মানুষের রক্ত নিংড়েই মুনাফার পাহাড় তৈরি করে। এইসব রক্তভুক ব্যবসাদাররা তখন আইন দিয়ে আটঘাট বাঁধে যেন তাদের মুনাফার রাস্তা না বন্ধ হয়। সব গভরমেন্টের আদল ঠিক সেই অনুযায়ী গড়ে উঠতে বাধ্য।" আমার কাছে এখনো আবছা এসব কথা। তবে মনেমনে জানি, তার ভেতর সত্য কী যেন আছে। আমার ছাত্রজীবনের ইতি ঘটানোর উচিত ছিল না। বুকের ভেতর শত কৌতূহল দাপাদাপি করে, সেই অসোয়াস্তির জ্বালা অনেক। সেদিন মেসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরার সময় দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা দেখলাম প্রচুর। কয়েক পা এগোলেই চোখে পড়ে : রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই। কোথাও কয়লা দিয়ে লেখা, কোথাও শাদা খড়িমাটি, কয়েক জায়গায় আলকাতরার পোঁচে আঁকা। এসব চোখে পড়ে, আমি একরকমের আবেশ অনুভব করি। কিন্তু তা আমাকে ঘুম পাড়ায় না বা নিস্তেজ করে ফেলে না। ট্রেনে পুঁটলিখোওয়া যুবককে নিয়ে যেমন অবাঙালি প্যাসেঞ্জারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তেজের সঙ্গে, তেমন তেজ আবার আমার মধ্যে প্রত্যাগত। নিজের শরীরের দিকে তাকাই। স্ফীত বুকে পাহাড়ের ভার গ্রহণের তাগত জমা আছে। অজানিত হাত ভাঁজ করে বাহুর পেশী কত শক্ত বা নরম দেখার ছেলেমানুষি পর্যন্ত পেয়ে বসে। আমি কেন পূর্বে গত দুবছর বয়স বাড়ার সাথে সাথে মিইয়ে যাচ্ছিলাম? আমার গায়ে এত তেজ আছে অথচ আমি ভেতরে ক্রমশ মরা কেন? আমার কেরানিজীবন আর বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। একটা কিছু করতেই হবে। কোনো নৈশ কলেজে ভর্তি হয়ে আবার ছাত্রজীবন ঝালিয়ে তুলব অথবা পিতার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা বন্ধ করে, সোজা তার আশ্রিত সন্তান হব আবার। ভেবে ঠিক করতে পারি নে। কিন্তু একটা কিছু করা দরকার। উনিশ শ বায়ান্ন সনের ফেব্রুয়ারি মাস আমার মনে শান্ত হয়ে রইল না। বাইরেও আলোড়ন। তা অনুভবের জন্যে সংবাদপত্র, শহরের দেয়ালই যথেষ্ট। একদিন আপিসে যাওয়ার পথে এক কিশোর আমাকে পথে আটকিয়ে বললে, "একটা কিনুন।" তার হাতে একটা ছোট পতাকা, ভেতরে লেখা "রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই।" জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার?" "খবরের কাগজ পড়েন নি? ভাষা-আন্দোলনের ফান্ড সংগ্রহে আমরা এই পতাকা বিক্রি করছি।" ছেলেটির হাতে একটি ছোট্ট ছিদ্রমুখ টিনের ভাণ্ডার। আমি তার ভেতর কিছু মুদ্রা গলিয়ে দিলাম। ছেলেটি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে অন্য পথচারীর শরণাপন্ন হল। ঠিক একদিন পরে আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৩ ফেব্রুয়ারি আবার আপিসে যাওয়ার পথে এক অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রচণ্ড হাসি আমাকে কাবু করে ফেলেছিল, কিন্তু তা ভেতরে চেপে নিঃশব্দ হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম একদম অকুস্থলে। বেটেখাটো এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পরে আছেন বহু পুরাতন জীর্ণ কালো আচ্‌কান। মাথায় লাল গোল তুর্কি টুপি। তার গায়ের রঙও বেশ কালো। ওর দিকে তাকালে এখন তার কাপড়চোপড়ের ফালাফালি অংশমাত্র দেখা যায়। মাথার টুপি, আচ্‌কান, পাজামা প্রভৃতিতে "রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই" মুদ্রিত ছোট ছোট পতাকা পিন দিয়ে গাঁথা। ভদ্রলোককে গোল করে ঘিরে আছে একদল স্কুলের কিশোর কুঁচো ছেলেপিলে এবং মাঝে মাঝে তারা হাঁটার সময় স্লোগান দিচ্ছে : "রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই।" ভদ্রলোক নীরবে হাঁটছেন। আর থুৎনির উপর খুব পাৎলা দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন থেকে থেকে। ছেলেরা তা-কে ধরে দাঁড় করিয়ে অমন চলমান পোস্টার বানানোর জন্যে পতাকা গেঁথেছে কোনো এক সময় আজ সকালে। দেখে হাসি লাগার কথা। কিন্তু ভদ্রলোকের করুণ মুখাবয়ব হাসি থামিয়ে দিতে বাধ্য। একটা মানুষ বিপদে পড়েছে, তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না। কিশোর কুঁচো ছেলেরা উৎসাহের আধিক্যে এমন দৃশ্যের অবতারণা করেছে। জানা গেল, এই ভদ্রলোক "হরফুল কোরান" বা "কোরানের অক্ষর" সমিতির সদস্য। তাঁরা মনে করেন, অর্থাৎ এখানে মজ্‌কুর

AMARBOI.COM

জনাব মনে করেন, যদি বাংলা বর্ণমালা আরবি বর্ণমালায় রূপান্তরিত হয়, তাহলে এদেশের মানুষের সৎ মুসলমান হওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। বর্তমানে নানা কারণে, এদেশে গোমরাহি (বিভ্রান্তি) ঢুকেছে। দুর্নীতি সেই জন্যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তা দূর করার উপায় "হরফুল কোরান" সমিতির উপদেশ। আর সেই যুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত আরবি। বহু দিন থেকে ওই সমিতি চালু আছে দেশে। এত দিনে তাদের ব্যাপক প্রসার দেখা যাচ্ছে। সত্যের বিস্তার দেরিতেই হয়। সেদিন সমিতির এই সদস্যের অমন দুর্দশা মোচনে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেন নি। ভদ্রলোক হাঁটছেন, নিঃশব্দ, নীরব। চারপাশের ছেলেরা স্লোগান আর জোর হাততালি দিচ্ছে মাঝে মাঝে। শুনলাম বহু দিন একাই হরফুল কোরান সমিতি চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। মুসলমানদের তাবৎ দুর্দশা— নৈতিক এবং অর্থনৈতিক সবই দূর হয়ে যাবে, যদি বাংলা অক্ষর পরিবর্তন করা যায়। ভদ্রলোক বড় শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কারো সঙ্গে কলহ বা তর্কে প্রবৃত্ত হন না। নিজের বক্তৃতা দুচার জনকে শোনাতে পারলেই তিনি খুশি। বর্তমানে ভাষা আন্দোলনের মুখে তিনি জেরবার হয়ে পড়েছেন। সরল বিশ্বাসী মানুষ কেন অমন অবহেলার পাত্র হয়? পতাকাখচিত চলমান শো-কেস এগোতে লাগল। আমার পথে মোড় নিয়েছে। আর তামাসা দেখার যো নেই। আমার ঠোঁটে হাসির রেশ উঠে তখনই মিলিয়ে যায়। আমি আপিসে যাওয়ার পথে। মিছিল আর চোখে পড়ে না। কিন্তু স্লোগান শুনতে পাই। তখনই আমার মনে হয়, মানুষটা ইমানদার, সে যা সত্য এবং শুভ মনে করে সেইমতো কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু তেমন ব্যক্তি এমন করুণার পাত্র কেন? ওকে দেখে হাসি এলেও কারো হাসা উচিত নয়। নগীবউদ্দীন বনাম অধ্যাপক সালামতের ঘটনায় একদিন ধাক্কা খেয়েছিলাম। আজ আবার তেমন হোঁচট খেতে লাগলাম। প্রশ্নের জবাব মেলে চিন্তার ভেতর দিয়ে। তার ভিত রচনা করে মানুষের জ্ঞান। অধ্যাপক সালামত ক্লাসে বলতেন। নতুন করে কথাটা আবার উপলব্ধি করলাম। সেদিকে আমি শূন্য। লেখাপড়া খিখতে গিয়েও পিছনে পড়লাম। আমার অনেক কিছু জানা দরকার। সেই উপায় খুঁজে আমাকে বের করতেই হবে। কিন্তু তর্কে প্রবৃত্ত হতে আমি তাগিদ পেতাম ভেতর থেকে। যা জ্ঞান আছে তা দিয়েই তো শুরু করা উচিত। তাবৎ জ্ঞান পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করলে তো একজন্মে কুলাবে না, এক পাও এগোতে পারবে না। সাংবাদিক সেলিম আলি এসেছিলেন কাজী আলমের কাছে। আমার জানা, বেসরকারি কাগজের সহকারী সম্পাদক। কিন্তু কাগজটা বেসরকারি হলেও সরকারের পোঁ ধরা এবং সরকার যেখানে ভাবে কোন অপরাধের জন্যে জেল জুলুম উপযুক্ত শাস্তি সেখানে ওদের জেলের ভেতর 'সেলে' ভরে রাখার জন্যে সুপারিশ করবে এই সংবাপত্রের কর্তৃপক্ষ। এমন কাগজের বেতনভুক সাংবাদিক মি. সেলিম। তার প্রতি আমার গোপন বিতৃষ্ণা থাকা স্বাভাবিক। অন্যদিকে আমার সাবেক লড়ুয়ে মনোভাব আবার যেন ফেরৎ আসছিল। সেদিন সকালে সেলিম আলি সাহেবের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতে আমার বেশি দেরি লাগে নি। আরো একটি ঘটনায় আমি ওই সময়কার হদিস আঁচ করতে পারছিলাম। প্রথমে শহরে এসে আমি যে ভদ্রলোকের বাসায় উঠেছিলাম তার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎ ঘটে হঠাৎ এক চায়ের দোকানে। তিনিও দেখা গেল, ভাষার ব্যাপারে আদৌ নির্বিকার নন। ছোটখাট ব্যবসা করেন, অবস্থা আর দশজন গ্রামবাসীর তুলনা খুবই ভালো। অথচ তিনিও রীতিমতো বিরক্ত। সোজা বললেন, এই পরছিমাদের লগে পারা যাবে না। সব আপিসে ওরা বড় বড় জায়গায় বসে। সামান্য আমদানির ব্যবসা। লাইসেন্স ইত্যাদি লাগে। জুতার সোল ক্ষয়ে যায় পথে। অথচ উর্দুভাষী হলে আর দেরি হয় না। 'শেয়ালে শেয়ালে নাক সোঙা-সুঙি খুব সহজ।' আমার কাছে "পচ্ছিমা" ঘৃণার হেতু বুঝতে দেরি হয় না। আঁতে ঘা লাগলে আঁৎকে উঠতে হয়। সেলিম আলি সাহেবের মুখে আজও শুনলাম সেই পুরাতন কথা : শিশুরাষ্ট্র খামখা এসব গণ্ডগোল পাকানো উচিত হচ্ছে না। আমার কাছে মুরুব্বির মুখে এবং উচ্চশিক্ষিত সাংবাদিকের নিকট থেকে আন্দোলনের জোয়ারের পর্যায়েও এমন উচ্চারণ অসহ্য লাগল। আমাদের উভয়ের তর্ক এমন দেওয়ালে ঠেকেছিল যে সেলিম সাহেব দুর্বল যুক্তি অবতারণায় অপারগ, শেষে ব্যক্তিগত বাণ হানতে শুরু করলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, কুল্লে মেট্রিক, এসব কথা তোমার মুখে শোভা পায় না।" আমিও কিন্তু তখন রাগী ষাঁড়, গুঁতোতে শিং খাড়া করলাম, "সরকারের দালালি করেন এবং দালালি মারফৎ রুজি কামাই আপনার। আপনার মুখ থেকে এমন কথা শোনা ছাড়া আর কী শোনা যাবে? কাজী আলম তখন ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, "আলী জাফর, চুপ করো। তুমি...।" তার মুখের দিকে চেয়ে আমি স্তব্ধ। অবিশ্যি তিনি চোখ টিপে জানিয়ে দিলেন যার গলিত অর্থ : "বেশ করেছ, ছোকরা। তবে— বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ এমন বলা উচিত হয় নি।" কাজী আলমও ভাষার ব্যাপারে আমাদের দলে। এই আনন্দে আমি সেলিম আলির কাছ থেকেই তখন ক্ষমা চেয়ে নিলাম। ভদ্রলোক এককাপ চা খেলেন পরে। কিন্তু আড্ডা মিইয়ে গেল। একপর্যায়ে তিনি আসর ত্যাগ করলেন। আর কটাইবা দিন। দেখতে দেখতে ভাষার প্রশ্নে সর্ব সংবাদপত্র তোলপাড়। কোনো না কোনো খবর থাকবেই। আমি প্রথমে সংবাদপত্র পাওয়ার আগ্রহে খুব সকাল সকাল উঠে পড়তাম। মেসের বারোয়ারি কাগজ হাতে আসতে দেরি হয়ে যায়। ওদিকে আবার আপিসের ডাক। তাই অমন পন্থা। একহপ্তা মাত্র হঠাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার দিকে সরকারি ভ্যান মাইক দিয়ে ঘোষণা ছড়ায় : সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছে। সভা-সমিতি মিছিল দশজনের বেশি একত্র হওয়া নিষিদ্ধ। এবং একমাসের জন্যে। শুধু ঢাকা শহরে নয়, সমস্ত প্রদেশ জুড়ে। তখনই মনে পড়ল, খবরের কাগজে বেরিয়েছিল ছাত্রদের "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা" কমিটি গত ৪ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২১ তারিখে গোটা পূর্ব-পাকিস্তানে হরতাল মারফত ভাষাদিবস পালন করা হবে। সমস্ত শহর থমথম করছিল সেই সন্ধ্যা থেকেই। বাসায় ফেরার সময় আমি তা লক্ষ্য করলাম। শুধু তাই নয়, গলির মোড়ে মোড়ে জটলা। তুমুল উত্তেজনার অন্তর্স্রোত রাস্তায় নামলেই অনুভব করা যায়। মেসে ফিরলাম। সেখানেও কাজী আলম এবং অন্যান্যেরা বলাবলি করছে, আগামী দিন কী হতে পারে? আমার আপিসের মালিক বলে দিয়েছেন, কাল দোকান খোলা হবে না ছোটখাট ব্যবসাদারদের মত বেশ জানা হয়ে যায়। কিন্তু বড় বড় ব্যবসাদার ও ফার্মের মালিকরা কী ভাবছে? আমার জানার কৌতূহল ছিল, উপায়

ছিল না। কারণ, তেমন মহল তো আমার নাগালের বাইরে। সালামত স্যার বলতেন, "দেখবে একটা ইস্যু নিয়ে সমাজের সকলে একমত পোষণ করে না। একই জিনিস— ধরো একটা গাছ— কে কোন অবস্থান থেকে গাছটা দেখছে, তদনুযায়ী গাছের আকার আয়তন দর্শকের কাছে ধরা পড়বে। সমাজে ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। গাছটা দূর থেকে ছোট মনে হবে। একজনের, আবার যে কাছে আছে তার কাছে বড়। কে কোন্ অ্যাংগেল (কোণ) থেকে দেখছে তার উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে।" নসিহতের মতো কথাগুলো আজ কানে এসে ঘা দিলে। অনেক কিছু জানার জন্যে সব চেয়ে উত্তম উপায় ছাত্র হয়ে থাকা সারাজীবন। ভাষা আন্দোলন বিস্তারের মূলে এদেশের ছাত্রদল। অথচ আমি ছাত্র নই। নিজের দীনতা বুকে পুষে পরদিনের জন্য আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয় কাগজের উপর। আজ সরকারি কাগজ অর্থাৎ সরকার সমর্থক কাগজও দেখা দরকার ছিল। সালামত স্যার বল্লেন শত্রুর গতিবিধি কী, তা না জানলে তোমার গতিবিধি ঠিক হতে পারে না। কাল বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল মুখ ধোওয়ার পূর্বে আমি নিজে বেরিয়ে হকারের কাছ থেকে একটা কাগজ কিনে আনলাম ছাত্ররা সভা ডেকেছে দুপুরে য়ুনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করা উচিত কি অনুচিত তখনই স্থির হবে কয়েক দিনের প্রচারের ফল কালই সন্ধ্যায় দেখা গিয়েছিল হরতালের অনুকূল মনোভাব ব্যাপক একশ চুয়াল্লিশ ধারার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তখনো কিছু আঁচ করা সম্ভব হয়নি। এই অনিশ্চয়তা একধরনের অসোয়াস্তির আঁচড় টেনে চলে আমার মনে দুপুরের খাওয়া পূর্বেই সেরে নিলাম ছুটির দিন ঘুমোনোর কথা যে মনে ওঠেনি তা নয় অন্যদিকে অসোয়াস্তি চাড়া দিয়ে ওঠে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে বিকেলের দিকে।

শহরের অবস্থা দেখা যাবে তখন কিন্তু মনে সায় বারবার বেরিয়ে যাওয়ার তরফে এবং গন্তব্যস্থল য়ুনিভার্সিটি এলাকা মেসে এক কামরায় তাস খেলা জমেছিল ছুটির দিনে সময় কাটানোর সময় আজ পার্টনারের অভাব ছিল না নচেৎ খেলায় বসে গেলে হঠাৎ ওঠা অশোভন অবিশ্যি খেলায় আমার মন বসত না কিছুতেই এ ফাঁকে শট্‌কে পড়লাম কাউকে কিছু না বলে রাস্তায় আমার মতই বিবাগী কয়েকজন পথচারীর সঙ্গে দেখা ওদের ছাত্র বলে ঠিক ঠাওর করেছিলাম আমিও কলেজের ছাত্র এই পরিচয় দিতে হলো। এমন দিনের সঙ্গী কি ছেড়ে দেয়া যায়? নিজের মিথ্যে ভাষণের কাছে কিছু ছোট হতে আমার কেন জানি বাধল না দোকানপাট সব বন্ধ দু-এক দরজা অর্ধেক খুলে হয়ত তামাসা দেখছে হরতাল সফল বৈইকী একসময় ছাত্র জনতার দরিয়ায় আমি কখন মিশে গিয়েছিলাম জানতাম না অনেক বচসা অনেক স্লোগান বজ্রমন্দ্র-রব শিক্ষানিকেতনের চতুর্দিকে এমন উত্তেজনা আর কখনো অনুভূব করি নি। বহুদিনের সংকুচিত আত্মা যেন দল মেলতে তৎপর সেই দিন যেন আগত। আমি ছাত্র বৈইকী বাপ তো জানেন আমি ছাত্র আর মিথ্যেবাদী থাকার প্রয়োজন হবে না কখনো আমার সমুদ্রে ঘূর্ণিলয় তরঙ্গ কম্পন শুরু হয়েছিল একসময় গেটের মুখে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী খাকি আর হেল্‌মেটে ছয়লাব পুলিশভ্যান আশেপাশে দশজন দশজনের কাতার বেরোয় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় কিন্তু কাতার কি স্থির থাকতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে? জীবনের স্বাদ যেখানে বর্তমানে সেখানে চাঞ্চল্য অস্থিরতা আসতে বাধ্য দশজনের কাতার পরে পুলিশের সাঁতারে পরিণত ওদের পক্ষে আর কুলিয়ে ওঠা সম্ভব নয় শুরু হলো কাঁদানে গ্যাস বোমার আর্তনাদ মানুষের আর্তনাদ তলিয়ে দেওয়ার জন্যেই তো এমন বিদারুণ শব্দের আয়োজন সভ্য এই সমাজে জনতা স্রোত আর এক খাতে পরিবাহিত নয় নানা আবর্ত তেমনই বিভিন্ন গতি-মুখ এবং গতি লড়াই শুরু হয়েছে তার ক্ষেত্র আর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সীমাবদ্ধ নয় এবং এখানে লড়াই অস্ত্র বনাম নগ্ন হাত কাঁদুনে বাষ্পের গন্ধে বিষাক্ত বাতাস ইট পাটকেল বা নিক্ষেপ সম্ভব যা হাতের কাছে আসে তা-ই নিয়ে মোকাবিলা করছে ছাত্র জনতা এবং এগিয়ে এসেছে তাদের পেছনে দেশের মানুষ মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেল এবং ছাত্রাবাসিক এই সব এলাকা আর ইলেম-অর্জনের কেন্দ্র নয় প্রাণ হরণের আততায়ীরা এখন চতুর্দিকে হঠাৎ গুলির আওয়াজ নিকটে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ শীর্যভঙ্গ নানা দিকে চোখ যে-দিকে যায় তা-ও কাঁদুনে বাষ্পের চোটে ক্ষতিগ্রস্ত সচল হয়ে ওঠে আরো গুলির আওয়াজ এবার আরো নিকটে চোখ তেড়ে তাকাই ঝাপসা কিছু দেখা যায় না কিন্তু শব্দ জানান দিয়ে যায় এক প্রেতায়িত হুংকার আমিও দৌড়াই নিকটে কোনো পাটকেল নেই যে ছুড়ব শত্রুদের দিকে গুলির শব্দ কানের পাশ দিয়ে শ-শ-নাদে এগোয় অস্ত্র-সংগ্রহে দৌড়াচ্ছিলাম নচেৎ পিছু ফেরার তো প্রশ্ন ওঠে না মোকাবিলা যেখানে পণ হঠাৎ বুঝতে পারলাম বাম দিক থেকে আমার কানের সামান্য নিচে ঘাড়ের উপর পাঁজরের কাছাকাছি কে যেন সজোরে বাড়ি মারল আমি ঢলে পড়ছি পেছনে ঘাড় ঘোরাতে কষ্ট পলকে দেখলাম রক্তের ফিন্‌কি একাধিক রেখায় আহ্ এত রক্ত ছিল এ শীর্ণ শরীরে জননী বাংলাভাষা! ঢলে পড়ছি বসুন্ধরার উপরে চেতনার প্রহরীরা রক্ত নয় যে মন্ত্রঃপূত জলসিঞ্চনে ক্রমশ পাথর হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার চেতনার দল তো নিমিষে নিরেট হয়ে যেতে পারে না আমি তখনো দেখতে পাই শুনতে পাই— রূপ-রস-গন্ধ এখনো আমার অনাত্মীয় নয় আরেক নতুন যাত্রাপথের প্রারম্ভে এইখানে আরেক আহত জনের গোঙানি শুনলাম নিকটেই কিন্তু চোখ ফিরিয়ে দেখব ঘাড় বাধা দিলে রক্ত ফিনকির গতি মন্দীভূত এত রক্ত ছিল এ শরীরে জননী বাংলাভাষা নিথর এক আবেশে ভাসমান তবু আমি চিৎকার দিতে চাই হে বাংলার অধিবাসীগণ বন্ধন ছেঁড়ার ভেতর দিয়েই মুহূর্ততার দীপ্তি এবং আনন্দ পরিবেশন করে যায় অতিক্রমণের আর কোনো দ্বিতীয় রাস্তা নেই নেই নেই এই শীতল মাটি মাটির লগে সমান্তরাল আমার ডান দিকের গণ্ডদেশ এমন শয্যার বিলাস শুধু আয়েসী কোন নাদান প্রত্যাখ্যান করবে সেই কবেকার পরিত্যক্ত জননী কোলের উম আবার ফিরে পাওয়া যায় আগে জানা ছিল না মা আমাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলতেন তার কাছ থেকেই আমার লুকোচুরি খেলা শেখা একপাশে আড়াল হয়ে গেলেও সামান্য মুখ বাড়িয়ে ডাক দিতেন জাফু আমি তখন তা-কে দেখে ফেলতাম ওই পলকটুকু বুকের ভেতর কী বুলিয়ে যেত কে জানে আমার কচি দাঁতে শুধু তা হাসি হয়ে ধরা দিত এই ফুলঝুরির ঝিলিক দেখার জন্যেই জননী হারিয়ে যেতেন একপলকে আবার অন্য পলকে খোঁজের নাগালে পড়তেন এমন কৌশল আনন্দের উৎস হয়ে যেতে পারে

সারাজীবনভর তা অনেক পরে শিখলাম তাও মুরুব্বি সালামত আলির মতো শিক্ষকের কাছ থেকে বাঁচার প্রহেলিকা তবু ঘুচে যায় না হিসাব লাগে কিনা এই হিসাবেই যত গণ্ডগোল একেক জন নিজের শ্লেটে হিসাব করে নিজের মতো আর তাই ফল দাঁড়ায় নানারকম একটার সঙ্গে আরেকটার গরমিল আহ্ ধুকধুক-রত বুক নিঃশ্বাস আছে অতি মৃদু সহজে বোঝা দায় এমন হলেও তবু চেতনারা নাকি সব মরে যায় না তখন জীবন-মৃত্যু ডুয়েল শুরু হয় কাছি-টানাটানি চলে তোমাদের হাত বাড়িয়ে দাও হে বাংলার অধিবাসীবৃন্দ মনে রেখো সীমার মধ্যে কোনো জিনিসের নিজস্ব পরিচয় থাকে ব্যথা বেদনা প্রচণ্ডতায় নিজ ধর্ম হারিয়ে ফেলে তা আর যন্ত্রণায়দায়ক কিছু থাকে না বাংলার বুকের উপর দক্ষিণ করোটে শয়ান শরীর ধমনীরা নিজ ধর্মে প্রবাহিত হে আকাশ তুমি সাক্ষী হে বাতাস তুমি সাক্ষী থাকো আমি আবার ফিরে গেছি আমার বাসনারা কামনারা যেখানে স্থিতি পেত আমি ছাত্র হতে চেয়েছিলাম আর তেমনই থাকতে চেয়েছিলাম সারাজীবন বাপের সঙ্গে আমার লুকোচুরি খেলার গ্লানি সমাপ্ত আমি জীবনকে জানতে চাই বুঝতে চাই এই চাওয়ার অস্থিরতা মুক্ত হতে চাই না কোনোদিন নিবিড় নির্জনতা আরো নিবিড় নীরবতা এই বিজন বনভূমি না আমার বাল্যের গ্রাম এত পাখি কেন ডাকে কেন এত বেবহা এখানে জলা-জাঙাল আকাশ শুধু মেঘলা দিনে নিকটে আসে আর নাগালের বাইরে থাকতে চায় না খালেক পাটোয়ারীর লগে মাছধরা একটা উৎসব বটে তখন আকাশে চিল কাঁদে এবং মাঝে মাঝে ঝাঁপ দেয় সব ভাসা মাছ ডুবে যায় পাথ্সাটে জলের সমতলে হঠাৎ একটা আলোড়ন একবার ফিরে যেতে চাই ফিরে যেতে কে না চায় কিন্তু কোথায় কোথা থেকে শুরু এটুকু জানা দরকার নচেৎ তুমি গন্তব্য ঠিক করতে পারবে না য়ুনিভার্সিটির বাইরে তো শুধু গ্রাম এবং শত শত গ্রাম তুমি যাবে কোথায় পা সাহায্য করে না সবসময় মনও না তখন সেদিকে আর কে যেতে চায় আহ্ আমার এই বিছানা নাকি সবসময় ওরা পছন্দ করে না যদি পড়ে থাকি পথচারীর মনে কিছু দাগ ফেলতে পারি এই দাগ বহু চোখের চাওয়ায় বড় হয় তা হতে দেওয়া চলে না দাগ দাগ খঞ্জরের মতো ধারালো হয়ে ওঠে এবং ভেতরের আঁত কেটে জানান দেয় পরিবেশ তোমাকে নির্বিকার থাকতে দেবে না তাই লাশ চোখের বাইরে রাখার দরকার হয় চোখ যেন না দেখে এই রকম মজার খেলা চোখে ঠুলি পরাতে না পারলে তখন সোজাসুজি ধূলি দাও পথের দিশা গোলমাল করে দাও তোমাকে সোজাসুজি দেখতে না পায় কেউ সোজা দৃষ্টি মানে সোজা বাড়ি তাক ঠিক তাই এত রকম ফন্দি ফিকির সালামত স্যার খুব ভালো বুঝতেন অথচ ভীরু নিজেকেই বলতেন বাস্টার্ড (জারজ) জারজ কোনো গাল হতে পারে না অথচ অমন গালে লোকে চটে যায় এক জনের বেশি দুজন বাপ কী করে হবে চিকিৎসাশাস্ত্র তা মানবেই না কোনোকালে নগীবউদ্দীন ইংরেজ সাহেবের পোষ্যপুত্র হতে চায় হালেচালে ড্রয়িংরুমে খানাপিনায় বাথরুমে তার সামাজিক আচরণের সংগে মতলবের মিল নেই কত রকমের চিড়িয়া থাকে চিড়িয়াখানায় অথচ এক সমাজ নাকি একেক কাঠামো হয়ে দেখা দেয় স্যারেরা বলতেন তার আদল চিনে যে কাজ করতে পারে সেই নাকি মহাজ্ঞানী মহাজন। কোথায় কোথায় অন্ধকারে আর কোনো শব্দ শোনা গেল না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল আমিও তাকিয়ে যেতে লাগলাম অনেক উঁচু থেকে সাত তলা কোন দালান থেকে লাফিয়ে পড়ছি। এত লোক জমিনের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে কেন কিসের চিৎকার? আমাকে লুফে নিল একজন বড় নরম হাত বড় নরম বুকের মধ্যে আমার জায়গা। সিতারা কী লাহোর থেকে ফিরে এসেছে? আশা কি রক্ষা করা যায়? হয়ত আশা রাখা যায় বয়সের সড়কে অনেক মোড় থাকে একেক মোড়ে বোধহয় অভিনব কিছু লুকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার দেখা মেলে আর তখন নিজেকে চেনাই দায় হয়ে ওঠে। শৈশব এবং যৌবনের গোধূলিবেলায় কত আবছা আবছা স্বপ্ন পুঞ্জীভূত হয়, অদ্ভুত তার আকার আয়তন এমনকি দেহও। সম্মুখ পদক্ষেপে অন্য কিছু হয়ে যায়। আমার মুখে কার নিঃশ্বাস অমন তপ্ত আর্দ্র নিঃশ্বাস শিরশির করে আমার গণ্ডদেশকে চুম্বনের আগ্রহে এগিয়ে আসে অথচ কোথাও স্পর্শ করে না শুধু নিঃশ্বাসের বায়ু জানান দেয় কে যেন এগিয়ে আসছে তার সুন্দর গ্রীবার উপর রক্ষিত শিরশোভাসহ যেমন ফুলদানির উপর সাজানো কুসুমের জনতা তুমি সাবাস পাও তাও ওই হাওয়ার অনুষঙ্গ দেহজ কিছু নয় এই তুমুল অন্ধকার অসীম শূন্যতা চুম্বন-বিরহিত তোমার গণ্ডদেশ পুড়তে থাকে আর নিকটে কিছু আসে না কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না নির্বাক বোবার জগতে বাস করা দুঃসাধ্য কী শুধু যোগাযোগের অভাবে না নিজেকে নিজে সম্বোধন করতে যদি না পারো যত কথাই তুমি বলো না কেন তা লুফে নেওয়ার আর কেউ না থাকে। তুমি শূন্য থেকে শুধু পড়তেই থাকবে এবং প্রার্থনা করবে এমন অবস্থার চেয়ে শেষপর্যন্ত পাতালই যদিও জানো সেখানে পতন অর্থ কঠিক বাস্তবের সঙ্গে তোমার সংঘাত আর তুমি নিমেষে চুরমার সহস্র খণ্ডে ছিটকে পড়বে। এদিক-ওদিক কিন্তু দুঃখ সেই পাতালেরই চত্বরে আলোর ছোঁয়াচ পাবে না আর কোনোদিন চেতনা যতই অটুট থাকুক না কেন আহ সিতারা বিশাল পৃথিবীর খণ্ড অংশ মাত্র দেখা যায় কিন্তু বিন্দু সিন্ধু হয়েই আসে, তুমি তার সাক্ষী কাছে এসো আরো নিবিড় নৈকট্যে পার্থক্যের পরিখা আমরা পার হতে পারলাম না। আমার আর পার হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই কে প্রশ্ন তুলবে তুমি তো নও একবছর আমার কাছে শতাব্দীর প্রসার নিয়ে এসেছিল শেষ মুহূর্তে যখন আসমানে জায়গা পেলাম তখন তোমার সঙ্গে ভালোরূপে হিসাবের আর সুযোগ রইল না হয়ত নগরের বাতাস লেগেছিল আমার গায়ে তাই তোমার সান্নিধ্য প্রত্যাশী কিন্তু তা-ও না বসীরন তো শহরেই মানুষ অবাঙালি দুই তরুণী রূপসী ছিল না কিন্তু লাবণ্যময়ী এবং যৌবনের দুকূল ছাপানো উচ্ছলতা চিরন্তন-বিস্তার নিতম্বে ও বক্ষোত্থিত উদ্বৃত্ত যুগল গোলকে যুগল দুই গোলার্ধ-পৃথিবী অথবা সোগরার চিকন দেহলতা কিন্তু উক্ত দুই এলাকায় দুই ভগিনী প্রতিযোগিতায় আবদ্ধ সকলেই নগরের বাতাসে মানুষ কিন্তু তারা আমার চোখকে আঁকড়াতে সক্ষম হয় নি মুহূর্তের তরে। এখানে গ্রামের কথা তোলাও নিছক খেয়াল জসিম চাচির মেয়েরা তো কচি খুকি ছিল না কিন্তু কারো ভেতর থেকে কিছু ডাক দিতে পারত না আমাকে তারা আমার নিকট অবিশ্যি খুব সহজলভ্য ছিল যদি বাধাও থাকত যথা বয়সে বড় গ্রামে দৃষ্টিকটু পার হতে পারতাম। আহ সিতারা কোনো অনুশোচনা আজ তোমার কানে পৌঁছে দিতে আমি অক্ষম মুহূর্তের প্রেক্ষাপটে আমার কুড়িটি বসন্ত ধেয়ে যায় দুর্দম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতি তারই স্রোতস্নাত আমার বক্ষস্পন্দন কিন্তু আর দ্রুত নয় এত ঢিমা... তোমার চোখ কান প্রতারিত হবে জীবনে সম্ভাবনা তো অন্তহীন তার একটা পাকড়ে আমরা এগোতে থাকি কিন্তু আরো নানা সম্ভাব্যভাবে যে তা বিন্যস্ত হতে পারে এই সোজা বাক্য কেউ কর্তব্যের মধ্যে আনতে অক্ষম হয়ত ধাপে ধাপে এগোতাম কিন্তু পারিবারিক গোলযোগে আমার এক ধর্ণি ভেঙে গেল সাঁকো-পথে হাঁটার সময় যা হতে পারে আর এক ধর্ণির উপর তখন হাত রাখলাম ভবিষ্যতে তোমার হাতের আশা অবিশ্যি অত সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারতাম না ওই আশা যদিও বিরূপ মন সব চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা পেত তিন চার বছর পরে তুমি ফিরে আসতে আমি ততদিনে দিনের চাকা বদলে ফেলতাম সেই সংকল্পই করছিলাম হঠাৎ এক ষাঁড় এসে উপস্থিত আমার সাজানো বাগান তছনছ তারপরও এগোতে লাগল আমাকে গুঁতিয়ে ধরাশায়ী করতে শুধু আমাকে নয় আমার অধস্তন এই দেশের ভবিষ্যতের নাগরিকদের আর বাগান মানে আমার বাগান নয় গোটা দেশ তাই তো দুচার জন মাতৃহরণকারী আত্মস্বার্থান্ধ ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেই এমনভাবে আলোড়িত এই উৎসভূমি সকলের উৎসভূমি সেখানে পৌঁছতে পারলেই এই মানব-জন্ম সার্থক হয়। সমস্ত মানুষ যখন এমন সম-চেতনার বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সমস্যার মোকাবিলা করে তখনই নিজেকে খুঁজে পায় প্রত্যেক ব্যক্তি এবং বইয়ের জগতের সঙ্গে অপর মানুষের সঙ্গে যে-পরোক্ষ-অপরোক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা তাকে দেয় অনির্বচনীয় আনন্দ এমন প্রেমই মানব-জন্ম সার্থক করার জন্যে কাম্য অধ্যাপক সালামতের কথাগুলো মনে আছে আবছা যদিও উপলব্ধি সিতারা এইখানে মাটির উপর শয়ান আমার দিকে একবার চেয়ে দ্যাখো তোমার চোখে চোখ পড়লে তুমি অন্যদিকে ত্বরা দৃষ্টি ফিরিয়ে ধরতে আর অন্যদিকে আমি ওই মুহূর্তের ঝিলিকে সফল চাওয়া-পাওয়ার শেষপ্রান্তে উপনীত পৃথিবীকে অসহ্য পুলক ছাড়া আর কিছু ভাবতে অক্ষম যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে হাসিমুখে পাঞ্জা কষতে রাজি হওয়া অতি সহজ অথচ সবই নেপথ্য রয়ে গেল। আমার ধূলিধূসর রক্তস্নাত এই বেশ কোনো বিবাহবাসরের দুলার নয় তবু এইখানে এই মজলিসে আমার দুলহিনের সাক্ষাৎ পাই সে আমার চোখে চোখ মেলে আছে এবং আমি তারই গহনে ক্রমশ সাঁতার কেটে যাই কী পরম আনন্দে নতুন জীবন যেন বদ্ধ জলাশয়ের মাছের নিকট বন্যার পানির গন্ধ এমনই উন্মাত্ততা সেই সৌরভে যে স্থির থাকা অসম্ভব এই মওজের ডাকে মাতাল ছাড়া তুমি আর কিছুই হতে পারো না হিসেব সেখানে অবান্তর যারা হিসেবী তারা নিজেদের সীমাবদ্ধতার গণ্ডীতে আটক করে ফেলে অনুভূতি সেখানে ম্রিয়মাণ ধনী আত্মীয়ের ভোজসভায় দরিদ্র স্বজন তুমি দূরে ছিলে দূরেই থাকো নগীবউদ্দীনের কন্যা যদি নাগিনী হয় আজব কিছু নেই তার মধ্যে জনক দেশের সকল মানুষের বিরুদ্ধ অনেকের সওয়াল সেখানে তুমি তো একজনের সর্বনাশের কারিগর অপরাধ অবিশ্যি হাল্কা প্রচণ্ডভাবে হাল্কা তার বিচার হয় না প্রয়োজন হয় না আমার সম্মুখে গাঢ়তম নীরবতার কুয়াশা আরো গভীরে ধাবমান বড় দ্রুত গাঢ়তম নির্জনতা তার দোসর এই সমতলে একবার ডাক দিয়ে যাও পরীক্ষা হোক নীরবতা এবং নির্জনতার ষড়যন্ত্রের প্যাচাল শক্তি কত দূর মোকাবিলা করতে পারে তোমার ডাক মনে হতো একদা সকল নীরবতা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চূর্ণকারী আজ আর তা মনে হয় না সম্মিলিত মানুষের ভেতর থেকে যে-কল্লোল উত্থিত তার সামনে পাহাড় ধ্বসে যায় তেমন আহ্বান আমার কর্ণপটে তাই তো এক করোটে শুয়ে আছি মাটির উপর কান পেতে তোমার ডাক খামখা ফালতু কিছু মনে হতে পারে তবু উৎকর্ণ থাকি মানবিক দুর্বলতার নববধূ এমন দীন বাসর-শয্যায় তুমি আসবে কেন তুমি তো সম্রাজ্ঞী ফিরে যাও মেহিদী রঞ্জিত তোমার করতল আমার করতলে রক্তের আলপনা তা কোনো শত্রুর শোণিত নয় অন্য সময় আফসোস করতাম আজ তা করব কোন দুঃখে কবির বাণী কণ্ঠে তুলে নিলাম...এবার জেনেছি সুনিশ্চয়...মৃত্যুকে করে ক্ষয়... মৃত্যুই জীবনের আরেক রকম বিস্তার হতে পারে অনেক পরে জেনেছি প্রিয়তমা আমার আশেপাশে আহতদের গোঙানি কানে গিয়েছিল বৈইকী আজ স্বার্থপরের মতো অনড় অসহায় শুধু শোনার পালা যেন কিছু করার ছিল না আমার দিক থেকে হাত অবশ তবু একবার ওঠার চেষ্টা পেয়েছিলাম পাঁজরের নিচে সাড়াশি দিয়ে কে যেন হেঁচকা টান দিলে হাড়ভাঙা মটমট শব্দের মতো অস্পষ্ট কিছু আর এগোতে পারলাম না অসহায়তা অক্ষমতার ঢের বেশি মর্মদাহী সম্পাদনজাত অসাফল্যের চেয়ে মাটির এত নিকটে আছি অথচ মাটির ধর্ম আমাকে স্পর্শ করল না সবই তো মৃত্তিকা-জাত মৃত্তিকা-উত্থিত আমি মাটির উপর শয়ান অনড় কোনো প্রস্তরপিণ্ড নই শুধু হৃৎস্পন্দন এবং ধমনীপ্রবাহের জন্যে নচেৎ আর কোনো পদবাচ্য মনুষ্য-পদবাচ্য না না না মুদ্রিত দুনয়ন তবু দৃষ্টির প্রতিবন্ধক কিছু আর নেই কে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে চেনা চেনা সুহৃজ্জন রেজা আলাওল কাজেমী পরিবার খলিল চাচা রহমান মিয়া খালেক পাটোয়ারী বাপজান মা মা মা না না না কর্ণপট-বিদারী এই তারস্বর দিগন্তে মিলিয়ে যায় বৈকালের উড়ন্ত পাখির ঝাঁকে সমস্র নীলিমায় নিচে গ্রাম্য নদী ফাল্গুনের রোদ পোহায় ঝোপঝাড়ে পূরবীর আবেগ তরঙ্গ সন্ধ্যা বিলম্ব করে না চাষির দাওয়ায় সারাদিনের মেহনত শেষ টুংটাং অবসর হু টানার মৃদু ডাক পিদিমের আলোয় রমণীরা চালের কাঁকর বাছে তাদের দিন তো কোনো কোনো সময় রাতের দ্বিতীয় প্রহর পেরিয়ে যায় সেখানে পরিশ্রম কালহীন প্রবেশ করে আমরণ বসবাসের জন্যে আহ কে সামনে চাউলের ডালা নিয়ে বসে আছে আমি তোমাকে চিনি তুমি আমাকে লুকোচুরি খেলা শিখিয়েছিলে সেই সেদিন থেকে যেদিন আধা-ফোটা বোলে আধ-ফোটা বোধে তুমিই ছিলে পৃথিবীর সড়কপথে হাঁটার তরে আমার প্রথম সবক-দাতা না সবক-দাত্রী কী কও কথা আজ কার লগে সবাই আমার চেনা হুনছ শহরে গুলি অইছে কাল তুমি আমারে আজ মাগরিব তক কিছু কইলে না অন্য মানষের মুখে না হুনলে ত আজও হুনতাম না জাফর মাকেই নাই কই নাই ক্যান কও নাই আমার পোলা নাই শহরে কই নাই তুমি খামাখা চিন্তা ভাবনা করবা তা-ই তা-ই কী শহরে তোমার পোলা আছে আমার পোলা নাই না হে দুস্‌রা কোন বিবির না আমার পোলার তোমার না গুসা হও গুসা হওয়ার কাম করলে গুসা করুম না আমি হুনছি আর কোনো খেতং নাই কারো শহরথন কেউ আইলে খবর পামু আমার বুক কাঁপে জাফর বাপ একডা পোলা তারেও ঘরে রাখার পারলাম না ঘরে থাইকলে তো মানুষ অইত না হ তুমি মানুষ হও নাই আমাদের মতো মানুষ অইব ক্যান আমাগো পোলা আরো বড়

অইব লিখাপড়া শিখলে সাব অইব কাল ফজরে খোঁজ নিতাম গুলি করছে হালারা গুলির কী ছিল এই যে রহমান ভাই আসেন শহরের খবর হুনছেন তো? হুনছি আন্দেশা করার কিছু নাই শহরে হাজার হাজার মানুষ থাকে হগ্‌গলরে তো মাইরা ফেলে নাই কেউ হগ্‌গলের লইয়া তো কাম নাই আমাগো একজন লইয়া কারবার রহমান ভাইসাব ঘোমটার ভেতর থেকে এই কথা আসে না আসে আরো গোপন বুকের নিভৃত কিনার থেকে তা আমি ছাড়া কারো বুঝার সাধ্যি নাই না নাই জননী বাংলাভাষা এত রক্ত ছিল এই শীর্ণ শরীরে পূর্বে কেউ জানিয়ে দেয় নি কেন? আহ শব্দ কিসের শব্দ এই অনবরত ক্রেঙ্কার মাঝে মাঝে শুধু লয় বদলায় সাপের মতো ট্রেন দুদ্দাড় হুশ্‌হাশ্ বেরিয়ে যাচ্ছে যেন একটা পুরু কংক্রিটের দেওয়াল সজোরে অদৃশ্য কিছুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা-মত্ত ভাষণ বদলায় ছোট বড় চাকার বাহিনী বঙ্গদেশ বাংলাভাষা বঙ্গদেশ বঙ্গদেশ বাংলাভাষা ভাষাবাংলা বাংলাদেশ দেশবাংলা বাংলাভাষা বঙ্গদেশ আর কিছু আজ কান তৈরি করতে প্রস্তুত অথচ ছেলেবেলায় এই চক্রসংগীত একেক এলাকায় একেক ভাবে বেজে উঠত কেন বাবা বিবি কোথাও কোথাও আগে চল পিছে চল শত রকমের তেলেনা গীত হতো একদা এত স্পিড মনে হয় মাথার উপর রেললাইন বসানো আছে আর ইঞ্জিন হেঁকে যাচ্ছে একদিন ফাস্টক্লাসে চড়েছিলাম সাহেব না হয়েও সেখানে চার সাহেব ছিল কিন্তু আমি নিচু স্তরের কেউ তখন মনে হয় নি অপরাধী ওরা আমি কুঁচকে যাব নাকি ওদের সামনে পুঁটলি খোওয়া তরুণ এমন কেঁচো কেন অথচ আমিও কেঁচো বনে যেতে বসেছিলাম তা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি হাঁক-ফুকার আমি চিৎকার দিতে পারি দুবছর না তিন বছর পরে ওর সাথে দেখা তার অবস্থা ফিরে গেছে কাপড়-চোপড় স্মার্ট চরণ-চালনা তা বলে দেয় অকপট সে বললে টাকাটা তার কাজে লেগেছিল একসঙ্গে তিন শ টাকা কম কথা নয় সে ব্যবসায় নেমে ছিল অল্প পুঁজি নিয়ে এখন অনেক গুণ বর্ধিত। বাপের মৃত্যু সেখানে তুচ্ছ ঘটনা ওর কথা বলার ঢঙে স্পষ্ট প্রকাশ। ঘেন্নায় আমি স্তব্ধবাক মুখ ফিরিয়ে নিতাম তখনই ট্রেন এসে পড়েছিল প্ল্যাটফর্মে ছোকরাটা ভিড়ে মিলিয়ে গেল আমার মতই কম্পার্টমেন্টের খোঁজে। উপকার সামাজিক উপকার হতে পারে সবসময় বাজি রেখে বলা যায় না কোন কর্মের ফল কেমন হবে ফাল্গুনের মৃদু হাওয়া কোন যোজন থেকে এত নিকটে সমাগত তা জিজ্ঞাসার সুযোগ অনুপস্থিত তবু বুকের স্তিমিত স্পন্দন একটু দ্রুত ধায় রেসের পাগলা ঘোড়া নয় অবিশ্যি স্টেথিসকোপে ধরা পড়বে না এই ভাষা সংখ্যা এখানে অবান্তর গণনায় ফলহীন জননী বাংলাভাষা এত রক্ত ছিল এ শরীরের এত রক্ত শত শত শতাব্দীর বঞ্চনা আমার সত্তার ভেতর শংকর মাছের লেজে তৈরি চাবুকের এত ফাটা দাগ কাটা দাগ আমি ভারবাহী পশুর সহোদর-রূপেই মনুষ্যজীবনের স্বাদ পেয়েছি হিসাব করতে এগোব না কত যুগ নয় কত মন্বন্তর আজও ঘাড়ের জোয়াল পায়ের ডাণ্ডাবেড়ি খুলতে অসমর্থ কিন্তু ধুঁকে ধুঁকেও মনিব-বন্দনার মহড়া আমার রপ্ত তাই মুহূর্তে হুতাশন হতে পারি নি ধূমায়িত দিবা-রাত্রের প্রহরের ভেতর আত্মকরুণা আত্মধিক্কার আমার এক ধরনের অবসর-বিনোদনী মানস-বিলাস এমন ক্ষেত্রে বাইরে তাকিয়ে যাচায়ের কোনো বালাই থাকে না নিজের গান নিজে গাও নিজে শোনো যদি অন্য লোক থাকে কেউ না

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা বায়বীয় কিছু অন্য কারো মানুষ আছে পৃথিবীতে তা মনে জায়গা দিও না অথচ তোমার গান কিন্তু মানুষের জন্য তুমি নিজেই তা প্রচার করো এমন পন্থা তোমাকে বেছে নিতে হয় কারণ তেমন ঘোষণা ছাড়া তুমি তো আবার মানুষ থাকতে পারো না এই আত্ম-অবমাননা তুমি প্রকাশ্যে করো না কিন্তু মনেমনে তুমি জানো তুমি মানুষ নও নচেৎ আত্মকরুণা আত্মধিক্কার আসে কোথা থেকে হে জননী বাংলাভাষা এত রক্ত ছিল এ শরীরে মাটির উপর থিকথিক জমাট রক্তিম সমুদ্র চোখ ছিল স্বপ্ন দেখার হাতিয়ার সেখানে ওই লাল দরিয়ার ঝিলিক ক্রমশ স্তিমিত দৃষ্টির আলোছায়ার ভেতর ডুবে যাচ্ছে আজকের দিনের সূর্য যা আগামী প্রত্যুষের রবি ওইখানে অন্ধকার এখনো চুম্বনের প্রত্যাশায় ভয় পায় তবু এগিয়ে যায় স্তিমিত স্পন্দন স্তিমিত দৃষ্টি স্তিমিত শ্রবণ নিস্তেজ ঘ্রাণের তাগদ ওরা আমাকে দেখে স্পন্দনহীন ওদের ক্রুর মোটা দৃষ্টি কখনো তলিয়ে দেখতে শেখে নি তাই ভুল করে ধরে নেয় আমি মড়া মড়া না না আমি অন্তরের বংশধর ইতিহাসের ঝঙ্কার প্রাগূষার শিহরণ-কম্পন জীবনের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া যুগে যুগে ওই মূর্খের দংগল কখনো উপলব্ধি করে না মগজের চারপাশ দস্তা ঢাকা বোধের প্রবেশ কোন রন্ধ্র দিয়ে আর হবে আহম্মক মূর্খ নাদান নির্বোধ আজ চিৎকার মারফৎ আমি জানাতে অক্ষম আমি মৃত নই কোনোকালে ছিলাম না মাটির উপর শয়ান মাটি এই দেশ আকাশকে ধরে রাখে আমি সেই মৃত্তিকার অণু অণুতম অংশ রূপ বদলে যাই এক থেকে আরেক আদল আমার আপাতক্ষয় তো ক্ষয় নয় অন্য আকারে পরিবর্তন মূর্খেরা বোঝে না সংঘাতই প্রাণলীলা আমি সচেতন খেলোয়াড় তাই মোকাবিলায় মেতে উঠি স্থবিরতা আমার ধর্ম নয় ফাল্গুনের এই বৈকাল ঝরে যায় গ্রাম নয় তবু শহরেও বনজ সৌরভ কম নয় এসব ওদের নাসিকায় পৌঁছায় না কোনো মৌসুম-সংবাদ ওদের কাছে গিয়ে আসান দেয় না এসেছি এসেছি রবে কারণ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উৎপাদন নরনারী অর্থাৎ মানুষ এই মানুষের রক্তের গন্ধ পায় ওরা রাক্ষসের মতো মানুষের গন্ধ পায় না তাই প্রকৃতির মৌসুমের আনন্দময় খবর ওদের চেতনায় সাড়া তুলতে অক্ষম আজও ওদের চোখ আমার বুকের স্পন্দন দেখে না যা ফল্গুধারার মতো তিমিরাভিসারী এত আলো চতুর্দিকে এত আলো স্তব্ধ ঠোঁট বাচাল হৃদয় নিজে নিজেই সংলাপ-মত্ত শ্রোতা নিষ্প্রয়োজন জননী বাংলাভাষা এত রক্ত ছিল এ শীর্ণ শরীরে...ওদের ভাষায় আমি মৃতদেহ মূর্খ মূর্খ পাঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল আমার আয়তন কয়েক ফুট ইঞ্চি দিয়ে মাপা ওদের খসলৎ নির্বোধেরা তবু লাশ সরায় আহত জন হত হয় গুম কারবার চালু হয় অপরাধের বোঝা হাল্কা করতে যেন পৃথিবীকে ঠেলে আরেক কক্ষপথে নিয়ে যাওয়া যায় বেআক্কেল পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের ধাক্কায় ধাক্কায় হটানোর অভিলাষী অধ্যবসায়ের গল্প ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়েছিল আজও ভুলতে পারে নি মগজ তো সেইখানে একঠায় দাঁড়িয়ে আছে পূর্বের জায়গায় ১৯৪৮ সনে পুলিশ কনেস্টবলেরা লালবাগ এলাকায় প্রতিবাদে রুখে উঠেছিল তাদের শাস্তি পাল্টা চোটে বহু হতাহত সব লাশ পাওয়া যায় নি মাত্র চার বছর আগেকার ঘটনা তবু অধ্যবসায়ের গল্প পুনরক্ত হয় বারবার হাসি পায় ইতিহাসের নির্বোধেরা কিছুই শেখে না আহ ঐতিহ্যের পাতা উল্টে যাও উল্টে যাও আমার নাম লিখো না লেখা অবান্তর আমাকে খণ্ডিত করো

না আমি অখণ্ড পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল মনে রেখো তোমরা মনে রেখো মনে রেখো জননী....জননী...এত...রক্ত...ছিল...এ শীর্ণ শরীরে.. বাপজান শহরে এসেছিলেন খলিল চাচার লগে.................আমার কোনো খোঁজ পান নি.............আমার লাশের কোনো হদিস ছিল না...................... গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছেন বাপজান বাসের প্যাসেঞ্জার.......নির্বিকার গাড়ি এগোতে লাগল*

....

*এই উপন্যাসের আরম্ভ শ্রী মণীন্দ্র রায়ের একটি কবিতার প্রতিধ্বনি— শেষের এক জায়গায় দুই পঙক্তি (এবার জেনেছি/ সুনিশ্চয় মৃত্যুই মৃত্যুকে করে ক্ষয়) কবি আবুল হোসেন লিখিত কবিতার অংশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত ওসমান
সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ॥ জানুয়ারি, ১৯১৭। পাড়া মেহেদী মহল্লা। গ্রাম : সবলসিংহপুর। থানা : খানাকুল। মহকুমা : আরামবাগ। জেলা : হুগলী। রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ। রাষ্ট্র : ভারতবর্ষ।

পিতা ॥ শেখ মহম্মদ এহিয়া। মাতা : গুলেজান বেগম।
শওকত ওসমান সাহিত্য ক্ষেত্রের ছদ্মনাম। আসল নাম শেখ আজিজুর রহমান।

শিক্ষা ॥ প্রথমে মক্তব, সবলসিংহপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা এবং পরে ১৯২৯-এ কলকাতা মাদ্রাসা-এ আলিয়ায় ভর্তি হন সপ্তম শ্রেণীতে। নবম শ্রেণীতে এ্যাংলো-পার্সিয়ান শাখায় স্থানান্তর। ১৯৩৩-এ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৩৪-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি এবং ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস। ভর্তি হন অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স ক্লাসে। ১৯৩৯ সালে বি.এ. পাস। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ.।

পেশা ॥ ১৯৪১-এ কলকাতায় গভর্নমেন্ট কমার্স কলেজে প্রভাষকের পদে যোগদান। ১৯৪৭-এ দেশ-বিভাগের সময় অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের মত করেই পূর্ববঙ্গে অপশন দিয়ে চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে যোগদান। ১৯৫৯ সালে ঢাকা কলেজে বদলি হন। ১৯৭০ সনে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত। ১৯৭২ সালে ১ এপ্রিল চাকরি শেষ হবার আগেই অবসর নেন, যাতে পূর্ণকালীন সাহিত্য-চর্চা করতে পারেন। চট্টগ্রামে বসবাস করতেন ৩৪ বি চন্দনপুরায় এবং ঢাকায় নিজ বাসগৃহে ৭ এ মোমেনবাগ, ঢাকা ১২১৭ ঠিকানায়।

পরিবার ॥ পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ঝামটিয়া গ্রামের জনাব শেখ কওসর আলী ও গোলাপজান বেগমের কনিষ্ঠ কন্যা সালেহা খাতুনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ১৯৩৮ সালের ৬ মে। জ্যেষ্ঠপুত্র বুলবন ওসমান, দ্বিতীয় পুত্র আসফাক ওসমান, তৃতীয় পুত্র ইয়াফেস ওসমান, চতুর্থ পুত্র মরহুম তুরহান ওসমান, কন্যা আনফিসা আসগার, কনিষ্ঠ পুত্র জাঁ-নেসার ওসমান, সর্ব কনিষ্ঠ কন্যা মরহুমা শারমনি ওসমান।

বিদেশ ভ্রমণ ॥ পাকিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক, ইরান, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স।

পুরস্কার ॥ ১৯৬২ সালে আদমজী, ১৯৬৬ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭ প্রেসিডেন্টের প্রাইড অব পারফরমেন্স পদক, ১৯৮৩ একুশে পদক, ১৯৮৬ নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক, ১৯৮৮ মুক্তধারা পুরস্কার, ১৯৯৬ মাহবুব উল্লাহ ফাউন্ডেশন পদক, ১৯৮৯ ফিলিপস্ সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯১ টেনাশিস্ পুরস্কার এবং ১৯৯৭ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার।

মৃত্যু ॥ সকাল ৭.৪০ মিনিট, ১৪ মে ১৯৯৮, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্য-কর্ম

উপন্যাস ॥ বণি আদম ১৯৪৬, জননী ১৯৫৮, ক্রীতদাসের হাসি ১৯৬২, চৌরসন্ধি ১৯৬৬, সমাগম ১৯৬৮, রাজা উপাখ্যান ১৯৭০, জাহান্নম হইতে বিদায় ১৯৭১, দুই সৈনিক ১৯৭৩, নেকড়ে অরণ্য ১৯৭৩, জলাংগী ১৯৭৪, রাজসাক্ষী ১৯৮৩, পতঙ্গ পিঞ্জর ১৯৮৩, আর্তনাদ ১৯৮৫, পিতৃপুরুষের পাপ ১৯৮৬, রাজপুরুষ ১৯৯২।

ছোটগল্প ॥ পিঁজরাপোল ১৯৫০, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প ১৯৫২, সাবেক কাহিনী ১৯৫৩, প্রস্তর ফলক ১৯৬৪, উভশৃঙ্গ ১৯৬৮, তিন মীর্জা ১৯৮৬, মনিব ও তাহার কুকুর ১৯৮৬, পুরাতন খঞ্জর ১৯৮৭, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯৯০, হস্তান্তর ১৯৯১।

কাব্যগ্রন্থ ॥ নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত ১৯৮২, শেখের সম্বরা ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৯২।

নাটক ॥ তস্কর লস্কর ১৯৪৪, বগদাদের কবি ১৯৫০, আমলার মামলা ১৯৫২, কাঁকরমনি ১৯৫২, জন্ম-জন্মান্তর ১৯৬০, নষ্টতান অষ্টভান ১৯৮৬, তিনটি ছোট নাটক ১৯৮৯।

শিশু-সাহিত্য ॥ ওটেন সাহেবের বাংলো ১৯৪৪, তারা দুইজন ১৯৫৪, মশফোন ১৯৫৭, ডিগবাজী ১৯৬৪, এতিমখানা ১৯৬৪, প্রাইজ ও অন্যান্য গল্প ১৯৬৯, জুজুগগা ১৯৬৯, ক্ষুদে সোস্যালিস্ট (মুজিব নগরের সাবু) ১৯৭৩, ছোটদের নানা গল্প ১৯৮২, ছোটদের কথা রচনার কথা ১৯৮৩, পঞ্চসঙ্গী ১৯৮৭।

প্রবন্ধ ॥ সমুদ্র নদী সমর্পিত ১৯৭৩, ভাব-ভাষা-ভাবনা ১৯৭৪, ইতিহাসে বিস্তারিত ১৯৮৫, সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই ১৯৮৬, মুসলমান মানসের রূপান্তর ১৯৮৬, পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা ১৯৯০, উপদেশ-কুপদেশ ১৯৯১।

আত্ম-জীবনীমূলক রচনা ॥ স্বজন স্বগ্রাম ১৯৮৬, কালরাত্রি খণ্ডচিত্র ১৯৮৬, মন্তব্য মৃগয়া ১৯৯০, অনেক কথন ১৯৯১, গুডবাই জাস্টিস মাসুদ ১৯৯৩, স্মৃতিখণ্ড : মুজিবনগর ১৯৯৩, উত্তরপর্ব : মুজিবনগর ১৯৯৪, অস্তিত্বের সঙ্গে সংলাপ ১৯৯৪, সোদরের খোঁজে স্বদেশের সন্ধানে ১৯৯৫, পোর্ট্রেট গ্যালারি ১৯৯৬, আর এক ধারাভাষ্য ১৯৯৬।

অন্যান্য রচনা ॥ হপ্তম পঞ্চম ১৯৫৪, সম্পাদনা : ফজলুল হকের গল্প-প্রতিভা প্রজ্বলিত নিমেষে নির্বাসিত ১৯৮৩, সমালোচনা : Eyeless in the urn by Sanjib Datta ১৯৮৩।

অনুবাদ ॥ নিশো (উপন্যাস) ১৯৪৮-৪৯, টাইম মেশিন ১৯৫৯, পাঁচ কাহিনী (লিও টলস্টয়) ১৯৫৯, স্পেনের ছোটগল্প ১৯৬৫, পাঁচটি নাটক (মলিয়র) ১৯৭৮, ডাক্তার আবদুল্লাহর কারখানা (নাটক) ১৯৭৩, পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষ ১৯৮৫, সন্তানের স্বীকারোক্তি (অমৃতা পৃতম) ১৯৮৫।

ইংরেজিতে অনূদিত ॥ Janani (জননী), State Witness (রাজসাক্ষী), Laughter of Slave (ক্রীতদাসের হাসি), God's Adversary and Other Stories (ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী), Bankajol (জলাংগী)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~